Written strictly according to the new syllabuses for Calcutta, Burdwan and North Bengal Universities on Political Science Paper 1 for Three Year Degree Course.

আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান

[ত্রিবার্ষিক স্নাতক শ্রেণীর প্রথম পত্রের পাঠ্যপুস্তক]

উৎপল রায় এম. এ., এল. এল. বি

প্রধান অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ,

কাটোয়া কলেজ

কাটোয়া, বর্ধমান

চ্যাটার্জি পাবলিশার্স

১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট.

কলিকাতা-১২

SYLLABUS

Three Year Degree Course

POLITICAL SCIENCE

PAPER I

Definition and scope of Political Science—Relation of Political Science to other Sciences—Methods of Political Science.

Definition of State—Difference between State, Government and other Associations.

Leading Theories of the Origin and Nature of the State—Theory of Divine Origin—Theory of Force—Theory of Social Contract—Views of Hobbes, Locke and Rousseau—Evolutionary Theory of the Origin of the State—Organic Theory about the nature of the State—The Idealist Theory—Marxist conception of the State,

Nature and characteristics of Sovereignty—Legal and Political Sovereignty—De Jure and De Facto Sovereignty—Doctrine of Popular Sovereignty—Austinian Theory of Sovereignty—its critical estimate—Theory of Limited Sovereignty. Attack upon the Monistic Theory of Sovereignty.

Definition and nature of Law—Different kinds of Law—Sources of Law. Distinction and relation between law and morality. Relation between Law and Liberty—The Concept of Liberty—Safeguards of Liberty in a modern State—Concept of Natural Law and Natural Right.

Meaning of Nationality—Nation and Nationalism—Essential elements of Nationality—Right of Self-Determination—Mono National State Vs. Poly National State—Dangers of Nationalism—Nationalism and Internationalism.

Citizens and Aliens—Modes of acquiring Citizenship—Rights and Duties of citizens—Hindrances to good citizenship—Relation between Rights and Duties.

Union of State and Forms of Government – Personal and Real Union—Confederation—Federal Union—Nature and types of Federation—Chief features and conditions of Federation—Merits and defects of Federation—Alliance – Distinction between Unitary and Federal Governments.

Forms of Governments—Monarchy, Aristocracy, Oligarchy and Democracy—Types of Democracy – Strength and weakness of Democracy—Comparison between Democracy and Dictatorship—Conditions essential to the suceess of Democracy.

Structure of Government—Organisation and functions of Legislature, Executive and Judiciary—Bicameralism, its merits and defects—Separation of Powers.

Functions of Government – Individualism and Socialism—their comparative merits and defects—Types of Socialism.

Constitution—Different kinds of constitutions—their strength and weakness.

Party system—Its advantages and disadvantages—Two-party system vs. Multiple-party system—One party Rule.

Public opinion—Its nature and its importance in Popular Government—Agencies for the formation of Public opinion.

Electorate—Universal Suffrage—Methods of minority representation—Direct and Indirect election—Relation between the representative and its constituency.

ভূমিকা

স্নাতক পাঠ্যক্রমে রাষ্ট্রবিজ্ঞান পঠন-পাঠনের ক্ষেত্রে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ইদানীংকালে লক্ষ্য করা যাইতেছে। প্রথমত, পঠনযোগ্য একটি স্বতন্ত্র বিষয় হিসাবে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বীকৃত লাভ করিয়াছে। ইহারই জন্য রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিষয়বস্তুর বিশেষীকরণ (Specialisation) ও উন্নত-মানের আলোচনার প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে অনুভূত হইতেছে। দ্বিতীয়ত, পাস পাঠ্যক্রম (Pass course) পর্যন্ত পরীক্ষার মাধ্যম হিসাবে মাতৃভাষাকে গ্রহণ করিবার বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ব্যাপকভাবে অনুসৃত হইয়াছে। রাষ্ট্রবিজ্ঞান পঠন-পাঠন এবং পাঠ্য পুস্তক রচনার ক্ষেত্রে এই দুইটি পরিবর্তনের ভূমিকা যে খুবই গুরুত্বপূর্ণ তাহা স্মরণ রাখিয়াই স্নাতক পাস পাঠ্যক্রমের প্রথম পত্রের পাঠ্যপুস্তক হিসাবে 'আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান' রচনা করিবার চেষ্টা করিয়াছি।

স্নাতক শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের নিকট রাষ্ট্রবিজ্ঞান একটি নতুন ও অপরিচিত বিষয়, অথচ বয়সে তাহারা একান্তই তরুণ। তাই রাষ্ট্রবিজ্ঞানের পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত সমস্ত বিষয়কে যথাযোগ্য মান এবং গুরুত্ব সহ ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে পরিচিত করাইবার ক্ষেত্রে আলোচনার জটিলতা পরিহারের চেষ্টা করিয়াছি, যাহাতে ইহা সুকুমার মনে কোনরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি না করিয়া বরং রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিষয়ের প্রতি একটি স্বাভাবিক আকর্ষণ সৃষ্টি করিতে পারে।

যে কোন বিষয়ে বিশেষ করিয়া রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে ছাত্র-ছাত্রীদের নিকট যথাযথভাবে উপস্থাপিত করিবার ব্যাপারে ভাব ও ভাষার প্রাঞ্জলতা অপরিহার্য বলিয়া মনে করি। বাংলা পরিভাষার কিছু কিছু অপ্রতুলতার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও ভাষা যাহাতে বক্তব্যের যথার্থ বাহন হইয়া উঠিতে পারে এবং ভাষার দুর্বলতার জন্য বক্তব্য যাহাতে হোঁচট না খায় এবং অর্থহীন বা দ্ব্যর্থবোধক হইয়া না উঠে সেই দিকে লক্ষ্য রাখিয়া এই পুস্তকের আগাগোড়া ভাষায় প্রাঞ্জলতা রক্ষার চেষ্টা করিয়াছি। মাতৃভাষা যথেষ্ট পরিপুষ্ট এবং সমৃদ্ধশালী নয় এই অজুহাতে কোন কোন মহল হইতে শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে মাতৃভাষাকে গ্রহণ না করিবার যে কথা বলা হয় তাহা সত্য নহে; এবং আশাকরি অদূর ভবিষ্যতে সর্বস্তরে শিক্ষা ও পরীক্ষার মাধ্যম হিসাবে মাতৃভাষার প্রবর্তন ঘটিবে।

প্রতিটি অধ্যায়ের আলোচিত বিষয়বস্তু সমস্ত অধ্যায়ে ছড়াইয়া বিক্ষিপ্তভাবে আলোচনা পরিহার করিয়া প্রতিটি বিষয়কে স্বতন্ত্র অংশে আলোচনা করিয়াছি

এবং আশাকরি এই পদ্ধতি অনুসরণে ছাত্র-ছাত্রীরা বিভ্রান্তি হইতে মুক্ত থাকিবে এবং বিশেষভাবে উপকৃত হইবে। সমস্ত তত্ত্ব ও বক্তব্যকে বিতর্কমূলক বিভিন্ন দৃষ্টিকোন ও মতবাদের আলোতে পর্যালোচনা করা হইয়াছে, কিন্তু ব্যক্তিগত মতবাদের দ্বারা ইহাকে ভারাক্রান্ত করা হয় নাই।

এই পুস্তক রচনার ব্যাপারে হুগলী মহসীন কলেজের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের প্রধান অধ্যাপক শ্রীরঘুবীর চক্রবর্তী মহাশয় নানা উপদেশ দিয়া আমাকে উৎসাহিত করিয়াছেন। তাঁহার প্রতি আমার শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি। ইহাছাড়াও বিদ্যাসাগর (প্রাতঃ) কলেজের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের প্রধান অধ্যাপক শ্যামল চক্রবর্তী, হুগলী মহসীন কলেজের অধ্যাপক কমলেন্দু চক্রবর্তী, বর্ধমান রাজ কলেজের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের প্রধান অধ্যাপক মৃত্যুঞ্জয় ভট্টাচার্য্য এবং অধ্যাপক সুধীর রায়, বিদ্যাসাগর কলেজের অধ্যাপক সত্যসাধন চক্রবর্তী, বাঁকুড়া ক্রিশ্চিয়ান কলেজের অধ্যাপক মনোরঞ্জন মণ্ডল, বর্ধমান উইমেন্স কলেজের অধ্যাপিকা কমলা গুহ, বগুলা শ্রীকৃষ্ণ কলেজের অধ্যাপক মিহির ভাদুড়ী এবং কাটোয়া কলেজে আমার সহকর্মী অধ্যাপক রবীন্দ্রনাথ গুহ, অধ্যাপক হিমাচল চক্রবর্তী, এবং অধ্যাপক সুভাষ ভট্টাচার্য্য বিভিন্ন ভাবে সহযোগিতা ও উৎসাহিত করিয়া আমাকে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করিয়াছেন।

পুস্তকটি প্রকাশ ও মুদ্রনের ব্যাপারে চ্যাটার্জী পাবলিশার্স কর্তৃপক্ষ এবং চ্যাটার্জী প্রিণ্টার্স প্রেসের কর্মীবৃন্দ প্রভৃত পরিশ্রম করিয়াছেন। তাঁহাদের প্রতি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি।

পুস্তকটিতে কয়েকটি অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি এবং সতর্কতা সত্ত্বেও কিছু কিছু ছাপার ভুল রহিয়া গেল। দ্বিতীয় সংস্করনের প্রয়োজীয়তা দেখা দিলে পুস্তকখানি এই সমস্ত দোষ-ত্রুটি মুক্ত হইয়া যাহাতে প্রকাশিত হইতে পারে সেই দিকে দৃষ্টি রাখিব।

'আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান' যদি ছাত্র-ছাত্রীদের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিষয়ের প্রতি আকর্ষন সৃষ্টি ও বৃদ্ধি করিয়া উহাদের উপকৃত করে এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞান অধ্যাপনায় নিযুক্ত সহকর্মী বন্ধুদের দ্বারা পুস্তকটি যদি সমাদৃত হয় তবেই নিজের পরিশ্রম সার্থক হইয়াছে বলিয়া মনে করিব।

বিনীত—

উৎপল রায়

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায়

রাষ্ট্রচিন্তার ক্রমবিকাশ

আজ হইতে প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে প্রাচীন গ্রীস দেশে রাষ্ট্রতত্ত্বের আলোচনার সূত্রপাত ঘটিয়াছিল। যদিও ইহা একটি প্রাচীন বিষয় কিন্তু আমাদের দেশে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের পঠন-পাঠন অতি অল্পদিন হইতে শুরু হইয়াছে। এমনকি জ্ঞান-বিজ্ঞানে উন্নত ইউরোপের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়েও এই বিষয়ে আলোচনার সূত্রপাত একশত বছরের বেশী নয়। স্বভাবতঃই রাষ্ট্রবিজ্ঞানের প্রকৃতি ও বিষয়বস্তু সম্পর্কে ধ্যান-ধারণা এখনও একটি চূড়ান্ত রূপ পরিগ্রহ করিতে পারে নাই। কিন্তু গতিশীল জীবন ও যুগের সঙ্গে রাষ্ট্র-বিজ্ঞানের একটি সহজ ও স্বাভাবিক সম্পর্ক রহিয়াছে বলিয়া এই বিষয়টি ক্রমশ অধিকতর জনপ্রিয়তা লাভ করিতেছে।

অন্ধকারাচ্ছন্ন যুগের বর্বর মানুষ বিবর্তন ও অগ্রগতির মধ্য দিয়া আজ জ্ঞান-গরিমা ও নিত্য নতুন সাফল্যের অধিকারী হইয়া সভ্যতার নব-দিগন্ত সৃষ্টির দিকে অগ্রসর হইতেছে। ভাবিয়া বিস্মিত হইতে হয়, অন্ধ-বিশ্বাস, কুসংস্কার, ধর্মবোধ, যুক্তিহীন মনোভাব প্রভৃতির পথ বিসর্জন দিয়া মানুষ কি করিয়া নিরবচ্ছিন্ন অগ্রগতির সোপান ভাঙ্গিয়া সভ্যতার স্বর্ণ-শিখরে উপনীত হইল। আদিতে যে মানুষের জীবনে ন্যায়-অন্যায় নির্দেশক কোন প্রকার নিয়ম কানুনের অস্তিত্ব ছিল না, এবং যে মানুষ শৃঙ্খলার অনুশাসনে আবদ্ধ জীবন-যাপনের কথা স্বপ্নেও ভাবিতে পারিত না,—ক্রমে ক্রমে সেই মানুষ শুধুমাত্র আইন-শৃঙ্খলাকেই মানিয়া লইল না, জীবনকে সুন্দর ও মহান করিয়া গড়িয়া তুলিবার প্রতিটি উপাদানকে আয়ত্ত করিল। ফলে, সৃষ্ট হইল সমাজ ও রাষ্ট্র।

প্রাগৈতিহাসিক যুগের সেই ঘনীভূত তমসাকে বিদীর্ণ করিয়া কিভাবে আমরা বর্তমান রাষ্ট্রনৈতিক স্তরে উপনীত হইয়াছি তাহা রাষ্ট্র-বিজ্ঞান তথা সমাজ-বিজ্ঞানের প্রতিটি ছাত্র-ছাত্রীর জানা আবশ্যক। রাষ্ট্র-বিজ্ঞান সমাজ-বিজ্ঞানেরই একটি শক্তিশালী শাখা এবং সমাজ ও রাষ্ট্রকে কেন্দ্র করিয়াই

মূলত ইহার ধারা প্রবাহিত। ডঃ গার্ণারকে (Dr. Garner) অনুসরণ করিয়া বলা যায় যে রাষ্ট্রকে কেন্দ্র করিয়াই রাষ্ট্র-বিজ্ঞানের আলোচনার সূত্রপাত ও সমাপ্তি (Political Science begins and ends with the state)। যে রাষ্ট্রকে লইয়া রাষ্ট্র-বিজ্ঞানের মূল আলোচনা সেই রাষ্ট্রের উৎস, চরিত্র প্রভৃতির শিকড় রহিয়াছে অন্ধকারাচ্ছন্ন অতীতের মধ্যে। সুতরাং অতীত হইতে বর্তমান পর্যন্ত সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক পরিক্রমায় মধ্য দিয়াই রাষ্ট্র-বিজ্ঞানের ধারাটিকে যথার্থভাবে উপলব্ধি করা যাইতে পারে বলিয়া আমরা এই আলোচনার সূত্রপাত করিলাম।

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, বর্তমান মানব সভ্যতা, সমাজ ও রাষ্ট্র বিরামহীন বিবর্তনের ফলশ্রুতি। বিবর্তনের মধ্য দিয়া যে ক্রমবিকাশ ঘটিয়াছে তাহা উপলব্ধি করিবার চেষ্টা করিলে দেখা যাইবে যে, প্রতি মুহূর্তে প্রতিনিয়ত জীবন ও সমাজের প্রতিটি স্তরে তিল তিল করিয়া পরিবর্তন ঘটিতেছে, যাহা আমরা সহজে অনুভব করিতে পারি না। কিন্তু একটা বিরাট সময়ের ব্যবধানে কোন একটা স্তরে প্রতি মুহূর্তের এই সূক্ষ্ম পরিবর্তনগুলি সঞ্চিত হইয়া যখন গুণগত ও মূলগত পার্থক্য সূচিত করে তখনই আমরা সেই পরিবর্তনকে উপলব্ধি করিয়া থাকি। এইরূপ পরিবর্তনকে মোটামুটিভাবে আমরা বিবর্তন নামে অভিহিত করিতে পারি। সমাজ, সভ্যতা ও রাষ্ট্র এই বিবর্তনের ফলশ্রুতি—ইহা কোন এক বিশেষ দিনে সৃষ্টি হয় নাই, যুগ-যুগান্তরের বিবর্তনের মধ্য দিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে। দুগ্ধকে দধিতে রূপান্তরিত করিবার জন্য রাখিয়া দিলে কোন একটা বিশেষ মুহূর্তে দুগ্ধের গুণের পরিবর্তন ঘটিয়া ইহা দধিতে রূপান্তরিত হয় না। অর্থাৎ প্রতিটি মুহূর্তে দুগ্ধ তাহার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হারাইয়া ক্রমশ দধির বৈশিষ্ট্য লাভ করিতেছে এবং দধিতে রূপান্তরিত হইবার পথে অগ্রসর হইতেছে। সুতরাং চেষ্টা করিলেও বোঝা যাইবে না কোন মুহূর্তে ইহা দুগ্ধ হইতে দধিতে রূপান্তরিত হইল। সুতরাং বলা যাইতে পারে যে, প্রতিটি মুহূর্তের বিরামহীন পরিবর্তনের মধ্য দিয়া দুগ্ধ দধিতে পরিণত হইয়াছে।

কোন একটা বিশেষ মুহূর্ত পর্যন্ত ইহা দুগ্ধ ছিল এবং পরের মুহূর্তেই ইহা দধিতে পরিণত হইল, ইহা যেমন সত্য নয়, তেমনি মানুষের সমাজ, সভ্যতা, রাষ্ট্র এবং জীবনবোধের পরিবর্তন কোন একটা বিশেষ দিন বা সময়ের ঘটনা নয়। এই পরিবর্তন প্রতিনিয়ত আমাদের অগোচরে ঘটিতেছে এবং

প্রাগৈতিহাসিক যুগের জীবনকে বর্তমান সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে রূপান্তরিত করিবার ক্ষেত্রে রহিয়াছে এই বিরামহীন পরিবর্তন।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের জনক আরিষ্টটল (Aristotle) মানুষকে মূলত সামাজিক জীব বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। সমাজ প্রবনতা মানুষের স্বাভাবিক ধর্ম। বস্তুত, সমাজকে কেন্দ্র করিয়াই মানুষের জীবন বিবর্তিত ও বিকশিত হইয়াছে, সামাজিক ধারাই মানুষের জীবনের গতি ও প্রকৃতি নির্ণয় করিয়াছে। এই সমাজ প্রবণতার জন্যই প্রাক্-রাষ্ট্রীয় যুগেও মানুষকে সংঘবদ্ধ জীবন-যাপন করিতে দেখা গিয়াছে। সংঘবদ্ধ জীবনের তাগিদ হইতে কালক্রমে গঠিত হইয়াছিল সমাজ এবং সমাজ বিবর্তনের যে সমস্ত স্তর অতিক্রম করিয়া মানুষ বর্তমান যুগে উপনীত হইয়াছে তাহার ইতিহাস যেমন বিস্ময়কর তেমনি চিত্তাকর্ষক।

মানুষের জীবন, সমাজ ও রাষ্ট্রের ক্রমবিকাশের ক্ষেত্রে ভৌগোলিক, অর্থ নৈতিক, সামাজিক ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা প্রভৃত প্রভাব বিস্তার করিয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু যে সমস্ত প্রেরণা ও ধারা সমাজ বিবর্তনে চালিকা শক্তি হিসাবে কাজ করিয়াছিল তাহারা হইল : জৈবিক প্রেরণা, ধর্মীয় প্রেরণা ও আত্মরক্ষামূলক সংহতির প্রেরণা। সমাজ বিবর্তনের এই ধারাগুলির প্রভাব অপরিসীম গুরুত্বের অধিকারী।

নারী ও পুরুষের পারস্পরিক স্বাভাবিক জৈব আকর্ষণ এবং তাহার ফলে বংশ বৃদ্ধি ও পরিবার সৃষ্টি সমাজ গঠনের অন্যতম মূল ভিত্তি। জৈব প্রয়োজন ও বংশ বৃদ্ধির মধ্য দিয়া গঠিত হইয়াছে পরিবার এবং পরিবারই হইল সমাজ জীবনের প্রথম পদক্ষেপ। জৈবিক মানুষের নিকট পরিবার একটি স্বাভাবিক ও সক্রিয় ব্যাপার। পশুদের জীবনে সর্বোচ্চ সংগঠন হইল যূথ এবং যূথ-জীবনই পশু-জীবনের চরম পরিণতি। কিন্তু মানব-জীবনে পরিবার ও যূথকে সমাজ জীবনের প্রথম ও সর্বনিম্ন সংগঠন হিসাবে অভিহিত করা যায়। পূর্বে যৌন সম্পর্ক কোন বন্ধন বা নিয়ম-কানুন মানিয়া চলিত না বলিয়াই সম্ভবত মাতৃ-তান্ত্রিক পরিবার প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল। কারণ নির্বিচার যৌন সম্পর্ক প্রচলিত থাকিলে শিশুর পিতৃত্ব নির্ণয় করা সম্ভবপর নয়, কিন্তু মাতৃত্ব নিশ্চিত। নির্বিচার যৌন সম্পর্ক হইতে মুক্তিলাভের ফলেই পরবর্তীকালে সুদৃঢ় পারিবারিক ভিত্তি স্থাপিত হয়। একদিকে পারিবারিক ভিত্তির সুদৃঢ় প্রতিষ্ঠা, অপরদিকে সম্পদ বৃদ্ধির ফলে পারিবারিক জীবনে স্ত্রীলোকের চাইতে

পুরুষের ভূমিকা অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ হইয়া উঠিল। ফলে, পিতৃ-প্রধান পরিবারের উদয় হইল। এঙ্গেলস্ (Engels) মাতৃ অধিকারের উচ্ছেদকে স্ত্রীজাতীর এক বিশ্ব-ঐতিহাসিক পরাজয় বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। কারণ, "এর ফলে স্ত্রী-জাতি হইল পদানত, শৃঙ্খলিত, পুরুষের লালসার দাসী, সন্তান সৃষ্টির যন্ত্র মাত্র।"

যাহাই হউক, আমাদের বক্তব্য জৈব প্রেরণা ও বংশ সৃষ্টির মধ্য দিয়া গঠিত হইয়াছে পারিবারিক জীবন, এবং পারিবারিক জীবনের ক্রমবিকাশের মধ্য দিয়া সৃষ্টি হইয়াছে সমাজ। সমাজের জনসংখ্যা বৃদ্ধি, সম্পত্তি-সৃষ্টি, ব্যক্তিগত মালিকানার জন্ম এবং ইহা হইতে উদ্ভূত অন্যান্য উপাদান রাষ্ট্রের উৎপত্তিকে আসন্ন, অনিবার্য ও অপরিহার্য করিয়া তুলিল।

জৈব প্রেরণার পরেই মানব-জীবনের ক্রমবিকাশের পথে ধর্মীয় প্রেরণা আদিম মানুষের জীবনে বিশেষভাবে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। অপরিচ্ছন্ন বুদ্ধি ও সীমিত অভিজ্ঞতার দ্বারা আদিম মানুষ প্রাকৃতিক শক্তির স্বরূপ বুঝিতে পারে নাই। এবং বিভিন্ন কার্য-কারণের ভিতরকার সম্পর্ক উপলব্ধি করিতে না পারিয়া ক্রমশ ধর্মীয় শক্তির নিকট নিজেদের সমর্পণ করিয়াছে। তাই চন্দ্র, সূর্য, তারকা, ভূমিকম্প, বিদ্যুৎপ্রবাহ, ঝঞ্ঝা, বৃষ্টি প্রকৃতির পশ্চাতে তাহারা দেব শক্তির প্রকাশ কল্পনা করিয়াছে, এই সমস্ত প্রাকৃতিক শক্তিগুলিতে দেবত্ব আরোপ করিয়াছে এবং ধর্মীয় রীতি-নীতির মাধ্যমে দেবতা ও ঈশ্বরের করুণালাভে সচেষ্ট হইয়াছে। প্রকৃতি রহস্য যখন মানুষের নিকট ছিল অনাবিষ্কৃত ও অজ্ঞাত, তখন ভীষণা প্রকৃতির শক্তিকে জয় ও বশ করিবার জন্য অগ্রসর হইয়াছিল মন্ত্র-তন্ত্র ও দৈবশক্তির অধিকারী তৎকালীন পুরোহিত, ধর্মযাজক ও ঐন্দ্রজালিকেরা। এই সমস্ত ধর্মযাজক ও ঐন্দ্রজালিকেরা মানব মনে প্রাধান্য বিস্তার করিয়া মানুষকে ধর্মভিত্তিক ঐক্যবদ্ধ করিয়াছে। পরবর্তীকালে ধর্মীয় প্রাধান্য বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে ইহারা রাষ্ট্রশক্তির উপরেও প্রাধান্য বিস্তারেরর চেষ্টা করিয়াছে এবং বহুক্ষেত্রে সাফল্য লাভ করিয়াছে। প্রাচীন মিশরের রাজা একাধারে প্রাচীন যাজক হিসাবে স্বীকৃতি ও দেবতা হিসাবে বন্দনা লাভ করিয়াছিলেন। মহাভারতেও দেখা যাইবে যে নায়কহীন পৃথিবীর মানুষকে শাসন করিয়া তাহাদের নিকট হইতে পূজা লাভ করিবার জন্য একজন নায়ককে পৃথিবীতে পাঠাইবার জন্য মানুষ ঈশ্বরের নিকট আকুল প্রার্থনা জানাইতেছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, ধর্মীয়

প্রেরণা, একই বিশ্বাস ও নির্দেশের বন্ধনে বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের সঙ্ঘবদ্ধ জীবনের পথকেই প্রশস্ত করে নাই, রাষ্ট্র গঠনের পাথেয় সৃষ্টিতেও প্রভূত সাহায্য করিয়াছে। ধর্মের প্রভাব মানুষের জীবনে যে কত' দৃঢ় ও ব্যাপক তাহা পরবর্তীকালে রাষ্ট্রনৈতিক ইতিহাসের পটভূমিকা বিশ্লেষণ করিলে সুস্পষ্ট হইয়া উঠিবে। ইতিহাস বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে, ধর্মকে বারবার অর্থ নৈতিক স্বার্থসিদ্ধি ও ক্ষমতা দখলের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করা হইয়াছে।

সমাজ গঠন ও রাষ্ট্রসৃষ্টিতে অপর যে প্রেরণাটি বিশেষভাবে কার্যকরী হইয়াছে, তাহা হইলে আত্মরক্ষামূলক সংহতির প্রেরণা। পারিবারিক জীবনকে যূথজীবনে রূপান্তরিত করার ক্ষেত্রে আত্মরক্ষার তাগিদ বহুলাংশে দায়ী। বিভিন্ন গোষ্ঠীর পারস্পরিক বিবাদ ও যুদ্ধকে কেন্দ্র করিয়া একদিকে গোষ্ঠীজীবনে ঐক্য ও সংহতি দেখা দিয়েছে; অন্যদিকে বাঁচিয়া থাকিবার জন্য মানুষকে নিত্য নতুন উপায় ও উপাদানের খোঁজ করিতে হইয়াছে। এরই ফলে বিনিময় ব্যবসা, দ্রব্যের আদান প্রদান প্রভৃতির মধ্য দিয়া অর্থ নৈতিক সম্পর্কে গড়িয়া উঠিয়াছে। এই বিরামহীন ক্রমবিকাশের চরম পরিণতি রূপলাভ করিয়াছে রাষ্ট্রগঠনের মধ্য দিয়া।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, জৈব প্রেরণা, ধর্মীয় প্রেরণা ও আত্মরক্ষামূলক সংহতির মধ্য দিয়া সমাজ জীবনের বিবর্তন ঘটিয়েছেন এবং ইহারই ফলশ্রুতি হিসাবে বিভিন্ন স্তরে যৌথ জীবন, সমাজ ও রাষ্ট্রের আত্মপ্রকাশ ঘটিয়াছে।

সুদীর্ঘ এই বিবর্তনে অর্থ নৈতিক পরিবেশ একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করিয়াছে। অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ হইতে মানবসমাজের এই বিবর্তনকে চারিটি স্তরে বিভক্ত করা যাইতে পারে।

অর্থ নৈতিক বিন্যাসের দিক হইতে বিশ্লেষণ করিলে প্রথম স্তরটিকে 'শিকারের যুগ' নামে অভিহিত করা যাইতে পারে। এই যুগে সভ্যতার আলো মানুষকে স্পর্শ করে নাই বলিয়া মানুষ আগুনের ব্যবহার জানিত না। জীবিকাগত দিক হইতে তাহারা ছিল মূলত শিকারী। দলবদ্ধভাবে তাহারা শিকারে বাহির হইত এবং শিকারলব্ধ কাঁচা মাংস ও ফল-মূল খাইয়া জীবন

জীবন ধারণ করিত। অর্থাৎ চাষবাস জানিত না বলিয়া শিকারই ছিল তাহদের মূল জীবিকা। কোন স্থানে স্থায়ীভাবে বসবাস করিবার অভ্যাস তাহাদের ছিল না, শিকারের অন্বেষণে দলবদ্ধভাবে যাযাবরের মতো ঘুরিয়া বেড়াইত।

নিছক শিকারের যুগে মানুষ পশুপালনের বুদ্ধি আয়ত্ব করিতে পারে নাই। কিন্তু সবসময়ে শিকারলব্ধ প্রয়োজনীয় আহার্য সংগ্রহের অনিশ্চয়তা মানুষকে পশুপালনের অভ্যস্ত করিয়া তুলিল। এই দ্বিতীয় স্তরটিকে 'পশুপালনের যুগ, নামে অভিহিত করা যায়। বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতা প্রসারের ফলে মানুষ পশুকে পোষ মানাইতে ও লালন-পালন করিতে শিখিল। ফলমূল ও মাংসের সঙ্গে পালিত পশুর দুগ্ধও এযুগের মানুষের জীবনধারনের উপকরণ ছিল। পশুচারণের প্রয়োজনীয়তার জন্যই মানুষকে উর্বর চারণভূমির সন্ধানে বাসস্থান পরিবর্তন করিতে হইয়াছে। অর্থাৎ পশুপালনের যুগেও যাযাবরবৃত্তির অবসান ঘটে নাই। এইরূপ মনে করিবার সঙ্গত কারণ আছে যে, পশুর মালিকানাকে কেন্দ্র করিয়া ধীরে ধীরে ব্যক্তিগত সম্পত্তি-বোধের উদ্ভব ঘটিয়াছিল।

পশুপালনের যুগের শেষের দিকে মানুষ কৃষির দ্বারা খাদ্য উৎপাদনে ক্রমশ পারদর্শী হইয়া উঠিল। এই স্তরটিকে 'কৃষিযুগ' নামে অভিহিত করা যায়। সমাজবিজ্ঞানীরা মনে করেন যে, কৃষির আবিস্কারে স্ত্রীজাতিরই অবদান ও ভূমিকা বেশী। কারণ পুরুষেরা যখন দীর্ঘ দিনের জন্য শিকারে বাহির হইয়া যাইত, তখন নারীরা খাদ্যাভাবে বিভিন্ন গাছপালার ফল মূলাদির অন্বেষণে ঘুরিয়া বেড়াইত এবং বীজ হইতে গাছ ও চাষের রহস্যকে ক্রমান্বয়ে আবিষ্কার করিল। কৃষিযুগে মূলত কৃষিজাত দ্রব্যই মানুষের জীবনধারণের মূল উপাদান হইয়া উঠিল। কৃষির প্রয়োজনে মানবগোষ্ঠীকে উর্বর ও সমৃদ্ধভূমির সন্ধান করিয়া সেই সমস্ত অঞ্চলে স্থায়ীভাবে বসবাস করিতে হইয়াছে। লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে সেইজন্যই পৃথিবীর বৃহৎ নদীগুলির উর্বর উপত্যকাকে কেন্দ্র করিয়া মানব সমাজের প্রাচীন সভ্যতা গড়িয়া উঠিয়াছিল। এই কৃষিযুগেই ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও মালিকানা-বোধের জন্ম হইল। কৃষিযুগের মধ্য দিয়াই পৃথিবীর ইতিহাসে স্থায়ী প্রভাবসৃষ্টিকারী সামন্ত প্রথা জন্মলাভ করিল।

কৃষিযুগে যে সভ্যতার উন্মেষ ঘটিল তাহারই পরিপুর্ণতা ঘটিল 'শিল্পযুগে'। সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে শুধুমাত্র কৃষিতে আবদ্ধ না থাকিয়া মানব সমাজ

দ্রুত শিল্পোন্নয়নের দিকে অগ্রসর হইতে শুরু করিল। বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে ব্যাপকভাবে কল-কারখানা স্থাপিত হইয়া ভোগ্যদ্রব্যের উৎপাদন বিশেষভাবে বৃদ্ধি পাইল। শুরু হইল পরিপূর্ণ শিল্পযুগ। এই ব্যাপক শিল্পপ্রসারকে 'শিল্প বিপ্লব' নামে অভিহিত করা হয়। বস্তুত, শিল্পবিপ্লব পৃথিবীর ইতিহাসে একটি যুগান্তকারী ঘটনা। বর্তমানে সামন্তপ্রথাকে উচ্ছেদ করিয়া শিল্পযুগ পরিপূর্ণভাবে বিকাশ ও প্রকাশ লাভ করিয়াছে।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে প্রত্যিটি যুগের ধনোৎপাদন ব্যবস্থা মানুষের জীবন ধারণ পদ্ধতিকে প্রভাবিত ও পরিবর্তিত করিয়াছে। ধনোৎপাদনের পদ্ধতি ও উপাদানের পরিবর্তনের ফলেই পশুপালনের যুগ হইতে ধীরে ধীরে আমরা বর্তমান স্তরে আসিয়া উপনীত হইয়াছি। জীবনে এই বিবর্তন বাস্তব কারণে ও ইতিহাসের অমোঘ নির্দেশে রূপায়িত হইয়াছে। রাষ্ট্রের ক্ষেত্রেও এই একই কথা প্রযোজ্য। সভ্যতার ক্রমবিকাশ ও প্রয়োজনের সঙ্গে সঙ্গতি রাখিয়া রাষ্ট্রের চরিত্র ও প্রকৃতি ক্রমাগত পরিবর্তিত হইয়া বর্তমান রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে।

প্রাচীন গ্রীসে এক একটি নগরকে কেন্দ্র করিয়া যে নগর-রাষ্ট্র বা City-State-এর অভ্যুত্থান ঘটিয়াছিল, সেই রাষ্ট্রের চরিত্র যুগ ও প্রয়োজনের সঙ্গে সঙ্গতি রাখিয়া ক্রমাগত পরিবর্তিত হইয়াছে। জীবনে সামাজিক, আধ্যাত্মিক, নৈতিক ও রাষ্ট্রনৈতিক প্রভৃতি দিকের সর্বাঙ্গীন উন্নতি সাধনই সে যুগের রাষ্ট্রের লক্ষ্য ছিল। গ্রীক্ ধ্যান ধারণায় রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্রের পরিধি ছিল ব্যাপক ও বিস্তৃত। রোমান যুগে রাষ্ট্রের কর্মপরিধিকে অনেকটা সীমিত রাখা হয়। রোমের রাজনৈতিক ও সাম্রাজ্যতান্ত্রিক শাসনপদ্ধতির মৌলিক আদর্শ তৎকালীন রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রনৈতিক মতবাদকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করিয়াছিল। খৃষ্টধর্মীয় আদর্শের দ্বারা মধ্যযুগের জীবন ধারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়। এই যুগে সামন্ত প্রথার উদ্ভবের ফলে শুধু মাত্র কর ধার্য করা ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার মধ্যেই রাষ্ট্রের ক্রিয়াকর্মকে আবদ্ধ রাখিবার চেষ্টা চলে। ষোড়শ শতাব্দীতে ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স ও স্পেনে সামন্ততন্ত্রের ধ্বংসের ভিতর দিয়া জাতীয় রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা হওয়ার জন্য সামন্তদের বিপুল ক্ষমতা রাষ্ট্রের অধীনে আনা হয়। ফলে, সাম্রাজ্যপ্রতিষ্ঠা ও বহির্বাণিজ্যের প্রসার ঘটে এবং আইন-শৃঙ্খলা,

শিক্ষা, সংস্কৃতি, কলা ও ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের ক্ষমতা ও কার্য প্রসারিত হয়।

'মার্ক্যান্ টাইলিষ্ট' নামে খ্যাত একদল দার্শনিক কৃষি, শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য প্রভৃতির ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণকে সমর্থন করিয়া বক্তব্য প্রচার করিবার প্রতিক্রিয়া হিসাবে 'ফিজিওক্র্যাটরা' আর্থিক ক্ষেত্রে ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্য ও প্রাধান্য দাবী করিলেন। ইহাদের মতে কৃষি, শিল্প, ব্যবসা ও বাণিজ্যের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রণ যত কম থাকিবে ও ব্যক্তিস্বাধীনতা হত বেশি থাকিবে ততই রাষ্ট্রের উন্নতি হইবে। উনবিংশ শতাব্দীতে এই মতবাদ পরিবর্তিত হইয়া ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের রূপ ধারণ করিল। ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবাদীরা রাষ্ট্রের সম্পূর্ণ বিলোপ দাবী করেন না বটে, কিন্তু তাহারা ব্যক্তির অধিকার ও স্বাধীনতাকে প্রসারিত করিয়া রাষ্ট্রের ক্ষমতাকে সংকুচিত করিতে চান। তাহারা মনে করেন যে, রাষ্ট্রের কার্যকলাপের গণ্ডীকে যত বেশি পরিমানে সীমিত করা যাইবে, রাষ্ট্র ও সমাজের তত বেশি মঙ্গল সাধিত হইবে।

ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবাদের প্রতিক্রিয়া হিসাবে সমাজতান্ত্রিক চিন্তার প্রকাশ ঘটিয়াছে। অপরপক্ষে সমাজতান্ত্রিক চিন্তার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তি-স্বাতান্ত্র্যবাদের প্রায় অবলুপ্তি ঘটিয়াছে। বর্তমান যুগ সমাজতন্ত্রের যুগ। তাই সমাজতান্ত্রিক দর্শনের ভিত্তিতে রাষ্ট্র গঠনের প্রবণতা বর্তমান যুগে বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হইতেছে। সমাজতন্ত্রের প্রবক্তা ও গুরু কার্ল মার্কস (Karl Marx) মনে করেন যে, প্রতিটি যুগের রাষ্ট্রীক ও সামাজিক বিধানের উপর সে যুগের শাসক শ্রেণীর স্বার্থ বিশেষভাবে প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে। সামন্ততান্ত্রিক যুগের রাষ্ট্র চিন্তা ও সামাজিক বিধানে সামন্ত প্রভুদের শ্রেণীস্বার্থ প্রতিফলিত হইয়াছে। তেমনি বর্তমান শিল্পযুগে যে অর্থ-নৈতিক ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তাহা মূলত সম্পদশালী শ্রেণীর স্বার্থকে রক্ষা করিবার জন্যই রচিত। বাস্তবানুগ সামাজিক ইতিহাসের ধারা বিশ্লেষণ করিয়া মার্কস্ দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন যে, সমাজে ও রাষ্ট্রে প্রতি যুগে শাসক ও শোষিত এই দুইটি শ্রেণীর অস্তিত্ব থাকে এবং ইহাদের মধ্যে শ্রেণী-সংঘর্ষ আবহমান কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে।

যাহাই হউক, রাষ্ট্রীয় বিবর্তন বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় এক সময় আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষা করা বা 'দারোয়ানী' করাই রাষ্ট্রের একমাত্র কাজ ছিল।

কিন্তু রাষ্ট্রীয় চিন্তার ক্ষেতে আমুল পরিবর্তনের ফলে সমাজতান্ত্রিক ও জনকল্যান-মূলক রাষ্ট্রে আবির্ভাব ঘটিয়াছে। বর্তমান যুগে রাষ্ট্র শুধু মাত্র আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষাই করে না, মানব জীবনের সর্বক্ষেত্রে ইহার হস্ত প্রসারিত। বর্তমান যুগে রাষ্ট্র পুরাতন গতানুগতিকতার পথ পরিত্যাগ করিয়াছে এবং জীবনের সর্বক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় শিকড় প্রসারিত হইতেছে। ইহার ফলে সমাজের বিভিন্ন অংশের মধ্যে সমন্বয় ও সহযোগিতার মনোভাব বৃদ্ধি পাইতেছে ও উন্নত জীবনযাত্রার পথ উন্মুক্ত হইয়াছে।

অপরদিকে বর্তমান যুগ উগ্র জাতীয়তাবাদ ও বিভিন্ন পরস্পরবিরোধী স্বার্থ ও শ্রেণী চেতনার সংঘাতে ভয়াবহ অবস্থা ধারণ করিয়াছে। যুদ্ধের বিভীষিকা কখনও বা ঠাণ্ডা ও কখনো বা উষ্ণরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়া সভ্যতার বুনিয়াদকে ধ্বংস করিবার জন্য নিয়ত প্রচেষ্টা চালাইতেছে। রাষ্ট্র চিন্তা ও মানব সভ্যতা তাই আজ এক বিরাট সংকটের সম্মুখীন। আমাদের যাহা কিছু সুন্দর, যাহা কিছু মহৎ এবং যাহা কিছু শ্রেষ্ঠ তাহাকে সর্ব প্রকার দুর্যোগের হাত হইতে রক্ষা করিতে হইবে। ইহার জন্য প্রয়োজন প্রতিযোগিতার পরিবর্তে সহযোগিতার হস্তকে প্রসারিত করা, আন্তর্জাতিক ভ্রাতৃত্ববোধ দ্বারা পৃথিবীকে উদ্বুদ্ধ করা। বিশেষ করিয়া বিগত দুইটি বিশ্বযুদ্ধের ব্যাপক ধ্বংসলীলার পর হইতে আন্তর্জাতিকার আদর্শ পৃথিবীতে ব্যাপকভাবে প্রসার লাভ করিতেছে। আগামী দিনের যুদ্ধ ও মারণাস্ত্রের ধ্বংসলীলা হইতে মানব সমাজ ও সভ্যতাকে রক্ষা করিবার শ্রেষ্ঠ উপায় হইতেছে আন্তর্জাতিকতাবোধ। এই আন্তর্জাতিক আদর্শের প্রতিষ্ঠানগত প্রকাশ ঘটিয়াছে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের (United Nations) মধ্য দিয়া।

কিন্তু সমস্যা হইল এই যে যতদিন উগ্র জাতীয়তাবোধ ও পরস্পর বিরোধী শ্রেণীতে জনসমষ্টি বিভক্ত থাকিবে ততদিন পর্যন্ত জাতির অহমিকার প্রকাশ ও শোষণের সম্ভাবনা উন্মুক্তই থাকিয়া যাইবে। সুতরাং শ্রেণীবিন্যাসমূলক সমাজের অস্তিত্ব যতদিন বর্তমান থাকিবে ততদিন আন্তর্জাতিকতায় মহান্ আদর্শে যুদ্ধহীন, শ্রেণীহীন সমাজ গঠনের সম্ভাবনা নাই।

মনে রাখিতে হইবে শোষণ, বঞ্চণা ও যুদ্ধের এই সর্বগ্রাসী ও বিপর্যয়কর অবস্থার মধ্য মানব সভ্যতাকে রক্ষা করিতে হইবে; সভ্যতার উপরে যে আবর্জনার স্তুপ জড়ো হইয়াছে তাহা হইতে ইহাকে মুক্ত করিতে হইবে। ইহার জন্য প্রয়োজন পৃথিবীর অপরাজিত মানুষের প্রতি বিশ্বাস ও গভীর

ভালবাসা। মনে রাখিতে হইবে যে, পৃথিবীর ইতিহাস রচনা করে মানুষ, কতিপয় শাসক ও যুদ্ধের উন্মাদনায় নিমজ্জিত ব্যক্তি নয়। মানুষের প্রতি গভীর বিশ্বাস ও ভালবাসাই আগামী দিনের উজ্জ্বল ইতিহাসের পাথেয়। সভ্যতার সংকট প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন :

"……মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ, সে বিশ্বাস শেষ পর্যন্ত রক্ষা করব। ……আর একদিন অপরাজিত মানুষ নিজের জয়যাত্রার অভিযানে সকল বাধা অতিক্রম করে অগ্রসর হবে তার মহৎ মর্যাদা ফিরে পাবার পথে। মানুষত্বের অন্তহীন প্রতিকারহীন পরাভবকে চরম বলে বিশ্বাস করাকে আমি অপরাধ মনে করি।"

দ্বিতীয় অধ্যায়

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সংজ্ঞা, প্রকৃতি, আলোচনাক্ষেত্র ও পদ্ধতি

(Definition, nature, scope and methods of Political Science)

মানুষের জীবনের একটি অপরিহার্য প্রতিষ্ঠান হিসাবে রাষ্ট্র আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। বস্তুত বর্তমান যুগে মানুষের জীবনের সঙ্গে রাষ্ট্র এমনি অঙ্গাঙ্গী-ভাবে জড়িত যে রাষ্ট্রচিন্তা হইতে পৃথক করিয়া মানুষের ইতিহাস পর্যালোচনা করা সম্ভবপর নয়। তাই, সমাজ সচেতন কোন মানুষই রাষ্ট্রবিজ্ঞান সম্পর্কে নির্লিপ্ত বা নিরপেক্ষ থাকিতে পারে না। রাষ্ট্রের উৎপত্তি হইতে সুরু করিয়া ইহার গঠন, পরিচালনা, নাগরিকের সঙ্গে সম্পর্ক ইত্যাদি সমুদয় রাষ্ট্র সম্পর্কীয় বিষয়ের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা একমাত্র রাষ্ট্রবিজ্ঞান আমাদের সামনে উপস্থিত করে। রাষ্ট্রবিজ্ঞান সম্পর্কে ধ্যান-ধারণা সৃষ্টি করিতে হইলে প্রথমেই ইহার সংজ্ঞা, প্রকৃতি, পরিধি সম্পর্কে আলোচনা করা প্রয়োজন।

১ ॥ রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সংজ্ঞা ও চরিত্র (Definition and nature) :

মানুষ মূলত রাষ্ট্রনৈতিক জীব। বস্তুত, রাষ্ট্রকে কেন্দ্র করিয়াই তাহার জীবন আবর্তিত ও বিকশিত হয়। রাষ্ট্রনৈতিক ধারাই মানুষের জীবন গঠনের গতি ও প্রকৃতি নির্ণয় করে। মানুষের রাষ্ট্রনৈতিক জীবনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্র সম্পর্কীয় বৈজ্ঞানিক আলোচনাকে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বলে। রাষ্ট্রের বিভিন্ন উপাদান যাহা মানুষের রাষ্ট্রনৈতিক জীবনকে স্পর্শ এবং প্রভাবিত করে তাহাই রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়। লাস্কিকে (Laski) অনুসরণ করিয়া বলা যায় যে রাষ্ট্রের পরিপ্রেক্ষিতে মানুষের জীবন বিশ্লেষণ করাই রাষ্ট্রবিজ্ঞানের কাজ।[1] বস্তুত রাষ্ট্রবিজ্ঞান সমাজবিজ্ঞানের একটি শাখা যাহা রাষ্ট্রের প্রকৃতি ও শাসন ব্যবস্থার মূল নীতি লইয়া আলোচনা করে। অর্থাৎ রাষ্ট্রের উৎস, গঠন ও কার্যাবলী ; রাষ্ট্রীয় তত্ত্ব, আদর্শ ও ক্ষমতা ; রাষ্ট্রের সরকার, আইন ও

1. **Political Science concerns itself with the life of men in relation to organised states.—Laski**

প্রতিষ্ঠানগুলি সম্পর্কে আলোচনা ও গবেষণাই রাষ্ট্রবিজ্ঞানের উপজীব্য বিষয়।[2] রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিষয়বস্তুকে আবার কোন কোন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী "বিশুদ্ধ রাষ্ট্রবিজ্ঞান" এবং "ফলিত রাষ্ট্রবিজ্ঞান" এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া উহাদের স্বতন্ত্র নামে অভিহিত করার পক্ষপাতী।

রাষ্ট্রবিজ্ঞান একটি গতিশীল বিষয়। তাই শুধুমাত্র রাষ্ট্র, সরকার ও শাসন-নীতি সম্পর্কীয় আলোচনার মধ্যেই রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু সীমাবদ্ধ থাকিতে পারে না। অতীতের ঘটনার পটভূমিকায় বর্তমান ও ভবিষ্যতের রাষ্ট্রনৈতিক বিষয়বস্তুর বিচার তথা বিশ্লেষণ করা রাষ্ট্রবিজ্ঞানের কর্তব্য।[3] ইদানীং কালে জার্মান রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা এক সম্মেলনে মানব জীবনের ব্যাপক সমস্যা, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার প্রয়োগ এবং সভ্যতা সম্পর্কীয় আলোচনাকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন।

কোন কোন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী মনে করেন যে রাষ্ট্রবিজ্ঞান ক্রমবিকাশের পথে, সুতরাং এখনই কোন সংজ্ঞা নির্দেশ করিয়া ইহার সীমারেখা টানিয়া দেওয়া ঠিক নয়। তাঁহাদের আশঙ্কা সংজ্ঞার পরিধি ক্ষুদ্র হইলে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের গণ্ডী যেরূপ সংকীর্ণ হইয়া দেখা দিবে, সেরূপ ইহার পরিধি অনর্থক ব্যাপক হইলে রাষ্ট্রবিজ্ঞান সামঞ্জস্যহীন হইয়া উঠিবে। আলোচনার সুবিধার জন্য রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিষয়-বস্তুকে সম্ভাব্য সীমার মধ্যে আবদ্ধ রাখিবার প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে একথা ঠিক। কিন্তু মানুষের রাষ্ট্রনৈতিক জীবন তাহার সামাজিক ও আর্থিক জীবনের প্রভাব মুক্ত নয়—তাই এই সমস্ত সংশ্লিষ্ট বিষয়বস্তুর আলোচনা রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সংজ্ঞার অঙ্গীভূত হইয়াছে।

২ ॥ বিষয়বস্তুর নামকরণ (Name of the subject) :

রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে বিভিন্ন নামে অভিহিত করা হইয়া থাকে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে জনক আরিস্টটল এই শাস্ত্রকে 'রাষ্ট্রনীতি' (Politics) নামে অভিহিত করিয়াছেন। কোন কোন দার্শনিক ইহার 'রাষ্ট্রদর্শন (Political

---

2. It is a science which is concerned with the state, which endeavours to understand and comprehend the state in its fundamental conditions, in its essential nature, its various forms of menifestion, its development.
—Bluntschli

3. Political Science is the study of past, present and future of political organisation and political function, of political institutions and political theories.—Gettell.

Philosophy) নামকরণ করিয়াছেন। রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মধ্যে কেহ কেহ এই শাস্ত্রকে 'রাষ্ট্রতত্ত্ব' (Theory of the state) বলার পক্ষপাতী। বর্তমানে অবশ্য এই শাস্ত্রটি 'রাষ্ট্রবিজ্ঞান' (Poltical Science) নামেই ব্যাপক পরিচিতি লাভ করিয়াছে। নিম্নে উপরোক্ত চারিটি নামের তাৎপর্য আলোচনা করা হইল।

রাষ্ট্রনীতি (Politics): রাষ্ট্রবিজ্ঞান শব্দটিকে যে অর্থে ব্যবহার করা হইা থাকে সেই অর্থেই আরিস্টটল রাষ্ট্রনীতি বা Politics শব্দটি ব্যবহার করিয়াছেন। রাষ্ট্রনীতি শব্দটি সম্ভবত প্রাচীন গ্রীক্ নগররাষ্ট্র ও নীতিকে বুঝাইবার জন্য ব্যবহার করা হইয়াছে। পরবর্তীকালে সিজউইক, (sidgwick) লর্ড অ্যাক্টন (Lord Acton) প্রভৃতি রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা এই নামকরণ সমর্থন করিয়াছেন। ইঁহারা রাষ্ট্রনীতিকে 'তত্ত্বগত রাষ্ট্রনীতি' (Theoretical Politics) ও 'ফলিত রাষ্ট্রনীতি' (Applied Politics) এইভাবে ভাগ করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে রাষ্ট্রের উৎস, বৈশিষ্ট্য, প্রকৃতি, গঠন প্রভৃতি বিষয়বস্তু তত্ত্বগত রাষ্ট্রনীতির অন্তর্ভূক্ত। ফলিত রাষ্ট্রনীতি বলিতে তাঁহারা সরকার সম্পর্কীয় আলোচনার কথা বলিয়াছেন।

'রাষ্ট্রনীতি' শব্দটি এই শাস্ত্রের সমুদয় আলোচ্য বিষয়বস্তুকে অঙ্গীভূত করিতে পারে কিনা এই বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে বলিয়া রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের একটি অংশ রাষ্ট্রনীতি নামকরণের বিরোধী। বস্তুত রাষ্ট্রবিজ্ঞান নামকরণের মধ্য দিয়া আলোচ্য শাস্ত্রে যেরূপ ব্যাপক বিষয়বস্তুকে অঙ্গীভূত করা সম্ভবপর, রাষ্ট্রনীতি নামের দ্বারা ইহার গণ্ডী কিছুটা পরিমাণে সংকীর্ণ হইয়া পড়ে বলিয়া ইহা সম্ভবপর নয়।

রাষ্ট্রদর্শন (Political Philosophy): রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে 'রাষ্ট্রদর্শন' নামে কোন কোন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী অভিহিত করিয়াছেন। রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তার পশ্চাতে রাষ্ট্রনৈতিক দর্শনের বিশেষ ভূমিকা রহিয়াছে বলিয়া সম্ভবত এই শাস্ত্রকে রাষ্ট্রদর্শন নামে অভিহিত করা হয়। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের পরিধি অনেক ব্যাপক—'রাষ্ট্রদর্শন' রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়বস্তুর একটি অংশ মাত্র। রাষ্ট্রদর্শন ব্যতীত আরও বহুবিধ বিষয় লইয়া রাষ্ট্রবিজ্ঞান আলোচনা করে। সুতরাং রাষ্ট্রদর্শন নামকরণের দ্বারা এই শাস্ত্রে বিষয়বস্তুকে সীমিত, খণ্ডিত ও অপূর্ণ করিয়া তোলা হইবে। তাই রাষ্ট্রদর্শন অপেক্ষা রাষ্ট্রবিজ্ঞান নামকরণ অধিকতর সুসঙ্গত।

রাষ্ট্রতত্ত্ব (Theory of the state) : 'রাষ্ট্রতত্ত্ব' শব্দটি ব্যবহারের সপক্ষে কোন কোন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। রাষ্ট্রের তত্ত্বগত বিষয় লইয়াই মূলত রাষ্ট্রতত্ত্বের আলোচনা কেন্দ্রীভূত থাকে বলিয়া ইহা রাষ্ট্রের উৎপত্তি, গঠন, বৈচিত্র্য এবং শাসনপদ্ধতি সংক্রান্ত আলোচনাকে অন্তর্ভুক্ত করিতে পারে না। বর্তমানে আমাদের আলোচ্য শাস্ত্রটি যেভাবে প্রসার লাভ করিয়া বিভিন্ন বিষয়বস্তুকে ইহার অঙ্গীভূত করিতেছে তাহাতে রাষ্ট্রবিজ্ঞান নামটি অধিকতর গ্রহণযোগ্য।

রাষ্ট্রবিজ্ঞান (Political Science) : বেশের ভাগ রাষ্ট্রবিজ্ঞানীই রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিষয়বস্তুর ব্যাপকতা ও আলোচনার গভীরতার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া এই শাস্ত্রকে রাষ্ট্রবিজ্ঞান (Political Science) নামে ব্যবহার করিয়াছেন। বর্তমানে শুধুমাত্র রাষ্ট্রের গতি প্রকৃতির মধ্যেই রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু পরিসমাপ্তি লাভ করে নাই। রাষ্ট্রের শাসন পদ্ধতি, শাসনসম্পর্কিত পরীক্ষা-নিরীক্ষা, সরকার সম্পর্কিত যাবতীয় আলোচনা এই বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। এইজন্য অনেকে বিষয়বস্তুর বিন্যাসকে বুঝাইবার জন্য শুধুমাত্র 'রাষ্ট্রবিজ্ঞান' না বলিয়া রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও শাসনপদ্ধতি (Political Science and Government) নামকরণের পক্ষপাতী।

৩॥ রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনা ক্ষেত্র (Scope of Political Science)

আরিষ্টটল (Aristotle) বলিয়াছেন, নিছক জীবনযাপন নয়, সুখী ও সুন্দর জীবন যাপন করাই মানুষের লক্ষ্য (The Purpose of a man is not only to live life but to live a good life)। এই সুন্দর জীবন যাপনের তাগিদ ও প্রেরণা হইতেই সৃষ্ট হইয়াছে সমাজ, রাষ্ট্র ও সরকার। যদিও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের মূলকেন্দ্রে রহিয়াছে মানুষ, কিন্তু শুধুমাত্র মানুষকে লইয়াই রাষ্ট্রনীতির পরিধি সীমাবদ্ধ নয়। সুন্দর মানব জীবন প্রতিষ্ঠার জন্য অন্যান্য যে সমস্ত সংশ্লিষ্ট সংস্থার অবদান রহিয়াছে স্বাভাবিক কারণে তাহারাও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের পরিধির মধ্যে স্থান লাভ করিয়াছে। সুতরাং মানুষ, রাষ্ট্র ও সরকার সম্পর্কীয় ব্যাপকতর বিষয়বস্তু রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত।

মানবকল্যাণই রাষ্ট্রবিজ্ঞানের উৎসের প্রধান কারণ এবং মানব জীবনের সুখ ও সমৃদ্ধি প্রসারিত করাই রাষ্ট্রনীতির মূল লক্ষ্য। এই লক্ষ্যে উপনীত হইবার

জন্য রাষ্ট্রবিজ্ঞান রাষ্ট্রের যেমন তত্ত্বগত আদর্শ স্থির করে তেমনি নাগরিকের অধিকার, দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে স্পষ্ট ধ্যান ধারণা গড়িয়া তোলে ও রাষ্ট্রনীতি নির্ধারণ করে। এই সমস্ত কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করিবার জন্য প্রয়োজন একটি সামাজিক সংস্থার—যাহার নাম রাষ্ট্র।

গার্নার (Garner) বলিয়াছেন : "Political Science begins and ends with the State"। সত্যই তাই, রাষ্ট্রকে কেন্দ্র করিয়াই রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সবকিছু আবর্তিত। সুতরাং রাষ্ট্রের উৎস হইতে শুরু করিয়া, ইহার গঠন, কার্য্য, বিবর্তন ও উপাদান সম্পর্কে সম্যক ধারনা সৃষ্টি করা রাষ্ট্রবিজ্ঞানের কাজ। কিন্তু যেহেতু রাষ্ট্রবিজ্ঞান একটি গতিশীল বিষয় সেইজন্য বর্তমান রাষ্ট্রকে যেভাবে আমরা দেখিতে পাই শুধুমাত্র তাহা বিশ্লেষণের ভিতর দিয়া রাষ্ট্রবিজ্ঞানের কাজ শেষ হইয়া যায় না। রাষ্ট্রের কর্তব্য, লক্ষ্য ও আদর্শের পটভূমিকায় রাষ্ট্রের কী রূপ পরিগ্রহ করা উচিত এই শাস্ত্র তাহাও আলোচনা করে। আরিষ্টটল বলিয়াছেন : মানবজীবনের প্রয়োজন হইতে সৃষ্ট হইয়া জীবনের সর্বাত্মক কল্যাণের জন্য রাষ্ট্রের অবিরাম প্রচেষ্টা চলিয়াছে।[4] অতীত হইতে শুরু করিয়া ভবিষ্যতের দিকে রাষ্ট্রের এই উত্তরায়ণ ও তাহার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সমুদয় ঘটনাবলী রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে।

পরবর্তী পর্যায়ে আসে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার কথা। ক্ষমতার ভিত্তি কী, কী ভাবে উহা প্রয়োগ করা যায়, কোথায় উহা প্রযুক্ত হয় এবং উহার ফল কী দাঁড়ায় ইত্যাদি সমুদয় বিষয় রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধিকারভুক্ত। অর্থাৎ রাষ্ট্রনীতির পরবর্তী আলোচনার বিষয়বস্তু হইতেছে সরকার। রাষ্ট্র পরিচালনা ও শাসন করে সরকার। তাই সরকারের গঠন, কার্যাবলী ও শ্রেণীবিভাগ রাষ্ট্রবিজ্ঞানের গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসাবে স্বীকৃতিলাভ করিয়াছে।

বর্তমান যুগে কোন রাষ্ট্রের পক্ষেই আত্মকেন্দ্রিক হইয়া বাঁচা সম্ভব নয়। প্রতিবেশী ও অন্যান্য রাষ্ট্র, সরকার, নাগরিক ও তাহাদের ঘটনাববী সম্পর্কে তাহাকে ওয়াকিবহাল থাকিতে হয় এবং পারস্পরিক উন্নতির জন্য ভাবের আদান প্রদান ও সৌভ্রাতৃত্বমূলক মনোভাব পোষণ করিতে হয়। চরম উদাসীন মনোভাব লইয়া কোন রাষ্ট্র বাঁচিতে পারে না। এইভাবে রাষ্ট্রবিজ্ঞান রাষ্ট্রীয় গণ্ডী ছাড়িয়া আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে নিজের সীমাকে প্রসারিত করিয়াছে।

4. "The state originated in the bare needs of life of man and it continues in existence for the sake of good life". Aristotle

১৯৪৮ সালে UNESCO-এর সম্মেলন নিম্নলিখিত বিষয়সমূহকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত করিবার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিয়াছে: (১) রাষ্ট্রীয় মতবাদ ও তাহার ইতিহাস, (২) রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান, তাহাদের সংবিধান ও বিভিন্ন রাষ্ট্রের তুলনামূলক আলোচনা, (৩) রাজনৈতিক দল ও মতবাদ, (৪) আন্তর্জাতিক বিধান, রাজনীতি ও সংস্থা। এই সমস্ত বিষয়কে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত করিবার ব্যাপারে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা মোটামুটি একমত।

এখন প্রশ্ন হইতেছে ভালমন্দ কোনরূপ মতামত প্রকাশ না করিয়া রাষ্ট্রবিজ্ঞান কী কেবলমাত্র বস্তুনিষ্ঠ এবং নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া সমস্ত কিছু বিশ্লেষণ করিবে? এক শ্রেণীর রাষ্ট্রবিজ্ঞানী অবশ্য মনে করেন যে, কোন প্রকার মূল্য নিধারণ বা মতামত প্রকাশের স্থান এই শাস্ত্র নয়। এই মতবাদের বিরোধিতা করিতে যাইয়া গ্রীভস্ (Greaves) আশঙ্কা প্রকাশ করিয়াছেন যে, এই মতবাদ ব্যাপকভাবে গৃহীত হইলে রাষ্ট্রবিজ্ঞান লোপ পাইবার সম্ভাবনা দেখা দিবে। একথা অস্বীকার করা যায় না যে, মূল্যায়ন বা ভালমন্দ সম্পর্কে একটি ধারণা নিরপেক্ষভাবে উপস্থিত করিতে না পারিলে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের গুরুত্ব ও প্রয়োজন বহুলাংশে কমিয়া যাইবে। এই প্রসঙ্গে রবসনের (Robson) বক্তব্য প্রনিধানযোগ্য। তিনি বলিয়াছেন যে রাষ্ট্রবিজ্ঞান শুধুমাত্র যাহা আছে তাহা লইয়াই সীমাবদ্ধ থাকিতে পারে না—যাহা হওয়া উচিৎ তাহাও ইহার বিষয়বস্তুর অন্তর্ভূত হওয়া উচিৎ। শাসন ব্যবস্থার গুণাগুণ সম্পর্কে বা ইহার ভাল-মন্দ সম্পর্কে রাষ্ট্রবিজ্ঞান নিরব ও নির্লিপ্ত থাকিতে পারে না।[5] সুতরাং মনে রাখিতে হইবে, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনা শুধুমাত্র কী আছে তাহা লইয়াই সীমাবদ্ধ নয়, কী হওয়া উচিৎ তাহা বিশ্লেষণ করাও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের দায়িত্ব।

৪ ॥ রাষ্ট্রবিজ্ঞান কি বিজ্ঞান? (Is Political Science a Science?)

রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে 'বিজ্ঞান' হিসাবে গ্রহণ করিবার রীতিকে আধুনিককালের ঘটনা বলিয়া উল্লেখ করা যাইতে পারে। কিন্তু রাষ্ট্রবিজ্ঞান প্রকৃতই বিজ্ঞান কিনা ইহা একটি বিতর্কমূলক বিষয়। রাষ্ট্র বিজ্ঞানের জনক আরিস্টটল ইহাকে চূড়ান্ত পর্যায়ের বিজ্ঞান বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। তাঁহার পদাঙ্ক অনুসরণ

5. "It is concerned both with what is and also with what should be. Political Science cannot be indifferent to the results of government, unable to distinguish between the good and the bad use of power....... So negative an attitude would deprive the subject its main interest, and render it devoid of significance and usefullness."—Robson.

করিয়া বোদাঁ (Bodin), হবস্ (Hobbes), সিজউইক (Sidgwick) প্রভৃতি রাষ্ট্র-বিজ্ঞানীগণ ইহাকে 'বিজ্ঞান' হিসাবে স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে 'বিজ্ঞান' হিসাবে গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিয়াছেন এমন পণ্ডিতের সংখ্যাও কম নয়। প্রসঙ্গক্রমে বার্ক (Bruke), মেটল্যাণ্ড (Maitland) প্রভৃতি পণ্ডিতের নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে 'বিজ্ঞান' আখ্যা দিবার বিরোধিতা করিয়া বাক্‌ল (Buckle) মন্তব্য করিয়াছেন : In the present State of knowledge, Politics so far from being a Science is one of the most backward of all arts। যাহা হউক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান 'বিজ্ঞান' কিনা বিচার করিবার জন্য আমরা দুইটি পদ্ধতির আশ্রয় লইব, প্রথমত ঐতিহাসিক এবং দ্বিতীয়ত বিশ্লেষণাত্মক।

ঐতিহাসিকভাবে বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে আরিস্টটল রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ধারাবাহিক পর্যবেক্ষণের নীতির প্রবর্তন করিয়াছিলেন। তাঁহার রাষ্ট্রনৈতিক বক্তব্য ১৫৮টি দেশের সংবিধান বিশ্লেষণের উপর ভিত্তি করিয়া গঠিত। সুতরাং তাঁহাকেই রাষ্ট্রবিজ্ঞানের জনক বলা যাইতে পারে। আরিস্টটলের এই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিকে আরও উন্নত পর্যায়ে প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন ইতালীয় বিখ্যাত রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ম্যাকেয়াভেলি (Machiavelli)। ম্যাকেয়াভেলির সর্বপ্রধান কাজ নীতিশাস্ত্র হইতে রাষ্ট্রনীতিকে পৃথকীকরণ এবং ইহার জন্যই তিনি প্রথম রাষ্ট্রবৈজ্ঞানিক হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করিয়াছেন। আরিস্টটল ও ম্যাকেয়াভেলির পদ্ধতিকে ষোড়শ শতাব্দীর ফরাসী দার্শনিক বোদাঁ তাহার বিশ্লেষণের মধ্যে প্রয়োগ করিয়াছিলেন। রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি কোন হইতে বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে হবস্, হারবার্ট স্পেনসার (Herbert Spencer) এবং মঁতেস্কোর (Montesquieu) নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বস্তুত, মঁতেস্কুকেই প্রথম আধুনিক রাষ্ট্রবৈজ্ঞানিক হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া যাইতে পারে। তিনি তাঁহার Spirit of the laws পুস্তকের বক্তব্যকে বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের দ্বারা উপস্থিত করিয়া রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সম্মুখে নতুন সম্ভাবনার দিগন্ত উন্মুক্ত করিলেন।[5]

বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রবিজ্ঞানকেও একটি প্রকৃত বিজ্ঞানে পরিণত করিবার প্রচেষ্টা ঊনবিংশ শতাব্দীতে বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়।

5. "I have not drawn my principles from my prejudices, but from the nature of things."—Montesquieu (The spirit of the laws)

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রখ্যাত চিন্তাবিদ সেণ্ট সাইমন (Saint Simon), কোঁৎ (Comte), স্পেনসার (Spencer), বেজহট (Bagehot) প্রভৃতির নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে, যাঁহারা রাষ্ট্রনৈতিক আলোচনার ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের আশ্রয় লইয়াছিলেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে আরিস্টটল হইতে সুরু করিয়া বেজহট পর্যন্ত চিন্তাবিদেরা রাষ্ট্রনীতি বিশ্লেষণে পর্যাপ্ত পরিমাণ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি গ্রহণ করিয়াছিলেন।

রাষ্ট্রবিজ্ঞান 'বিজ্ঞান' কিনা বিশ্লেষাত্মক পদ্ধতির দ্বারা এইবার বিচার করা যাইতে পারে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে বিজ্ঞান হিসাবে স্বীকার করিতে যে সমস্ত কারণে আপত্তি করা হয় তাহা নিয়ে আলোচনা করা হইল :

১। বিজ্ঞানের সংজ্ঞা অনুসারে রাষ্ট্র বিজ্ঞান বিজ্ঞান নয়।

২। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের কোন নির্দিষ্ট অনুশীলন পদ্ধতি নাই, কারণ ইহার বিষয়বস্তু খুবই জটিল।

৩। রাষ্ট্রীয় সংস্থা ও বিষয়বস্তু লইয়া গবেষণাগারে কোনরূপ পরীক্ষানিরীক্ষা করা সম্ভব নয়, কারণ ইহার বিষয়বস্তু খুবই ব্যাপক।

৪। পরিবর্তনশীল মানুষের সমাজ, রাষ্ট্র ও সংস্থা লইয়াই রাষ্ট্রনীতির কারবার। গবেষণার বিষয়বস্তু সদা পরিবর্তনশীল হইলে অভ্রান্ত সিদ্ধান্তে আসা সম্ভবপর নয়। তাই রাষ্ট্রনীতির গবেষণার ফল সর্বদাই অনিশ্চয়তাপুর্ণ।

৫। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের কোন ধারাবাহিকতা নাই, কারণ ইহার বিষয়বস্তু অস্থায়ী ও পরিবর্তনশীল।

এই সমস্ত যুক্তি যথেষ্ট শক্তিশালী সন্দেহ নাই। কিন্তু এই ব্যাপারে কোনরূপ সিদ্ধান্তে আসিবার পুর্বে আমাদের জানিতে হইবে 'বিজ্ঞানের' প্রকৃত সংজ্ঞা কী ? কেবলমাত্র যুক্তির ধারাবাহিকতাকে আমরা বিজ্ঞান বলিব ? অথবা, কোনরূপ ব্যতিক্রম ব্যতীত নির্দিষ্ট কারণে যদি নির্দিষ্ট ঘটনা ঘটে (যেমন পদার্থ ও রসায়নবিত্যার ক্ষেত্রে) এমন বিষয়কেই কেবলমাত্র বিজ্ঞান বলিব ? অথবা, রীতিসম্মত পর্যবেক্ষণ, অভিজ্ঞতা ও পর্যালোচনার ভিত্তিতে যদি কোন বিষয় হইতে প্রচুর জ্ঞানলাভ করা যায় তবে তাহাকে বিজ্ঞান বলিব ? আমাদের মতে শেষোক্ত ধারণাই সঠিক এবং সেই অনুযায়ী রাষ্ট্রনীতি বিজ্ঞান পদবাচ্য। রাষ্ট্রবিজ্ঞানীগণ তাঁহাদের বিষয়বস্তুর শ্রেণীবিভাগ, বিশ্লেষণ ও পরীক্ষা দ্বারা রাষ্ট্রনৈতিক সূত্র আবিষ্কারের চেষ্টা করেন। এই সমস্ত আবিষ্কৃত সূত্র সর্বদা

অভ্রান্ত না-ও হইতে পারে। কারণ, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের গবেষণাগার সমস্ত পৃথিবী এবং বিষয়বস্তু হইতেছে যুগ-যুগান্তরের সঞ্চিত রাষ্ট্রীয় অভিজ্ঞতা।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা আরিস্টটলের সময় হইতে আরম্ভ করিয়া আজ পর্যন্ত বহু দেশের ও বহু যুগের রাষ্ট্রের গঠন, সরকারের শ্রেণীবিভাগ ও বিভিন্ন ধরণের শাসনপদ্ধতি পর্যবেক্ষণ করিয়াছেন। এই পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে তাঁহারা সরকারের শ্রেণীবিভাগ করিয়াছেন, এবং কোন শ্রেণীর সরকার কী উপায়ে চলিবে এবং তাহা দ্বারা জনগন কতটা পরিমাণ উপকৃত হইবে তাহাও অনুমানের ভিত্তিতে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। আরিস্টটল ১৫৮টি সংবিধান লইয়া গবেষণা করিয়া বিপ্লবের কারণ ও প্রতিকার সম্পর্কে যে সমস্ত সিদ্ধান্ত করিয়াছেন তাহার গুরুত্ব আজও অপরিসীম। ব্রাইস (Bryce) তাঁহার Modern Democracies নামক পুস্তকে বিভিন্ন গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার গতি ও প্রকৃতি তুলনা করিয়া যে বক্তব্য উপস্থিত করিয়াছেন তাহারাও অশেষ গুরুত্ব রহিয়াছে। সুতরাং রীতিসম্মত পর্যবেক্ষণ; অভিজ্ঞতা ও তুলনামূলক পর্যালোচনার ভিতর দিয়া রাষ্ট্রনীতি যেভাবে অগ্রসর হইতেছে তাহাতে ইহাকে বিজ্ঞান বলা চলে।

একথা ঠিক যে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অনুমান সর্বদা অভ্রান্ত হয় না বা পদার্থ ও রসায়নবিদ্যার মত ইহা লইয়া গবেষণাগারে পরীক্ষা করা যায় না। এই সকল বিজ্ঞানের বিষয়বস্তু জড় পদার্থ এবং তাহাদের স্বাধীন কোন ইচ্ছা নাই। কিন্তু মানুষই মূলত রাষ্ট্রনীতির বিষয়বস্তু। মানবসমাজ সম্পর্কে এমন কোন সিদ্ধান্ত করা যায় না যাহা স্থান-কাল-পাত্র নির্বিশেষে সত্য হইতে বাধ্য। অর্থনীতি সম্পর্কেও একই কথা প্রযোজ্য। এই কারণে ধনবিজ্ঞানী মার্শাল (Marshall) অর্থনীতির সিদ্ধান্তকে জোয়ার-ভাঁটার বিষয়ের সহিত তুলনা করিয়াছেন। ব্রাইসকে অনুসরণ করিয়া সেইরূপ রাষ্ট্রনীতিকেও আমরা আবহবিজ্ঞানের (Meterology) সমপর্যায়ে স্থাপন করিতে পারি। বৃষ্টি, মেঘ ও ঝড় সম্পর্কীয় ভবিষ্যদ্‌বাণী যেমন সর্বদা অভ্রান্ত নয়, রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর সিদ্ধান্তও তেমনি সর্বদা অভ্রান্ত হইবে এমন নিশ্চয়তা নাই।

পূর্বেই বলা হইয়াছে, রাষ্ট্রনীতিকে লইয়া গবেষণাগারে পরীক্ষা করিবার তেমন কোন সুযোগ নাই। তাই মূলত পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতেই ইহা লইয়া সিদ্ধান্ত করিতে হয়। সেই জন্য ইহাকে পরীক্ষামূলক বিজ্ঞান (Experimental Science) না বলিয়া পর্যবেক্ষণমূলক বিজ্ঞান (Observational Science) বলা উচিত। উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, যদি দেখা যায় যে নির্দিষ্ট এক

ধরণের শাসনযন্ত্র গ্রহণের ফলে সেই দেশগুলিতে গণঅসন্তোষ দেখা দিয়াছে, তবে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা উহা লইয়া আক্ষরিক অর্থে গবেষণা (experiment) হয়তো করিতে পারিবেন না। কিন্তু এই ঘটনাবলী পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত করিতে পারেন যে ঐ নির্দিষ্ট শাসনতন্ত্র স্থায়ী রাষ্ট্রগঠনের পক্ষে উপযুক্ত নয়।

সুতরাং সমস্ত কিছু বিশ্লেষণ করিয়া আমরা সিদ্ধান্ত করিতে পারি যে, রীতিসম্মত পর্যবেক্ষণ, অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে আলোচনা ও তুলনামূলক পদ্ধতির প্রয়োগ করিয়া বিশেষ জ্ঞান লাভ করাকে যদি বিজ্ঞান হিসাবে স্বীকার করা হয়, তবে রাষ্ট্রনীতি নিশ্চয়ই বিজ্ঞান হিসাবে স্বীকৃত হইবে—যদিও মনে রাখিতে হইবে পদার্থ বিজ্ঞান বা রসায়নবিজ্ঞান যে অর্থে বিজ্ঞান রাষ্ট্রনীতি সেই অর্থে বিজ্ঞান পদবাচ্য নাও হইতে পারে। অর্থাৎ রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিজ্ঞান হইলেও 'ব্যবহারিক বিজ্ঞান' (applied science) নয়। ব্রাইসের ভাষায় ইহাকে 'অপরিণত বিজ্ঞান' বলিয়া অভিহিত করা যায়।

৫। রাষ্ট্রবিজ্ঞান আলোচনা পদ্ধতি (Methods of Political Science)

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে রাষ্ট্রবিজ্ঞান মোটামুটি বিজ্ঞান পদবাচ্য। কি উপায়ে এই বিজ্ঞান লইয়া গবেষণা করা যায় তাহাই বর্তমানে আমাদের আলোচনার বিষয়। পদার্থ ও রসায়ন বিস্তার মত প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের গবেগণা ও উন্নতির জন্ত বিবিধ প্রকার বৈজ্ঞানিক সাজ সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি আবিষ্কৃত হইয়াছে। রাষ্ট্র বিজ্ঞানের গবেষণার জন্ত এইরূপ কোন যন্ত্রপাতি নাই। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তাই বিভিন্ন পদ্ধতিকে আশ্রয় করিয়া গবেষণা ও বিশ্লেষণের প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। এই জন্তই বলা হয়: What the microscope is to biology, or the telescope to astronomy, a scientific method is to the social sciences"। জন স্টুয়ার্ট মিল (John Stuart Mill), কোঁৎ, লর্ড ব্রাইস প্রভৃতি পণ্ডিতগণের দ্বারা রাষ্ট্রবিজ্ঞান গবেষণার পদ্ধতিগুলি যথেষ্ট সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠিয়াছে। বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রবিজ্ঞানীগণ বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনা করিতেছেন। প্রতিটি পদ্ধতি আলোচনা না করিয়া আমরা কেবলমাত্র গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতিগুলিকে লইয়া আমাদের আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখিব।

(ক) ঐতিহাসিক পদ্ধতি (Historical method) : ঐতিহাসিক জ্ঞানের ভিত্তিতে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলির অতীতে দৃষ্টি নিক্ষেপ এবং তাহার পরিপ্রেক্ষিত বর্তমানকে বিচার-বিশ্লেষণ করাকে রাষ্ট্রনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলি সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভ করাকে ঐতিহাসিক পদ্ধতির প্রয়োগ বলা হয়।[6]

রাষ্ট্রতত্ত্ব ও রাষ্ট্রনৈতিক প্রতিষ্ঠান উভয়ের অনুশীলনে ঐতিহাসিক পদ্ধতির প্রয়োগ করা চলে। ঐতিহাসিক দৃষ্টি ছাড়া রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান ও মতবাদের ক্ষেত্র বিশ্লেষণ সম্ভবপর নয়। কারণ, বিবর্তনের ধারা ঐতিহাসিক পদ্ধতি ব্যতীত উপলব্ধি করা যায় না। রাষ্ট্রবিজ্ঞানীকে এই গবেষণা ও বিশ্লেষণ নিরপেক্ষভাবে করিতে হইবে এবং সতর্ক থাকিতে হইবে যাহাতে ঐতিহাসিক তথ্যগুলি নির্ভুল হয় এবং যে তথ্যসমূহের ভিত্তিতে যুক্তি তর্কের অবতারণা করা হইবে, উহা যেন স্পষ্ট ও যুক্তিসঙ্গত হয়। ঐতিহাসিক পদ্ধতির একটি অসুবিধা হইতেছে, ইহা রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলি অতীতে কিরূপ ছিল সেই সম্পর্কে আলোকপাত করিতে পারে, কিন্তু কি হওয়া উচিত যে সম্পর্কে কোন বক্তব্য রাখিতে পারে না। তাই ঐতিহাসিক পদ্ধতিকে অনুসরণ করিয়া বেশি দূর অগ্রসর হওয়া যায় না। এই দুর্বলতা থাকা সত্ত্বেও ঐতিহাসিক পদ্ধতির গুরুত্ব অপরিসীম।

(খ) পরীক্ষামূলক পদ্ধতি (Experimental Method) :

পরীক্ষামূলক পদ্ধতি মূলত প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেই বিশেষভাবে প্রযোজ্য—রাষ্ট্রবিজ্ঞানে ইহার প্রয়োগের ক্ষেত্রে একান্তই সীমাবদ্ধ। রসায়ন, পদার্থ ইত্যাদি বিজ্ঞান জড় পদার্থ লইয়া গবেষণা করে। সেক্ষেত্রে একটি বস্তু লইয়া বারবার পরীক্ষা করিবার সুযোগ আছে। কিন্তু রাষ্ট্রবিজ্ঞানে এইরূপ কেন সুযোগ নাই।[7] রাষ্ট্রবিজ্ঞানী নাগরিকের ব্যক্তি-স্বাধীনতা হরণ করিয়া পরীক্ষা করিতে পারেন না যে ইহার ফল কী হইল? অথবা, বর্তমান পরিস্থিতিতে ভারতবর্ষে এককেন্দ্রিক সরকার গঠন করিলে কী ফল দেখা

6. "The Historical Method seeks an explanation of what institutions are and are tending to be, more in the knowledge of what they have been and how they came to be, what they are, than in the analysis of them as they stand."—Pollock

7. The phenomenon with which the chemist deals are and always have been identical, the can be weighed and measured, whereas human phenomena can only be described"—Lord Bryce

দিবে তাহা জানিবার জন্ম যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো ভাঙ্গিয়া এককেন্দ্রিক শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিবার সুযোগ রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের নাই। গবেষণার বিষয়বস্তু যেখানে এই ধরণের সেখানে পরীক্ষামূলক পদ্ধতি প্রয়োগের দ্বারা অভ্রান্ত সিদ্ধান্তে আসা সম্ভব নয়। গার্নার বলিয়াছেন: We cannot do in politics what the experimenter does in chemistry.

তথাপি ইহা বলা সঙ্গত হইবে না যে, রাষ্ট্রবিজ্ঞানে পরীক্ষামূলক পদ্ধতির কোন স্থানই নাই। কার্যত রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা অনুশীলনের ক্ষেত্রে অনেকাংশে পরীক্ষামূলক পদ্ধতি অবলম্বন করেন। যেমন, কোন দেশে শাসনকার্য পরিচালনার জন্ম যদি নতুন রীতি ও আইন কার্যকরী করিতে হয়, তবে উহা লইয়া প্রথমে সতর্কতার সহিত পরীক্ষা চালানো হয় এবং পরীক্ষার ফলাফল লক্ষ্য করিয়াই উহা প্রয়োগ বা বর্জন করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

(গ) পর্যবেক্ষণমূলক পদ্ধতি (Observational Method)

রাষ্ট্রবিজ্ঞানে পর্যবেক্ষণমূলক পদ্ধতির স্থান খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এইজন্ম রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে কেহ কেহ পরীক্ষামূলক বিজ্ঞান না বলিয়া পর্যবেক্ষণমূলক বিজ্ঞান হিসাবে অভিহিত করেন (observational and not an experimental science)। এই পদ্ধতির প্রয়োগ করিতে হইলে সিদ্ধান্তে আসিবার পূর্বে ঘটনাবলীকে গভীর মনোযোগের সঙ্গে অনুশীলন করিতে হয় এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়াবলীর প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে উহার গতিধারা পর্যবেক্ষণ করা প্রয়োজন। লর্ড ব্রাইস তাঁহার বিখ্যাত পুস্তক The American Commonwealth এবং The Modern Democracies লিখিবার সময় এই পদ্ধতি প্রয়োগ করিয়াছিলেন। কোনরূপ বক্তব্য উপস্থিত করিয়া সিদ্ধান্তে আসিবার পূর্বে তিনি সংশ্লিষ্ট দেশ ভ্রমণ করিয়া তাহাদের সরকারের কার্যাবলী পর্যবেক্ষণ করিয়াছিলেন এবং রাষ্ট্রনায়কদের সঙ্গে প্রয়োজনীয় আলাপ করিয়াছিলেন। গভীর পরিশ্রম করিয়া অতীত ও বর্তমানের সঙ্গে যোগসূত্রকারী ঘটনাবলী পর্যবেক্ষণ করিয়া সিদ্ধান্ত করিতে পারিলে এই পদ্ধতি প্রয়োগের ফল মোটামুটি অভ্রান্ত হয়।

(ঘ) তুলনামূলক পদ্ধতি (Comparative Method): পৃথিবীর ইতিহাসের বিভিন্ন ঘটনা, ধারা ও সংস্কার তুলনামূলক বিচার বিশ্লেষণের ভিতর দিয়া রাষ্ট্রনৈতিক সূত্র ও ভাবধারার আবিষ্কারকে তুলনামূলক পদ্ধতির প্রয়োগ

বলা যাইতে পারে। সুতরাং ইহাকে ইতিহাসমূলক পদ্ধতির সহযোগী বলিয়া আখ্যা দেওয়া হয়।

তুলনামূলক পদ্ধতিকে প্রাচীনকাল হইতেই প্রয়োগ করা হইতেছে। আরিস্টটল ১৫৮টি রাষ্ট্রের তুলনামূলক বিশ্লেষণের দ্বারা তাঁহার আদর্শ রাষ্ট্রের কল্পনা করিয়াছিলেন। মঁতেস্কো (Montesquieu) বিভিন্ন যুগের রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলির তুলনামূলক বিশ্লেষণের দ্বারা The spirit of the laws রচনা করেন। Ancient law নামক গ্রন্থ লিখিবার সময় হেনরী মেইন (Henry Maine) একই পদ্ধতি প্রয়োগ করিয়াছিলেন। অর্থাৎ, তাঁহারা একই প্রকৃতির ঘটনাবলী খুঁজিয়া বাহির করিয়া উহাদের ভিতর হইতে কারণ ও ফলাফল নির্ণয় করিয়াছিলেন।

বিশেষ সতর্কতার সহিত এই পদ্ধতি প্রয়োগ করা উচিত। সাধারণ সূত্রগুলি আবিষ্কারের ক্ষেত্রে দেখিতে হইবে, যে দেশগুলির ভিতর তুলনা করা হইতেছে উহাদের মধ্যে যেন পরিবেশের সামঞ্জস্য থাকে। নয়তো ভিন্ন সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবেশ সম্পন্ন দুইটি দেশের ভিতর সাধারণ সূত্র আবিষ্কার করিয়া কোন সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইলে উহা ভ্রান্ত হইতে বাধ্য।

(ঙ) দার্শনিক পদ্ধতি (Philosophical Method): এই পদ্ধতি প্রয়োগের ক্ষেত্রে কতকগুলি বিষয়কে অনুমানের ভিত্তিতে স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া পূর্বেই গ্রহণ করা হয় এবং উহা হইতে অবরোহ প্রণালী (deductive-method) দ্বারা সিদ্ধান্তে পৌঁছানো হয়। রাষ্ট্র কেন প্রয়োজন, ইহার কার্য কী, ইহার আদর্শ কী, ব্যক্তির সহিত কী প্রকারের সম্পর্ক থাকিবে ইত্যাদি প্রশ্নের মীমাংসা দার্শনিক উপায়ে করা হইয়াছে। এই পদ্ধতির সমর্থকগণ একটি অলৌকিক ও ভাবমূলক আদর্শের পরিপ্রেক্ষিতে সমস্ত কিছু বিচার ও বিশ্লেষণ করিয়াছেন। স্বাভাবিক কারণেই ইহাদের আলোচনা, বক্তব্য ও সিদ্ধান্ত বাস্তব ঘটনাবলীকে উপেক্ষা করিয়া কল্পনাভিত্তিক হইয়া দেখা দিয়াছে। ভাব ও আদর্শের ক্ষেত্রে অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করায় এই পদ্ধতি-লব্ধ ফল অনেক স্থানেই অবাস্তব হইয়া উঠিয়াছে। আরিস্টটল হইতে শুরু করিয়া হেগেল (Hegel) গ্রীন (Green), ব্রাড্‌লে (Bradley), বোসাঙ্কেত (Bosanquet) প্রভৃতি বিখ্যাত দার্শনিকগণ এই পদ্ধতি প্রয়োগ করিয়াছেন।

(চ) আইনমূলক পদ্ধতি (Juridical Method): আইনমূলক পদ্ধতি রাষ্ট্রকে একটি আইনমূলক ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান (Legal Person) বলিয়া

মনে করে। এই পদ্ধতি অবলম্বন করিলে রাষ্ট্রকে আইনমূলক প্রতিষ্ঠান হিসাবে আইন প্রণয়ন ও আইন কার্যকরী করিবার দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হয়। রাষ্ট্রের উৎপত্তি, ক্রমবিকাশ ও অন্যান্য আইন বহির্ভূত তত্ত্ব ও তথ্যের ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি কোন আলোকপাত করিতে পারে না।

(ছ) জীববিজ্ঞানমূলক পদ্ধতি (Biological Method): এই পদ্ধতি রাষ্ট্রকে একটি জীবদেহের সহিত তুলনা করিয়া তাহার পরিপ্রেক্ষিতে রাষ্ট্রের গঠন, বিবর্তন, কার্যাবলী ইত্যাদি আলোচনা করে। জীবদেহের সঙ্গে রাষ্ট্রের কিছু কিছু সাদৃশ্য থাকিলেও উহার ভিত্তিতে কোন সিদ্ধান্ত করিলে তাহা অবৈজ্ঞানিক হইবার সম্ভাবনাই বেশি। প্রসঙ্গত বলা যাইতে পারে যে সরকারের আইন, শাসন ও বিচার বিভাগকে জীবদেহের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সঙ্গে তুলনা করিয়া এই পদ্ধতি সিদ্ধান্তে আসিবার চেষ্টা করে। স্বাভাবিক কারণেই এই ধরণের সিদ্ধান্ত সময় সময় ভ্রান্ত হইতে বাধ্য।

(জ) সমাজবিজ্ঞানমূলক পদ্ধতি (Sociological Method): এই পদ্ধতি অনুযায়ী রাষ্ট্রকে একটি সামাজিক জীব হিসাবে মনে করা হয় এবং রাষ্ট্রের নাগরিকদের ইহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ হিসাবে গণ্য করা হয়। নাগরিকদের গুণ ও দোষকে এই পদ্ধতি অনুযায়ী রাষ্ট্রে প্রতিফলিত করিয়া সেই দৃষ্টিভঙ্গীর সাহায্যে সবকিছু বিচার বিশ্লেষণ করা হয়।

এই সমস্ত পদ্ধতি ছাড়াও রাষ্ট্রনীতি আলোচনার ক্ষেত্রে আরও কতকগুলি পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়। উদাহরণ হিসাবে প্রতিষ্ঠানমূলক পদ্ধতি (Institutional Method), বিশ্লেষণাত্মক পদ্ধতি (Analytical Method), মনোবিজ্ঞানমূলক পদ্ধতি (Psychological Method), পরিসংখ্যামূলক পদ্ধতি (Statistical Method) প্রভৃতির নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে।

উপরোক্ত পদ্ধতিগুলি লইয়া আলোচনাকালে ইহা পরিষ্কারভাবে বোঝা গিয়াছে যে, রাষ্ট্রবিজ্ঞান আলোচনার ক্ষেত্রে কোন একটি পদ্ধতি এককভাবে যথেষ্ট নয়। কোন একটি পদ্ধতি প্রয়োগের দ্বারা রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনা স্বয়ংসম্পূর্ণ হইতে পারে না—প্রায় সমস্ত পদ্ধতিরই অল্প বিস্তর প্রয়োজন রহিয়াছে। সুতরাং কোন একটি বিশেষ পদ্ধতিকে অনুসরণ না করিয়া কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতির একত্র প্রয়োগ করিলে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বেশি পরিমাণ উপকৃত হইতে পারে। অনেকে মনে করেন যে, পর্যবেক্ষণ, ঐতিহাসিক ও তুলনামূলক পদ্ধতির একত্র প্রয়োগ করিলে ভাল ফল লাভ করা যাইতে পারে।

আরিস্টটল হইতে সুরু করিয়া ব্রাইস ও ফাইনার (Finer) পর্যন্ত বহু রাষ্ট্রবিজ্ঞানী এই নীতি প্রয়োগ করিয়া রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অনেক অমূল্য তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন।

অনেক রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর মতে ইতিহাসিক ও দার্শনিক পদ্ধতির মিশ্রণের মধ্য দিয়া রাষ্ট্রবিজ্ঞান পঠন পাঠনের প্রকৃত পদ্ধতি আবিষ্কৃত হইতে পারে। এই মতের শক্তিশালী সমর্থক ছিলেন লিপসন (Lipson)। তিনি তাঁহার Great Issues of Politics পুস্তকে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, "The methodology of Political Science becomes a combination of the two approaches of Philosophy and History"। রাষ্ট্রবিজ্ঞান শুধুমাত্র যাহা আছে তাহা সন্তুষ্ট থাকিতে পারে না, যাহা হওয়া উচিত তাহাও আলোচনা করে। অতীত হইতে বর্তমান পর্যন্ত অবস্থাকে ঐতিহাসিক পদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমে জানা যায়। অপরপক্ষে লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, নৈতিকবোধ প্রভৃতি সংক্রান্ত মূল্যায়ণ দার্শনিক পদ্ধতির দ্বারা সম্ভব। সুতরাং এই দুইটি পদ্ধতির একত্র প্রয়োগের মধ্য দিয়া রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনা সুষ্ঠুভাবে করা যাইতে পারে।[৪]

তৃতীয় অধ্যায়

রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও অন্যান্য বিষয়ের পারস্পরিক সম্পর্ক

(Relations of Political Science & other Sciences)

কোন বিষয় সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভ করিতে হইলে সেই বিষয়ের সঙ্গে সমগোত্রীয় অন্যান্য বিষয়ের পারস্পরিক সম্পর্ক অনুধাবন করা একান্ত প্রয়োজন। রাষ্ট্রবিজ্ঞান একটি মানবীয় বিষয় এবং সমাজ বিজ্ঞানের একটি অংশবিশেষ। সুতরাং রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সঙ্গে অন্যান্য মানবীয় বিষয় (Humanities) তথা সমাজ বিজ্ঞানের অন্যান্য ধারার সম্পর্ক বিশ্লেষণ করা এবং পারস্পরিক সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য আলোচনা করা একান্ত প্রয়োজন। বস্তুত, সমাজ বিজ্ঞানকে একটি ফুলের সাথে কল্পনা করিয়া বলা যাইতে পারে যে ইতিহাস, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, দর্শন, অর্থনীতি প্রভৃতি বিষয়গুলি সেই ফুলের আলাদা আলাদা পাঁপড়ি। সমাজ বিজ্ঞানের মূল ধারা হইতে ইহারা উপাদান সংগ্রহ করিয়াছে সত্য, কিন্তু নিজেদের স্বতন্ত্র স্বত্বা হারাইয়া ফেলে নাই। একই উৎস হইতে উৎপন্ন হইয়াও ইহারা নিজেদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিয়াছে সুতরাং রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে একটি পরিপূর্ণ তত্ত্ব হিসাবে তুলিয়া ধরিতে হইলে সম্পর্কযুক্ত অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে ইহার তুলনামূলক আলোচনা করা প্রয়োজন। ইহার ফলে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের পরিধি, প্রসার ও বিষয়বস্তু সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণার সৃষ্টি হইবে। নিম্নে আমরা রাষ্ট্র-বিজ্ঞানের সঙ্গে অন্যান্য সহযোগী বিষয়ের আলোচনা উপস্থিত করলাম।

১ ॥ রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও ইতিহাস (Political Science and History) :

রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও ইতিহাস সমাজবিজ্ঞানের দুইটি ঘনিষ্ঠ শাখা। ইতিহাসকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের গবেষণাগার হিসাবে অভিহিত করা যায়। লর্ড অ্যাকটন (Acton) বলিয়াছেন : ইতিহাসের স্রোতধারায় বালুকণা সমূহের মধ্যে স্বর্ণরেণুর মতন রাষ্ট্রবিজ্ঞান যেন জমিয়া উঠিয়াছে।[1] বর্তমানের শিকড় রহিয়াছে অতীতের মধ্যে। অতীতকে না জানিলে বর্তমানকে জানা যায় না। ইতিহাসই ধারাবাহিক

1. "The science of politics is the one science that is deposited by the stream of History like the grains of gold in the sand of a river."

—Lord Acton

ভাবে অতীতকে উপস্থিত করে। ইতিহাস আমাদের শিক্ষা দেয় অতীতে কী ঘটিয়াছে, কেন ঘটিয়াছে এবং তাহার ফল কী হইয়াছে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানী তাহার পরিপ্রেক্ষিতে বিচার, বিশ্লেষণ করিয়া রাষ্ট্রনৈতিক তত্ত্বকে প্রতিষ্ঠা করেন। উদাহরণ হিসাবে বলা যাইতে পারে যে, 'জাতীয়তাবাদ', 'সমাজতন্ত্রবাদ' বা 'ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ' সম্পর্কে রাষ্ট্রনৈতিক তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে ইতিহাসের উপর ভিত্তি করিয়া তাহা রচনা করিতে হইবে। নতুবা ইহা মূল্যহীন হইতে বাধ্য। এইজন্য অনেকে মনে করেন যে ইতিহাস রাষ্ট্রনীতির সম্মুখে নূতন দিক (third dimension) উন্মোচন করিয়াছে।

তেমনি স্বীকার করিতে হইবে যে ইতিহাসও রাষ্ট্রনীতির কাছে প্রচুর পরিমাণে ঋণী। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের জ্ঞান ছাড়া ইতিহাস পরিপূর্ণতা প্রাপ্ত হয় না। হিটলার ও মুসোলিনীকে জানিতে হইলে বিংশ শতাব্দীর ইতালি ও জার্মাণীর ফ্যাসিবাদ ও নাৎসীবাদকে বুঝিতে হইবে। ফ্যাসিবাদ ও নাৎসীবাদের পটভূমিকায়ই মুসোলিনী ও হিটলারের মূল্যায়ন সম্ভব। প্রকৃতপক্ষে ইতিহাস ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান পরস্পরের পরিপূরক।

ইতিহাস ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের এই পারস্পরিক সম্পর্ক লক্ষ্য করিয়া বার্জেস (Burgess) বলিয়াছেন যে, এই দুইটি শাস্ত্রকে পৃথক করিয়া দেওয়া হইলে একটি মৃত বা বিকলাঙ্গ হইবে এবং অপরটি আলেয়ার মত অবাস্তব হইয়া যাইবে। আর এক ধাপ অগ্রসর হইয়া ঐতিহাসিক সিলি (Seely) বলিয়াছেন : "রাষ্ট্রবিজ্ঞান ব্যতীত ইতিহাস ফলপ্রসূ হয় না ; ইতিহাস ব্যতীত রাষ্ট্রবিজ্ঞান ভিত্তিহীন হয়"[২]। এই পারস্পরিক নির্ভরশীলতা প্রসঙ্গে সিলি আরও বলিয়াছেন যে, ইতিহাসের দ্বারা বিশদীকৃত না হইলে রাষ্ট্রবিজ্ঞান গ্রাম্য ভাবাপন্ন হয় এবং ইতিহাস রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সঙ্গে সম্পর্ক হারাইলে তাহা আর ইতিহাস থাকে না—সাহিত্যে রূপান্তরিত হয়।

বার্জেস, সিলি প্রভৃতি পণ্ডিতগণ রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও ইতিহাসের পারস্পরিক সম্পর্ক যেভাবে বিশ্লেষণ করিয়াছেন তাহা আংশিক সত্য—সম্পূর্ণ সত্য নয়। এই সমস্ত মন্তব্য কিছুটা অতিশয়োক্তি দোষে দুষ্ট। মনে রাখিতে হইবে যে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সঙ্গে ইতিহাসের যদিও গভীর যোগ আছে, কিন্তু সমস্ত প্রকারের ইতিহাসের সাথে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সম্পর্ক নাই। উদাহরণ

২. "History without political Science has no fruit, political Science without History has no root." —Seely

হিসাবে চারুবিদ্যার ইতিহাস ও মুদ্রাক্রম বিকাশের ইতিহাসের উল্লেখ করা যাইতে পারে। তেমনি, সমস্ত রাষ্ট্রনৈতিক তত্ত্বই ইতিহাসের সহিত সম্পর্ক যুক্ত নয়। প্লেটোর 'রিপাবলিকের আদর্শ' বা বেন্থামের 'হিতবাদ' ইতিহাসকে ভিত্তি করিয়া রচিত হয় নাই। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, ইতিহাসের পরিধি অত্যন্ত ব্যাপক—ইহার অন্তর্গত সব কিছুর সঙ্গেই রাষ্ট্র-বিজ্ঞানের সম্পর্ক নাই। আবার তেমনি ইতিহাসের অনেক বিষয়বস্তুকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের পটভূমি বাদেই আলোচনা করা যায়। এই সমস্ত কারণে ইতিহাসকে নিছক অতীতের রাষ্ট্রবিজ্ঞান এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে বর্তমানের ইতিহাস[3] হিসাবে বার্জেস, সিলি বা ফ্রীম্যানের (Freeman) বক্তব্য আমরা সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করিতে পারি না।

কোন কোন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী মনে করেন ইতিহাসের সঙ্গে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সম্পর্ক খুব গভীর নয়, ইতিহাসকে বাদ দিয়া সহজেই রাষ্ট্রনৈতিক তত্ত্ব আলোচনা করা যায়। বার্কার (Barker) এই মতবাদ পোষণ করেন। তিনি বলিয়াছেন: ইতিহাসকে ভিত্তি না করিয়াও শক্তিশালী রাষ্ট্রনৈতিক তত্ত্বের সৃষ্টি হইতে পারে।[4] বার্কারের এই মন্তব্য রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও ইতিহাসকে দুইটি স্বতন্ত্র শাস্ত্র হিসাবে স্বীকৃতি দিয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও ইতিহাসের গবেষণার ক্ষেত্রে ইহাদের পারস্পরিক অবদানকে অস্বীকার করিয়াছে। রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও ইতিহাস পরস্পরের পরিপূরক ইহা অস্বীকার কোন সঙ্গত কারণ নাই। বরং লীককে (Leacock) অনুসরণ করিয়া আমরা বলিতে পারি যে ইতিহাসের সমস্তটা না হইলেও কিছুটা অংশ রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অঙ্গীভূত।[5]

২। রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও অর্থনীতি (Political Science & Economics)

রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও অর্থনীতিকে দুইটি স্বতন্ত্র বিষয় হিসাবে গ্রহণ করিবার রীতি অতি অল্পদিন হয় গৃহীত হইয়াছে। প্রাচীন কালে বিশেষ করিয়া গ্রীস দেশে অর্থনীতিকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের একটি হিসাবে মনে করা হইত এবং ইহাকে 'Political Economy' নামে অভিহিত করা হইয়াছিল। অ্যারিস্টটল রাষ্ট্রবিজ্ঞান লিখিবার সময় ধন উৎপাদনের বিষয়ও

3. History is past politics, politics is present History. —Freeman

4. "We must admit the possibility of a great and influential theory of Politics which has no definite basis in History." —Barker.

5. "Some History is part of Political Science." —Leacock.

আলোচনা করিয়াছেন। অষ্টাদশ শতাব্দীতে 'ফিজিওক্র্যাটস্‌রা' (Physiocrats) অর্থশাস্ত্রকে রাজনীতির একটি শাখা (a branch of statemanship) বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। আবার প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ অ্যাডাম স্মিথ (Adam Smith) অর্থনীতির তত্ত্ব আলোচনা করিতে যাইয়া কী উপায়ে রাষ্ট্রকে শক্তিশালী করা যায় তাহাও আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। অ্যাডাম স্মিথের ভাষায় বলা যায়, "জনগন ও সার্বভৌমকে শক্তিশালী করাই রাষ্ট্রনৈতিক অর্থনীতির উদ্দেশ্য।"[6] এই দুইটি শাস্ত্রকে এইরূপ অভিন্নভাবে কল্পনা করিবার কারণ ইহাদের পারস্পরিক ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ও নির্ভরশীলতা। ইহা ছাড়াও ইহাদের নিজেদের আলোচনার পরিধি যথেষ্ট পরিমাণে বিস্তৃত না হওয়ার জন্য এতদিন পৃথকীকরণ ও বিশেষীকরণের প্রয়োজন অনুভব করা হয় নাই।

কিন্তু বর্তমানে রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও অর্থনীতির বিষয়বস্তুর পরিধি ব্যাপকতর হওয়ায় ইহাদের স্বতন্ত্রভাবে পঠন-পাঠনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়াছে। বর্তমান যুগে অর্থনীতিকে রাষ্ট্রের নিছক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা মনে করিবার সঙ্গত কারণ নাই। ধনের উৎপাদন, ভোগ ও বণ্টন যেভাবে জটিল আকার ধারণ করিয়াছে এবং উহাকে বর্তমানে যেভাবে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ হইতে পর্যালোচনার চেষ্টা চলিতেছে তাহাতে অর্থনীতিকে একটি পরিপূর্ণ বিষয় হিসাবে স্বীকৃতি না দিয়া উপায় নাই। ঠিক তেমনি নতুন নতুন তত্ত্বে ও তথ্যে রাষ্ট্রবিজ্ঞান যেভাবে সমৃদ্ধ ও পরিপুষ্ট হইয়া উঠিতেছে এবং অর্থনীতির সঙ্গে সম্পর্কহীন বিভিন্ন বিষয়বস্তু রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনার অঙ্গীভূত হইতেছে, তাহাতে উহাকেও আর অর্থনীতির সঙ্গে যুক্ত রাখা যায় না।

রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও অর্থনীতি দুইটি স্বতন্ত্র শাস্ত্র হিসাবে গৃহীত হইলেও এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই যে ইহারা ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত। মানুষই মূলত উভয় শাস্ত্রের উপাদান এবং মানবকল্যাণ মূল লক্ষ্য। বর্তমান যুগের রাষ্ট্র শুধুমাত্র আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে পরিচালিত হয় না। মানুষের জীবনের বিভিন্ন দিকে ইহার হস্ত-প্রসারিত। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা আজ উৎপাদন, বণ্টন, আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা, করনীতি, মুদ্রা, ব্যাঙ্ক পরিচালনা প্রভৃতি ক্ষেত্রে প্রসারিত। কৃষিনীতি, শিল্পনীতি, জাতীয়করণনীতি, বণ্টননীতি এবং অর্থনৈতিক পরি-

6. Political Economy proposes to enrich the people and the sovereign.
—Adam Smith.

কল্পনাও রাষ্ট্র নির্ধারণ করে। এই সমস্ত অর্থনৈতিক নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক দর্শন ও মতবাদ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সেখানকার রাজনৈতিক দর্শনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। তেমনি সোভিয়েত রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা মার্কসবাদী রাজনৈতিক দর্শনের প্রতিফলন। অর্থাৎ রাজনৈতিক ও রাষ্ট্রনৈতিক দর্শনের পার্থক্যই বিভিন্ন দেশের অর্থনৈতিক পার্থক্য সূচনা করে।

সুতরাং, বিভিন্ন দেশে যে বিভিন্ন প্রকার অর্থনৈতিক ব্যবস্থা দেখা যায় তাহা মূলত পৃথিবীর বিভিন্ন রাজনৈতিক চিন্তার প্রতিফলন, বা যে সমস্ত রাজনৈতিক তত্ত্ব দেখা দিয়াছে সেগুলি অর্থনৈতিক চিন্তা হইতে উদ্ভূত। যাঁহারা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদে বিশ্বাস করেন তাঁহারা রাষ্ট্রের ক্ষমতাকে সীমিত রাখিয়াছেন। সেখানে ধন উৎপাদন ও বণ্টনের ভিতর কোনরূপ সামঞ্জস্য নাই। সমাজতন্ত্রবাদে যাহারা বিশ্বাসী তাহারা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাকে বহুদূর পর্যন্ত প্রসারিত করিয়া অর্থনৈতিক বিধিব্যবস্থাকে সম্পূর্ণভাবে রাষ্ট্রের অধীনে আনিয়াছেন। দেশের উৎপাদনকে মোটামুটি সমভাবে বণ্টন করিয়া ধনী-দরিদ্রের পার্থক্য ঘুচাইবার প্রয়াসে তাঁহারা লিপ্ত। হিটলার ও মুসোলিনী জার্মানী ও ইতালীতে যে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা মূলত তাহাদের রাজনৈতিক দর্শন নাৎসীবাদ ও ফ্যাসীবাদেরই প্রতিফলন। এই সমস্ত কারণে বর্তমান যুগে রাজনৈতিক দর্শন নিরপেক্ষ কোন প্রকার অর্থনৈতিক ব্যবস্থার কথা কল্পনা করা যায় না বা অর্থনৈতিক পটভূমিকাকে অস্বীকার করিয়া কোন রাষ্ট্রদর্শন বিশ্লেষণ সম্ভব নয়। তাই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ, সমাজতন্ত্রবাদ প্রভৃতি তত্ত্বকে অর্থনীতি হইতে মুক্ত করিয়া নিছক রাষ্ট্রনৈতিক তত্ত্ব হিসাবে প্রতিষ্ঠা করা যায় না। কার্ল মার্কস (Karl Marx) ইতিহাসের অর্থনৈতিক ব্যাখ্যার পরিপ্রেক্ষিতে তাঁহার সমস্ত রাজনৈতিক বক্তব্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও অর্থনীতি দুইটি পৃথক শাস্ত্র হইলেও ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। ইহারা একে অন্যের পরিপূরক হিসাবে উভয়কে শক্তিশালী করিয়াছে। কিন্তু রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও অর্থনীতির এই পারস্পরিক সহযোগী মনোভাব ইহাদের স্বাতন্ত্র্য নষ্ট করে নাই (They co-operate, and yet maintain their autonomies)।

৩ ॥ রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞান (Political Science & Sociology) :

সমাজবিজ্ঞান রাষ্ট্রবিজ্ঞানের জনক—রাষ্ট্রবিজ্ঞান সমাজবিজ্ঞানের একটি সমৃদ্ধশালী শাখা। উভয় বিষয়ই মূলত মানুষকে লইয়া আলোচনা করে। কিন্তু সমাজবিজ্ঞানের পরিধি অনেক ব্যাপকতর। মানুষের জীবনের প্রাথমিক পর্যায় হইতে আরম্ভ করিয়া ইহার বিবর্তন, চরিত্র ও বিভিন্ন ঘটনাবলী সামাজিক দৃষ্টি কোণ হইতে সমাজবিজ্ঞান বিশ্লেষণ করে। সমাজবিজ্ঞানের পরিধি যেমন ব্যাপক তেমনি ইহা রাষ্ট্রবিজ্ঞান হইতে প্রাচীন।[7] সমাজবিজ্ঞান মানুষের জীবনের রাষ্ট্রগত, আইনগত, ধর্মগত এবং অর্থনৈতিক ঘটনাবলীর আলোচনা বা আলোকপাত করে। কিন্তু রাষ্ট্রবিজ্ঞান শুধুমাত্র রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তার ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ। ইহা প্রত্যক্ষভাবে মানুষের আচার ব্যবহার, রীতি, ধর্ম ও অর্থনীতি বিষয়ে আলোচনা করিবার প্রয়োজন বোধ করে না। কেবলমাত্র রাষ্ট্রীয় ও রাষ্ট্রনৈতিক চেতনা সম্পন্ন মানবীয় প্রতিষ্ঠান ও তত্ত্ব লইয়াই রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনা কেন্দ্রীভূত। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের উৎস রহিয়াছে সমাজবিজ্ঞানের ভিতর (the Political is embedded in the social)। ফরাসী দার্শনিক পল জানে (Paul Janet) বলেন যে, সমাজবিজ্ঞানের যে অংশ রাষ্ট্রের মূল ভিত্তি ও শাসন পদ্ধতি সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক আলোচনা করে তাহাকে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বলে।[8] তাই রাষ্ট্রবিজ্ঞানীকে এই সমস্ত বিষয় আলোচনা করিবার সময় সমাজবিজ্ঞান হইতে উপাদান ও তথ্য সংগ্রহ করিতে হয়। সামাজিক প্রতিষ্ঠান হইতে রাষ্ট্র আজ একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। বর্তমান রাষ্ট্র সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করিতে হইলে রাষ্ট্রের ক্রমবিকাশ এবং অতীতের সামাজিক প্রতিষ্ঠানরূপী রাষ্ট্রকে জানিতে হইবে। প্রসঙ্গত, জেঙ্কস (Jenks), মরগ্যান (Morgan), গিডিংস (Giddings) প্রভৃতি সমাজবিজ্ঞানীরা আদিম সমাজের যে বিশ্লেষণ করিয়াছেন, তাহার উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই সমস্ত বিশ্লেষণ হইতে রাষ্ট্রবিজ্ঞান প্রভূত তথ্য সংগ্রহ করিয়াছে।

তেমনিভাবে সমাজবিজ্ঞানও অনেক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রবিজ্ঞান হইতে তথ্য সংগ্রহ করে। রাষ্ট্রীয় সংস্থার উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ সম্পর্কে রাষ্ট্রবিজ্ঞান যেমন

---

7. Political Science begins much later with the life of the race than does Sociology.

8. "Political Science is that part of Social Science which treats of the foundations of the state and the principles of Government." —Paul Janet

সমাজবিজ্ঞান হইতে জ্ঞান সংগ্রহ করে, তেমনি সমাজবিজ্ঞানকেও এই সমস্ত রাষ্ট্রীয় সংস্থার গঠন, কার্যাবলী প্রভৃতি বিষয়ে তথ্য রাষ্ট্রবিজ্ঞান হইতে সংগ্রহ করিতে হয়।

সমাজবিজ্ঞান ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ভিতর এইরূপ ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে থাকা সত্ত্বেও মনে রাখা প্রয়োজন যে, কয়েকটি ক্ষেত্রে উহাদের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য রহিয়াছে। প্রথমত, সমাজবিজ্ঞান মানুষকে সামাজিক জীব হিসাবে এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞান মানুষকে রাজনৈতিক জীব হিসাবে বিশ্লেষণ করে। দ্বিতীয়ত, রাষ্ট্রকে কেন্দ্র করিয়া মানুষ যখন সংগঠিত হইয়াছে তখন হইতে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনার সূত্রপাত, কিন্তু সমাজবিজ্ঞান অনেক প্রাচীন। তৃতীয়ত, রাষ্ট্র নামক একটি মাত্র মানবীয় প্রতিষ্ঠান লইয়াই রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনা কেন্দ্রীভূত, কিন্তু সমাজবিজ্ঞান অন্যান্য প্রকারের প্রতিষ্ঠানকেও তাহার আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করিয়াছে। চতুর্থত, সমাজবিজ্ঞানের পরিধি অনেক ব্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের পরিধি সেই অনুপাতে ক্ষুদ্র।

৪ ॥ রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও নীতিশাস্ত্র (Political Science & Ethics) :

রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও নীতিশাস্ত্রের ভিতরকার সম্পর্কের আলোচনা করিতে যাইয়া অধ্যাপক গিলক্রাইষ্ট (Gilchrist) বলিয়াছেন যে, রাষ্ট্রনৈতিক নিয়মকানুনের বিজ্ঞানকে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বলে এবং ইহার সঙ্গে নৈতিক নিয়মকানুনের বিজ্ঞান বা নীতিশাস্ত্রের সম্পর্ক রহিয়াছে।[9] অর্থাৎ, এককথায় রাষ্ট্রবিজ্ঞান নীতিশাস্ত্রের সঙ্গে সম্পর্কে যুক্ত। উভয়ের উদ্দেশ্য এক হইবার জন্যই ইহারা পরস্পরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক যুক্ত। রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও নীতিশাস্ত্র উভয়েরই উদ্দেশ্য সামাজিক মানুষের উন্নতি সাধন করা। নীতিশাস্ত্র মূলত মানুষের আভ্যন্তরীণ জগৎ লইয়া ব্যস্ত। চিন্তা ও বিবেকের বিশুদ্ধতা দ্বারাই উন্নতি হওয়া সম্ভবপর বলিয়া এই শাস্ত্র মনে করে। তাই আদর্শগত দিক হইতে কী হওয়া উচিত তা নীতিশাস্ত্র নির্ধারণ করে। অপর পক্ষে রাষ্ট্রবিজ্ঞান মানুষের বাহ্যিক আচার আচরণের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ। বিশুদ্ধ, সংযত বাহ্যিক আচার ব্যবহারের প্রতিষ্ঠা করিয়া রাষ্ট্রবিজ্ঞান মানুষের সর্বাঙ্গীন উন্নতি করিবার জন্য প্রয়াসী হয়। কিন্তু শুধুমাত্র যাহা আছে তাহা লইয়াই রাষ্ট্রবিজ্ঞান সন্তুষ্ট থাকিতে পারে না—যাহা হওয়া উচিত সেই দিকেও দৃষ্টিপাত করিতে হয়। তাই এ্যাকটন বলিয়াছেন, রাষ্ট্র যাহা করে

9. "Political Science, the Science of political order, is also connected with Ethics, the Science of moral order." —Gilchrist

রাষ্ট্রবিজ্ঞান শুধুমাত্র তাহা লইয়াই আলোচনা করে না, যাহা করা উচিত তাহাও বিশ্লেষণ করে।[10] এই স্থানেই নীতিশাস্ত্রের সঙ্গে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সম্পর্ক।

ম্যাকিয়াভেলি তাঁহার বিখ্যাত 'The Prince' নামক গ্রন্থে দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন যে রাজনীতির সহিত নীতিশাস্ত্রের কোন সম্পর্ক নাই। কারণ নীতিশাস্ত্র অনুমোদন করে না এমন সমস্ত পন্থা অবলম্বন করিয়াই রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধ করা হইয়া থাকে। আরিষ্টটল নীতিশাস্ত্র হইতে রাজনীতিকে পৃথক করিয়া বিবেচনা করিলেও তিনি রাষ্ট্রের দোষগুণ বিচার করিয়াছেন নৈতিক মাপকাঠি দিয়া। বার্ক (Burke) মনে করিতেন যে, নীতিশাস্ত্রের সিদ্ধান্ত ব্যাপকভাবে রাজনীতিতে প্রতিফলিত হয়। সুতরাং তাঁহার মতে, নীতিশাস্ত্র ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান সম্পর্কযুক্ত। সরকার কী করিতেছে তাহা জানা যেমন প্রয়োজন, তেমনি সরকারের আদর্শ ও কর্তব্য জানা তাহা অপেক্ষা অধিকতর প্রয়োজন। নীতিশাস্ত্র আমাদের ইহা জানিতে সাহায্য করে।

ম্যাকিয়াভেলির বক্তব্যের প্রতিধ্বনি তুলিয়া এ যুগের এক শ্রেণীর রাষ্ট্রবিজ্ঞানী নীতিশাস্ত্র হইতে রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে পৃথক করিতে চাহিয়াছেন। কিন্তু রাষ্ট্রের কি করা উচিত, কি করা অনুচিত, কিভাবে মানবজীবনের সার্বজনীন কল্যাণসাধিত হইবে তাহার আলোচনা যদি রাষ্ট্রবিজ্ঞানে না থাকে তবে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের উপযোগিতা বহুলাংশে কমিয়া যাইবে। রাষ্ট্রনীতি শুধু কুটনীতি নহে, তাই মানব কল্যাণ বিরোধী এবং নৈতিক দোষে দুষ্ট কোন বক্তব্য ও পন্থা রাষ্ট্রনীতিতে স্থান পাইবার যোগ্য নহে। তাই রাষ্ট্রবিজ্ঞানের যথাযথ ভূমিকা গ্রহণের ক্ষেত্রে নীতিশাস্ত্রের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ও অবদান রহিয়াছে।

৫ ॥ রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও ভূগোল (Political Science and Geography)

মানুষের জাতিগত জীবন ও চরিত্র সৃষ্টির ক্ষেত্রে ভৌগোলিক অবস্থা ও জলবায়ুর বিশেষ অবদান আছে বলিয়া অনেকে মনে করেন। আরিষ্টটল হইতে সুরু করিয়া অনেক রাষ্ট্রবিজ্ঞানী জাতি এবং রাষ্ট্রগত চরিত্র সৃষ্টির ক্ষেত্রে জলবায়ু, ভৌগোলিক অবস্থান, মৃত্তিকার বৈশিষ্ট্য, নদ-নদী ও পাহাড়-পর্বতের অবস্থিতি প্রভৃতি ভৌগোলিক উপাদানকে গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া মনে

10. "The Great question is to discover not what Goverments prescribe but what they ought to prescribe." —Lord Acton

করিয়াছেন। আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মধ্যে বোঁদা প্রথম এই ব্যাপারে আলোকপাত করেন। রুশোও (Rousseau) মনে করিতেন যে সরকারের চরিত্রের সঙ্গে সেই স্থানের জলবায়ুর সম্পর্ক রহিয়াছে। তাঁহার মতে গ্রীষ্মপ্রধান দেশে স্বেচ্ছাচারিতা, শীতপ্রধান দেশে বর্বরতা এবং নাতি-শীতোষ্ণ অঞ্চলে সুস্থ ও স্বাভাবিক সরকার চলিতে পারে। সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক সংস্থাগুলির উপরে জলবায়ু প্রভাব সম্পর্কে মঁতেস্কু (Montesquieu) বিস্তারিতভাবে আলোচনা করিয়াছেন। মঁতেস্কুর আলোচনার অনিবার্য সিদ্ধান্ত হইল ভৌগোলিক পরিবেশই মানুষের চরিত্র গঠন করে এবং ইহার উপরেই স্বাধীনতা রক্ষা করা বা পরাধীনতাকে মানিয়া লইবার মানসিক-গঠন গড়িয়া উঠে। বাক্‌ল (Buckle) তাঁহার History of Civilization পুস্তকে দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন যে, ব্যক্তির স্বাধীন ইচ্ছা দ্বারা ব্যক্তি বা সমষ্টি জীবনের কার্যা-বলী পরিচালিত হয় না—মূলত ইহা জলবায়ু, খাদ্য ও মৃত্তিকার বৈশিষ্ট্যের উপর নির্ভরশীল। যেমন, জাতীয় জনসমাজ (Nationality) গঠনে ভৌগোলিক উপাদানের ভূমিকা খুব বেশি।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে কোন জনসমাজের জাতিগত চরিত্রের উপর সেখানকার শাসনব্যবস্থা এবং রাষ্ট্রনীতি বহুলাংশে নির্ভরশীল।[11] এই জাতিগত চরিত্র আবার গড়িয়া উঠে ভৌগোলিক পরিবেশকে কেন্দ্র করিয়া। এই সমস্ত পণ্ডিতগণের মতে তাই রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সঙ্গে ভূগোলের বিশেষ সম্পর্ক রহিয়াছে। এই বক্তব্যের সঙ্গে দ্বিমত হইবার কোন কারণ নাই। বস্তুত ভৌগলিক ঐক্যের অভাবে রাষ্ট্রনৈতিক্ ঐক্য গড়িয়া না উঠিবার দৃষ্টান্ত পৃথিবীতে বিরল নহে।

কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে উপরোক্ত বক্তব্যসমূহের মধ্যে কিছুটা অতি-রঞ্জন রহিয়াছে। ভৌগোলিক পরিবের্শের সঙ্গে জাতিগত চরিত্র গঠন এবং রাষ্ট্রীয় রূপরেখার যেমন সম্পর্ক আছে তেমনি ব্যতিক্রমেরও অভাব নাই। একই প্রকার ভৌগোলিক পরিবেশ ও জলবায়ুতে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের অধিকারী জাতির আত্মপ্রকাশ ঘটে এবং বিভিন্ন শ্রেণীর রাষ্ট্রীয় কাঠামো ও চরিত্রের অভ্যুত্থান দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সঙ্গে ভূগোলের সাধারণভাবে সম্পর্ক আছে বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে—কিন্তু এই সম্পর্ককে বেশিদূর টানা ঠিক নহে।

11 "In any conntry physical conditions and inherited institutions so affect the political development of a nation as to give its Government a distinctive character"—Bryce.

৬॥ রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও জীববিদ্যা (Political Science and Biology)

রাষ্ট্রকে একটি জীবন্ত প্রাণীর সঙ্গে তুলনা করিয়া ইহার প্রকৃতিকে জৈব মতবাদের দ্বারা ব্যাখ্যা করিবার প্রচেষ্টা বহুদিন হইতেই লক্ষ্য করা যাইতেছে। আরিষ্টটল, হবস্ ও রুশো এই মতবাদের পুরোধা। ঊনবিংশ শতাব্দীতে ডারউইনের (Charles Darwin) বিবর্তনবাদকে ভিত্তি করিয়া রাষ্ট্র ও জীবদেহের অভিন্নতা প্রমাণের বিশেষ প্রবণতা হারবার্ট স্পেনসার (Herbert Spencer) ও ব্লুনৎস্লির (Bluntschli) মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। জীবদেহের সঙ্গে রাষ্ট্রের কয়েকটি আপাত সদৃশ্যতার উপর নির্ভর করিয়া ইহারা রাষ্ট্রকেও একটি জীবন্ত প্রাণী (Living organism) বলিয়া কল্পনা করিয়াছেন। সুতরাং এই মতবাদ অনুসারে প্রাণীবিদ্যার সূত্রকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

রাষ্ট্রের সঙ্গে প্রাণীদেহের আপাত সাদৃশ্যর কথা বলা হইলে হয়তো কাহারও আপত্তির কারণ থাকিত না। কিন্তু এই মতবাদ যে ভাবে রাষ্ট্র জীবদেহের প্রকৃতির অভিন্নতা প্রমাণের চেষ্টা করিয়াছেন—তাহাতে আপত্তি না করিয়া পারা যায় না। কারণ, রাষ্ট্র ও জীবদেহের আপাত সাদৃশ্য দ্বারা উহাদের অভিন্নতা প্রমাণিত হয় না। সুতরাং রাষ্ট্রের সঙ্গে জীববিদ্যার সম্পর্ক খুব একটা সফল ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত নয়, তবে এই মতবাদ রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তাকে একটা যুগে বিশেষভাবে প্রভাবিত করিয়াছিল।

৭॥ রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞান (Political Science and Psychology)

মনোবিজ্ঞানের আলোতে রাষ্ট্রনৈতিক ক্রিয়া কর্মকে বিশ্লেষণের প্রবণতা বেশ কিছুদিন হইতে লক্ষ্য করা যাইতেছে। কোঁৎ (Comte) তাঁহার রাষ্ট্র-নৈতিক তত্ত্বের আলোচনাতে মনোবিজ্ঞানের উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়াছেন। রাষ্ট্রনৈতিক বিচার তথ্য বিশ্লেষণে স্পেনসার (Spencer) মনোবিজ্ঞানকে জীব-বিজ্ঞানের মতই প্রাধান্য দিয়াছেন। বেজ্‌হট (Bagehot) তাঁহার 'Physics and Politics' নামক পুস্তকে দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন যে বৃটিশ সংবিধান মূলত বৃটিশ জাতির মনস্তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত। বার্কার (Barker) মনে করেন যে, বস্তুত বেজ্‌হটের উক্ত পুস্তক প্রকাশিত হইবার পর হইতেই রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা

সামাজিক-মনোবিজ্ঞানীতে রূপান্তরিত হইয়াছেন। ব্রাইস (Bryce) মন্তব্য করিয়াছেন যে, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের মূল মনোবিজ্ঞানে মধ্যে নিহিত রহিয়াছে।

ইহাদের মতে স্বাভাবিক প্রবৃত্তি, আবেগ ও মানসিক গঠনও ইচ্ছাশক্তি মানুষের চিন্তারাজ্যে প্রভাব বিস্তার করিবার ফলে রাষ্ট্রবিজ্ঞানও স্বাভাবিকভাবেই প্রভাবিত হয়। অনেকাংশে জাতিগুলির মানসিক গঠন ও বোধ দ্বারা রাষ্ট্রচিন্তা নিয়ন্ত্রিত হয় বলিয়া রাষ্ট্রনৈতিক আলোচনাতে মনোবিজ্ঞানের ভূমিকা অস্বীকার করা যায় না। উদাহরণ হিসাবে জাতীয়তাবাদ (Nationalism) বা রাজনৈতিক দলের কথা বলা যাইতে পারে। জাতীয়তাবাদ একান্তভাবেই একটি মানসিক অনুভূতি, জাতির মনস্তত্ত্বের সঙ্গে ইহার গভীর সম্পর্ক রহিয়াছে। রাজনৈতিক দলগুলি জনগণের মনস্তত্ত্বকে কখনই উপেক্ষা করিতে পারে না— জনগণের মনস্তত্ত্বের উপর নির্ভর করিয়াই উহাদের কার্যপদ্ধতি স্থির করিতে হয়। সরকারের ক্ষেত্রেও একই কথা বলা যাইতে পারে। জনগণের ইচ্ছা-অনিচ্ছা অর্থাৎ মনস্তত্ত্বকে উপেক্ষা করিয়া কোন গণতান্ত্রিক সরকারই চলিতে পারে না। সুতরাং বেশ কিছুটা পরিমাণে মনোবিজ্ঞানের উপর রাষ্ট্রবিজ্ঞান নির্ভরশীল। বার্কার রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে মনোবিজ্ঞানের পদ্ধতি প্রয়োগের সীমাবদ্ধতার (limitations) উল্লেখ করিয়া যথার্থই বলিয়াছেন যে শুধুমাত্র মনোবিজ্ঞানের প্রয়োগের দ্বারা রাষ্ট্রনৈতিক ধারাকে নির্ণয় বা বিশ্লেষণ করা সম্ভব নহে।

চতুর্থ অধ্যায়

রাষ্ট্রের সংজ্ঞা ও চরিত্র

(Definition and nature of the state)

সামাজিক সংস্থার মধ্যে সর্বাপেক্ষা বৃহৎ ও গুরুত্বপূর্ণ সংস্থা হইল রাষ্ট্র। রাষ্ট্রকে কেন্দ্র করিয়াই নাগরিক জীবনের চরম অভিব্যক্তি ঘটিয়াছে। তাই রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনা ও গবেষণার ক্ষেত্রে স্বাভাবিকভাবেই রাষ্ট্রই প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে। ইতালীর প্রখ্যাত রাষ্ট্রনৈতিক দার্শনিক ম্যাকিয়াভেলিই তাঁহার 'The Prince' নামক গ্রন্থে প্রথম 'রাষ্ট্র' শব্দটি ব্যবহার করেন। প্রাচীন গ্রীস ও রোমে অবশ্য বহুকাল আগে নগর-রাষ্ট্র বা city state-এর প্রচলন ছিল। প্রাচীন গ্রীক্ ও রোমানগণ নগরকেন্দ্রীক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রে বাস করিত এবং এই সমস্ত নগররাষ্ট্রকে 'পলিস' (Polis) বা 'সিভিটাস' (civitas) নামে অভিহিত করিত।

১॥ **রাষ্ট্রের সংজ্ঞা :** আরিস্টটল হইতে সুরু করিয়া বিভিন্ন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ হইতে বিশ্লেষণ করিয়া রাষ্ট্রের নানা প্রকার সংজ্ঞা নির্দেশ করিয়াছেন। এই সমস্ত সংজ্ঞাগুলি সংখ্যায় যেমনি অনেক, বক্তব্যের দিক হইতেও তেমনি স্বাতন্ত্রের দাবী করিতে পারে। রাষ্ট্রকে কেহ সমাজের উন্নত স্তর বলিয়া মনে করেন; কাহারও নিকট ইহা আইনের অভিব্যক্তি ; কেহ বা ইহাকে শ্রেণীস্বার্থের প্রতিফলন বা ক্ষমতার সংগঠিত রূপ (Power system) বলিয়া মনে করেন। আবার কেহ বা জনকল্যাণকর ব্যবস্থার অঙ্গ হিসাবে রাষ্ট্রকে দেখিয়াছেন। যে সংস্থা মানবজীবনের চালিকা-শক্তি হিসাবে পৃথিবীতে গৌরবজনক আসনের অধিকারী হইয়াছে এবং যাহার ব্যাপকতার কোন সীমা নাই, সেই সংস্থার সংজ্ঞা যে বৈচিত্রে পরিপূর্ণ ও বিবিধ হইবে তাহাতে আর সন্দেহ কী? যাহাই হোক আমরা রাষ্ট্রবিজ্ঞানের কেবলমাত্র কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সংজ্ঞা নিয়ে আলোচনা করিতেছি।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের জনক আরিস্টটল রাষ্ট্রের সংজ্ঞা নির্দেশ করিয়া বলিয়াছেন : "পূর্ণাঙ্গ ও স্বাবলম্বী অর্থাৎ সুখী ও সম্মানজনক জীবনের উদ্দেশে কিছু সংখ্যক

পরিবার ও গ্রামের সমাবেশকে রাষ্ট্র বলে।"[1] বর্তমান যুগে যে ধরণের রাষ্ট্র আমরা দেখিতে পাই তাহা আরিস্টটলের আমলে ছিল না। তাই তিনি পূর্ণাঙ্গ ও স্বাবলম্বী জীবন যাপনের উদ্দেশে মিলিত পরিবার ও গ্রামের সংগঠিত রূপকেই রাষ্ট্র বলিয়াছেন। রোমের বিখ্যাত পণ্ডিত সিসেরো (Cicero) বলিয়াছেন রাষ্ট্র হইল "অধিকার সম্বন্ধে সমচেতনাবদ্ধ ও সুযোগ-সুবিধার পারস্পরিক অংশ গ্রহণে ঐক্যবদ্ধ বিপুলসংখ্যক জনসমাজ।"[2]

বোঁদা (Bodin) রাষ্ট্রের সংজ্ঞা দিয়া বলিয়াছেন, "বিভিন্ন পরিবার ও তাহাদের সাধারণ ধন সম্পত্তির একটি মিলিত সংস্থা যাহা চরম ক্ষমতা ও যুক্তির দ্বারা পরিচালিত।"[3] ব্লুনৎস্লীর (Bluntschli) মতে কোন নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে রাষ্ট্রনৈতিকভাবে সংগঠিত জনসমাজই রাষ্ট্র।[4]

আন্তর্জাতিক আইনের বিখ্যাত পণ্ডিত অধ্যাপক হল (Hall) বলিয়াছেন : "রাষ্ট্রনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত, বহিঃশক্তির শাসন মুক্ত জনসমাজকে স্বাধীন রাষ্ট্রের সংজ্ঞা বলা যাইতে পারে।"[5] রাষ্ট্রপতি উইলসন (wilson) আইনের দৃষ্টিতে রাষ্ট্রের সংজ্ঞা নির্ণয় করিয়া বলিয়াছেন, "আইন অনুসারে সংগঠিত, নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের অধিকারী এক জনসমষ্টি।"[6]

ভাববাদী দার্শনিক হেগেলের নিকট রাষ্ট্র একটি বিমূর্তভাবের প্রকাশ হিসাবে ব্যক্ত হইয়াছে।[7] অপরপক্ষে বস্তুবাদী দর্শনে বিশ্বাসী মার্কসবাদীরা মনে করেন যে বিভিন্ন শ্রেণীর উপর একটি শ্রেণীর আধিপত্য বিস্তার করিবার

1. "A union of families and villages, having for its end perfect and self-sufficing life by which we mean a happy and honourable life."
—Aristotle.

2. The state is "a common society united by a common sense of right and a mutual paticipation in advantages." —Cicero

3. "An association of families and their common possessions governed by a supreme power and reason." —Bodin

4. "The state is a politically organised people of a definite territory."
—Bluntschli

5. "The marks of an independent state are that the community consisting it is permanently established for a political end, that it possesses a defined territory, and that it is independent of external control." —Hall

6. "A state is a people organised for law within a definite territory."
—Wilson

7. "The incarnation of the objective spirit." —Hegel

সংগঠন হইল রাষ্ট্র। (an organisation of one class dominating over the other classes)। অর্থাৎ কার্ল মার্কস (Karl Marx) ও তাঁহার অনুগামীরা ক্ষমতাসীন শ্রেণীর আধিপত্য বজায় রাখিবার হাতিয়ার হিসাবে রাষ্ট্রকে দেখিয়াছেন। ওপেনহাইমার (oppenheimer) ও ল্যাস্কিও (Laski) মোটামুটিভাবে এই ধারণাকেই সমর্থন করিয়াছেন।

সর্বশেষে আমরা আর একটি সংজ্ঞা লইয়া আলোচনা করিব। এই সংজ্ঞাটি দিয়াছেন ডঃ গার্ণার (Garner)। ডঃ গার্ণার প্রদত্ত সংজ্ঞাটি অনেকটা সুস্পষ্ট ও পরিপূর্ণ। ইহা একদিকে রাষ্ট্রের ধারণাকে (concept) যেমন তুলিয়া ধরিয়াছে, তেমনি অপরদিকে রাষ্ট্রের চরিত্র বা উপাদানগুলিকে যথার্থ ভাবে পরিস্ফুট করিয়াছে। ডঃ গার্ণার বলিয়াছেন, "রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও শাসন তান্ত্রিক আইনের ধারায় রাষ্ট্র হইল বহুসংখ্যক জনতার এক সমাজ, যাহা একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে স্থায়ীভাবে বাস করে, যাহা বহি নিয়ন্ত্রণ হইতে স্বাধীন বা প্রায় সেইরূপ এবং যাহার এমন একটি সংগঠিত শাসন ব্যবস্থা আছে, যে শাসন ব্যবস্থার প্রতি জনগণের ব্যাপক অংশ অভ্যাসবশত বশ্যতা জ্ঞাপন করিয়া থাকে।" (The state as concept of political Science and Public law, is a community of persons more or less numerous, permanently occupying a definite portion of a territory, independent or nearly so, of external control and possessing an organised Government to which the great body of inhabitants render habitual obedience)।

২ ॥ রাষ্ট্রের উপাদান

গার্ণার প্রদত্ত সেই সংজ্ঞা বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে রাষ্ট্র মূলত চারিটি উপাদান লইয়া গঠিত। যথা: (১) জনসমষ্টি (Population), (২) নির্দিষ্ট ভূখণ্ড (Territory), (৩) শাসন প্রতিষ্ঠান বা সরকার (Government) এবং (৪) সার্বভৌমিকতা (Sovereignty)। রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে এই উপাদানগুলি একান্তভাবেই অপরিহার্য—ইহাদের কোন একটি উপাদানের অভাব হইলে সেই সংস্থাকে রাষ্ট্র নামে অভিহিত করা যায় না। কেহ কেহ অবশ্য মনে করেন যে স্থায়িত্ব (Permanence) এবং আন্তর্জাতিক স্বীকৃতিকে (International recognition) রাষ্ট্রের উপাদান হিসাবে স্বীকার করা যাইতে পারে। এই দুইটি উপাদানের মূল্যায়ন আমরা পরে করিব। আপাতত রাষ্ট্র সম্পর্কীয়

ধারণা স্পষ্ট করিবার জন্য আমরা গার্ণার প্রদত্ত উপাদানগুলি লইয়াই আলোচনা করিতেছি।

(ক) **জনসমষ্টি** (Population) : ব্যক্তি জীবনের পরিপুর্ণতার জন্য রাষ্ট্র। সুতরাং জনসমষ্টি ছাড়া কোন রাষ্ট্রের কল্পনা করা যায় না। জনসমষ্টি রাষ্ট্রের একটি প্রধান ও অপরিহার্য উপাদান। সংঘবদ্ধভাবে যখন মানুষ বাস করিতে আরম্ভ করিল, তখনই সমাজ ও রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়। তাই সমাজ ও রাষ্ট্র প্রভৃতি সংস্থাগুলি একান্তভাবেই মানবীয় এবং জনসমষ্টিকে বাদ দিয়া ইহাদের অস্তিত্ব থাকিতে পারে না। রাষ্ট্রের জনসমষ্টিকে পুর্ণ নাগরিক, অপুর্ণ নাগরিক, বিদেশী প্রভৃতি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়।

রাষ্ট্র গঠনের জন্য কি পরিমাণ জনসমষ্টির প্রয়োজন তাহা নির্দিষ্ট করিয়া বলা যায় না। আরিষ্টটল ক্ষুদ্র জনসংখ্যার ভিত্তিতে রাষ্ট্র গঠনের পক্ষে ছিলেন, কারণ তিনি মনে করিতেন ইহাতে রাষ্ট্র শক্তিশালী থাকে। গার্ণার 'মোটামুটি বহুসংখ্যক' কথাটি ব্যবহার করিয়াছেন, ইহার দ্বারা অবশ্য জনসমষ্টির পরিমাণ অনুমান করা কঠিন। ম্যাকআইভার (Mac Iver) ল্যাস্কি (Laski) প্রভৃতি রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা জনসমষ্টির সংখ্যা অপেক্ষা রাষ্ট্রের সামাজিক সংগঠনের উপর গুরুত্ব দিয়াছেন। পৃথিবীতে বিভিন্ন সংখ্যার জনসমষ্টি বিশিষ্ট রাষ্ট্র দেখিতে পাওয়া যায়। একদিকে ভারতবর্ষ বা চীনের মত বিরাট জনসংখ্যা লইয়া যেমন রাষ্ট্র গঠিত হইয়াছে, তেমনি অপরদিকে সুইজারল্যাণ্ডের মত সল্প জনসংখ্যা সম্পন্ন রাষ্ট্রও পরিলক্ষিত হয়। অনেকে মনে করেন যে জনসংখ্যা এমন হওয়া উচিত যাহাতে শাসক ও শাসিতের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করা সম্ভবপর হয়। একটি রাষ্ট্র যতটা পরিমাণ জনসংখ্যার ভার বহন করিতে পারে উহাকেই রাষ্ট্রের 'কাম্য জনসংখ্যা' বলে।

(খ) **নির্দিষ্ট ভূখণ্ড** (Territory) : শুধুমাত্র জনসমষ্টির দ্বারা রাষ্ট্র গঠিত হয় না। এই জনসমষ্টি যদি নির্দিষ্ট কোন স্থানে বসবাস না করিয়া যাযাবরের মত ঘুরিয়া বেড়ায় তাহা হইলে রাষ্ট্র গঠিত হইতে পারে না। সুতরাং যতক্ষণ পর্যন্ত জনসমষ্টি কোন নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের অধিকারী না হইতেছে ততক্ষণ রাষ্ট্র গঠিত হইতে পারে না। অর্থাৎ ভূখণ্ড রাষ্ট্রের একটি অপরিহার্য অঙ্গ। জনসমষ্টিকে স্থায়িভাবে বসবাস করিবার জন্য নির্দিষ্ট ভূখণ্ড প্রয়োজন—নতুবা জনসমষ্টি যাযাবর শ্রেণীতে পরিণত হইবে। ব্লুনৎশ্লী (Bluntsehli) তাই বলিয়াছিলেন : "রাষ্ট্রের শারীরিক ভিত্তি যেমন আছে জনসমষ্টিতে, তেমনি বাস্তব ভিত্তি

হইতেছে জমিতে। জনসমষ্টি যতক্ষণ না ভূখণ্ড পাইতেছে, ততক্ষণ রাষ্ট্রে পরিণত হয় না"। গেটেলও (Gettel) বলিয়াছেন যে ভূমিগত সার্বভৌমিকতাই রাষ্ট্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য। পূর্বে ইহুদিরা সারা পৃথিবীতে ছড়াইয়া ছিল, ইহারা যখন প্যালেষ্টাইনে স্থায়িভাবে বসবাস আরম্ভ করিল তখনই ইহুদি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হইল। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, রাষ্ট্র যে সকল উপাদানের সমন্বয়ে গঠিত হয় নির্দিষ্ট ভূখণ্ড উহার ভিতর অন্যতম ও একটি অপরিহার্য উপাদান।

প্রশ্ন হইল, নির্দিষ্ট ভূখণ্ড বলিতে প্রকৃতপক্ষে কি বোঝায়? নির্দিষ্ট ভূখণ্ড বলিতে রাষ্ট্রবিজ্ঞান রাষ্ট্রের নির্দিষ্ট ভৌগোলিক সীমার অস্তিত্বের কথা বোঝায়। ভৌগোলিক সীমা এখানে ব্যাপকতর অর্থে প্রয়োগ করা হইয়াছে। নির্দিষ্ট ভূখণ্ড দ্বারা শুধু ভূমির উপরিভাগকেই বোঝায় না, রাষ্ট্রের অন্তর্গত সমুদয় ভূমিতল, নদ-নদী, পাহাড়-পর্বত, এবং সমুদ্র উপকূলবর্তী জলভাগের কিছু অংশ (territorial waters) রাষ্ট্রের সীমানার মধ্যে ধরা হয়। রাষ্ট্রের সীমা শুধু জল ও স্থলের ভিতরই সীমাবদ্ধ নয়। রাষ্ট্রের উপরিভাগে যে বায়ুমণ্ডল রহিয়াছে উহার ক্ষেত্রেও সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রের ক্ষমতা পরিব্যপ্ত। যদিও এই সমস্ত ক্ষেত্রে কিছু কিছু ব্যতিক্রম রহিয়াছে, তাহা পরে আলোচনা করা যাইবে।

রাষ্ট্র গঠনের জন্য ভূখণ্ডের আয়তন কতটা হইবে সেই সম্পর্কে কোন নির্দিষ্ট নিয়ম নাই। তাই আমরা যেমন ভারতবর্ষ ও চীনের মত বিরাট ভৌগোলিক আয়তন বিশিষ্ট রাষ্ট্র দেখিতে পাই তেমনি 'লাক্সেমবুর্গ' এর (মাত্র ৯৯৯ বর্গ মাইল) মত ক্ষুদ্র আয়তনের রাষ্ট্রও পৃথিবীতে আছে। আরিষ্টটল বলিয়াছেন যে গাছপালা, পশুপক্ষীর মত রাষ্ট্রের আকারেরও একটা সীমা আছে। ইহার কম বেশী হইলে রাষ্ট্র তাহার স্বরূপ হারায়। প্রাচীন কালে ধারণা ছিল ক্ষুদ্রকায় রাষ্ট্রেই গণতন্ত্র সম্ভব। রুশো (Rousseau) মনে করিতেন যে ক্ষুদ্রায়তন রাষ্ট্র বৃহৎ রাষ্ট্র হইতে শক্তিশালী। মঁতেস্কু (Montesquieu), টকভিল (Toqueville) প্রভৃতিরা মনে করিতেন যে গণতন্ত্র ক্ষুদ্র আয়তন বিশিষ্ট রাষ্ট্রেই চলিতে পারে। অপরপক্ষে ট্রিটশকে (Trietschke) রাষ্ট্রের ক্ষুদ্রতাকে পাপ বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। যাহাই হউক রাষ্ট্রের আয়তন সম্পর্কে বাধা ধরা কোন নীতি অনুসরণ করা যায় না। তবে দেখা গিয়াছে যে রাষ্ট্রের প্রাধান্য, গুরুত্ব, শক্তি ও মর্যাদা অনেক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের আয়তনের উপর নির্ভর করে। আয়তন যাহাই হোক না কেন ভূখণ্ডের সীমানা

নির্দিষ্ট হওয়া চাই, কেন না রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা ইহার অধীনস্থ ভূখণ্ডের উপরই প্রয়োগ করা চলে।

অধ্যাপক হল (Hall) রাষ্ট্রের অপরিহার্য উপাদান হিসাবে ভূখণ্ডের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেন না। ডুগোয়া (Duguit) বলিয়াছেন রাষ্ট্র সেখানেই সম্ভব যেখানে শাসক ও শাসিতের মধ্যে শ্রেণীবিভাগ রহিয়াছে এব এই বিভাগের জন্য কোন নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের প্রয়োজন হয় না।[৪] ডুগোয়ার এই বক্তব্য সম্পূর্ণ সত্য নয়। মানসিক ঐক্যের ভিত্তিতে ইহুদীদের মত রাষ্ট্রহীন জনসমাজ গড়িয়া উঠিতে পারে সত্য, কিন্তু তাহা দ্বারা রাষ্ট্রের অপরিহার্য উপাদান হিসাবে ভূখণ্ডের প্রয়োজনীয়তা বাতিল হইয়া যায় না। বস্তুতঃপক্ষে রাষ্ট্র চিন্তার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের অস্তিত্ব রাষ্ট্রের একান্ত প্রয়োজনীয় অঙ্গ হিসাবে যোগ হইয়াছে। তাই এঙ্গেলস (Engels) বলিয়াছেন যে, "প্রাচীন সমাজ ব্যবস্থার সঙ্গে রাষ্ট্রের পার্থক্য ঘটিয়াছে মূলত নির্দি ভূখণ্ডের ভিত্তিতে"।[৯]

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, রাষ্ট্রের ভূখণ্ড থাকিতেই হইবে, নহিলে উহ রাষ্ট্র পদবাচ্য হইবে না। রাষ্ট্রীয় সার্বভৌম ক্ষমতা উহার অধীনস্থ ভূখণ্ডে উপর সম্পূর্ণভাবে প্রয়োগ করা চলিবে। সাধারণভাবে রাষ্ট্রের এই চূড়ান্ত অপ্রতিহত সার্বভৌম ক্ষমতা রাষ্ট্রীয় ভূখণ্ডের উপর এককভাবে আধিপত্য বিস্তার করে এবং অন্য কোন ক্ষমতাকে রাষ্ট্র নিজের এলাকায় স্বীকার কে না। কিন্তু ইহার কিছু কিছু ব্যতিক্রম রহিয়াছে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে রাষ্ট্র ইহা নিজস্ব এলাকায় সার্বভৌম ক্ষমতার প্রয়োগ করিতে বা এককভাবে প্রয়ো করিতে পারে না। এই সমস্ত ব্যতিক্রমগুলোকে নীচে আলোচনা কর হইল।

১। যে সমস্ত ক্ষেত্রে কোন একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ড লইয়া দুই বা ততোধিক রাষ্ট্রের মধ্যে বিবাদ দেখা যায় এবং উহার আশু মীমাংসার সম্ভাবনা থাকে না তখন কোন কোন ক্ষেত্রে বিবদমান রাষ্ট্রগুলি চুক্তিদ্বারা একই সঙ্গে উক্ত নির্দি ভূখণ্ডের উপর অধিকার প্রয়োগ করিয়া থাকে। সুদানে বৃটিশ ও মিশরে

8. "Territory is not an in dispensable element in the formation of state." —Dugu

9. "As against the ancient gentile organiations, the primary distin uishing feature of the state is the division of the subjects of the sta according to territory." —Eng

এইরূপ যুক্ত অধিকার ছিল। ইহাকে সহ মালিকানা বা Co-dominium বলে। এইরূপ ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের উপর কোন একটি রাষ্ট্রের একক এবং চূড়ান্ত ক্ষমতা থাকে না।

২। কোন একটি রাষ্ট্রের ভিতর যে সমস্ত বিদেশী দূতাবাস থাকে সেই সমস্ত দূতাবাসের অধীনস্থ এলাকা আন্তর্জাতিক আইনের পরিপ্রেক্ষিতে সেই সকল বিদেশী রাষ্ট্র সমূহের ভূখণ্ড বলিয়া গণ্য করা হয়।

৩। যুদ্ধকালীন অবস্থায় কোন এক রাষ্ট্রের সরকার পলাইয়া অন্য দেশে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া দেশের বিধিসঙ্গত সরকার বলিয়া স্বীকৃত হইতে পারে, যদিও সেই ক্ষেত্রে তাহার নিজের রাষ্ট্রের ভূখণ্ডে তাহার শাসন অচল।

(গ) শাসন প্রতিষ্ঠান বা সরকার (Government): কোন নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত জনসমষ্টি দ্বারা রাষ্ট্র পরিচালনা করা সম্ভব নয়। রাষ্ট্র গঠনের তৃতীয় অপরিহার্য উপাদান হইতেছে শাসন প্রতিষ্ঠান বা সরকার। ইহার দ্বারাই রাষ্ট্র পরিচালিত হয়। এই শাসন প্রতিষ্ঠানই রাষ্ট্রের কর্ণধার। রাষ্ট্রের সমষ্টিগত ইচ্ছা, রাষ্ট্রের মহান উদ্দেশ্য কার্যকরী হয় এই শাসন প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে। বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সংখ্যক ব্যক্তি লইয়া নানা উপায়ে সরকার গঠিত হইয়া থাকে। ইহারাই রাষ্ট্রযন্ত্রকে পরিচালনা করেন। সরকারের ক্ষমতাকে তিনটি ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে: যথা শাসন বিভাগীয় ক্ষমতা, বিচার বিভাগীয় ক্ষমতা ও আইন বিভাগীয় ক্ষমতা। এই তিন বিভাগে দায়িত্ববদ্ধ ব্যক্তি সমষ্টি লইয়াই সরকার গঠিত হয়।

(ঘ) সার্বভৌম ক্ষমতা (Sovereignty): রাষ্ট্র পরিচালনা করিয়া রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য ও আদর্শকে বাস্তবে রূপায়িত করিতে হইলে ইহাকে অপ্রতিহত ক্ষমতার অধিকারী হইতে হইবে। এই অপ্রতিহত, অসীম, চূড়ান্ত ক্ষমতাকেই বলা হয় সার্বভৌম ক্ষমতা। রাষ্ট্রের উপাদানগুলির মধ্যে সর্বপ্রধান হইল সার্বভৌম ক্ষমতা। এই সার্বভৌম ক্ষমতা আবার আভ্যন্তরীণ ও বহিস্থ এই দুই ভাগে বিভক্ত। আভ্যন্তরীণ সার্বভৌম ক্ষমতার দ্বারা রাষ্ট্র তাহার অন্তর্গত সকল জনসাধারণ ও প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে পূর্ণ আনুগত্য দাবী করিতে পারে। রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ সার্বভৌম ক্ষমতার জন্যই রাষ্ট্র আইন রচনা করে, বিচার পরিচালনা করে এবং শাসনক্ষমতা প্রয়োগ করে। এই ক্ষমতা বলেই রাষ্ট্রের অধীনস্থ জনগণও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান রাষ্ট্রীয় আইন, বিচার ও শাসন

মানিতে বাধ্য। আবার বহিস্থ সার্বভৌম ক্ষমতার জন্যই রাষ্ট্র বহিঃশক্তির নিয়ন্ত্রণ-মুক্ত হয় এবং স্বাধীনভাবে নিজেকে পরিচালনা করিতে পারে।

সমালোচকেরা বলিয়া থাকেন যে রাষ্ট্রের এই সার্বভৌম ক্ষমতা আভ্যন্তরীণ ও বহিঃস্থ কোন ক্ষেত্রেই চূড়ান্ত ও অসীম নয়, ইহারা একান্তভাবেই সীমাবদ্ধ (The state is limited within, it is limited without)। কারণ আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে ব্যাপক গণ ইচ্ছার নিকট এবং বহির্ক্ষেত্রে অন্যান্য রাষ্ট্রের সমষ্টিগত ইচ্ছার নিকট অনেক সময়ই রাষ্ট্রকে নতি স্বীকার করিতে হয়।

ইহা ছাড়াও স্থায়িত্ব (Permanence), ধারাবাহিকতা (continuity) আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি (International recognition) প্রভৃতিকে অনেকে রাষ্ট্রের উপাদান হিসাবে মনে করেন। কিন্তু রাষ্ট্রের উপাদান হিসাবে ইহাদের স্বপক্ষে যুক্তিপূর্ণ বক্তব্য উপস্থিত করিতে না পারার জন্য রাষ্ট্রবিজ্ঞানীগণ ইহাদের রাষ্ট্রের অপরিহার্য, উপাদান হিসাবে স্বীকৃতি দিতে প্রস্তুত নন। সুতরাং দেখা যাইতেছে রাষ্ট্রের উপাদান হিসাবে জনসমষ্টি, নির্দিষ্ট ভূখণ্ড, সরকার ও সার্বভৌম শক্তি একান্ত অপরিহার্য। ইহাদের কোন একটির অভাব ঘটিলে উহা রাষ্ট্র পদবাচ্য হইতে পারে না।

৩ ॥ রাষ্ট্র ও অন্যান্য সংস্থা : অন্যান্য সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলির মত রাষ্ট্রও একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান। রাষ্ট্রসহ এই সমস্ত সামাজিক প্রতিষ্ঠান লইয়াই সমাজ গঠিত। সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে রাষ্ট্রের সঙ্গে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের কিছু সাদৃশ্য আছে সত্য, কিন্তু মৌলিক দিক হইতে রাষ্ট্রের সঙ্গে অন্যান্য সামাজিক প্রতিষ্ঠানের গুরুত্বপুর্ণ পার্থক্য রহিয়াছে। এই পার্থক্য রাষ্ট্র ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের উদ্ভব হইতে শুরু করিয়া গঠনবৈচিত্র্য, ক্ষমতা প্রয়োগ, কার্যপদ্ধতি ও উদ্দেশ্যের ক্ষেত্রে প্রসারিত। প্রথমত, রাষ্ট্রের উৎপত্তি হইয়াছে বিবর্তনের মধ্য দিয়া। অন্যান্য সংস্থার উৎপত্তির ক্ষেত্রে বিবর্তনের বিশেষ কোন ভূমিকা আছে কিনা সন্দেহ। দ্বিতীয়ত, প্রত্যেক রাষ্ট্রের একটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক সীমা ও ভূখণ্ড থাকে। ইহার অধীনস্থ এলাকায় রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত থাকে। অন্যান্য সামাজিক প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্বের জন্য এইরূপ কোন ভৌগোলিক সীমা ও ভূখণ্ডের প্রয়োজন হয় না। তৃতীয়ত, বিভিন্ন দেশের নাগরিক লইয়া প্রতিষ্ঠান গঠন করা যায়। যথা : রেডক্রস সোসাইটি, রামকৃষ্ণ মিশন ইত্যাদি। কিন্তু রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে এইরূপ ঘটনা ঘটিতে পারে না। চতুর্থত, মানুষ একের বেশি রাষ্ট্রের সভ্য (স্বাভাবিকভাবে) হইতে পারে না। কিন্তু

ইচ্ছানুযায়ী মানুষের একের বেশি সামাজিক প্রতিষ্ঠানের সভ্য হইতে কোন বাধা নাই। পঞ্চমত, রাষ্ট্রের প্রতি মানুষের আনুগত্য ও ইহার সদস্য হওয়া বাধ্যতামূলক। অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সদস্যপদ মানুষের ইচ্ছাধীন। ষষ্ঠত, সামাজিক সংগঠনগুলির একটি নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য থাকে। কিন্তু রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য ব্যাপক ও বহুবিস্তৃত, কারণ মানুষের সর্বাঙ্গীন উন্নতিই রাষ্ট্রের লক্ষ্য। সপ্তমতঃ, সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলি হইতে রাষ্ট্র অনেক বেশি স্থায়ী। উদ্দেশ্য সফল হইলেই অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলির বিনাশ ঘটে। কিন্তু রাষ্ট্র মোটামুটিভাবে স্থায়ী। অষ্টমতঃ, অন্যান্য সামাজিক প্রতিষ্ঠান রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রাধীন; কিন্তু রাষ্ট্র কাহারো দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় না। নবমত, রাষ্ট্র ও অন্যান্য সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপুর্ণ পার্থক্য হইতেছে সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা আছে। কিন্তু অন্যান্য সামাজিক প্রতিষ্ঠানের এইরূপ কোন ক্ষমতা নাই। নিম্নে আমরা কয়েকটি সংস্থা লইয়া আলোচনা করিয়া উহাদের সঙ্গে রাষ্ট্রের পার্থক্য নির্দেশ করিতেছি।

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ: (United Nations) পৃথিবীর বিভিন্ন সার্বভৌম রাষ্ট্রের মিলিত একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা। যুদ্ধের সম্ভাবনা প্রশমিত করিয়া বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠা করা, বিভিন্ন দেশের মধ্যে পারস্পরিক সম্প্রীতি বৃদ্ধি করা এবং মানুষের সর্বাঙ্গীন উন্নতির পথ প্রশস্ত করাই এই সংস্থার উদ্দেশ্য। রাষ্ট্রের সহিত এই সংস্থার কিছু কিছু আপাত সাদৃশ্য লক্ষ্য করিয়া কেহ কেহ ইহাকে রাষ্ট্র পর্যায়ভুক্ত করিয়াছেন। এইরূপ সিদ্ধান্ত করিবার কারণ এই যে, প্রথমত, রাষ্ট্রের মত এই সংস্থারও আইনবিভাগ, বিচার বিভাগ ও শাসন বিভাগ রহিয়াছে। দ্বিতীয়ত, বিশ্বশান্তি রক্ষার জন্য ইহা যে কোন রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিতে পারে। তৃতীয়ত, এই সংস্থা যুদ্ধশেষে চুক্তি স্থাপন করিতে পারে। চতুর্থত, কার্য পরিচালনার জন্য ইহার পরিচালকবর্গ, দপ্তরখানা ও কোষাগার আছে। এই সমস্ত লক্ষ্য করিয়া কেহ কেহ ইহাকে অভিভাবক রাষ্ট্র (Super State) রূপে অভিহিত করেন।

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের এই সমস্ত বৈশিষ্ট্য থাকা সত্ত্বেও ইহাকে সাধারণ রাষ্ট্রের পর্যায়ভুক্ত করা যাইতে পারে না। রাষ্ট্র কয়েকটি একান্ত প্রয়োজনীয় উপাদান লইয়া গঠিত হয়। কিন্তু জাতিপুঞ্জের ক্ষেত্রে এই সমস্ত উপাদানের অভাব বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। প্রথমত, রাষ্ট্রের মত জাতিপুঞ্জের কোন নির্দিষ্ট ভূখণ্ড এবং নিজস্ব কোন জনসমষ্টি নাই। দ্বিতীয়ত, জাতিপুঞ্জের যদিও

রাষ্ট্রের মত শাসনযন্ত্র আছে কিন্তু ইহাদের বিধিনিষেধ অন্যান্য রাষ্ট্রের উপর বাধ্যতামূলকভাবে প্রয়োগ করা যায় না, ইহা অন্যান্য রাষ্ট্রের সম্মতিসাপেক্ষ। তৃতীয়ত, বিভিন্ন রাষ্ট্র নিজস্ব সার্বভৌম ক্ষমতা পরিত্যাগ না করিয়া সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সভ্য হয়। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের কোন সার্বভৌম ক্ষমতা নাই যাহার দ্বারা ইহা অন্যান্য রাষ্ট্রের উপর নিজস্ব আইন প্রতিষ্ঠা করিতে পারে। চতুর্থত, জাতিপুঞ্জের যুদ্ধ ঘোষণা করিবার শক্তি ও সামর্থ্য খুবই সীমাবদ্ধ, কারণ এই ক্ষেত্রেও জাতিপুঞ্জকে অন্যান্য রাষ্ট্রের সদিচ্ছার উপর নির্ভর করিতে হয়।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জকে রাষ্ট্ররূপে আখ্যা দেওয়ার কোন সঙ্গত কারণ নাই। বর্তমান পৃথিবীর রাজনৈতিক অবস্থায় জাতিপুঞ্জের প্রতিপত্তি ও গুরুত্ব বহুলাংশে যদিও বৃদ্ধি পাইয়াছে, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও ইহা রাষ্ট্রীয় মর্যাদা লাভ করিতে পারে নাই। ইহা নিছকই বহু রাষ্ট্র কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত একটি স্বেচ্ছা প্রতিষ্ঠান (voluntary association) মাত্র।

পশ্চিমবঙ্গকে (State of West Bengal) লইয়া আলোচনা করিয়া দেখান যাইতে পারে যে ইহা রাষ্ট্র নয়। ভারতীয় সংবিধানে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অধীনস্থ সরকার সম্পন্ন অঞ্চলগুলিকে যদিও স্টেট (State) নামে অভিহিত করা হইয়াছে, কিন্তু ইহারা যুক্তরাষ্ট্রের অংশ (Units) মাত্র, রাষ্ট্র নয়। কোন নির্দিষ্ট অঞ্চলকে রাষ্ট্র হইতে হইলে ইহার জনসমষ্টি, নির্দিষ্ট ভূখণ্ড, সরকার ও সার্বভৌমিকতা থাকা প্রয়োজন। একটু বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে, পশ্চিমবঙ্গে যদিও জনসমষ্টি, নির্দিষ্ট ভূখণ্ড এবং সরকারের অস্তিত্ব আছে তবুও রাষ্ট্রের পক্ষে একান্ত অপরিহার্য উপাদান সার্বভৌম ক্ষমতা ইহার নাই। এই সার্বভৌম ক্ষমতা রহিয়াছে কেন্দ্রের বা যুক্তরাষ্ট্রের। এই সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী না হইবার জন্য পশ্চিমবঙ্গ রাষ্ট্র নয়। এই কারণে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অধীনস্থ বিহার, মাদ্রাজ, কেরল, মহারাষ্ট্র, পঞ্জাব প্রভৃতি অঙ্গ রাজ্যগুলির ভিতর কোনটাই রাষ্ট্র নহে।

নিউইয়র্ক (New York) আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের অঙ্গরাজ্য। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের অঙ্গরাজ্য হইবার জন্য নিউইয়র্কের কোন সার্বভৌম ক্ষমতা নাই। সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী না হইলে কোন অঞ্চলকে রাষ্ট্র হিসাবে আখ্যা দেওয়া যায় না। সুতরাং যেজন্য পশ্চিমবঙ্গ রাষ্ট্র নহে, সেই কারণেই নিউ-ইয়র্কও রাষ্ট্র হিসাবে স্বীকৃত পাইতে পারে না।

৪॥ **রাষ্ট্র ও সরকার** দৈনন্দিন জীবনে রাষ্ট্র ও সরকারের ভিতর কোনরূপ পার্থক্য না করিয়া একই অর্থে এই দুইটি শব্দকে প্রয়োগ করা হইয়া থাকে। হবস্ তাঁহার 'লেভিয়াথান' পুস্তকে একই অর্থে এই শব্দ দুইটিকে ব্যবহার করিয়াছেন। ফরাসী সম্রাট চতুর্দশ লুই (Louis XIV) বলিয়াছেন 'আমিই রাষ্ট্র' (I am the State)। কিন্তু রাষ্ট্রবিজ্ঞানে এই দুইটি শব্দের অর্থ সম্পূর্ণ পৃথক। রাষ্ট্র একটি বিশাল প্রয়োজনীয় সামাজিক প্রতিষ্ঠান, আর সরকার হইল সেই রাষ্ট্রের ইচ্ছার রূপকার। রাষ্ট্রের সঙ্গে সরকারে পার্থক্যগুলি নিম্নে আলোচনা করা হইল।

১। রাষ্ট্র একটি অন্যতম সামাজিক প্রতিষ্ঠান, সরকার ইহার একটি উপাদান। রাষ্ট্রের ইচ্ছা ও উদ্দেশ্য সরকারের মাধ্যমে কার্যকরী করা হয়। উপাদান কখনই সমগ্রের সমান হইতে পারে না।

২। রাষ্ট্রের সার্বভৌমিকতা আছে। সরকার রাষ্ট্রীয় ইচ্ছাকে কার্যে পরিণত করার একটি উপাদান মাত্র, ইহার সার্বভৌম শক্তি নাই।

৩। রাষ্ট্র গঠিত হয় দেশের সমগ্র জনসমষ্টি লইয়া। কিন্তু এই বিশাল জনসমষ্টির একটা অংশমাত্র শাসনকার্যে জড়িত থাকে এবং সরকার বলিতে সেই অংশটুকুকে বোঝায়।

৪। রাষ্ট্র মোটামুটি ভাবে স্থায়ী। কিন্তু সরকার একান্তভাবেই সাময়িক ইহার কোন স্থায়িত্ব নাই। একই রাষ্ট্রে সরকারের অনেকবার রূপান্তর ঘটিয়া থাকে।

৫। অনেকের মতে রাষ্ট্রের কোন বাস্তব রূপ নাই,—ইহা একটি বিমূর্ত ভাব (abstract Idea) মাত্র। কিন্তু সরকারের বাস্তব রূপ (concrete expression) আছে। তাই দেখা যায় জনগণের সরকারের বিরুদ্ধে অসন্তোষ থাকে কিন্তু রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে নহে।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, রাষ্ট্র ও সরকারকে একই অর্থে প্রয়োগ করিবার কোন যুক্তি সঙ্গত কারণ নাই। বস্তুত পক্ষে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে ইহারা সম্পূর্ণ পৃথক অর্থে ব্যবহৃত হয়। এই প্রসঙ্গে অধ্যাপক গার্নার বলিয়াছেন :— "রাষ্ট্রের একটি অপরিহার্য উপাদান হইল সরকার। কিন্তু কোন একটি প্রাণীর মস্তিষ্ক বলিতে যেমন প্রাণীটিকে বোঝায় না বা কোন পর্ষদের পরিচালক মণ্ডলীর

দ্বারা যেমন পর্ষদকে নির্দেশ করে না, তেমনি সরকার বলিতে রাষ্ট্র বোঝায় না।[10]

পঞ্চম অধ্যায়

রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্পর্কীয় মতবাদ

(Theories of the origin of state)

সমাজ জীবনের একটা স্তরে মানুষের প্রয়োজন হইতেই রাষ্ট্র নামক সংস্থা ও অন্যান্য সামাজিক সংগঠনের উদ্ভব এবং উৎপত্তি ঘটিয়াছিল। কিন্তু কি করিয়া মানব সমাজে প্রথমে রাষ্ট্রের আবির্ভাব ঘটিয়াছিল সে সম্বন্ধে চূড়ান্ত প্রমাণসিদ্ধ কোন তথ্য আজ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। স্বভাবতই এই ব্যাপারে সমাজ-বিজ্ঞানী ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মধ্যে কোন সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত দেখিতে পাওয়া যায় না। রাষ্ট্র চিন্তার ইতিহাসে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী নানা প্রকার তত্ত্ব ও তথ্যের উপস্থানের দ্বারা রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্পর্কীয় ভিন্ন ভিন্ন মতবাদের কথা বলিয়াছেন। এই সমস্ত মতবাদ বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই পরস্পর বিরোধী বলিয়া ইহাদের ভিতর মৌলিক সাদৃশ্য এবং ঐক্য প্রায় খুঁজিয়াই পাওয়া যায় না। রাষ্ট্রচিন্তার ইতিহাস বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে কোন একটা যুগে রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্পর্কীয় কোন একটি বিশেষ মতবাদ প্রাধান্য এবং প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। কিন্তু পরবর্তী কোন এক সময় সেই মতবাদ বর্জিত হইয়া ইতিহাসের আবর্জনায় নিক্ষিপ্ত হইয়াছে এবং অন্য একটি মতবাদ ইহার স্থানে নব প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্পর্কীয় বিভিন্ন তত্ত্ব প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে একদিকে যেমন সংস্কার, ধর্মবোধ ও কল্পনাভিত্তিক চিন্তা প্রভূত পরিমাণ প্রভাব বিস্তার করিয়াছে; তেমনি অপর পক্ষে সমাজ বিজ্ঞান, নৃতত্ত্ব, মানব জাতির কুলগত তত্ত্ব, বিবর্তন তত্ত্ব এবং ইতিহাস প্রয়োজনীয় আলোকপাতের দ্বারা এই সমস্ত মতবাদের উদ্ভবের ক্ষেত্রে বিশেষ সাহায্য করিয়াছে এবং রাষ্ট্রের উৎপত্তির তত্ত্বকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। এই সমস্ত বিজ্ঞানভিত্তিক তত্ত্বের আবিষ্কার ও অনুশীলনের পূর্বে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা কল্পনার উত্তর নির্ভর করিয়াই রাষ্ট্রের উৎপত্তি ব্যাখ্যা করিবার

চেষ্টা করিতেন। ইহারই জন্য রাষ্ট্রের উৎপত্তিকে কেন্দ্র করিয়া কয়েকটি কল্পনা প্রসূত মতবাদ দেখিতে পাওয়া যায়। যথা :

১। ঐশ্বরিক উৎপত্তি তত্ত্ব (Theory of Divine Origin)

২। সামাজিক চুক্তি মতবাদ (Social contract theory)

৩। বলপ্রয়োগ মতবাদ (Theory of Force)

এই সমস্ত কল্পনাপ্রসূত মতবাদগুলি রাষ্ট্রের উৎপত্তির কারণ নির্ণয় করিতে পারে নাই বটে, কিন্তু ইহাদের মধ্যে কিছু সত্য নিহিত আছে বলিয়া এই তত্ত্ব-গুলোর আলোচনা অপরিহার্য হইয়া দেখা দিয়াছে। ইহা ছাড়াও মনে রাখিতে হইবে এই সমস্ত তত্ত্ব কখনও কখনও সমকালীন চিন্তা জগতে প্রচণ্ড আলোড়ন সৃষ্টি করিয়া ইতিহাসকে প্রভাবান্বিত করিয়াছিল। সুতরাং কল্পনাপ্রসূত মতবাদগুলির ঐতিহাসিক ও তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে।

উপরোক্ত কল্পনাপ্রসূত মতবাদগুলি ছাড়াও সমাজ বিজ্ঞান ও ঐতিহাসিক ভিত্তিমূলক দুইটি মতবাদ রহিয়াছে।

৪। পরিবার সম্প্রসারণের পিতৃতান্ত্রিক ও মাতৃতান্ত্রিক তত্ত্ব
(Patriarchal and Matriarchal Theory)

৫। ঐতিহাসিক বা বিবর্তনবাদমূলক তত্ত্ব (Historical or
Evolutionary Theory)

ইহাদের মধ্যে ঐতিহাসিক বা বিবর্তনমূলক তত্ত্ব রাষ্ট্রের উৎপত্তির গ্রহণ-যোগ্য এবং সন্তোষজনক ব্যাখ্যা উপস্থিত করিতে সক্ষম হইয়াছে।

এই সমস্ত মতবাদগুলি মূলত রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্পর্কীয় হইলেও মনে রাখিতে হইবে যে ইহাদের মধ্যে ঐশ্বরিক উৎপত্তি তত্ত্ব, বলপ্রয়োগ মতবাদ এবং সামাজিক চুক্তি মতবাদের বক্তব্য শুধুমাত্র রাষ্ট্রের উৎপত্তি ব্যাখ্যার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। এই তিনটি মতবাদ রাষ্ট্রের প্রকৃতি সম্পর্কেও কিছুটা আলোক-পাত করিয়াছে। এই জন্যই রাষ্ট্র সমন্ধীয় মতবাদগুলিকে 'রাষ্ট্রের উৎপত্তি'ও 'রাষ্ট্রের প্রকৃতি' এইরূপ শ্রেণীবিভাগকে অনেক রাষ্ট্রবিজ্ঞানী বিজ্ঞানসম্মত বলিয়া মনে করেন না।

১॥ ঐশ্বরিক উৎপত্তি তত্ত্ব (Theory of Divine origin)

রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্পর্কিত কল্পনাপ্রসূত তত্ত্বগুলির মধ্যে ঐশ্বরিক উৎপত্তি তত্ত্ব সর্বাপেক্ষা প্রাচীন। এই তত্ত্ব মনে করে যে রাষ্ট্র ঈশ্বর কর্তৃক সৃষ্ট এবং তাঁহারই ইচ্ছায় পরিচালিত। ঈশ্বর রাষ্ট্র সৃষ্টির মাধ্যমে তাঁহার প্রতিনিধির

দ্বারা শাসন পরিচালনা করিয়া মানুষের সভ্য ও সুখী জীবন যাপনের সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত করিয়াছেন। সুতরাং ঈশ্বরের ইচ্ছাই রাষ্ট্রনৈতিক সমাজ গঠনের মূল ভিত্তি। ঈশ্বরের আদেশ ও ইচ্ছাকে কার্যে রূপান্তরিত করেন তাঁহার প্রতিনিধি রাজা। ঈশ্বর ও তাঁহার প্রতিনিধি রাজার ইচ্ছা এক এবং অভিন্ন বলিয়া এই মতবাদ মনে করে। সুতরাং বিনা প্রতিবাদে রাজার আদেশ, নির্দেশ ও ইচ্ছাকে মান্য করা প্রজাদের একান্ত কর্তব্য। কারণ রাজার বিরুদ্ধাচারণ করার অর্থ হইল ঈশ্বর ও ধর্মের বিরুদ্ধাচারণ করা—ইহা মহাপাপ[1]। ঈশ্বরের প্রতিনিধি রাজা তাহার কার্যের জন্য জনসাধারণের নিকট কোন প্রকার কৈফিয়ৎ দিতে বাধ্য নহেন, কারণ জনসাধারণের প্রতি তাহার কোন দায়িত্ব নাই। একমাত্র ভগবানের বিচার সভাতেই তাহার দায়িত্ব ও কার্যাবলীর বিচার হইতে পারে। সুতরাং এই মতবাদ অনুসারে কোন প্রকার দ্বিধা ও সংকোচ না রাখিয়া সমস্ত অবস্থায় ঈশ্বরের প্রেরিত প্রতিনিধি রাজাকে মান্য করা ও তাহার প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করা জনগণের পবিত্র কর্তব্য। এই মতবাদ রাষ্ট্রকে শুধু ঈশ্বর সৃষ্ট বলিয়াই মনে করে না, রাজাকেও ঐশ্বরিক ক্ষমতার অধিকারী বলিয়া স্বীকার করে। অর্থাৎ ঐশ্বরিক উৎপত্তি তত্ত্ব যে রাষ্ট্রের কথা বলিয়াছে তাহাকে ধর্মীয় রাষ্ট্র বা ঐশ্বরিক রাষ্ট্র (Theocratic state) বলিয়া অভিহিত করা যায়।

ঐশ্বরিক উৎপত্তি তত্ত্বকে বিশ্লেষণ করিয়া ডকটর ফিগিস্ (Figgis) দেখাইয়াছেন যে চারটি মূল সূত্রের উপর এই তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত। প্রথমত, রাষ্ট্র ঈশ্বর সৃষ্ট প্রতিষ্ঠান। দ্বিতীয়ত, বংশানুক্রমে রাজত্ব করা শাসকদের ঈশ্বর প্রদত্ত অধিকার। তৃতীয়ত, ঈশ্বর ছাড়া অন্য কাহারও নিকট রাজা নিজের কাজের জন্য কৈফিয়ৎ দিতে বাধ্য নন। চতুর্থত, রাজার আদেশ মান্য করা ও তাঁহার প্রতি অনুগত থাকা প্রজাদের পবিত্র কর্তব্য এবং বিরুদ্ধাচারণ করা পাপ।

প্রাচীন মিশর, চীন, পারস্য, জাপান, ভারতবর্ষ প্রভৃতি দেশে এই মতবাদের সমর্থন দেখিতে পাওয়া যায়। মধ্যযুগে যখন পোপ ও রাজার ভিতর শ্রেষ্ঠত্ব লইয়া বিরোধ শুরু হয়, তখন রাজার পক্ষ হইতে এই বলিয়া প্রচার করিয়া হইয়াছিল যে তিনি শ্রেষ্ঠ, কারণ তিনি ঈশ্বর প্রেরিত প্রতিনিধি।

1. "Under any circumstances resistance to a king is a sin, and ensures damnation." —Dr. Figgis

অপরপক্ষে পোপের সমর্থকগণ পোপকে ঈশ্বরের প্রতিনিধি বলিয়া দাবী করে। কিন্তু যুদ্ধ বিগ্রহের ফলে পোপের দাবী শেষপর্যন্ত টেকে নাই। ইংলণ্ডের রাজা প্রথম জেমস্ (James I) ১৬০৩ খৃষ্টাব্দে পার্লামেণ্টে ভাষণ প্রদানকালে বলিয়াছিলেন যে "তিনি স্বামী এবং সমগ্র দেশ তাহার আইনসম্মত স্ত্রী"[2], কারণ রাজারা পৃথিবীতে ঈশ্বরের মানবীয় প্রতিবিম্ব (kings are the breathing Images of God upon earth)। প্রথম জেমসের এই বক্তব্যকে সাহিত্যের মধ্য দিয়া আরও উন্নত পর্যায়ে প্রতিষ্ঠা করিবার ক্ষেত্রে রবার্ট ফিল্মার-এর (Robert Filmer) নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁহার মতে রাজার ক্ষমতা শুধু ঈশ্বরদত্তই নয়, ইহা সন্তানের উপর পিতার ক্ষমতার ন্যায় ব্যাপক, স্বাভাবিক এবং এই ক্ষমতা রাজারা বংশানুক্রমে ভোগ করিবার অধিকারী। শুধুমাত্র প্রথম জেমস্ বা ফিল্মার নয়, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে জনশক্তির অভ্যুত্থান রোধ করিবার জন্য প্রয়োজন মত রাজার ঈশ্বরদত্ত ক্ষমতার কথা প্রচার করিয়া রাজতন্ত্রকে শক্তিশালী করিবার প্রচেষ্টা অন্যান্যদের মধ্যেও লক্ষ্য করা যায়। মার্টিন লুথার, ক্যালভিন প্রভৃতি প্রোটেষ্ট্যাণ্ট ধর্মবিপ্লবের রথীগণ রাজাকে ঈশ্বরের প্রতিনিধি হিসাবে প্রচার করিয়া জনগণকে তাঁহার নিকট বশ্যতা স্বীকারে আহ্বান জানাইয়াছেন।

প্রথম জেমস্ রাজাকে ঈশ্বরের প্রতিনিধি বলিয়া দাবী করিয়াছিলেন। কিন্তু অদৃষ্টের নির্মম পরিহাস এই যে তাহার পুত্র ইংলণ্ডের পরবর্তী রাজা প্রথম চার্লস্‌কে (Charles I) প্রজাদের হাত হইতে রক্ষা করিয়া তাহার পরাজয় ও মৃত্যু রোধ করিবার জন্য কোন ঈশ্বরের আবির্ভাব ঘটিল না। সামাজিক চুক্তির মতবাদের প্রসার, ইউরোপের নবজাগরণ, গণতান্ত্রিক চিন্তাধারার বিস্তার ঐশ্বরিক উৎপত্তি তত্ত্বের মূলে কুঠারাঘাত হানিল। রাষ্ট্রের উৎপত্তির কারণের ব্যাখ্যা হিসাবে সপ্তদশ শতাব্দী হইতেই এই মতবাদের প্রভাব ধীরে ধীরে কমিয়া আসিতেছিল—বর্তমানে ইহা একান্তভাবেই বর্জিত।

সমালোচনা: ঐশ্বরিক উৎপত্তি তত্ত্বের বিরুদ্ধে বহু যুক্তির উত্থাপন করিয়া ইহার সমালোচনা করা হইয়াছে:

১। রাষ্ট্র একটি মানবীয় প্রতিষ্ঠান—প্রয়োজনের মধ্য দিয়াই ইহার সৃষ্টি

---

2. "I am the Husband, and all the whole Isle is my lawful wife, I am the Head, and it is my Body; I am the shepherd and it is my flocke."

—James I

হইয়াছে। কিন্তু এই মতবাদ সমস্ত প্রকার যুক্তি অস্বীকার করিয়া রাষ্ট্রকে একটি ঐশ্বরিক সংস্থা বলিয়া মনে করে।

২। ঐশ্বরিক মতবাদের প্রবক্তাগণ এই মতবাদের স্বপক্ষে কোন বিজ্ঞান-সম্মত যুক্তি এবং ঐতিহাসিক তথ্য উপস্থিত করিতে পারে নাই। সুতরাং এই তত্ত্ব অবৈজ্ঞানিক, অনৈতিহাসিক ও কাল্পনিক।

৩। ঐশ্বরিক উৎপত্তি তত্ত্ব রাজার সমস্ত নীতি ও কার্যকে বিনা প্রতিবাদে গ্রহণ করা প্রজাদের কর্তব্য বলিয়া দাবী করে। অর্থাৎ রাজা অন্যায় করিলেও প্রজাকে সেই অন্যায় সহ্য ও সমর্থন করিতে হইবে। এই বক্তব্য অযৌক্তিক এবং স্বভাবতই গ্রহণযোগ্য নয়।

৪। স্বৈরাচারিতাকে সমর্থন ও চরম রাজতন্ত্র প্রসারিত করিবার জন্যই স্বার্থ সংশ্লিষ্ট মহল হইতে নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য এই তত্ত্বকে দাঁড় করান হইয়াছিল এইরূপ মনে করিবার সঙ্গত কারণ রহিয়াছে।

৫। রাজার ক্ষমতা অসীম, চূড়ান্ত এবং তিনি কোন মানবীয় কর্তৃত্বের নিকট তাহার কাজের জন্য দায়িত্বশীল নহেন বলিয়া এই মতবাদ যে বক্তব্য প্রচার করিয়াছে তাহা প্রকারান্তরে স্বৈচারিতারই জন্ম দেয় বলিয়া ইহা সমর্থনযোগ্য নয়।

৬। এই তত্ত্ব রাষ্ট্র নামক রাষ্ট্রনৈতিক সংস্থাকে জটিল ধর্মীয় জটাজালে আবদ্ধ করিয়াছে। কিন্তু রাষ্ট্র মূলত ধর্মনিরপেক্ষ স্বভাবজাত সংস্থা। রাজার সহিত ধর্মের পার্থক্য নির্ণয় করিয়া যীশুখৃষ্ট বলিয়াছেন, "সীজারের যাহা প্রাপ্য সীজারকে দাও, এবং ঈশ্বরের যাহা প্রাপ্য ঈশ্বরকে দাও।"[৩]

৭। ঐশ্বরিক উৎপত্তি তত্ত্ব রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রে চরম রাজতন্ত্র (Absolute Monarchy) ছাড়া সরকারের অন্যপ্রকার শ্রেণীবিভাগের সম্ভাবনাকে অস্বীকার করিয়াছে।

মূল্যায়ন: যদিও ঐশ্বরিক উৎপত্তি তত্ত্বটি শুধুমাত্র ভ্রান্তই নয়—অন্যকে বিভ্রান্ত করিবার পক্ষেও যথেষ্ট, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও স্বীকার করিতে হইবে যে রাষ্ট্র চিন্তার ক্ষেত্রে এই মতবাদের কিছুটা গুরুত্ব আছে। এই মতবাদ রাজাকে ঈশ্বরের প্রতিনিধি স্বীকার করিয়া তাঁহার নিকট আনুগত্যের দাবী করিয়াছিল বলিয়া মানুষকে নিয়মানুবর্তিতা ও শৃঙ্খলার বন্ধনে আবদ্ধ করা সহজসাধ্য

3. "Render unto Caesar the things that are Caesar's, and render unto God the things that are God's."

হইয়াছিল। গেটেল (Gettell) যথার্থই বলিয়াছেন যে মানুষ যখন স্বায়ত্ত শাসনের উপযুক্ত ছিল না তখন এই তত্ত্ব মানুষকে আনুগত্যের শিক্ষায় শিক্ষিত করিয়া রাষ্ট্র-বিবর্তনে সাহায্য করিয়াছিল। রাষ্ট্র প্রবর্তনের প্রাথমিক স্তরে রাজশক্তিকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে এই তত্ত্বের বিশেষ ভূমিকা ছিল। ইহা ছাড়াও মানুষের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতিতে এই মতবাদ সহায়তা করিয়াছিল। সর্বোপরি, এই মতবাদ ভুল প্রমাণিত হইলেও ব্যবহারিক ক্ষেত্রে ইহার প্রভাব সম্পূর্ণভাবে বিলুপ্ত হয় নাই, বরং বর্তমান যুগেও ইহার ভিত্তিতে ধর্মীয় রাষ্ট্র স্থাপনের প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হইতেছে।

২॥ সামাজিক চুক্তি মতবাদ (Social Contract Theory)

রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে প্রচলিত মতবাদগুলির মধ্যে সামাজিক চুক্তি মতবাদটি সর্বাধিক প্রসিদ্ধ। রাষ্ট্র ঈশ্বর সৃষ্টি করেন নাই, বা ইহা নিজ হইতে গড়িয়া উঠে নাই, ইহা একান্তভাবেই মানবিক চুক্তির ফলপ্রসূত একটি সংস্থা—এইরূপ চিন্তা বহু প্রাচীনকাল হইতেই করা হইতেছে। মহাভারতে, বাইবেলে, কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে, রোমান আইনে ও প্রাচীন গ্রীক দার্শনিকদের বক্তব্যে এই মতবাদের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রাচীন গ্রীসের সোফিষ্ট (Sophists) পণ্ডিতেরা রাষ্ট্রকে চুক্তির দ্বারা সৃষ্ট সংস্থা বলিয়া মনে করিতেন। গ্রীক দার্শনিক আরিষ্টটল (Aristotle) ও প্লেটো (Plato) এই মতবাদের উল্লেখ করিয়া ইহার তীব্র সমালোচনা করিয়াছেন। মধ্যযুগের শেষ অধ্যায় পর্যন্ত রোমান আইনের (Roman Law) মধ্য দিয়া এই মতবাদের বিশেষ প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। ষোড়শ শতাব্দীতে রিচার্ড হুকারের (Richard Hooker) লেখায় এই বক্তব্যের সমর্থন পাওয়া যায়। কিন্তু এই মতবাদের দীর্ঘ ইতিহাস থাকা সত্ত্বেও মূলত তিনজন দার্শনিকের লেখার ভিতর দিয়াই এই মতবাদ সুদৃঢ় ভিত্তির উপর নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া রাষ্ট্রচিন্তার ক্ষেত্রে প্রভূত আলোড়ন ও বিরাট প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। ইঁহারা হইলেন সপ্তদশ শতাব্দীর ইংরেজ দার্শনিক টমাস্ হবস্ (Thomas Hobbs) ১৫৮৮-১৬৭৯, জন লক্ (John Locke) ১৬৩২-১৭০৪ এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর ফরাসী দার্শনিক জাঁ জাক রুশো (Jean Jackques Rousseau) ১৭১২-১৭৭৮।

সামাজিক চুক্তি মতবাদ শুধুমাত্র রাষ্ট্রের উৎপত্তি কি করিয়া হইল তাহাই ব্যাখ্যা করে নাই; ইহা প্রজার সহিত রাজার পারস্পরিক সম্পর্ক, প্রজার

স্বাধীনতার স্বরূপ, শাসকের কর্তৃত্বের সীমা প্রভৃতি নির্দেশ করিয়া রাষ্ট্রের প্রকৃতি সম্পর্কেও আলোকপাত করিয়াছে। রাষ্ট্রের উৎপত্তি ও প্রকৃতি এই উভয়বিধ উদ্দেশ্যকে সামনে রাখিয়া এই মতবাদের তিনজন প্রবক্তা নিজেদের স্বতন্ত্র দৃষ্টিকোন হইতে এই মতবাদকে উপস্থিত করিয়াছেন।

রাষ্ট্রের উৎপত্তির পূর্বে আদিম মানুষ যে অবস্থা ও পারিপার্শ্বিকতার ভিতর বাস করিত এই মতবাদের প্রবক্তাগণ তাহাকে প্রাকৃতিক অবস্থা (State of Nature) নামে অভিহিত করিয়াছেন। রাষ্ট্রের অস্তিত্ব না থাকিবার জন্য এই প্রাকৃতিক অবস্থায় মনুষ্য সৃষ্ট কোনপ্রকার আইনকানুন অধিকার ও শৃঙ্খলা ছিল না। যাহা ছিল তাহাকে 'স্বাভাবিক আইন' ও 'স্বাভাবিক অধিকার' বলা যাইতে পারে। এই স্বাভাবিক আইন (Natural Law) দ্বারা আদিম মানুষ নিয়ন্ত্রিত হইত এবং স্বাভাবিক অধিকার (Natural Rights) বোধ দ্বারা তাহারা পরিচালিত হইত। কিন্তু এইরূপ অবস্থায় বাস করিবার ফলে তাহাদের জীবন দুর্বিসহ হইয়া উঠিল। বিশৃঙ্খল ও অরাজকতার হাত হইতে রক্ষা পাইয়া সুস্থ জীবনযাপনের তাগিদে মানুষ স্বেচ্ছাকৃত চুক্তির (Voluntary Contract) ভিতর দিয়া সৃষ্টি করিল রাষ্ট্র—শুরু হইল মানুষের রাষ্ট্রীয় জীবন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, প্রাকৃতিক অবস্থার বর্ণনা এবং চুক্তির প্রকৃতি ও স্বরূপ বিশ্লেষনের ক্ষেত্রে এই তিনজন দার্শনিক একমত পোষণ করিতেন না। সুতরাং চুক্তিমতবাদী (contractualists) এই দার্শনিক ত্রয়ীর মতামত স্বতন্ত্রভাবে আলোচনা করা প্রয়োজন।

হবসের অভিমত: সামাজিক চুক্তিবিষয়ক হবসের মতবাদ ১৬৫১ সালে তাঁহার বিখ্যাত 'লেভিয়াথান' (Leviathan) নামক গ্রন্থে প্রকাশিত হয়। হবসের সময় ইংলণ্ডে রাজা ও পার্লামেণ্টের মধ্যে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব চলিতে থাকে। ইহারই ফলশ্রুতি হিসাবে বারো বছরের জন্য ইংলণ্ডে ক্রমওয়েলের সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। হবস্ ব্যক্তিগতভাবে ইংলণ্ডের রাজা দ্বিতীয় চার্লসের গৃহ-শিক্ষক ছিলেন। রাজা ও পার্লামেণ্টের এই দ্বন্দ্বে তিনি রাজতন্ত্রের সমর্থক ছিলেন। ইংলণ্ডের এই রাজনৈতিক অবস্থার পটভূমিকায় নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্রকে সমর্থন করিবার উদ্দেশ্যে হবস্ তাঁহার সামাজিক চুক্তি মতবাদ উপস্থিত করেন। ইংলণ্ডের তদানীন্তন রাজনৈতিক অস্থিরতা ও অচল অবস্থা হবস্‌কে ক্ষুব্ধ ও চিন্তিত করিয়া তুলিয়াছিল। এই অবস্থা হইতে মুক্তি পাইবার উপায় হিসাবে তিনি না পারিলেন গণতান্ত্রিক দলের বিপ্লবাত্মক চিন্তাধারায় বিশ্বাস

স্থাপন করিতে, বা না পারিলেন যুক্তিবাদী মনকে দিয়া ঐশ্বরিক মতবাদ গ্রহণ করিতে। সুতরাং স্বাভাবিকভাবেই চরম রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে তিনি সমস্যা সমাধানের পথ খুঁজিয়া পাইলেন এবং এই উদ্দেশ্যে সামাজিক চুক্তি মতবাদকে প্রয়োগ করিলেন।

প্রাক্ রাষ্ট্রীয় যুগের মানুষের প্রকৃতি ও চরিত্র বিশ্লেষণের মধ্যেই হবসের সামাজিক চুক্তি মতবাদের ভিত্তি নিহিত। হবসের মতবাদ অনুযায়ী বলা যায় যে, প্রাক্ রাষ্ট্রীয় যুগে চারিত্রিক দিক হইতে মানুষ ছিল স্বার্থপর, নীচ, লোভী, কলহপ্রিয় ও আক্রমণমুখী। মানুষের নিজের তৈয়ারী কোন প্রকার আইন না থাকিবার জন্য 'জোর যার মুল্লুক তার' এই ধরনের প্রাক্ সামাজিক নীতির দ্বারা জীবন নিয়ন্ত্রিত হইত। এই অবস্থায় মানুষের অধিকারও স্বাভাবিক কারণেই ছিল শক্তিনির্ভরশীল। তাই মানুষ পারস্পরিক হিংসা, হানাহানি ও দ্বন্দ্বে লিপ্ত ছিল। এই সমস্ত কারণে প্রাক্‌রাষ্ট্রীয় অবস্থায় মানুষের জীবন সঙ্গীহীন, কুৎসিত, দীন, পাশবিক ও স্বল্পায়ু হইয়া উঠিল। এই প্রসঙ্গে হবস্ বলিয়াছেন: "Conditions in the state of nature made man's life salitary, poor, nasty, brutish and short". এইরূপ প্রাকৃতিক অবস্থায় কোন প্রকার আইন, কানুনের অস্তিত্ব না থাকায় যে যতটুকু নিজ ক্ষমতার দ্বারা বজায় রাখিতে পারিত, সেইটুকুর উপরেই স্বাভাবিক অধিকার প্রতিষ্ঠিত থাকিত।

স্বাভাবিকভাবেই এই ধরনের জীবন মানুষের নিকট দুর্বিসহ ও অসহ্য হইয়া উঠিল। তাই আত্মরক্ষার প্রাথমিক তাগিদে এবং এই অসহনীয় জীবন হইতে মুক্তি পাইবার উদ্দেশ্যে চুক্তিতে আবদ্ধ হইয়া রাষ্ট্র সৃষ্টি করিল। হবসের মতে মানুষ এই পারস্পরিক চুক্তির ভিতর দিয়া প্রাক্ সামাজিক যুগের অবাধ স্বাধীনতা নির্দিষ্ট কোন এক ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর হাতে তুলিয়া দিল (যিনি রাজা বা শাসনকর্তা হিসাবে অভিহিত হইলেন)। হবসের ভাষায় বলা যায়: 'যেন প্রত্যেক প্রত্যেককে বলিতেছে যে আমি নিজেকে চালাইবার অধিকার ত্যাগ করিয়া এই ব্যক্তি বা ব্যক্তি-সমষ্টির হস্তে ক্ষমতা সমর্পণ করিলাম এই শর্তে যে তুমিও তোমার অধিকার উহাকে অর্পণ করিবে, এবং অনুরূপভাবে উহাকে সকল কার্যের ক্ষমতা প্রদান করিবে।' এইরূপে পারস্পরিক চুক্তির মধ্য দিয়া সৃষ্টি হইল সার্বভৌম শক্তি ও রাষ্ট্র নামক সংস্থা যাহা প্রাকৃতিক অবস্থার অবসান ঘটাইয়া সংযত, সুশৃঙ্খল ও সুন্দর জীবন যাপনের পথ উন্মুক্ত

করিল। হবস্ বলিয়াছেন, "এইভাবে জন্মলাভ করিল বিশাল লেভিয়াথান, বা শ্রদ্ধাসহকারে বলিতে গেলে, মরণশীল দেবতা, অমর ঈশ্বরের ছত্রছায়ায় যিনি আমাদের শান্তি ও নিরাপত্তার নিয়ন্তা"।

হবসের উপরোক্ত বক্তব্য বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে রাজার ক্ষমতা অসীম, অবিভাজ্য এবং হস্তান্তরের অযোগ্য। অর্থাৎ এক কথায় হবসের দৃষ্টিতে রাজা চরম সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। দ্বিতীয়ত, রাজা এই চুক্তির অংশ গ্রহণকারী কোন পক্ষে ছিলেন না। তিনি চুক্তির ফলে উদ্ভূত। সুতরাং তিনি চুক্তির উর্ধ্বে। অধ্যাপক ডানিং (Dunning) বলিয়াছেন যে, এই চূড়ান্ত ক্ষমতার অধিকারী বা সার্বভৌম শক্তির অস্তিত্ব চুক্তির দ্বারা সৃষ্ট হইয়াছে, চুক্তির পূর্বে নহে।[4] রাজা জনগণের সঙ্গে কোন প্রকার চুক্তির সম্পর্ক দ্বারা আবদ্ধ নন বলিয়া তিনি প্রজাদের নিকট তাহার কার্যাবলীর জন্য কোনরূপ কৈফিয়ৎ দিতে বাধ্য নন। তৃতীয়ত, হবস মনে করেন সার্বভৌম ক্ষমতা ব্যবহারের ক্ষেত্রে কোন শর্ত থাকিতে পারে না। সুতরাং রাজার ক্ষমতা শর্তহীন এবং অবাধ। চতুর্থত, প্রাকৃতিক অবস্থার অবসান ঘটাইতে হইলে নিরঙ্কুশ সার্বভৌম শাসন ছাড়া অন্য কোন তৃতীয় সম্ভাবনার পথ উন্মুক্ত ছিল না। চুক্তি করিয়া প্রাকৃতিক অবস্থার অবসান ঘটান মানেই নিরঙ্কুশ সার্বভৌম ক্ষমতাকে মানিয়া লওয়া, যাহার অর্থ প্রজারা সমস্ত আইন ও নির্দেশ মানিতে বাধ্য এবং বিদ্রোহের অধিকার হইতে বঞ্চিত। পঞ্চমত, হবসের দৃষ্টিতে আইন হইল সার্বভৌমিকতার আদেশ, সার্বভৌমই সকল আইনের উৎস। সুতরাং সার্বভৌমিকের দান হইল স্বাধীনতা। এইরূপে হবস 'লেভিয়াথান' গ্রন্থের ভিতর দিয়া তাঁহার নিজস্ব দৃষ্টিকোণ হইতে সামাজিক চুক্তি মতবাদ বিশ্লেষণ করিলেন। হবসের মতবাদ পরিষ্কার ভাষায় রাজশক্তির নিরঙ্কুশ ক্ষমতা ঘোষণা করিয়া রাজার স্বেচ্ছাচারিতাকে সমর্থন জানাইল।

লকের অভিমত : বাস্তব পক্ষে রাজতন্ত্র যখন ইংলণ্ডের বুকে ক্রমশঃ দুর্বল, অসম্মানিত এবং ভগ্ন হইয়া পড়িতেছে সেই সময়ে রাজতন্ত্রের সমর্থনে হবসের এই অনমনীয় যুক্তিজালকে মানুষ সন্তুষ্টচিত্তে গ্রহণ করিতে পারিল না। ইহারই প্রতিক্রিয়া স্বরূপ ১৬৮৮ খ্রীষ্টাব্দের বিপ্লবকে সমর্থন ও ইহার ন্যায্যতা

4. **"A superior, or soveriegn, exists only by virtue of the pact, nor prior to it."** —**Dunning**

প্রমাণিত করিয়া লক্ তাঁহার 'Two Treaties on Civil Government' নামক গ্রন্থে নূতন করিয়া সামাজিক চুক্তি মতবাদকে উপস্থিত করিলেন।

১৬৮৮ সালের রক্তহীন বিপ্লবের লক্ ছিলেন একজন বিরাট সমর্থক। বিপ্লবের কারণ ও প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যার মাধ্যমে লক দেখাইবার চেষ্টা করিলেন যে, শাসিতের সম্মতির উপরই শাসন ভিত্তিশীল হইয়া উঠে। এই ভাবে হবসের চরম রাজতন্ত্রের পরিবর্তে লক্ তাঁহার সামাজিক মতবাদের ভাষ্যের দ্বারা সীমাবদ্ধ রাজতন্ত্রের (Limited Monarchy) নীতি প্রতিষ্ঠা করেন।

লক্ তাঁহার মতবাদের প্রথমেই প্রাকৃতিক অবস্থা ও মানুষের চারিত্রিক দিকে আলোকপাত করিয়াছেন। তাঁহার মতে, মানুষ স্বার্থপর, আত্মসর্বস্ব ও অসামাজিক জীব নয়। সে স্বাভাবিক আইন ও যুক্তির বিচার মানিয়া চলে। সুতরাং প্রাকৃতিক অবস্থায় মানুষ সুখ, শান্তি ও স্বাধীনভাবে জীবন যাপন করিত। তাহাদের এই স্বাধীনতা হবস-বর্ণিত বলগাহীন হিংস্র উচ্ছৃঙ্খলতা নয়, ইহা স্বাভাবিক আইন অনুযায়ী যুক্তির বন্ধনে আবদ্ধ। সুতরাং লকের মতে প্রাকৃতিক অবস্থা হানাহানি, কাটাকাটির উচ্ছৃঙ্খল রাজত্ব নয়—ইহা পারস্পরিক শুভেচ্ছা, সহায়তা, শান্তি ও নিরাপত্তার রাজত্ব। তাহা হইলে প্রশ্ন হইল, মানুষ এই প্রাকৃতিক অবস্থার অবসান ঘটাইল কেন? লকের মতে মানুষ প্রাকৃতিক অবস্থার অবসান ঘটাইয়া রাষ্ট্র সৃষ্টি করিল মূলত তিনটি কারণে। প্রথমত, ন্যায় ও অন্যায়ের নির্দেশক সর্বজনস্বীকৃত ও সুপ্রতিষ্ঠিত আইনের অভাব। দ্বিতীয়ত, পরিচিত ও নিরাসক্ত বিচারকের অভাব। তৃতীয়ত, ন্যায় বিচারকে কার্যে পরিণত করিবার কার্যকরী বিভাগের অভাব। এই অবস্থায় কিছু অসৎ ও স্বার্থান্বেষী ব্যক্তি পরিস্থিতিকে বিপদসংকুল করিয়া তুলিতে পারে। সুতরাং জীবনকে শান্তিপূর্ণ ও নিরাপদ করিবার জন্য রাষ্ট্র গঠনের প্রয়োজন দেখা দিল।

লক্ মনে করেন যে রাষ্ট্র গঠনের ক্ষেত্রে চুক্তি হইয়াছিল দুইটি। প্রথমে মানুষ নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য পূরণের জন্য চুক্তির দ্বারা নিজের স্বাভাবিক অধিকার সর্বসাধারণে সমর্পণ করিল—কোন ব্যক্তি বিশেষকে নহে। এই চুক্তিটি প্রকৃত পক্ষে সামাজিক চুক্তি এবং ইহার দ্বারা রাষ্ট্র গঠিত হইল। এইবার দেখা দিল সরকার গঠনের পালা। দ্বিতীয় চুক্তিটিকে সরকার গঠনের চুক্তি বলা যাইতে পারে। রাষ্ট্র তাহার সংগঠিত চরিত্রের সাহায্যে শাসক নির্বাচন ও সরকার

গঠন করিল। এইভাবে লক্ রাষ্ট্র ও সরকারের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করিলেন। দ্বিতীয় চুক্তি সম্পর্কে লকের সুস্পষ্ট কোন বক্তব্য নাই—ইংগিত আছে মাত্র। যাহা হউক লকের চুক্তি দ্বারা জনসাধারণ তাহাদের স্বাভাবিক অধিকারের কিছু অংশ সমর্পণ করিল অবশিষ্ট অধিকার রক্ষা করার জন্ত। এই সমস্ত অধিকার চুক্তির সর্তানুযায়ী রক্ষা করার দায়িত্ব শাসকের এবং তিনি চুক্তির অন্তর্গত—চুক্তির উর্ধ্বে নহেন।

শাসকের ক্ষমতা এই চুক্তি দ্বারা সীমাবদ্ধ করা হইল। যে উদ্দেশ্ত সিদ্ধ করিবার জন্ত ইহার পত্তন করা হইয়াছে তাহাকে সফল করিয়া তোলাই শাসকের কর্তব্য। এই কর্তব্যে ব্যর্থ হইলে শাসকে পরিবর্তন করিবার অধিকার প্রজাদের আছে। প্রয়োজনবোধে শাসকের বিরুদ্ধে প্রজারা সামগ্রিকভাবে বা ব্যক্তিগতভাবে বিদ্রোহও করিতে পারে।

লক্ তাহার যুক্তি প্রতিষ্ঠার জন্ত জনগণের স্বাধীনতার উপর গুরুত্ব দিয়া বলিলেন: 'শৃঙ্খলা যদি পশুশালা বা বন্দীশালার শৃঙ্খলায় পরিণত হয়, তবে তাহা মানুষের কাম্য নহে; যে অবস্থায় ব্যক্তিগত স্বাধীনতা বাস্তবে অনুভব করা যায় এবং সম্পত্তির নিরাপত্তা ও ন্যায় বিচারে নিশ্চিত হওয়া যায় সেই অবস্থাই মানুষের কাম্য। সুতরাং প্রাকৃতিক অবস্থার দায়-দায়িত্ব সামাজিক জীবনে লুপ্ত হইয়া যায় না। আইনের উদ্দেশ্ত স্বাধীনতা রক্ষা করা ও তাহার পরিধিকে বিস্তৃত করা—তাহাকে ধ্বংস বা খর্ব করা নহে'।

অর্থাৎ লক্ তাহার যুক্তির সাহায্যে প্রমাণ করিলেন যে প্রজার কল্যাণ সাধন ও স্বাধীনতা রক্ষা করা শাসকের দায়িত্ব। যতক্ষণ পর্যন্ত তিনি এই দায়িত্ব পালন করেন ততক্ষণ পর্যন্তই তাহার শাসন ক্ষমতায় থাকিবার অধিকার থাকে। মোট কথা শাসকের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ এবং শাসনের ভিত্তি হইতেছে প্রজার সম্মতি। রাজার ব্যক্তিগত আদেশই আইন নয়। এইভাবে লক্ তাঁহার মতবাদের ভিতর দিয়া সীমাবদ্ধ রাজতন্ত্রকে সমর্থন করিলেন, আইন-অনুমোদিত সার্বভৌমিকতার তত্ত্বকে উপেক্ষা করিয়া 'জনগণের সার্বভৌমিকতার নীতি' উপস্থিত করিলেন, দৃঢ়তার সঙ্গে 'সাম্য' ও 'স্বাধীনতার' কথা প্রচার করিলেন এবং রাজতন্ত্রের স্বৈরাচারিতার সম্ভাবনার পথ রুদ্ধ করিয়া সরকারকে গণতান্ত্রিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা করিলেন।

রুশোর অভিমত: লকের মতবাদের নূতন পথ নির্দেশ করিয়া বিখ্যাত ফরাসী দার্শনিক রুশো গণতন্ত্রের অনিবার্যতা ঘোষণা করিলেন ১৭৬২ সালে

প্রকাশিত তাঁহার প্রসিদ্ধ 'Contract Social' নামক গ্রন্থে। বস্তুত রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্পর্কীয় রুশোর সামাজিক মতবাদ এই গ্রন্থের মধ্য দিয়াই প্রকাশিত হইয়াছে। হবসের বক্তব্যের মধ্য দিয়া অবাধ রাজতন্ত্রের ন্যায্যতা প্রকাশিত হয়। লক্ উহার গণ্ডী প্রসারিত করিয়া সীমাবদ্ধ রাজতন্ত্রের যৌক্তিকতা প্রতিষ্ঠা করেন. কিন্তু রুশো রাজতন্ত্রের ভিত্তিমূলকে উৎপাটিত করিয়া প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের অনিবার্যতা প্রমাণিত করেন।

রুশোও তাঁহার বক্তব্য উপস্থিত করিতে যাইয়া প্রথমে 'প্রাকৃতিক অবস্থা' ও তৎকালীন মানুষের চরিত্র নিয়া আলোচনা শুরু করেন। সামাজিক চুক্তি মতবাদের অন্যান্য প্রবক্তাগণ 'প্রাকৃতিক অবস্থা'-এর উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়াছিলেন বলিয়া রুশোও প্রাকৃতিক অবস্থা সম্পর্কে নিজস্ব দৃষ্টিকোণ হইতে মতামত উপস্থিত করিয়াছেন, যদিও তিনি প্রাকৃতিক অবস্থায় বিশ্বাসী ছিলেন না।[5] যাহাই হউক রুশো মনে করিতেন প্রাক্ রাষ্ট্রীয় যুগের মানুষ মূলত ছিল সৎ। তাই 'প্রাকৃতিক অবস্থায়' কোনপ্রকার হানাহানি, কাটাকাটি, নিষ্ঠুরতা ও স্বার্থপরতা ছিল না। মানুষ সরলতা, সৌহার্দ্য ও ভ্রাতৃত্বমূলক মনোভাবের দ্বারা পরিচালিত হইত। সুতরাং প্রাকৃতিক অবস্থায় মানুষ ছিল সরল, সুস্থ ও সন্তুষ্ট। এক কথায় বলা যায়, স্বর্গ যেন পৃথিবীর বুকে নামিয়া আসিয়াছিল।

কিন্তু জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও সম্পত্তির উদ্ভবের ফলে এই স্বর্গরাজ্য হইতে মানুষকে বিদায় গ্রহণ করিতে হইল। প্রাকৃতিক অবস্থায় সাধারণত মানুষ যুক্তি দ্বারা বিচার করিত না, স্বাভাবিক প্রেরণা দ্বারা চালিত হইত। কিন্তু জনসংখ্যা বৃদ্ধি. সম্পত্তির উদ্ভব ও বুদ্ধি-যুক্তির প্রয়োগের ফলে দেখা দিল বৈষম্য, অশান্তি ও জটিলতা। ফলে মানুষ তাহার আদিম সরলতা, সুখ ও শান্তিকে হারাইল। চুক্তির মধ্য দিয়া সৃষ্টি হইল রাষ্ট্র। রুশোর মতে চুক্তি হইয়াছিল একটি এবং এই চুক্তি দ্বারা কোন ব্যক্তি বিশেষ ক্ষমতার আসীন হন নাই। রুশোর মতে জনগন সকলে মিলিত হইয়া চুক্তি করিয়া তাহাদের সমস্ত প্রকার অধিকার 'সামগ্রিক মিলিত যৌথ' এক ব্যক্তিত্বের (Collective Body) নিকট সমর্পণ করিল। অর্থাৎ অধিকার ও ক্ষমতা কোন ব্যক্তি

5. The state of nature "perhaps never existed, probably will never exist, and of which none the less it is necessary to have just ideas. in order to judge well our present state." —Rousseau

বিশেষের হাতে সমর্পণ করা হইল না, সমষ্টিগত ইচ্ছার (General will) প্রতিভূ শক্তির নিকট ইহা অর্পণ করা হইল। এইরূপে সৃষ্টি হইল রাষ্ট্র। 'সমষ্টিগত ইচ্ছা' সম্পর্কে আমরা একটু পরে আলোচনা করিতেছি।

সমালোচনা: সামাজিক চুক্তি মতবাদ প্রথম দিকে রাষ্ট্রচিন্তার ক্ষেত্রে প্রভূত আলোড়ন সৃষ্টি করিয়াছিল। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীতে বিভিন্ন দার্শনিকের তীব্র যুক্তিবাদী চিন্তার আক্রমণে ইহা দুর্বল হইয়া পড়ে। হিউম (Hume), বেন্থাম (Bentham), বার্ক (Burke), অষ্টিন (Austin) প্রমুখ রাষ্ট্রবিজ্ঞানীগণ বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ হইতে এই মতবাদকে সমালোচনা করিয়াছেন। নিম্নে সেইগুলি আলোচনা করা হইল।

১। এই মতবাদ সম্পূর্ণভাবে অনৈতিহাসিক—ইতিহাস ইহার পক্ষে সাক্ষ্য দেয় না। মানবসভ্যতার ইতিহাস আলোচনা করিয়া এইরূপ কোন চুক্তির প্রমাণ উপস্থিত করা যায় না।

২। সমাজ বিজ্ঞানের ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, সামাজিক বিকাশের ধারা গোষ্ঠী হইতে ব্যক্তির দিকে। কিন্তু সামাজিক চুক্তি মতবাদের প্রবক্তাগণ মনে করেন যে, 'প্রাকৃতিক অবস্থার' বিলোপ ঘটাইয়া রাষ্ট্র স্থাপনের উদ্দেশ্যে গোষ্ঠী নয়, ব্যক্তি হিসাবে মানুষ চুক্তি করিয়াছিল। কিন্তু এইরূপ অবস্থা একমাত্র সমাজজীবনের কিছুটা অগ্রগতির পরে সম্ভব।

৩। আদিম যুগের মানুষের পক্ষে চুক্তি করিয়া রাষ্ট্র স্থাপনের ধারণা থাকা সম্ভবপর নয়। এই কারণে এই মতবাদকে যুক্তিহীন ও অবাস্তব আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে।

৪। সামাজিক চুক্তির ভাষ্যকারগণ মানুষের স্বাভাবিক অধিকারের কথা বলিয়াছেন। আইন না থাকিলে কোন প্রকার স্বাভাবিক অধিকারে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। সুতরাং যেখানে আইন কার্যকরী নয়, সেখানে স্বাভাবিক অধিকারের কল্পনা করা অযৌক্তিক।

৫। চুক্তি সর্বদা বাধ্যতামূলক নয়, ইহা ইচ্ছামূলকভাবে প্রয়োগ করা যায়? কিন্তু রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে ইহা আরোপ করিয়া কী রাষ্ট্রের অবসান ঘটানো যায়। সুতরাং রাষ্ট্রের ভিত্তি চুক্তি হইতে পারে না।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, সামাজিক চুক্তি মতবাদকে রাষ্ট্রের উৎপত্তির বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা হিসাবে গ্রহণ করা যায় না। পরবর্তীকালে ইহা ব্যর্থহীন

ভাবে প্রমাণিত হইয়াছে যে, সামাজিক চুক্তি মতবাদ একান্তভাবেই একটি কাল্পনিক মতবাদ।

৩॥ সমষ্টিগত ইচ্ছা (General will)

রুশোর 'সমষ্টিগত ইচ্ছা'র তত্ত্বটি একই সাথে নিন্দা ও প্রশংসার কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থিত। বস্তুত রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তার ক্ষেত্রে রুশোর সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপুর্ণ অবদান এই সমষ্টিগত ইচ্ছার তত্ত্ব। রুশোর মতে এই 'সমষ্টিগত ইচ্ছা'-র নিকট সকলে যেমন অধিকার সমর্পণ করিল তেমনি ইহা সকলের ক্ষেত্রেই সমভাবে প্রযোজ্য।[6] জনগণের সমস্ত অংশের ইচ্ছার মিলন ঘটিয়াছে বলিয়া ইহা 'সমষ্টিগত' নহে, সাধারণের কল্যাণকর বলিয়াই ইহা সমষ্টিগত। সমষ্টিগত ইচ্ছা জনগণের ইচ্ছার যোগফলও নহে, কারণ জনগণের ব্যক্তিগত ইচ্ছার সঙ্গে সমষ্টিগত ইচ্ছার কোন সম্পর্ক নাই—কেবলমাত্র জনগণের পক্ষে কল্যাণকর ব্যক্তি-ইচ্ছাগুলির মিলনের যৌথরূপের মধ্যেই 'সমষ্টিগত ইচ্ছা' নিহিত।

রুশো বলিলেন যে, এই 'সমষ্টিগত ইচ্ছা'র নিকট যেহেতু সকলে অধিকার সমর্পণ করিল, সেইজন্য রাষ্ট্রে চূড়ান্ত ক্ষমতার অধিকার কাহারও নাই। রুশোর 'সমষ্টিগত ইচ্ছা' সর্বব্যাপক, সর্বগ্রাসী, সর্বোচ্চ ও সর্বকল্যাণকর। এইরূপে রুশো তাঁহার এই মতবাদের ভিতর দিয়া জনসাধারণকে সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী করিলেন। যেহেতু সমগ্র জনসাধারণের অংশ গ্রহণের মধ্য দিয়া এই সমষ্টিগত ইচ্ছার প্রকাশ এবং উদ্ভব ঘটিতেছে, সেইজন্য সমষ্টিগত ইচ্ছার দায়িত্ব বা ইহা প্রয়োগের অধিকার জনসাধারণ ছাড়া অন্য কাহারও উপর ন্যস্ত থাকিতে পারে না। সুতরাং রাজতন্ত্র বা পরোক্ষ গণতন্ত্রমূলক রাষ্ট্র ব্যবস্থার প্রশ্নই উঠিতে পারে না। কারণ আইন প্রণয়নে জনগণের অংশ গ্রহণের মধ্য দিয়াই 'সমষ্টিগত ইচ্ছা' যথাযথভাবে মূর্ত হইয়া উঠিতে পারে এবং সত্যকারের নৈতিক স্বাধীনতার উপলব্ধি ঘটিতে পারে। সুতরাং রুশোর মতে প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রই রাষ্ট্রের প্রকৃতরূপ। রুশো বলিলেন, আইন হইল সমষ্টিগত ইচ্ছার মূর্ত রূপ, ইহার সহিত স্বাধীনতার কোন বিরোধ থাকিতে পারে না। এইভাবে রুশো 'স্বাধীনতা' ও 'কর্তৃত্বে'র (Liberty and Authority) ভিতরকার চিরন্তন বিরোধের নিষ্পত্তি করিলেন। রুশো ঘোষণা করিলেন : 'মানুষ স্বাধীন হইয়া জন্মিয়াছে, কিন্তু সর্বত্রই সে শৃঙ্খলে আবদ্ধ' (Man is born free

6. "Which must both come from all and apply to all." —Rousseau

and everywhere he is in chains)। মানুষের স্বাধীনতা; অধিকার ও প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের সমর্থনে রুশোর এই সমস্ত বক্তব্য বিপ্লবের অগ্নিগর্ভ রণধ্বনি হইয়া পৃথিবীর সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িল।

অর্থাৎ এক কথায় রুশোর মতে প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রই রাষ্ট্রের কাম্য রূপ; আইনের মধ্য দিয়া সমষ্টিগত ইচ্ছা মূর্ত হইয়া উঠে; আইন প্রণয়নের মধ্য স্বাধীনতার উপলব্ধি ঘটে এবং এইরূপ অবস্থায় স্বাধীনতা ও কর্তৃত্বের মধ্যে কোন বিরোধ থাকে না।

সমষ্টিগত ইচ্ছা সম্পর্কীয় রুশোর বক্তব্য খুব বেশি স্পষ্ট ও পরিষ্কার নহে। তিনি ইহার প্রকৃতিকে বিশ্লেষণ করিয়াছেন সত্য, কিন্তু কি করিয়া ইহার সন্ধান পাওয়া যাইবে সেই সম্পর্কে তাঁহার বক্তব্য অস্পষ্ট ও ধোঁয়াটে। রুশো স্বাধীনতা ও কর্তৃত্বের সমন্বয় সাধন করিয়াছেন বটে, কিন্তু জনগণের সার্বভৌমত্বের অধিকারকে অবাধ, চরম ও নিরঙ্কুশ করিবার জন্য আইনের বিরুদ্ধাচরণ অসম্ভব ও অবৈধ হইয়া দেখা দিয়াছে। এইজন্য কেহ কেহ মনে করেন 'সমষ্টিগত ইচ্ছার' মধ্য দিয়া রুশোর 'টোটালিটারিয়ান' (Totalitarian) চরিত্রও প্রকাশ পাইয়াছে।[7]

৪ ॥ সামাজিক চুক্তি মতবাদের মূল্যায়ণ

সামাজিক চুক্তি মতবাদ রাষ্ট্রের উৎপত্তির কারণ নির্ণয়ে এবং রাষ্ট্রের প্রকৃতি ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ ব্যর্থ ও মূল্যহীন হইলেও ইহার ঐতিহাসিক মূল্যকে অস্বীকার করা যায় না। সামাজিক চুক্তি মতবাদ বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে হবস্, লক্ ও রুশোর আলোচনার ভিতর দিয়া এমন কতকগুলি তত্ত্ব, তথ্য ও আদর্শের কথা ঘোষিত হইয়াছে যাহা রাষ্ট্রবিজ্ঞানের স্থায়ী ও অমূল্য উপাদান হিসাবে পরবর্তীকালে স্বীকৃত হইয়াছে এবং সামাজিক চুক্তি মতবাদের এই সমস্ত উপাদান রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে প্রভূত পরিমাণে সমৃদ্ধিশালী করিয়া তুলিয়াছে। সুতরাং সামাজিক চুক্তি মতবাদের বিরুদ্ধে যে সমস্ত সমালোচনা করা হইয়াছে তাহা স্বীকার করিয়াও বলা যায় যে এই সমস্ত সমালোচনার দ্বারা সামাজিক চুক্তি মতবাদের বাস্তব গুরুত্ব ও অবদান ম্লান হইয়া যায় নাই। রাষ্ট্রের উৎপত্তি ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে এই মতবাদ যদিও মূল্যহীন, কিন্তু অন্যান্য ক্ষেত্রে ইহার অবদান অপরিসীম গুরুত্বপূর্ণ।

---

7 "Rousseau's doctrine, thou‹h it pays lip-service to democracy, tends to the justification of totalitarian state." —Bertrand Russel

যে সমস্ত মূল্যবান সিদ্ধান্তের উৎপত্তির ফলে এই মতবাদ বাস্তব গুরুত্ব লাভ করিয়াছে তাহা এবার আলোচনা হইতেছে। প্রথমত. বর্তমানে সার্বভৌমতার যে ধ্যান-ধারণা রাষ্ট্রবিজ্ঞানে আলোচিত হয়, তাহা মূলত সামাজিক চুক্তি মতবাদের অবদান। হবস্ এই চুক্তিবাদের মধ্যদিয়া আইন সঙ্গত সার্বভৌমিতার (Legal Sovereignty) তত্ত্বকে প্রতিষ্ঠা করিলেন। লক্ জন্ম দিলেন রাষ্ট্র-নৈতিক সার্বভৌমিতাকে (Political Sovereignty) এবং রুশোর লেখার মধ্য দিয়া জনগণের সার্বভৌকিতা (Popular Sovereignty) মূর্ত হইয়া উঠিল। সার্বভৌমিকতার মত একটি গুরুত্বপুর্ণ তত্ত্ব মূলত চুক্তি মতবাদকে আশ্রয় করিয়া বিকাশলাভ করিয়াছে।

দ্বিতীয়ত, এই মতবাদের মহত্তম কীর্তি হইতেছে এই যে রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে ধর্মতত্ত্বের জটিল জটাজাল হইতে মুক্ত করিয়া ইহা ধর্মকেন্দ্রীক রাষ্ট্র কল্পনার অবসান ঘটাইল। এই মতবাদ ঘোষণা করিল, প্রজার ইচ্ছাই রাষ্ট্রের ভিত্তি —ঐশ্বরিক উপাদান রাষ্ট্রের উৎপত্তি কারণ নয়। সুতরাং বলা যাইতে পারে যে বাইবেলের কুট ব্যাখ্যা হইতে মুক্ত করিয়া এই মতবাদ রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে নতুন ধারায় প্রবাহিত করিল।

তৃতীয়ত, সামাজিক চুক্তি মতবাদ অবাধ রাজতন্ত্রের মূল ভিত্তিপ্রস্থরকে অপসারিত করিয়া গণতন্ত্রের কেতন উড়াইয়াছে। লক্ ও রুশো প্রত্যক্ষভাবেই, রাজতন্ত্রের বিরোধিতা করিয়া গণতন্ত্রের স্বপক্ষে যুক্তিপুর্ণ বক্তব্য উপস্থিত করিলেন। ইঁহারা ঘোষণা করিলেন যে, শাসনকর্তা যদি তাহার দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করিতে ব্যর্থ হয় তবে জনগণ তাহাকে পরিবর্তন করিবার অধিকারী। হবস্ যদিও অবাধ রাজতন্ত্রের সমর্থক ছিলেন, কিন্তু 'প্রজার ইচ্ছার ভিত্তিতেই রাষ্ট্রের উৎপত্তি' তাঁহার এই স্বীকৃতি রাজতন্ত্রের ভিত্তি দুর্বল করিয়া দিল। বস্তুত সামাজিক চুক্তি মতবাদের মাধ্যমেই স্বীকৃত হইল যে, রাষ্ট্রের মূলভিত্তি হইল প্রজার সম্মতি। এই বক্তব্যের মধ্য দিয়াই ধ্বনিত হইল গণতন্ত্র ও মানুষের অধিকারের বাণী।

চতুর্থত, রাজার ঈশ্বরদত্ত অধিকার তত্ত্বের প্রধান প্রতিষেধক (chief antidote) হিসাবে সামাজিক চুক্তি মতবাদ আত্মপ্রকাশ করায় সংস্কারযুক্ত ও বিজ্ঞানভিত্তিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দ্বার উন্মুক্ত হইল।

পঞ্চমত, সর্বপ্রথম রাষ্ট্র ও সমাজের মধ্যে পার্থক্য সুস্পষ্টভাবে নির্দেশ করিয়া এই মতবাদ রাষ্ট্রবিজ্ঞানের প্রভূত উন্নতি সাধন করিয়াছে।

ষষ্ঠত, বিশেষ করিয়া উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ও গণতান্ত্রিক চেতনা সৃষ্টির ক্ষেত্রে এই মতবাদের বিশেষ অবদান রহিয়াছে। রাষ্ট্র একটি মানবিক প্রতিষ্ঠান এবং জনগণের সহযোগিতা ও সম্মতির উপর ইহা স্থাপিত—এই সত্যকে প্রতিষ্ঠা করিয়া সামাজিক চুক্তি মতবাদ গণতন্ত্রের গোড়াপত্তন করিয়াছে। শাসকের ক্ষমতা সীমিত ও নির্ধারিত করিয়া এবং শাসিত জনগণের সম্মতিকে প্রাধান্য দিয়া এই মতবাদ গণতন্ত্রের ভিত্তি রচনা করিয়াছে।[৪] বস্তুত সামাজিক চুক্তি মতবাদকে বর্তমান গণতন্ত্রের অগ্রদূত বলিয়া অভিহিত করা যায়।

সপ্তমত, এই মতবাদের মধ্য দিয়া 'স্বাধীনতা' ও 'ন্যায়'-এর আদর্শ প্রকাশ লাভ করিয়াছে। বার্কারকে অনুসরণ করিয়া বলা যায় যে, চুক্তিবাদের যুক্তির মধ্যে দুইটি মৌলিক ধারণা প্রকাশ পাইয়াছে যাহার প্রতি মানুষের চিন্তা সর্বদা দৃঢ়ভাবে সংলগ্ন থাকিবে। এই ধারণা দুইটি হইতেছে স্বাধীনতা ও ন্যায়ের আদর্শ।[৯] বস্তুত, এই আদর্শ হইতেই স্বাধীনতা, সাম্য, মৈত্রী, মানুষের অধিকার, আত্ম-নিয়ন্ত্রণের মৌলিক অধিকার প্রভৃতি সম্পর্কীয় ধ্যান-ধারণার জন্ম ও প্রসার লাভ ঘটে। এই মতবাদের উপর নির্ভর করিয়া ইংলণ্ডের গৌরবময় বিপ্লব অনুষ্ঠিত হয়, যাহার ফলে ইংলণ্ডে স্বৈরাচারী শাসনের অবসান ঘটিয়া গণতন্ত্রের ভিত্তি স্থাপিত হয়। ফরাসী বিপ্লব ও আমেরিকার উপনিবেশগুলির স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রেরণাও দিয়াছিল এই মতবাদ।

সুতরাং এই চুক্তি মতবাদ একদিকে তত্ত্ব ও আদর্শগত অবদান দ্বারা রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে উন্নত করিয়াছে এবং অপরদিকে এই চুক্তি মতবাদের আদর্শ পৃথিবীর বুকে সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করিয়া পুরাতন, জরা-জীর্ণ ও সংস্কারের বন্ধনে আবদ্ধ সমাজকে নতুন বৈপ্লবিক খাতে প্রবাহিত করিয়াছে। সামাজিক চুক্তি মতবাদের এই বাস্তব গুরুত্বকে অস্বীকার করিবার কোন উপায় নাই।

8. "The Contract Theory, however,.........served a useful purpose in its day by providing a weapon for combating irresponsible rules and justification for resistance to tyranny."—Garner.

9. "It was a way of expressing two fundamental ideas or values to which human mind will always cling—the value of liberty and the value of justice."—Barker.

৫ ॥ হবস্, লক্ ও রুশোর মতবাদের সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য :

হবস্, লক্ ও রুশো প্রত্যেকেই নিজ নিজ দৃষ্টিকোন হইতে রাষ্ট্রের উৎপত্তি ও ইহার প্রকৃতি বিশ্লেষণ করিয়াছেন। এই তিনজন দার্শনিকই সমসাময়িক রাজনৈতিক ঘটনাবলীর দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন। তাই, এই ত্রয়ীর মতবাদ বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে, সামাজিক মতবাদের ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে ইহাদের বক্তব্যে কিছু পরিমান সাদৃশ্য থাকিলেও বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই ইহাদের বক্তব্যে মৌলিক অসঙ্গতি ও বৈসাদৃশ্য দেখা দিয়াছে। প্রাকৃতিক অবস্থার ব্যাখ্যা ও চুক্তির স্বরূপ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে হবস্ ও লক্ সম্পূর্ণ বিপরীত ধারণা পোষণ করিতেন। রুশো মোটামুটিভাবে উভয় মতবাদের মধ্যে সমন্বয় সাধন করিয়াছেন। নিম্নে হবস্ ও লক্ ও রুশোর সামাজিক চুক্তি বিষয়ক মতবাদের সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য আলোচনা করা হইল।

হবস্, লক্ ও রুশোর মতবাদের সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য উপলব্ধি করিতে হইলে তাঁহাদের সমসাময়িক ঐতিহাসিক পটভূমি জানা প্রয়োজন। পূর্বেই বলা হইয়াছে, হবসের সময়ে ইংলণ্ডের রাজার সঙ্গে পার্লামেণ্টের ক্ষমতার দ্বন্দ্ব চলিতে ছিল। হবস্ ছিলেন রাজতন্ত্রের উগ্র সমর্থক। সুতরাং তাঁহার Leviathan গ্রন্থে এই চুক্তি মতবাদের ভিতর দিয়া তিনি চরম রাজতন্ত্রকে সমর্থন করিবার প্রয়াসী হইয়াছেন। লক্ ১৬৮৮ খৃষ্টাব্দের রক্তহীন বিপ্লবের অন্যতম সমর্থক ছিলেন। অত্যাচারী রাজার সিংহাসনচ্যুতির যৌক্তিকতা ও বিপ্লবের কারণ ব্যাখ্যা করিয়া উহা সমর্থনের জন্য তিনি তাঁহার 'Two Treaties on Government' গ্রন্থে এই চুক্তি মতবাদকে উপস্থিত করিলেন। ফরাসী চিন্তানায়ক রুশো এই ধরণের কোন ঐতিহাসিক ঘটনার সমর্থনে তাঁহার মতবাদ যদিও প্রচার করেন নাই, কিন্তু ব্যক্তিগত ধারণা ও চিন্তার বশবর্তী হইয়াই তিনি তাঁহার এই মতবাদ 'Contract Social' গ্রন্থে প্রকাশ করিয়া চিন্তারাজ্যে স্মরণীয় হইয়া উঠিলেন।

প্রাক্-সামাজিক প্রাকৃতিক অবস্থা, স্বাভাবিক আইন ও স্বাভাবিক অধিকারের বর্ণনার ক্ষেত্রে হবস্, লক্ ও রুশোর মতবাদের মধ্যে গভীর বৈসাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। হবস্ মনে করিতেন যে, প্রাকৃতিক অবস্থায় জীবন ছিল বীভৎস, পাশবিক ও স্বল্পস্থায়ী। তাই মানুষ দীন, নীচ ও স্বার্থপর জীবন যাপন করিত। বাহুবলের নীতির দ্বারাই সাধারণতঃ প্রাক্ সামাজিক যুগের মানুষ নিয়ন্ত্রিত হইত। লকের মতে প্রাকৃতিক অবস্থায় শান্তি ও শুভেচ্ছা বিরাজ

করিত এবং এই অবস্থা ছিল কল্যাণকর। প্রাক্ সামাজিক অবস্থায় মানুষকে লক্ আত্মসর্বস্ব ও অসামাজিক মনে করিতেন না। বরং মানুষ স্বাধীন, সুখী ও শান্তিপূর্ণ জীবন যাপন করিত। রুশো প্রাকৃতিক অবস্থাকে মর্তের স্বর্গ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। তাঁহার মতে আদিম মানুষ স্বাধীনতা, সাম্য ও মৈত্রী বজায় রাখিয়া বসবাস করিত।

চুক্তির প্রকৃতি ব্যাখ্যা করিয়া হবস্ বলিয়াছেন চুক্তি হইয়াছিল একটি। এই চুক্তির দ্বারা প্রত্যেকে তাহার সর্বপ্রকার অধিকার বিনা শর্তে সমর্পণ করিয়াছে এবং রাজা চুক্তির অংশীদার নহেন। লকের মতে চুক্তি হইয়াছিল দুইটি—একটি সামাজিক এবং অপরটি রাজনৈতিক। প্রথমে সামাজিক চুক্তির দ্বারা রাষ্ট্র গঠিত হয় এবং পরে রাজনৈতিক চুক্তির দ্বারা শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। লকের মতে রাজা চুক্তির অংশীদার। রুশো মনে করিতেন যে, চুক্তি হইয়াছে একটি। এই চুক্তির দ্বারা কোন এক যৌথ ব্যক্তিদের হাতে সমস্ত অধিকার সমর্পিত হইল। রুশো এই চুক্তিকে মানুষের মধ্যে পারস্পরিক চুক্তি হিসাবে অভিহিত করিয়াছেন।

সার্বভৌমত্ব সম্পর্কে হবসের অভিমত হইল এই যে, সার্বভৌম শক্তি অবাধ, চূড়ান্ত, অপ্রতিহত, আদি এবং অপরিসীম। রাজাই একমাত্র সার্বভৌম শক্তির অধিকারী এবং সার্বভৌম শক্তির (রাজার) আজ্ঞাই আইন। লকের মতে সার্বভৌমিকতা অবিভাজ্য নয়। যদিও সরকার ইহার ব্যবহার করেন, কিন্তু মূলত ইহা জনগণের অধিকারের দ্বারা সীমাবদ্ধ। রুশো নিরঙ্কুশ সার্বভৌমিকতায় বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁহার মতে রাজা বা সরকার ইহার অধিকারী নন—ইহার অধিকারী সক্রিয় সমগ্র জনতা। রুশোর দৃষ্টিতে আইন হইল সমষ্টিগত কল্যাণকর ইচ্ছার প্রকাশ।

শাসনব্যবস্থা সম্পর্কিত মতামতের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, হবস্ ছিলেন অবাধ রাজতন্ত্রের প্রবল সমর্থক—তাই স্টুয়ার্ট রাজবংশের স্বেচ্ছাচারিতাকে তিনি সমর্থন করিয়াছেন। লক্ ছিলেন সীমাবদ্ধ রাজতন্ত্রের সমর্থক। এই মতবাদের সাহায্যে তিনি ইংলণ্ডের গৌরবময় বিপ্লবের ন্যায্যতা প্রমাণ করেন। রুশো প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র সমর্থন করেন। তিনি তাঁহার এই মতবাদের দ্বারা ফরাসী বিপ্লবের প্রেরণা জোগান।

মানুষের অধিকার সম্পর্কে হবসের ধারণা ছিল খুবই সীমিত। কোন অবস্থাতেই মানুষ রাজার বিরুদ্ধাচারণ করিতে পারিবে না। সুতরাং হবসের

মতবাদ অনুযায়ী একমাত্র আইনপ্রদত্ত অধিকার ও আত্মরক্ষার অধিকার ছাড়া জনগণের আর কোন অধিকার অবশিষ্ট ছিল না। লক্ সীমাবদ্ধ রাজতন্ত্রের সমর্থক ছিলেন। রাজা চুক্তির শর্ত ভঙ্গ করিলে জনসাধারণের রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার আইন সঙ্গত অধিকার আছে। সুতরাং লকের মতে অধিকার অনেকখানিই থাকিয়া গেল। লকের মতে জীবন, সম্পত্তি, স্বাধীনতা ও বিপ্লবের অধিকার জনগণের রহিল। রুশোর মতবাদ অনুযায়ী স্বাধীনতা ও সাম্য মানুষের জন্মগত অধিকার। সমষ্টিগত সার্বভৌম ইচ্ছা করিলেই সরকারকে পরিবর্তন করিতে পারেন। সুতরাং রুশোর মতে স্বাভাবিক অধিকারের কোন হানিই ঘটে নাই।

হবস রাষ্ট্র ও সরকারের মধ্যে কোন প্রকার পার্থক্য করেন নাই। কিন্তু লক্ ও রুশো রাষ্ট্র ও সরকারের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করেন।

হবস্, লক্ ও রুশো এই তিনজন দার্শনিকই চুক্তি মতবাদের ভিতর দিয়া শাসক ও শাসিতের সম্পর্ক বিশ্লেষণ করিয়াছেন। তিনজন দার্শনিকই এই তত্ত্বকে প্রচার করিয়া প্রচণ্ড প্রভাব সৃষ্টিকারী ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্রের মূলে চরম কুঠারাঘাত করিয়াছেন।

৬ ॥ হবস্ ও লকের তত্ত্বের মিলন ঘটিয়াছে রুশোর তত্ত্বে :

সামাজিক চুক্তি মতবাদের অন্যতম প্রবক্তা রুশোর বক্তব্য বিশ্লেষণ করিয়া অনেকে বলিয়া থাকেন যে, তিনি হবস্ ও লকের চিন্তাধারা ও তত্ত্বের মিলন ঘটাইয়াছেন। আর একটু পরিষ্কারভাবে মত ব্যক্ত করিয়া অনেকে বলেন যে, হবসের যুক্তি ও লকের সিদ্ধান্তকে যুক্ত করিয়া রুশো তাঁহার প্রতিপাদ্য বিষয় উপস্থিত করিয়াছেন (Rousseau combines the premises of Hobbes with the conclusions of Locke)। সামাজিক চুক্তি সম্পর্কে হবস্, লক্ ও রুশোর ভাষ্য আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, হবস্ ও লকের বক্তব্যে ভিতর যতটা অসাদৃশ্যতা রহিয়াছে, রুশোর ভাষ্য উহাদের সঙ্গে ততটা অসাদৃশ্যমূলক নয়। বস্তুতপক্ষে হবস্ ও লকের ভাষ্য পরস্পরবিরোধী, কিন্তু রুশোর বক্তব্যের সঙ্গে কিছু পরিমাণে হবসের এবং কিছু পরিমাণে লকের চিন্তার সঙ্গে সাদৃশ্য রহিয়াছে। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও রুশো হবস্ ও লকের বক্তব্যের মিলন ঘটাইয়াছেন, এই মত আপাতদৃষ্টিতে স্ববিরোধী বলিয়া প্রতীয়মান হইতে পারে। কারণ, যদিও লক ও রুশোর চিন্তাধারার মধ্যে একটি মিলনসূত্র আবিষ্কার করা কষ্টকর

নয়, কিন্তু অবাধ রাজতন্ত্রের ভাষ্যকার হবসের সঙ্গে মানুষের অধিকার ও গণতন্ত্রের চারণ কবি রুশোর ভিতর মিল খুঁজিয়া বাহির করা কষ্টকর। মনে রাখিতে হইবে, যে মিলনের কথা বলা হইতেছে তাহা শুধুমাত্র প্রাকৃতিক অবস্থা বা সামাজিক চুক্তির মিল নয়—উহা আরও গূঢ় তত্ত্বগত মিল।

এই তত্ত্বগত মিল আলোচনা করিবার পূর্বে দেখানো যাইতে পারে যে, রুশো কীভাবে প্রাকৃতিক অবস্থা বা সামাজিক চুক্তি ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে হবস্ ও লকের চিন্তাধারার ভিতর সেতু রচনা করিলেন। প্রথমত, হবস্ প্রাকৃতিক অবস্থাকে বীভৎস, পাশবিক ও স্বল্পস্থায়ী বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। লক্ ইহার বিরোধিতা করিয়া ইহাকে শান্ত ও কল্যাণকর বলিয়াছেন। রুশো যদিও প্রাকৃতিক অবস্থা সম্পর্কে লকের বক্তব্য সমর্থন করিলেন, তবু তিনি স্বীকার করিলেন যে, সম্পত্তির উদ্ভব ও জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে প্রাকৃতিক অবস্থা ক্রমশ জটিল হইয়া হবস্ বর্ণিত অবস্থার সম্মুখীন হইল। দ্বিতীয়ত, চুক্তির প্রকৃতি আলোচনার ক্ষেত্রে দেখা যাইবে যে, রুশো একদিকে যেমন হবসের মত একটি চুক্তির মাধ্যমে রাষ্ট্রের উৎপত্তি সমর্থন করেন, তেমনি লকের দ্বিতীয় চুক্তিকে (যাহার দ্বারা জনগণ শাসনযন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিল) সরাসরি চুক্তি বলিয়া অভিহিত না করিয়া 'আইন প্রণয়ন' হিসাবে ব্যাখ্যা করিলেন। তৃতীয়ত, 'স্বাধীনতা' ও 'অধিকার' সম্পর্কিত আলোচনার ক্ষেত্রে দেখা যাইবে যে, হবস্ মনে করেন শাসকের আইন দ্বারা স্বীকৃত স্বাধীনতাটুকুই জনগণ শুধু ভোগ করিতে পারিবে। লকের মতে ইহা যথেষ্ট নয়, ইহার দ্বারা স্বাধীনতা সীমিত হইবে। রুশো যদিও সীমিত স্বাধীনতার বিরোধী ছিলেন, তথাপি তিনি মনে করিতেন যে আইনের ভিতর দিয়াই পূর্ণ স্বাধীনতার প্রকাশ সম্ভব। অর্থাৎ রুশোর মতে রাষ্ট্রকর্তৃত্ব ও স্বাধীনতার মধ্যে কোন মৌলিক বিরোধ নাই। এইভাবে হবস্ ও লকের চিন্তাধারার মধ্যে রুশো মিলন ঘটাইলেন।

কিন্তু তত্ত্বগত দিক হইতে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হইতেছে এই যে রুশো হবসের নিকট হইতে সার্বভৌমত্বের ধারণা গ্রহণ করিলেন। হবসের মতে এই সার্বভৌমত্বের প্রতিকূলে দাঁড়াইবার শক্তি কাহারো নাই। সার্বভৌমের নিকট সকলকে বিনা দ্বিধায় আনুগত্য জানাইতে হইবে। এই সার্বভৌম শক্তি সকল চুক্তি ও সকল অধিকারের উর্ধ্বে। হবসের এই সার্বভৌমিকতার তত্ত্বকে রুশো সামগ্রিকভাবেই গ্রহণ করিয়াছেন। হবসের মত রুশোও বিশ্বাস করেন যে, সার্বভৌমত্ব এক, অবিভাজ্য, অভ্রান্ত, সর্বশক্তিমান এবং চূড়ান্ত শক্তি। কিন্তু

উহাদের ভিতর সাদৃশ্য থাকা সত্ত্বেও মনে রাখিতে হইবে যে, এক জায়গায় উহাদের মধ্যে একটি মৌলিক প্রভেদ রহিয়াছে। হবস্ সার্বভৌমত্বের অধিষ্ঠান দেখিয়াছিলেন কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিসমষ্টির মধ্যে রুশো তাহার পরিবর্তে সকল নাগরিকের সমষ্টিগত ইচ্ছাকে সার্বভৌমত্বে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। এইখানে রুশো হবস্‌কে বর্জন করিয়া গ্রহণ করিয়াছেন লক্‌কে। লক্ মনে করিতেন যে, চুক্তি ভঙ্গকারী শাসককে অপসারণ অধিকার জনগণের আছে। অর্থাৎ তিনি জনসাধারণের সার্বভৌমত্বে বিশ্বাসী ছিলেন। রুশোর হস্তে এই জনসাধারণের সার্বভৌমিকতা সমষ্টিগত ইচ্ছার রূপ গ্রহণ করিল। সুতরাং বলা যাইতে পারে যে, রুশো হবসের নিকট হইতে সার্বভৌমত্বের তত্ত্বটি গ্রহণ করিয়া লকের জনতার অধিকারের ভিত্তিতে উহাকে সমষ্টিগত ইচ্ছায় পরিণত করেন।

সুতরাং হব্‌স্, লক্ ও রুশোর চিন্তার ভিতর পারস্পরিক অসঙ্গতি ও বৈসাদৃশ্য থাকিলেও রুশোর মতবাদে হবসের তত্ত্ব ও লকের সিদ্ধান্তের কিছুটা পরিমাণে মিলন ঘটিয়াছে।

৭ ॥ সামাজিক চুক্তি মতবাদ ঐশ্বরিক মতবাদের প্রতিষেধক :

সামাজিক চুক্তি মতবাদের প্রবক্তাগণ রাষ্ট্রকে একান্তভাবেই মনুষ্য সৃষ্টি একটি সামাজিক সংস্থা হিসাবে মনে করিতেন। তাঁহারা বিশ্বাস করিতেন যে, আদিম মানুষের মধ্যে চুক্তির ভিত্তিতেই রাষ্ট্রের উদ্ভব হইয়াছে। নিজেদের প্রয়োজনেই মানুষ এই সংগঠন সৃষ্টি করিয়াছে। রাষ্ট্র সৃষ্টির ক্ষেত্রে তাঁহারা অন্য কোন অলৌকিক শক্তির অবদান স্বীকার করেন না। তাঁহাদের এই ব্যাখ্যা রাষ্ট্র-বিজ্ঞানকে গূঢ় ধর্মতত্ত্বের জটিল জটাজাল হইতে মুক্ত করিয়া নতুন ধারায় প্রবাহিত করিতে সাহায্য করিয়াছে।

রাষ্ট্রের উৎপত্তির কারণ ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া ঐশ্বরিক মতবাদ ঘোষণা করিল যে রাষ্ট্র ঈশ্বর কর্তৃক সৃষ্ট এবং তাহারাই ইচ্ছায় পরিচালিত। রাজাকে ঈশ্বরের প্রতিনিধি বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া এই মতবাদ ঘোষণা করিল যে, রাজার মধ্য দিয়া ঈশ্বরের ইচ্ছাই কার্যকরী হয়। কারণ রাজা এবং ঈশ্বরের ইচ্ছা অভিন্ন। যেহেতু রাজার মধ্য দিয়া ঈশ্বরের ইচ্ছা প্রতিফলিত হয় সেইজন্য রাজার ইচ্ছাকে বিনা শর্তে মান্য করা উচিত। এইভাবে এই মতবাদ সমস্ত প্রকার যুক্তি-তর্ক অস্বীকার করিয়া কল্পনা ও সংস্কারের এক বিচিত্র জটাজালে সমস্ত চিন্তাকে আচ্ছন্ন করিল। ইহারই প্রতিক্রিয়া হিসাবে দেখা দিল

সামাজিক চুক্তি মতবাদ। এই মতবাদের ভাষ্যকারগণ ঈশ্বরিক মতবাদের তাত্ত্বিক ভিত্তিপ্রস্তরকে অপসারণ করিয়া দৃঢতার সঙ্গে ঘোষণা করিলেন যে রাষ্ট্র মূলত মনুষ্য প্রয়াস হইতে উদ্ভূত একটি মানবিক সংগঠন। ইহাদের এই ঘোষণা নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত করিল—ধর্মশাস্ত্রের ঈশ্বর সম্পর্কিত কূট ব্যাখ্যার উপর রাষ্ট্রের উৎপত্তি আর নির্ভরশীল রহিল না।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, ধর্মকে রাষ্ট্রনীতি হইতে পৃথক করিয়া সামাজিক চুক্তি মতবাদের ভাষ্যকারগণ ঘোষণা করিলেন যে, রাষ্ট্র গঠনের ক্ষেত্রে রাজার কোন স্থান বা অবদান নাই, রাজতন্ত্রই একমাত্র ঈশ্বর অনুমোদিত শাসন পদ্ধতি নয় এবং রাজা ঈশ্বরের প্রতিনিধি হিসাবে নিজেকে দাবী করিতে পারে না। লক্‌ ও রুশো আর একটু অগ্রসর হইয়া এই মত ব্যক্ত করিলেন যে রাজা তাহার ক্ষমতার অপব্যবহার করিলে প্রজাদের বিদ্রোহ ও প্রতিকার করিবার অধিকার থাকিবে, কারণ রাজার ক্ষমতা প্রজাদের স্বাধীনতা ও সম্মতির দ্বারা সীমাবদ্ধ। তাঁহারা এই কারণেই মনে করেন যে রাজা ঈশ্বরের নিকট তাহার কার্যের জন্য দায়ী নহেন—তিনি তাহার কার্যের জন্য প্রত্যক্ষভাবে প্রজাদের নিকট দায়ী।

সামাজিক চুক্তি মতবাদকে কেন্দ্র করিয়া এই ধারণা ক্রমশ বদ্ধমূল হইয়া উঠিল যে, ঈশ্বর একের পর এক রাষ্ট্র সৃষ্টি করিয়া এক একজন রাজার হস্তে উহা সমর্পণ করেন নাই। সুতরাং রাজার স্বেচ্ছাচারিতা ও প্রজাপীড়ন চুক্তি-বাদীদের যুক্তির আঘাতে ম্রিয়মান হইয়া উঠিল। ইহার ফলে এই মতবাদের ভিত্তিতে বিভিন্ন দেশে রাজার স্বৈরাচারিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, প্রজাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা ও সাম্য-মৈত্রী স্বাধীনতার দাবীতে বিপ্লব আরম্ভ হইল। এইভাবে রাজার ঈশ্বরদত্ত ক্ষমতার নীতি ও ঐশ্বরিক উৎপত্তিবাদের তত্ত্ব ভ্রান্ত বলিয়া প্রমাণিত হইল। সুতরাং বলা যাইতে পারে, সামাজিক চুক্তি মতবাদ রাষ্ট্রচিন্তা জগতে এক নূতন আলোড়ন সৃষ্টি করিয়া ঐশ্বরিক মতবাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হিসাবে আত্ম প্রকাশ করিল।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, সামাজিক চুক্তির অন্যতম প্রবক্তা হবস্‌ ঈশ্বরের ভূমিকা ও কর্তৃত্বকে সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করেন নাই, বরং তিনি অবাধ রাজতন্ত্রের সমর্থন করিয়াছেন এবং ধর্ম ও রাজার কার্যের মধ্যে একটি সীমারেখা নির্দেশ করিয়া রাজাকে সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে, হবস্‌ অবাধ রাজতন্ত্রকে স্বীকার

করিলেও তাঁহার যুক্তিতে যখন তিনি বলিলেন যে প্রজাদের ইচ্ছার ভিত্তিতেই প্রথমত রাষ্ট্রের উৎপত্তি এবং তাহাদের নিরাপত্তা রক্ষার জন্যই এই চুক্তির প্রয়োজন দেখা দিয়াছিল, তখন তিনি অপ্রত্যক্ষভাবে অবাধ রাজতন্ত্রের ভিত্তিমূলে আঘাত করিলেন। সেই আঘাতকে আরও প্রসারিত করিয়া লক্ ও রুশো ঐশ্বরিক মতবাদকে ভিত্তিচ্যুত করিলেন। সুতরাং ঐশ্বরিক মতবাদকে অবাস্তব ও ভিত্তিহীন প্রমাণিত করিবার ক্ষেত্রে সামাজিক চুক্তি মতবাদের বিরাট অবদান রহিয়াছে। তাই ম্যাকআইভার (Maciver) যথার্থই বলিয়াছেন যে, ঈশ্বরদত্ত অধিকার ও উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত দায়িত্বহীন ক্ষমতা সম্পর্কে মানুষের ধ্যান ধারণাকে পরিবর্তন করিতে সামাজিক চুক্তি মতবাদ প্রভূত সাহায্য করিয়াছে।[10]

৮। বলপ্রয়োগ মতবাদ (Theory of Force):

রাষ্ট্রের উৎপত্তি ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা হিসাবে লীকক (Leacock), হিউম (Hume), ওপেনহিমার (Oppenheimer), জেঙ্কস (Jenks) প্রভৃতি রাষ্ট্র বিজ্ঞানীগণ বলপ্রয়োগ মতবাদটির প্রচার করিয়াছেন। এই মতবাদ শুধুমাত্র রাষ্ট্রের উৎপত্তিই আলোচনা করে নাই, ইহা রাষ্ট্রের প্রকৃতিরও ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করিয়াছে।

এই মতবাদ অনুসারে ইতিহাসের দিক হইতে বিচার করিলে দেখা যাইবে যে, স্বার্থান্ধ শক্তিশালী ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর প্রভুত্বলিপ্সা ও আধিপত্য বিস্তারের জন্য অন্যকে আক্রমণ করিয়া দাসত্ব, শৃঙ্খল, ও অধীনতায় আবদ্ধ করিবার প্রয়াসের ভিতরই রাষ্ট্রের উৎপত্তির উপাদান নিহিত আছে। অর্থাৎ বল প্রয়োগের দ্বারা বিজিত মনুষ্য সম্প্রদায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসাবেই রাষ্ট্রের সূত্রপাত ঘটিয়াছিল। এইরূপভাবে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হইবার কারণ হিসাবে বলা হইয়াছে যে, যদিও মানুষ সমাজবদ্ধ জীব, কিন্তু চারিত্রিক দিক হইতে মূলতঃ সে কলহপ্রিয়, আক্রমণমুখী ও প্রভুত্বলিপ্সু। এই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের জন্যই সে আদিম যুগ হইতেই বলপ্রয়োগ করিয়া আসিতেছে। প্রথমস্তরে গোষ্ঠীর (clan) শক্তিশালী ব্যক্তি শক্তি প্রয়োগ করিয়া অন্যদের বশীভূত করিত এবং তাহাদের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করিত এবং

10. "For it (Social contract Theory) helped to clear men's mind............ of those fervent ideas of divine right and inherent irresponsible power."
—Mac Iver

গোষ্ঠিপতির মর্যাদা লাভ করিতেন। পরবর্তী স্তরে এই দলপতি তাহার অধীনস্থ লোক লইয়া অন্য দলকে আক্রমণ করিয়া তাহাদের পরাজিত এবং নিজ প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করিত। এইভাবে জনসংখ্যা বৃদ্ধিতে গোষ্ঠি উপজাতিতে (Tribe) রূপান্তরিত হয়। এই পদ্ধতি চলিতে চলিতে ক্রমে একটি সমগ্র এলাকায় এই উপদলের এবং তাহাদের দলপতির প্রভুত্ব কায়েম হইল। দলপতি তাহার অধীনস্থ এলাকায় নিজের প্রভুত্বই শুধু প্রতিষ্ঠা করিলেন না, তাঁহার আজ্ঞাকে আইনে পরিণত করিলেন। এই আইন কেহ অমান্য করিলে দলপতির নিকট হইতে দণ্ডলাভ করিত। এইরূপে 'জোর যার মুল্লুক তার' নীতির উপর ভিত্তি করিয়া রাষ্ট্রের উৎপত্তি হইল। বলপ্রয়োগের মধ্য দিয়া রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্পর্কে ড: লীকক (Leacock) বলিয়াছেন : মানুষের দ্বারা মানুষকে আক্রমণ ও তাহাকে দাসত্বের শৃঙ্খলে বন্ধন করা, দুর্বল জাতির উপর সবল জাতির আক্রমণ ও তাহাদের পরাধীন করা এবং স্বার্থান্ধ বলবানের প্রভুত্ব লিপ্সার মধ্যেই ঐতিহাসিক দিক দিয়া রাষ্ট্রের উৎপত্তির সন্ধান করিতে হইবে। কোকারকে (Coker) অনুসরণ করিয়া বলা যায় যে, ইহা ভীতি প্রদর্শন দ্বারা প্রভুত্ব বিস্তার, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যুদ্ধবাদ এবং আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে রাজনৈতিক বিরোধিতা দমনের নীতি।[11]

রাষ্ট্রের প্রকৃতির ক্ষেত্রে এই মতবাদ বলিয়া থাকে যে, রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর আভ্যন্তরীণ শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষা ও বৈদেশিক আক্রমণের হাত হইতে রাষ্ট্রকে রক্ষা করিবার জন্যও শক্তি প্রয়োগের প্রয়োজন ছিল।

বলপ্রয়োগ মতবাদকে বিভিন্ন সময়ে স্বার্থ সংশ্লিষ্ট মহল বিভিন্ন উদ্দেশে ব্যবহার করিয়াছেন। মধ্যযুগে চার্চ (Church), পোপ প্রভৃতি ধর্মীয় সংগঠন ও ব্যক্তির ক্ষমতাকে রাষ্ট্রের উপরে স্থাপনের উদ্দেশে বলা হইত যে রাষ্ট্রের শক্তি হীন বাহুবল হইতে, কিন্তু চার্চের শক্তি ধর্ম ও নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত।

দার্শনিক হবস্ (Hobbes) শক্তিতত্ত্বের বক্তব্যকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা করিবার চেষ্টা করেন। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী স্পেনসার (Spencer) মনে করিতেন যে, সরকারের জন্ম পাপ হইতে ; অশুভ জন্মের চিহ্ন সে বহন করিতেছে।[12] সুতরাং সরকারী ক্ষমতার পরিধিকে সীমিত করা প্রয়োজন।

11. "It is a creed of dominance by intimidation—militancy in international relations and forcible suppression of political dissent in domestic government."—Coker.

12. "Goverment is the offrspring of evil, bearing about it the marks of its parentage." —Harbert Spencer.

শুধুমাত্র সমাজের যোগ্য ব্যক্তিদেরই বাঁচিবার অধিকার আছে। (Survival of the fittest)। তাঁহারা এই বক্তব্যের ভিতর দিয়া বলপ্রয়োগ মতবাদের স্বর কিছুটা ধ্বনিত হইয়াছে। জার্মান পণ্ডিত ট্রিটসকে (Treitschke) রাষ্ট্রশক্তির উপাসনা ও যুদ্ধের গৌরব গাথায় মুখর হইয়া মূলতঃ এই মতবাদকেই স্বীকার করিয়াছেন। কোকার (Coker) দেখাইয়াছেন যে, বিংশ শতাব্দীর ফ্যাসিষ্ট চিন্তাধারা এই মতবাদ হইতে প্রেরণা লাভ করিয়াছিল। ব্লুৎস্লী (Bluntschli) মনে করেন যে শক্তি বা সার্বভৌমই যে, রাষ্ট্রের প্রধান ও অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য তাহা এই মতবাদের ভিতর দিয়া সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। মার্কসবাদীরা যুদ্ধ ও রাষ্ট্রশক্তির অনুরক্ত না হইয়াও শক্তিকে রাষ্ট্রের মূল উপাদান হিসাবে স্বীকার করিয়াছেন। রাষ্ট্রের উৎপত্তি ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া মার্কসীয় দৃষ্টি কোণ হইতে বলা হইয়াছে যে, রাষ্ট্র শ্রেণীগত শাসন কায়েম করিবার যন্ত্র বিশেষ। কিন্তু এই শ্রেণীগত শাসন ও পীড়নের জন্য প্রয়োজন শক্তি। অর্থাৎ রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে শক্তির (Coercive power) গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা মার্কসবাদীরাও স্বীকার করেন।[18] সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, প্রাচীন কাল হইতেই এই মতবাদ রাষ্ট্রদর্শনের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে গুরুত্বলাভ করিয়া আসিতেছে এবং বিভিন্ন ব্যক্তি এই মতবাদকে বিভিন্ন উদ্দেশ্যে ব্যবহার করিয়াছেন।

সমালোচনা : শক্তিকে রাষ্ট্রের অপরিহার্য একটি উপাদান হিসাবে গ্রহণ করিলেও প্রশ্ন থাকিতেছে যে, একমাত্র শক্তির ভিত্তিতেই কী রাষ্ট্রের উৎপত্তি হইয়াছে ? তাহা যদি হয়, তবে জনগনের ইচ্ছাও সম্মতির কী কোন মূল্যই নাই। আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানীগণ মনে করেন, যদিও রাষ্ট্রের উৎপত্তিতে শক্তি অন্যতম উপাদান হিসাবে কাজ করিয়াছে, তবু ইহা কোনমতেই একমাত্র উপাদান নয়। প্রখ্যাত ইংরেজ দার্শনিক গ্রীন (T. H. Green) রাষ্ট্রের উৎপত্তির ক্ষেত্রে জনসাধারনের স্বেচ্ছাভিত্তিক সম্মতির উপর গুরুত্ব দিয়া বলিয়াছেন যে, মানুষের ইচ্ছাই রাষ্ট্রের ভিত্তি, শক্তি নহে (Will, not force is the basis of the state)। অর্থাৎ রাষ্ট্রের ভিত্তি হইল জনসাধারণের সম্মতি, শক্তি নয়। অনুরূপভাবে, ম্যাক-আইভারও (Mac-Iver) মনে করেন

18. According to Marx, the state is an organ of class rule, an organ for the oppression of one class by another; it is the creation of 'order' which legalises and perpetuates this oppression by moderating the conflict between the classes.—Lenin.

যে, একমাত্র পাশবিক বল জনগণকে সংগঠিত রাখিতে পারে না এবং জনসাধারনের সম্মতির অনুবর্তী না হইলে পাশবিক শক্তি বিভেদেরই জন্ম দেয়।[14] ইহাদের মতবাদ অনুসরণ করিয়া বলা যাইতে পারে যে, জনগণের ইচ্ছা ও সম্মতি না থাকিলে পাশবিক শক্তি বিশেষ কিছু করিতে পারে না। উদাহরণ হিসাবে বলা যাইতে পারে, শক্তিশালী রুশ সম্রাট জারকে জনসাধারনের বৈপ্লবিক অভিযানের কাছে পরাজয় স্বীকার করিতে হইয়াছে। ফরাসী বিপ্লব ও পৃথিবীর অন্যান্য ইতিহাস প্রমাণ করিয়াছে যে, জনগনের সদিচ্ছাও সমর্থনের দ্বারা পুষ্ট না হইলে শুধুমাত্র বলপ্রয়োগের ভিত্তিতে কোন রাষ্ট্র স্থায়ী হইতে পারে না।

কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে, গ্রীনের বক্তব্য কিছুটা পরিমানে যুক্তিপূর্ণ হইলেও ইহা অভ্রান্ত নহে। এই প্রসঙ্গে লিণ্ডসেকে (Lindsay) অনুসরণ করিয়া বলা যাইতে পারে, রাষ্ট্র কর্তৃত্ব বজায় রাখিবার জন্ত শক্তির প্রয়োজন যেরূপ, সম্মতিরও সেরূপ প্রয়োজন রহিয়াছে। সম্মতিই রাষ্ট্রকে বিধিসঙ্গত রূপ দান করিয়াছে। বস্তুত, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ও তদীয় আইনকে আলস্য, অজ্ঞতা, অভ্যাস, ভয় ও প্রয়োজনীয়তা প্রভৃতি বিবিধ কারণে মানুষ মান্য করে। উপরোক্ত কারণগুলি হইতে 'ইচ্ছা' ও 'ভয়' বোধের জন্ম যাহারা আইন মান্য করইতে সাহায্য করে।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, বলপ্রয়োগ মতবাদকে সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করা যায় না। কারণ হিসাবে বলা যায়: (১) গ্রীণের বক্তব্যকে অনুসরণ করিয়া মানুষের সদিচ্ছা ও সম্মতি রাষ্ট্রগঠনের ক্ষেত্রে এক বিরাট ভূমিকা পালন করে। (২) এই মতবাদ স্বাধীনতা, অধিকার, গণতন্ত্র প্রভৃতি রাষ্ট্রনৈতিক আদর্শ বিরোধী। ইহা স্বৈরাচারিতাকে সমর্থন করে। (৩) এই মতবাদ মানুষের মহত্ত্ব ও উদারতা প্রভৃতিকে চাপা দিয়া তাহার নীচতা ও অন্যান্য অসৎ প্রবৃত্তির উপর প্রাধান্য দেয়। (৪) এই মতবাদ যুদ্ধবাদকে সমর্থন করে, তাই ইহা শান্তি ও সংহতির বিরোধী।

শক্তি ও সম্মতির যৌথ প্রয়োগের ভিতর দিয়াই রাষ্ট্র তাহার ভিত্তিপ্রস্তর রচনা করে। লিণ্ডসে (Lindsay) যথার্থ ই বলিয়াছেন: 'অধিকাংশ আইনই প্রয়োগ করা সম্ভব, কারণ অধিকাংশ লোকই তাহা চালু রাখিতে ইচ্ছুক......

14. "Force always disrupts, unless it is made subservient to common will."—Mac Iver.

কিন্তু অধিকাংশ লোকের সাধারণতঃ মান্য করা এবং সকল লোকের সর্বক্ষণ মান্য করা এক নয়। ইহার মধ্যে একটু ফাঁক থাকিয়া যায়। এই ফাঁকটুকু পুরনের জন্যই শক্তি প্রয়োগের প্রয়োজন দেখা দেয়।'[15]

৯॥ ঐতিহাসিক বা বিবর্তনমূলক মতবাদ (Historical of Evolutionary Theory):

ডঃ গার্ণার (Dr. Garner) বলিয়াছেন: "রাষ্ট্র ঈশ্বর সৃষ্ট বস্তু নয়, বা ইহা বলপ্রয়োগের ফলও নয়, সম্মেলন বা কোন গৃহীত 'প্রস্তাবের ভিত্তিতেও ইহার সৃষ্টি হয় নাই, পরিবারের সম্প্রসারণের ভিতর দিয়াও ইহার জন্ম হয় নাই।"[16] অর্থাৎ ঐশ্বরিক উৎপত্তিবাদ, বলপ্রয়োগ মতবাদ, পিতৃতান্ত্রিক-মাতৃতান্ত্রিক মতবাদ ও সামাজিক চুক্তি মতবাদ কোনটাই রাষ্ট্রের উৎপত্তির সঠিক কারণ নির্ণয় করিতে পারে নাই। দীর্ঘকালের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের পর্যালোচনা ও অনুশীলনের ভিতর দিয়া এই সত্য প্রকাশ পাইয়াছে যে, রাষ্ট্রের জন্মের কোন সরল সূত্র নাই। নানাবিধ জটিল উপাদানের মিশ্রণে, ক্রম বিকাশের পথে, বিবর্তনের ধাপে ধাপে তমসাচ্ছন্ন আদিম মানব জীবন আধুনিক রাষ্ট্রের রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। বার্জেস যথার্থই বলিয়াছেন রাষ্ট্র হইতেছে মানব সমাজের নিরবচ্ছিন্ন বিকাশের ফল[17]। বার্জেসের এই বক্তব্য সম্পর্কে মতদ্বৈধতা থাকিতে পারে, কিন্তু রাষ্ট্র যে মানব সমাজের বিবর্তনের ফল ইহা বিজ্ঞানসম্মত ভাবে গৃহীত হইয়াছে। প্রকৃতির কোলে জন্মলাভ করিয়া মানুষকে বাঁচিয়া থাকিবার জন্য প্রকৃতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে হইয়াছে, খাদ্য সংগ্রহ ও আত্মরক্ষার জন্য জীবন সংগ্রাম করিতে হইয়াছে, জৈবিক প্রেরণায় বংশ বৃদ্ধি করিতে হইয়াছে। এই নিরবচ্ছিন্ন বিবর্তনের মধ্য দিয়াই সভ্য রাষ্ট্রনৈতিক জীবনের

---

15. Most laws......will work and can be enforced because most people want usually to keep them...... there must be force because there are rules which have little value unless everyone keeps them and force is needed to fill up the gap between most people usually and all people always obeying."
—A. D. Lindsay.

16. "The state is neither the handiwork of God, nor the result of superior physical force, nor the creation of resolution or convention, nor a mere expansion of the family."
—Garner

17. "The state is a continuous development of human society out of a grossly imperfect beginning through crude but improving forms of manifestation towards a perfect and universal organisation of mankind." —Burgess.

প্রতিষ্ঠা। এই নিরবচ্ছিন্ন বিকাশ তথা বিবর্তনের ভিতর দিয়া রাষ্ট্র সৃষ্টির বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা উপস্থিত করিয়াছে ঐতিহাসিক মতবাদ বা বিবর্তনবাদ। নৃতত্ত্ব, সমাজবিজ্ঞান, ভাষা, বিজ্ঞান, প্রত্নতত্ত্ব ও ইতিহাসের গবেষণার ফলে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা রাষ্ট্রের উৎপত্তির বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা হিসাবে এই মতবাদকে গ্রহণ করিয়াছেন।

ঐতিহাসিক মতবাদ বা বিবর্তনবাদ রাষ্ট্রকে মানব সমাজের ক্রমপ্রগতির ফলশ্রুতি হিসাবে ব্যাখ্যা করিয়াছে। আদিম যুগ হইতে শুরু করিয়া এক বিরামহীন বিবর্তনের মধ্য দিয়া রাষ্ট্র ধীরে ধীরে বর্তমানস্বরূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। বহুবিধ উপাদানের জটিল মিশ্রণে, বিভিন্ন ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়া সমাজ জীবনের আদিম অবস্থা হইতে রাষ্ট্র ক্রমে ক্রমে বর্তমান অবস্থায় উপনীত হইয়াছে। কিন্তু ইহার অর্থ এই নয় যে, মানুষের সচেতন ইচ্ছা ও কার্য প্রণালীর ভিতর দিয়া এই বিবর্তন কার্যকারী হইয়াছে। মানুষের প্রয়োজনের তাগিদে, তাহার অজ্ঞাতে সমাজ জীবনে নানা রূপান্তর ঘটিয়াছে এবং সেই রূপান্তরের ভিতর দিয়াই আধুনিক রাষ্ট্রের আবির্ভাব। নিম্নলিখিত উপাদানগুলির সমাজ জীবনের এই রূপান্তর ও বিবর্তনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রহিয়াছে।

(ক) রক্তের সম্পর্কবোধ (Kinship)
(খ) ধর্মের বন্ধন (Religion)
(গ) অর্থনৈতিক প্রয়োজন (Economic need)
(ঘ) আত্মরক্ষার তাগিদ, শক্তির সংগঠন ও ব্যবহার (Force)
(ঙ) রাষ্ট্রনৈতিক চেতনা (Political consiousness)

(ক) রক্তের সম্পর্কবোধ (Kinship): মানুষ সমাজবদ্ধ জীব। মানুষের এই সামাজিক জীবন যাপনের প্রকৃতির মধ্যেই রাষ্ট্র গঠনের বীজ নিহিত ছিল বলিয়া বিবর্তনমূলক মতবাদ বিশ্বাস করে। আর এই সমাজবদ্ধ জীবন যাপনের সবচেয়ে বড় যোগসূত্র ছিল রক্তের সম্পর্ক বা পারিবারিক সংগঠন। মনুষ্য প্রকৃতি ও জৈবিক প্রেরণার দ্বারা পুরুষ ও নারী মিলিত হইয়া বংশ সৃষ্টি করে। সন্তানের জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই তাহাকে বাঁচাইয়া বড় করিবার প্রয়োজন দেখা দেয়। এই দায়িত্ব প্রধানত আসিয়া পড়ে নারীর উপর। কিন্তু শুধুমাত্র এই দায়িত্ব পালনই যথেষ্ট নয়, জীবন সংগঠিত করিবার জন্য নিয়ম ও শৃঙ্খলার প্রয়োজন দেখা দিল। বংশ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সন্তান

লালন-পালনের ভিতর দিয়া একটা নৈকট্যবোধ জাগ্রত হইল। পরিবারস্থ সকলে একই পুরুষ হইতে উদ্ভূত এই বোধ নৈকট্যকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিল। দত্তক পুত্র গ্রহণের নিয়ম প্রাচীন সমাজে প্রচলিত ছিল বলিয়া কোথাও কোথাও রক্তের সম্পর্কের ধারণা ছিল একান্তই কৃত্রিম। যাহাই হউক এইভাবে রক্তের সম্পর্কের বন্ধন মানুষকে পরিবার গঠন করিয়া একত্র বাস করিতে এবং নিয়ম শৃঙ্খলা রক্ষা করিয়া সন্তান-সন্ততি প্রতিপালনে উৎসাহিত করিয়াছিল। বংশ বৃদ্ধির ফলে পরিবার যখন সম্প্রসারিত হইয়াছে তখনই তাহা হইতে সৃষ্টি হইয়াছে গোষ্ঠী (clan), উপজাতি (Tribe) ও জাতি (Nation)। কারণ, পরিবারের সংখ্যা যখন বৃদ্ধি পাইল তখন আর গৃহকর্তার পক্ষে বিরাট পরিবারের উপর অখণ্ড কর্তৃত্ব বা শাসন বজায় রাখা সম্ভবপর হইল না। স্বভাবতই পরিবার তাই গোষ্ঠী উপজাতিতে বিভক্ত হইয়া পড়িল। কিন্তু এই বিভক্ত গোষ্ঠী ও উপজাতির মধ্যে রক্তের সম্পর্ক অবিচ্ছিন্ন রহিল। এইভাবে রাষ্ট্রের সম্পর্ক মানুষের ভিতর ব্যাপক নৈকট্য স্থাপন করিয়া রাষ্ট্র স্থাপনের একটি মূল্যবান উপাদান সৃষ্টি করিল। রক্তের বন্ধনের ভিত্তিতে গঠিত গোষ্ঠী এবং তাহা হইতে রাষ্ট্র সৃষ্টি সম্পর্কে ম্যাক আইভার (Mac Iver) সুন্দরভাবে বলিয়াছেন : পূর্ব পুরুষগণের মধ্যে রক্তের সম্পর্ক ধীরে ধীরে ব্যাপক সামাজিক ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে রূপান্তরিত হইল। পারিবারিক কর্তৃত্ব গোষ্ঠীপতির কর্তৃত্বে পরিণত হইল। এইভাবে সৃষ্টি হইল রাষ্ট্র—প্রথমে সৃষ্টি হইল সমাজ এবং সমাজ পরে সৃষ্টি করিল রাষ্ট্র।

রক্তের সম্পর্ক ভিত্তিক পরস্পরবিরোধী দুইটি মতবাদ দেখিতে পাওয়া যায়। মতবাদ দুইটি হইল পিতৃতান্ত্রিক (Patriarchy) ও মাতৃতান্ত্রিক (Matriarchy) সমাজব্যবস্থা। এই সম্পর্কে আমরা পরে আলোচনা করিব।

(খ) ধর্মের বন্ধন (Religion): রাষ্ট্রের বন্ধনের মত ধর্মের বন্ধনও রাষ্ট্রের বিবর্তনের অনুকূলে আবহাওয়া সৃষ্টি করায় রাষ্ট্র সৃষ্টির একটি মূল্যবান উপাদান হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে। বিশেষ করিয়া জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে রাষ্ট্রের বন্ধন যখন শিথিল হইল, ধর্মীয় বন্ধনই তখন মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করিতে বিশেষ সাহায্য করিয়াছিল। উইলসনের (Wilson) ভাষায় বলা যায় 'ধর্ম ছিল রাষ্ট্রের বন্ধনের চিহ্ন ও প্রতীক। ইহা ঐক্য, পবিত্রতা ও

কৃতজ্ঞতার প্রকাশ'[18]। আদিম সমাজে পরিবার সম্প্রসারণের ফলে ইহারা গোষ্ঠীতে বিভক্ত হওয়ায় উহাদের মধ্যে ধর্মই ঐক্য স্থাপনে সাহায্য করে। প্রাচীনকালে প্রকৃতিপূজা ও পূর্বপুরুষদের পূজার্চাদির মাধ্যমে ধর্মরূপ পরিগ্রহ করিয়াছিল। যাহারা একই পুরুষ হইতে উদ্ভূত মনে করিত, তাহারা একত্রিত হইয়া সময় সময় পূর্বপুরুষদের উদ্দেশ্যে পিণ্ডাদি প্রদান করিত। ইহাতে গোষ্ঠীজীবনে ঐক্য বৃদ্ধি পাইল। ইহা ছাড়া ঝড়, জল. বজ্রপাত, ভূমিকম্প প্রভৃতি বিপর্যয়কে প্রাচীনকালে লোকে খুব ভয় করিত। এক শ্রেণীর ঐন্দ্রিজালিক (Magician) অতি প্রাকৃতিক শক্তির সাহায্যে ইহাদের শান্ত করিতে পারে বলিয়া দাবী করিত। অজ্ঞ ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানুষ কিছুটা ভয়ে, কিছুটা শ্রদ্ধায় তাহাদের আদেশ মানিত। এইরূপে কোন কোন স্থানে তাহারা রাজশক্তি পর্যন্ত পরিচালনা করিতে লাগিল। কোথাও বা একই ধর্মমন্দিরে একই উপাসনায় বত লোকদের ভিতর ঐক্য দেখা গেল। এইরূপে ধর্মসংস্কার মানুষের সমষ্টিগত বন্ধন ও ঐক্য বৃদ্ধি করিয়া তাহাকে আজ্ঞানুবর্তী হইতে শিখাইল। গেটেল (Gettell) যথার্থই বলিয়াছেন যে. রাজনৈতিক ক্রম বিকাশের আদিমতম ও সর্বাপেক্ষা সংকটময় যুগে একমাত্র ধর্মই বর্বরতম অরাজকতাকে দমন করিয়া মানুষকে শ্রদ্ধার মনোভাব ও আনুগত্য শিখাইয়াছিল[19]। কিছুদিন আগেও মানুষের জীবনে ধর্মের প্রভাব ছিল ব্যাপক। সুতরাং বুঝিতে কষ্ট হয় না যে রাষ্ট্র গঠনের প্রাথমিক যুগে যখন যুক্তিহীন মানুষের নিকট ধর্ম সর্বগ্রাসী ছিল, তখন এই ধর্ম মানুষের ঐক্যবদ্ধ জীবনযাপনের ক্ষেত্রে কী বিরাট অবদান সৃষ্টি করিয়াছিল।

(গ) অর্থনৈতিক প্রয়োজন (Economic need): সর্বপ্রকার প্রতিকূল শক্তির সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া বাঁচিয়া থাকা মানুষের স্বাভাবিক ধর্ম। কিন্তু এই বাঁচিবার জন্য আহার্য হইতে শুরু করিয়া নানাবিধ বস্তুর প্রয়োজন। এই সমস্ত বস্তু মানুষের পক্ষে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় সংগ্রহ করা সম্ভবপর নয়, তাই যৌথবদ্ধভাবে কোন এক বা একাধিক নায়কের নেতৃত্বে তাহারা ইহা সংগ্রহের চেষ্টা করিত। ইহার জন্য প্রয়োজন নায়কের প্রতি বশ্যতা, শৃঙ্খলা রক্ষা ও তাহার

18. "Religion was the seal and sign of common blood, the expression of oneness, its sanctity, its obligations."—Wilson.

19. "In the earliest and most difficult periods of political development religion alone could subordinate barbaric anarchy and teach reverence and obedience."—Gettell.

নির্দেশ পালন করা। এইরূপ আহার্য ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় বস্তু সংগ্রহের অর্থ নৈতিক কারণ হইতেই প্রাথমিক পর্যায়ের অর্থ নৈতিক ব্যবস্থা গড়িয়া উঠে। এই অর্থ নৈতিক ব্যবস্থার আরও উন্নত ও বিবর্তিত রূপের ভিতর দিয়াই রাষ্ট্র গঠিত হয়। কারণ অর্থ নৈতিক প্রয়োজনের একটা বিশেষ স্তরে সম্পত্তি অর্জন ও সঞ্চয়ের প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। ইহার সঙ্গে পণ্য বিনিময়, সম্পত্তির মালিকানা রক্ষা, ধনবৈষম্য প্রভৃতি জটিল পদ্ধতি ও সমস্যার সূত্রপাত ঘটিল। একদিকে আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে শান্তি রক্ষার জন্য আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষা, অপর দিকে বহিঃশত্রুর আক্রমণ হইতে দেশকে রক্ষার জন্য বলিষ্ঠ সংগঠন করা একান্ত প্রয়োজনীয় হইয়া দেখা দিল। শ্রমবিভাগ হইতে উদ্ভূত বিভিন্ন শ্রেণীর পারস্পরিক স্বার্থ সংঘাত হইতে রাষ্ট্রকে রক্ষা করিবার জন্য আইন প্রণয়ন ও শাসনযন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইল। এইভাবে অর্থ নৈতিক প্রয়োজনের তাগিদ হইতে ক্রমবিকাশের পথে রাষ্ট্র আত্মপ্রকাশ করিয়াছে।

(ঘ) আত্মরক্ষার তাগিদ, শক্তির সংগঠন ও ব্যবহার (Force) : সমাজবিবর্তনের প্রথম হইতেই আত্মরক্ষার তাগিদে শক্তির সংগঠন ও উহার প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। আদিম যুগে মানুষকে শক্তির সাহায্যে শিকার করিয়া আহার্য সংগ্রহ করিতে দেখা গিয়াছে, আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইয়া আত্মরক্ষার জন্য বলপ্রয়োগ করিতে দেখা গিয়াছে, গোষ্ঠীপতির নির্দেশকে কার্যে পরিণত করিবার জন্যও বলপ্রয়োগ করিতে হইয়াছে। ইহা ছাড়া অন্য গোষ্ঠী বা রাষ্ট্রের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার জন্য মানুষকে শক্তির আশ্রয় লইয়া যুদ্ধবিগ্রহে অংশ গ্রহণ করিতে হইয়াছে। আত্ম রক্ষার তাগিদে এবং বাঁচার সংগ্রামে এই শক্তি প্রয়োগ গোষ্ঠীপতি বা উপজাতির নেতার নির্দেশেই পরিচালিত হইত বলিয়া এই সমস্ত নেতাদের ক্ষমতা পরিব্যাপ্তি লাভ করে এবং নেতৃত্বাধীন সমাজের উদ্ভব হয়। এই প্রসঙ্গে প্রচলিত বক্তব্য "যুদ্ধের মধ্য দিয়া রাজার সৃষ্টি" (War begot the King) স্মরণ করা যাইতে পারে। সুতরাং রাষ্ট্রগঠনের ক্ষেত্রে শক্তি ব্যবহারের যথেষ্ট গুরুত্ব রহিয়াছে এবং তাই ইহা একটি উল্লেখযোগ্য অবদান হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে।

(ঙ) রাষ্ট্রনৈতিক চেতনা (Political Consciousness) : রাষ্ট্রনৈতিক চেতনা বলিতে এমন একটি ধারণা বোঝায় যাহার দ্বারা মানুষ তাহাদের নিজেদের সর্বজনীন স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য রাজনৈতিক বোধ দ্বারা

উদ্বুদ্ধ হইয়া রাজনৈতিক সংগঠন প্রতিষ্ঠা করিতে অগ্রসর হয়। প্রাক্ সামাজিক যুগের প্রাথমিক স্তরে মানুষের ভিতর এই চেতনা জাগ্রত হয় নাই, কিন্তু জীবনে জটিলতা বৃদ্ধি এবং সম্পত্তির উদ্ভবের সঙ্গে সঙ্গে এই চেতনা ক্রমশ দেখা দিতে আরম্ভ করে। রাষ্ট্র সেই উপলব্ধিরই পরিণতি। জীবন ধারনের প্রয়োজনের তাগিদে মানুষের ভিতরে প্রথমে যে চেতনা দেখা দেয় রাষ্ট্রের ভিতর দিয়াই কালক্রমে উহা বাস্তব রূপ লাভ করে। তাই রাষ্ট্র গঠনের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রনৈতিক চেতনার মূল্য অপরিসীম।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, রাষ্ট্র কোন একদিনে আকস্মিক ভাবে জন্মলাভ করে নাই। ইহার পিছনে রহিয়াছে যুগ যুগান্তরের বিবর্তন। রক্তের বন্ধন, ধর্মের বন্ধন, অর্থ নৈতিক প্রয়োজন, আত্মরক্ষার তাগিদে শক্তির সংগঠন, রাষ্ট্রনৈতিক চেতনা প্রভৃতি উপাদানের সমবায়ে অত্যন্ত অস্পষ্ট আকার হইতে ক্রমশ বিকশিত হইয়া রাষ্ট্র বর্তমান রূপ লাভ করিয়াছে।

মূল্যায়ন : বিবর্তনমূলক বা ঐতিহাসিক মতবাদকে রাষ্ট্র সৃষ্টির একমাত্র গ্রহণযোগ্য তত্ত্ব হিসাবে গ্রহণ করা যায়। এই মতবাদ কোনপ্রকার কাল্পনিক ধ্যান ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। বাস্তবকে ভিত্তি করিয়া বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে রাষ্ট্রের উৎপত্তির ব্যাখ্যা এই মতবাদেই দেখিতে পাওয়া যায়। সমাজবিজ্ঞানও স্বীকার করে যে, সমাজ-বিবর্তনের এক বিশেষ স্তরে রাষ্ট্র জন্মলাভ করিয়াছে। পূর্ববর্তী মতবাদগুলি শুধুমাত্র রাষ্ট্র সৃষ্টির এক একটি উপাদানকে গ্রহণ করিয়াছে এবং অন্যান্য উপাদানকে অস্বীকার করিয়াছে। তাই ইহারা রাষ্ট্র সৃষ্টির প্রকৃত কারণ ব্যাখ্যা করিতে পারে নাই। যেমন ধর্মের সম্পর্কেই একমাত্র উপাদান মনে করিয়া 'ঐশ্বরিক মতবাদে'র সৃষ্টি হইয়াছে, শক্তির সংগঠন ও ব্যবহারকেই একমাত্র প্রাধান্য দিয়া 'বলপ্রয়োগ মতবাদে'র আবির্ভাব ঘটিয়াছে, শুধুমাত্র অর্থ নৈতিক প্রয়োজন এবং রাষ্ট্রনৈতিক চেতনাকে গ্রহণ করিয়া 'সামাজিক চুক্তি মতবাদের' উদ্ভব হইয়াছে এবং একমাত্র রক্তের সম্পর্কের উপর গুরুত্ব দিয়া পিতৃতান্ত্রিক মাতৃতান্ত্রিক মতবাদের সৃষ্টি হইয়াছে। বিবর্তনবাদী মতবাদই কেবলমাত্র রাষ্ট্র সৃষ্টির পশ্চাতে যে সমস্ত উপাদান আছে তাহাদের উপর যথাযোগ্য গুরুত্ব আরোপ করিয়া বিজ্ঞান, যুক্তি ও ইতিহাস সম্মত বক্তব্য উপস্থিত করিয়াছে। তাই সমস্ত দিক হইতে বিচার করিয়া এই বিবর্তনবাদী তত্ত্বকে অভ্রান্ত বলিয়া গ্রহণ করা যায়।

১০ ॥ পিতৃতান্ত্রিক মাতৃতান্ত্রিক মতবাদ (Patriarchal Matriarchal theory)

এই মতবাদও স্বীকার করে বিবর্তনের মধ্য দিয়াই রাষ্ট্রের উৎপত্তি হইয়াছে। বিবর্তনের প্রাথমিক সূত্রে পরিবারের সৃষ্টি হয় এবং পরিবারের সম্প্রসারণের ফলেই রাষ্ট্রের উৎপত্তি হয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্য সময় হইতেই পণ্ডিতগণের মধ্যে এই মতবাদ দানা বাধিয়া উঠিতে থাকে যে, পিতা, মাতা, ভাই, বোন এইগুলি শুধুমাত্র কতকগুলি উপাধি নয়, ইহাদের মধ্য নির্দিষ্ট সম্পর্ক ও পারস্পরিক দায়-দায়িত্ব জড়াইয়া আছে বলিয়াই ইহারা এক একটি একক (unit) এবং পারিবারিক বন্ধনে আবদ্ধ। পরিবার একটি সক্রিয় ব্যাপার—কখনই অচল নয়। সমাজ যেমন নিম্নতর হইতে উচ্চতর পর্যায়ে উপনীত হয়, পরিবারও তেমনি নিম্নতর হইতে পরিবর্তন ও সম্প্রসারণের ফলে উচ্চতর পর্যায়ে উপনীত হয় এবং জন্মলাভ করে রাষ্ট্র নামক রাষ্ট্রনৈতিক সংস্থা।

কিন্তু রাষ্ট্র গঠনের প্রাথমিক সূত্রের এই পরিবারের প্রকৃতি ও চরিত্র লইয়া সমাজবিজ্ঞানীরা ঐক্যমত নহেন। রাষ্ট্র সৃষ্টির প্রাথমিক সূত্র হিসাবে পরিবারকে স্বীকার করিলেও প্রাগৈতিহাসিক যুগের সেই পরিবার পিতৃতান্ত্রিক ছিল অথবা মাতৃতান্ত্রিক ছিল সেই বিষয়ে তাঁহাদের মধ্যে বিতর্কের অবকাশ আছে। কেহ কেহ মনে করেন যে প্রাক্ রাষ্ট্রীয় যুগের পরিবার পুরুষজাতির নেতৃত্বেই পরিচালিত হইত এবং ইহাদের বক্তব্য পিতৃতান্ত্রিক মতবাদ হিসাবে পরিচিত। অপরপক্ষে যাঁহারা মনে করিতেন যে নারীজাতির নেতৃত্বেই পরিবার গঠিত ছিল, তাঁহাদের অভিমত মাতৃতান্ত্রিক মতবাদ বলিয়া অভিহিত করা হয়। আমরা মতবাদ দুইটি স্বতন্ত্রভাবে আলোচনা করিতেছি।

পিতৃতান্ত্রিক মতবাদ : পিতৃতান্ত্রিক মতবাদের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী সমর্থক ছিলেন হেনরী মেইন (Henry Maine)। ১৮৬১ ও ১৮৭৪ সালে প্রকাশিত তাঁহার যথাক্রমে Ancient Law এবং Early History of Institutions নামক পুস্তক দুইখানির মধ্য দিয়া প্রাচীন সমাজ জীবনের বর্ণনা, বিশ্লেষণ ও তথ্য পরিবেশনার দ্বারা তিনি এই মতবাদ প্রতিষ্ঠা করেন।

এই মতবাদের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হইল পিতার কর্তৃত্বভিত্তিক পরিবারই রাষ্ট্র সৃষ্টির প্রথম সোপান এবং এই পরিবারের বৃদ্ধি ও সম্প্রসারণের মধ্য দিয়া রাষ্ট্র সৃষ্টি হইয়াছে। স্বামী, স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি লইয়া যে পরিবার গঠিত হয়, সেই পরিবারের সর্বময় কর্তা হইলেন সেই পরিবার বয়োজ্যেষ্ঠ পুরুষ এবং

পরিবারস্থ সকলের উপর তাহার সর্বময় কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত থাকে, তিনিই পরিবারের দণ্ড-মুণ্ডের কর্তা[20]। জৈবিক প্রেরণায় বংশবৃদ্ধির ফলে ক্রমে পরিবার ভাঙে এবং গড়িয়া উঠে অন্যান্য পরিবার। নতুন পরিবারগুলির উপরই পুরানো বয়োজ্যেষ্ঠ পরিবার-কর্তার কর্তৃত্ব অক্ষুণ্ণ থাকে। এমনি করিয়াই পরিবারগুলিকে লইয়া গঠিত হয় গোষ্ঠী (clan) ও উপজাতি (Tribe)। এইভাবে বিবর্তনধারার একটি সূত্রে এই সমস্ত গোষ্ঠী ও উপজাতি মিলিয়া মিশিয়া গড়িয়া তোলে রাজার কর্তৃত্বাধীন রাষ্ট্র। সুতরাং এই মতবাদ তিনটি মূল শর্তের উপর প্রতিষ্ঠিত :

(১) রক্তের সম্পর্কের ভিত্তিতে গঠিত পরিবারই রাষ্ট্রের প্রাথমিক সূত্র।

(২) এই পরিবারের কর্তৃত্ব ছিল বয়োজ্যেষ্ঠ পুরুষের হস্তে ন্যস্ত।

(৩) বিবাহবন্ধন ও বংশবৃদ্ধির ফলে পরিবারের সম্প্রসারণের মধ্য দিয়া রাষ্ট্র সৃষ্টি হইয়াছে।

এই মতবাদের সমর্থকগণ তাঁহাদের মতবাদের সমর্থনে বাইবেল, প্রাচীন ইহুদী, গ্রীস ও রোমের ইতিহাস ও ভারতীয় যৌথ পরিবারের নিদর্শন উপস্থিত করিয়াছেন এবং বিভিন্ন তত্ত্ব ও ঐতিহাসিক তথ্যের দ্বারা দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন যে প্রাচীনকাল হইতেই পারিবারিক ক্ষেত্রে পুরুষ জাতির প্রাধান্যই প্রতিষ্ঠিত ছিল।

মর্গ্যান (Morgan), ম্যাকলেনান (Mclenan), জেঙ্কস (Jenks) প্রভৃতি পণ্ডিতগণ এই মতবাদকে তীব্রভাবে সমালোচনা করিয়াছেন। জীব জগতে স্ত্রী জীবজন্তু ও পাখীর প্রাধান্য বিশ্লেষণ করিয়া তাহারা দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন আদিম মানুষের জীবনেও ইহারই প্রতিফলন ঘটিয়াছিল। ইহা ছাড়াও তাঁহারা মনে করেন যে আদিম সমাজে সুদৃঢ় বিবাহবন্ধন ছিল না বলিয়া এবং এক নারীর বহুপতি প্রথা প্রচলিত থাকিবার জন্য নবজাত সন্তানের পিতৃত্ব নির্ণয় সম্ভবপর ছিল না বলিয়া মাতার সাহায্যেই পরিচয় নির্ধারণ করা হইত এবং স্বাভাবিক কারণেই মাতৃকেন্দ্রীক পরিবারই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

20. "The elementary group is the family connected by common subjection to the highest male ascendent...The eldest male parent—the eldest ascendent is absolutely supreme in his household. His dominion extends to life and death and is as unqualified over his children and their houses as over his slaves." —Henry Maine

মাতৃতান্ত্রিক মতবাদ : মর্গ্যান প্রভৃতি সমাজবিজ্ঞানীরা পিতৃতান্ত্রিক মদবাদকে বিরোধিতা করিয়া মাতৃতান্ত্রিক সমাজের বক্তব্য তুলিয়া ধরিলেন। অষ্ট্রেলিয়া, আমেরিকা প্রভৃতি স্থানের প্রাচীনতম অধিবাসীদের জীবন বিশ্লেষণ করিয়া তাঁহারা দেখান যে আদিতে মাতৃকেন্দ্রীক সমাজ ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। অর্থাৎ পরিবারের উপর নারীজাতির অখণ্ড কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত ছিল। এই মাতৃতান্ত্রিক পরিবারই সম্প্রসারিত হইয়া পরবর্তীকালে রাষ্ট্রের রূপ পরিগ্রহ করে। মাতৃতান্ত্রিক মতবাদটি নিম্নলিখিত যুক্তির উপর নির্ভরশীল :

১। আদিম সমাজের নারী ইন্দ্রজালিক (Black Art) শক্তির চর্চা করিয়া উহাদের আয়ত্ত করিয়াছিল বলিয়া এবং নারী জন্ম দিয়া নতুন প্রাণের সৃষ্টি করিতে পারে বলিয়া কার্য-কারণ জ্ঞানহীন আদিম মানুষ ভয় ও ভক্তিতে নারীকে প্রাধান্য দিয়াছিল।

২। জীবজগতে নারী পশুপাখীর প্রাধান্য বেশি। মানুষ অনুকরণ প্রিয় জীব বলিয়া আদিম মানুষের জীবনে নারীর প্রাধান্য ঘটিয়াছিল।

৩। আদিকালে বিবাহ প্রথা ছিল সাময়িক ও ক্ষণভঙ্গুর। নারীর বহুপতি গ্রহণ ছিল স্বাভাবিক ঘটনা। সুতরাং পরিবারে শিশুর পিতার নিশ্চিয়তা নাই, কিন্তু মাতা নিশ্চিত। তাই মায়ের দিক হইতে বংশ ঠিক করা হইত এবং এর ফলে নারী জাতি পরিবারের উপর প্রাধান্য বিস্তার করেন।

মাতৃতান্ত্রিক মতবাদে বিশ্বাসী পণ্ডিতগণের মতে সম্পদ সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে নারীর পরিবর্তে পরিবারে পুরুষের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হইতে থাকে। ইহার ফলে পুরুষেরা গৃহস্থলীর কর্তৃত্বও দখল করে এবং ক্রমে নারীজাতি পদানত হইয়া পড়ে। পুরুষজাতির এই একছত্র শাসনের ফলেই পিতৃপ্রধান পরিবার পরবর্তীকালে সৃষ্ট হয়।

মাতৃতান্ত্রিক মতবাদের প্রবক্তাদের যুক্তি অনেক বেশি শক্তিশালী এবং প্রাচীনকালে প্রাথমিকস্তরে মাতার রক্তের দ্বারা যে সন্তানের সম্পর্ক নিরোপিত হইত সেই বিষয়ে মতবাদের বিশেষ কোন অবকাশ নাই। তবে এই প্রথা হয়তো খুব বেশি দিন চালু ছিল না কারণ ইহার স্বপক্ষে বিশেষ কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। সর্বোপরি বলা প্রয়োজন যে, পিতৃতান্ত্রিক-মাতৃতান্ত্রিক মতবাদ সমাজগঠন সম্পর্কে কতটা আলোকপাত করিয়াছে রাষ্ট্রের উৎপত্তির ব্যাপারে ততটা করিতে পারে নাই।

ষষ্ঠ অধ্যায়

রাষ্ট্রের প্রকৃতি সম্বন্ধে মতবাদ

(Theories of the nature of the State)

রাষ্ট্রের সঙ্গে ব্যক্তির পারস্পরিক সম্পর্কের পটভূমিকায় রাষ্ট্রের কাঠামো, চরিত্র এবং উহার প্রতি ব্যক্তির আনুগত্য প্রকাশের কারণ ও আনুগত্যের সীমারেখা লইয়া আলোচনা করা প্রয়োজন। এই সমস্ত আলোচনাকে রাষ্ট্রের প্রকৃতি সম্পর্কীয় আলোচনা বলিয়া অভিহিত করা যাইতে পারে। পূর্বে রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্পর্কে আলোচনা করিতে যাইয়া আমরা দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছি যে, ঐশ্বরিক উৎপত্তি তত্ত্ব, বলপ্রয়োগ মতবাদ এবং সামাজিক চুক্তি মতবাদ মূলত রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্পর্কীয় মতবাদ হইলেও, ইহারা রাষ্ট্রের প্রকৃতি সম্পর্কেও কিছুটা আলোকপাত করিয়াছে। বর্তমান পর্যায়ে একান্তভাবে রাষ্ট্রের প্রকৃতি লইয়া আলোচনা করিয়াছে এইরূপ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ মতবাদ লইয়া আমরা আলোচনা করিব।

১॥ জৈব মতবাদ (Organismic theory of the state):

রাষ্ট্রের প্রকৃতি বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে যে সমস্ত মতবাদ প্রচলিত জৈব মতবাদ তাহাদের অন্যতম। সামাজিক চুক্তির মতবাদ ও অন্যান্য যে সমস্ত মতবাদ কৃত্রিম উপায়ে রাষ্ট্রের উৎপত্তি ব্যাখ্যা করিয়াছে মূলত তাহাদের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া হিসাবে জৈব মতবাদ আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। রাষ্ট্রকে কৃত্রিম উপায়ে মনুষ্য সৃষ্ট একটি সংস্থা হিসাবে জৈব মতবাদ স্বীকার করে না—বরং ইহা রাষ্ট্রকে একটি প্রাণবন্ত সামাজিক জীব হিসাবে কল্পনা করিয়া থাকে।

জৈব মতবাদ অতি প্রাচীনকাল হইতে রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তার সঙ্গে জড়িত হইয়া আছে। গ্রীক্ দার্শনিক প্লেটো ও আরিস্টটল রাষ্ট্রকে মানব দেহের সহিত তুলনা করিয়াছেন। রোম্যান্ দার্শনিক সিসেরোর (Cicero) রচনায় জৈব মতবাদের আলোচনা দেখা যায়। হবস্ ও রুশো রাষ্ট্রের সঙ্গে জীব-দেহের সাদৃশ্য বর্ণনা করিয়াছেন। হবস্ তাঁহার 'লেভিয়াথান' বা অতিকায় জীবের সঙ্গে রাষ্ট্রের তুলনা করিয়াছেন। রুশোর মতে রাষ্ট্রের মস্তিষ্ক হইতেছে সরকার। তিনি রাষ্ট্রের দুর্বলতার সহিত মানবদেহের ব্যাধিকে তুলনা

করিয়াছেন। তবে মনে রাখা প্রয়োজন যে রুশোর সময় পর্যন্ত এই মতবাদ সুস্পষ্ট রূপ গ্রহণ করিতে পারে নাই। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম হইতেই রাষ্ট্র ও জীবদেহের অভিন্নতা প্রমাণের উদ্দেশ্যে কয়েকজন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী তাঁহাদের বক্তব্য উপস্থিত করেন এবং জৈব মতবাদটি পরিপূর্ণরূপ ধারণ করে। ইঁহাদের মধ্যে জার্মান দার্শনিক ব্লুনৎশ্লি (Bluntschli) এবং ইংরেজ দার্শনিক হারবার্ট স্পেনসারের (Herbert Spencer) নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বস্তুতপক্ষে ইঁহাদের হাতেই এই মতবাদটি চরমরূপ লাভ করিয়াছে।

এই মতবাদ অনুসরণ করিয়া বলা যায় যে প্রাণীদেহের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের নিজ নিজ কার্য পালনের দায়িত্ব থাকা সত্ত্বেও যেমন পরস্পরের প্রতিপূরক, তেমনি সমাজের অন্তর্গত ব্যক্তিদের স্বতন্ত্র ইচ্ছা ও কার্য থাকিলেও ইহারা সমাজের অবিচ্ছেদ্য অংশ।[1] এইরূপ জৈব মতবাদ রাষ্ট্রকে একটি জীবদেহের সঙ্গে তুলনা করিয়া উভয়ের মধ্যে কতকগুলি প্রকৃতিগত ও গঠনগত সাদৃশ্য প্রতিষ্ঠা করিবার চেষ্টা করিয়াছে। এই সাদৃশ্যমূলক যুক্তির ভিত্তিতে প্রমাণ করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে যে, রাষ্ট্রের একটি নিজস্ব সত্তা আছে—ইহা যন্ত্রবিশেষ নয়। জীবদেহের যেমন সামগ্রিকতা আছে, রাষ্ট্রেরও তেমনি সামগ্রিকতা আছে। এই তাই আর একটু অগ্রসর হইয়া এই মতবাদ রাষ্ট্রকে একটি প্রাণবন্ত জীব হিসাবে কল্পনা করিয়া থাকে। এই মতবাদকে বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে, জীবদেহের কয়েকটি লক্ষ্যণীয় বৈশিষ্ট্যকে রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিয়া বলা হইয়াছে: (ক) জীবদেহের মত বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সমন্বয়ে রাষ্ট্র গঠিত ; (খ) জীবদেহের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মত রাষ্ট্রের বিভিন্ন শাখা পরস্পরের পরিপূরক ও নির্ভরশীল ; (গ) জীবদেহের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের নিজ নিজ কাজ সম্পাদনের উপর যেমন জীবদেহের স্বাস্থ্য ও সজীবতা নির্ভর করে, তেমনি রাষ্ট্রের অধীনস্থ বিভাগগুলির সুষ্ঠু পরিচালনার উপর রাষ্ট্রের স্বাস্থ্য নির্ভরশীল ; (ঘ) জীবদেহের যেমন জন্ম, বৃদ্ধি, ক্ষয় ও মৃত্যু আছে, রাষ্ট্রেরও তেমনি জন্ম, বৃদ্ধি ও ক্ষয় আছে ; (ঙ) কোষের (Cell) সমবায়ে যেমন জীবদেহ গঠিত হয়, তেমনি রাষ্ট্রও বিভিন্ন ব্যক্তির সমবায়ে গঠিত হয়। তাই কোষের সঙ্গে জীবের যে সম্পর্ক ব্যক্তির সঙ্গে রাষ্ট্রেরও সেই সম্পর্ক।

1. "...........as the relation of the hand to the body, or the leaf to the tree, so is the relation of men to society." —Leacock.

এইভাবে সাদৃশ্যমূলক আলোচনার ভিত্তিতে প্রমাণ করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে যে, একমাত্র সমাজ বা রাষ্ট্রেরই একটি সামগ্রিক সত্তা আছে। ব্যক্তি হইল রাষ্ট্রের সেই সামগ্রিক সত্তার অঙ্গীভূত। সুতরাং ব্যক্তির কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই।

কোন কোন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী রাষ্ট্র ও জীবের ভিতরকার তুলনাকে চরম স্তরে উন্নীত করিয়া দাবী করিয়াছেন যে, রাষ্ট্র শুধুমাত্র প্রাণীদেহের সঙ্গে তুলনীয় নহে, রাষ্ট্র নিজেই একটি জীবন্ত প্রাণী (Living organism)। এই প্রকারের মতবাদের প্রবক্তা হইলেন ব্লুনৎস্লি, স্পেনসার প্রভৃতি দার্শনিকগণ। ব্লুনৎস্লি বলিলেন, রাষ্ট্র অন্যতম প্রাণবন্ত জীব, নিয়ম শৃঙ্খলার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। ইহা কৃত্রিম প্রতিষ্ঠান নহে।[2] তিনি রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে যৌন সম্পর্ক আরোপ করিতেও দ্বিধা করেন নাই। তাহার মতে রাষ্ট্র পুরুষ জীব ও চার্চ (Church) স্ত্রী জীব। ডারউইন (Darwin) প্রবর্তিত বিবর্তনবাদের তত্ত্বটি প্রয়োগ করিয়া স্পেনসার জৈব মতবাদকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। স্পেনসার ও সমাজ বিজ্ঞানী শাফ্‌ল্ (Albert shaffle) রাষ্ট্রের সঙ্গে জীবদেহের চূড়ান্তভাবে তুলনা করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা ব্লুনৎস্লির মত রাষ্ট্রকে পরিপূর্ণ জীবন্ত প্রাণী বলিয়া বর্ণনা করেন নাই। মূলত ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদকে প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যেই স্পেনসার অযৌক্তিকভাবে বিবর্তনবাদ তত্ত্বটির প্রয়োগ করিয়াছিলেন। কিন্তু এ বিষয়ে তিনি সফল হন নাই। স্পেনসারের মতে বাধ্যতামূলক শিক্ষাব্যবস্থা, জনকল্যাণমূলক আইন, শ্রমিক আইন, দুর্গতদের রাষ্ট্রীয় সাহায্য করার প্রচেষ্টা সম্পূর্ণ অপ্রয়োজনীয়। কারণ, বিবর্তনবাদ এই শিক্ষাই দেয় যে, জীবন সংগ্রামে যাহারা জয়ী হইবে একমাত্র তাহাদেরই বাঁচিয়া থাকার অধিকার। জৈব মতবাদের ক্ষেত্রে স্পেনসার বলিলেন যে জীবদেহ ও সমাজদেহ ক্ষুদ্র কোষ হইতে জীবন সুরু করিয়া পরবর্তীস্তরে আসিয়া পরিপূর্ণতা লাভ করে। তিনি জীব ও সমাজের গঠনগত ও কার্য্যাবলীর সাদৃশ্য বর্ণনা করিয়াছেন। রাষ্ট্র ও জীবদেহের মৌলিক সাদৃশ্য প্রতিষ্ঠা করা সত্ত্বেও স্পেনসারকে স্বীকার করিতে হইয়াছে যে, জীবদেহের গঠনের ক্ষেত্রে ইহার অংশগুলি অভিন্নভাবে (concrete) জড়িত, কিন্তু সমাজের ক্ষেত্রে ইহারা অভিন্নভাবে জড়িত নয় (discrete)।

2. "No mere artificial lifeless machine, (but) a living spiritual organic being."
—Bluntschli

সমালোচনা : জৈব মতবাদ যদি একথা প্রচার করিত যে, রাষ্ট্র শুধুমাত্র কতকগুলি বিচ্ছিন্ন ব্যক্তির সমাহার নয়, তাহাদের ভিতরকার সম্পর্ক গভীর ও মৌলিক, তবে হয়ত আপত্তির কারণ থাকিত না। কিন্তু এই মতবাদ যেভাবে রাষ্ট্র ও জীবদেহের ভিতরকার আপাত সাদৃশ্যের উপর নির্ভর করিয়া উভয়ের অভিন্নতা প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছে তাহা সমর্থন করা যায় না। সাদৃশ্যের ভিত্তিতে অভিন্নতা প্রমাণ করিতে হইলে সাদৃশ্য যে মৌলিক তাহা প্রমান্ করিতে হইবে, কতকগুলি বাহ্য সাদৃশ্য দেখিয়া একের চরিত্র অন্যতে আরোপ করা যায় না। ইহাদের ভিতর সাদৃশ্য যেমন আছে তেমনি যথেষ্ট পরিমানে মৌলিক পার্থক্যও রহিয়াছে। দ্বিতীয়ত, জীবদেহ ও রাষ্ট্রের ভিতরকার তুলনা খুব একটা যুক্তিগ্রাহ্য নহে। কারণ জীবদেহের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের স্বতন্ত্র কোন ইচ্ছা থাকিতে পারে না, কিন্তু রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিসমষ্টির ইচ্ছার সমন্বয়েই রাষ্ট্রীয়নীতি নির্ধারিত হয়। তৃতীয়ত, জীবদেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কার্যাবলী সম্পূর্ণভাবে জীবদেহের মধ্যেই সীমাবদ্ধ, কিন্তু রাষ্ট্রের অধীনস্থ ব্যক্তির কার্যাবলী রাষ্ট্রের মধ্যেই সীমাবদ্ধ বা নিঃশেষিত নয়, ইহা রাষ্ট্রদেহের বাহিরেও পরিব্যপ্ত। চতুর্থত, প্রাণীদেহের চেতনশক্তি একমাত্র মস্তিষ্কে কেন্দ্রীভূত, কিন্তু রাষ্ট্রের চেতনশক্তি একস্থানে কেন্দ্রীভূত না হইয়া বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে প্রসার লাভ করিয়া থাকে। পঞ্চমত, জীবদেহের জন্ম জীবদেহ হইতেই একমাত্র সম্ভবপর এবং এই জীবদেহের মৃত্যু অনিবার্য। কিন্তু রাষ্ট্রের জন্ম সম্পর্কে এইরূপ কোন সিদ্ধান্ত করা চলে না। তাহা ছাড়া, রাষ্ট্রের মৃত্যু জীবদেহের মত অনিবার্যও নহে। সুতরাং জীবদেহের জন্ম মৃত্যু ও বিকাশের সঙ্গে রাষ্ট্রের জন্ম, মৃত্যু ও বিকাশের মৌলিক প্রভেদ রহিয়াছে। ষষ্ঠত, জীবদেহের কোন অংশকে উহা হইতে বিচ্ছিন্ন করিলে জীবদেহ জীবিত থাকিতে পারে না, কিন্তু কোন রাষ্ট্রের কিছু লোককে রাষ্ট্র হইতে বহিষ্কৃত করিলে রাষ্ট্র ধ্বংস প্রাপ্ত হয় না। উপরোক্ত আলোচনা দ্বার্থহীন ভাবে প্রমাণ করে যে জীবদেহের সঙ্গে রাষ্ট্রের তুলনা অচল। সর্বোপরি এই মতবাদ রাষ্ট্রকে জীবদেহের সঙ্গে তুলনা করিয়া ব্যক্তিকে সম্পূর্ণভাবে রাষ্ট্রের অংশে পরিনত করিয়াছে এবং উহার দ্বারা ব্যক্তির ইচ্ছা ও সত্তাকে বিসর্জন দেওয়া হইয়াছে। এইরূপ হইলে ব্যক্তি তাহার স্বাধীনতা হারাইতে বাধ্য। সুতরাং জৈব মতবাদ ব্যক্তি স্বাধীনতার পরিপন্থী। এই সমস্ত কারনে অধ্যাপক গেটেল বলিয়াছেন : "জৈব মতবাদ রাষ্ট্রের প্রকৃতির কোন সন্তোষজনক ব্যাখ্যা বা

রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্র সম্বন্ধে কোন নির্ভরযোগ্য নির্দেশ দিতে পারে না।"[৪] হবহাউসও (Hobhouse) মনে করেন যে, রাষ্ট্রকে প্রানীর সঙ্গে তুলনা করিবার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ নাই।

এই মতবাদের সমস্ত ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও স্বীকার করিতে হইবে যে, ইহার কিছুটা ঐতিহাসিক মূল্য রহিয়াছে। এই মতবাদ রাষ্ট্রের অন্তর্গত বিভিন্ন ব্যক্তির পারস্পরিক নির্ভরশীলতা প্রমান করিয়া রাষ্ট্রের ঐক্যের উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়াছে। দ্বিতীয়ত, এই মতবাদ ব্যক্তি ও সমাজের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কথা প্রচার করিয়াছে। ইহার ফলে রাষ্ট্রিক ও সামাজিক সহযোগিতার প্রয়োজনীয়তাকে গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে। তৃতীয়ত, এই মতবাদের সর্বাপেক্ষা বড় অবদান এই যে, রাষ্ট্রকে কৃত্রিম সংস্থা হিসাবে প্রমাণ করিবার যে প্রচেষ্টা সামাজিক চুক্তি প্রভৃতি মতবাদ করিয়াছিল, এই মতবাদ তাহার বিরুদ্ধে প্রচার করিয়াছে যে, রাষ্ট্র মনুষ্য সৃষ্ট কোন কৃত্রিম প্রতিষ্ঠান নহে—ইহা বিবর্তনের ভিতর দিয়া জন্ম লাভ করিয়াছে।

২ ॥ ভাববাদ (Idealistic theory of the state :

রাষ্ট্রের প্রকৃতি সম্বন্ধে ভাববাদ বা আদর্শবাদ আর একটি মতবাদ। বিভিন্ন দার্শনিক এই মতবাদকে নানা নামে অভিহিত করিয়াছেন। প্রসিদ্ধ জার্মান দার্শনিক হেগেলের (Hegel) ভাববাদ (Idealism) নাম হইতেই এই নামকরণটি বহুল প্রচার লাভ করিয়াছে। অনুসন্ধান করলে দেখা যাইবে যে, এই মতবাদটি অতি প্রাচীনকাল হইতেই প্রচলিত ছিল। গ্রীক্ দার্শনিক প্লেটো ও আরিষ্টটলের বক্তব্যের মধ্যে এই মতবাদের পরিচয় পাওয়া যায়। প্লেটোর 'রিপাবলিক' গ্রন্থে এই মতবাদের ভিত্তিতে আদর্শ রাষ্ট্রের কল্পনা দেখিতে পাওয়া যায়। প্লেটোর মতবাদকে সম্পূর্ণ সমর্থন না করিলেও আরিষ্টটল রাষ্ট্রের এই পরিণতির সমর্থক ছিলেন। জার্মান দার্শনিক কাণ্ট (Kant), ফিচে (Fichte) এবং হেগেলের হাতে এই মতবাদ চরম রূপ লাভ করে। যদিও অনেকে মনে করেন যে, কাণ্টই আদর্শবাদের জনক, কিন্তু বস্তুত পক্ষে হেগেলের রচনার মধ্য দিয়াই এই মতবাদ চূড়ান্ত পর্যায়ে উপনীত হয়। হেগেলের শিষ্য বার্নহার্ডি (Bernhardi) ট্রিট্‌সকের (Treitschke) এই মতবাদ

৪. The organismic theory is neither a satisfectory explanation of the nature of the state nor a trustworthy guide to state activity.—Gettell.

প্রচারের ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রহিয়াছে। ইংলণ্ডে আদর্শবাদী রাষ্ট্রদর্শনের উল্লেখযোগ্য সমর্থক ছিলেন গ্রীন্ (Green), ব্রাড্লে (Bradley) এবং বোসাঙ্কেত (Bosanquet)।

ব্যক্তির সঙ্গে সম্পর্কের পটভূমিকায় রাষ্ট্রকে বিচারের প্রচেষ্টা ভাববাদে লক্ষ্য করা যায়। ব্যক্তির সঙ্গে রাষ্ট্রের বিরোধ মূলত ব্যক্তি-স্বাধীনতা ও রাষ্ট্র-কর্তৃত্বের মধ্যকার বিরোধ। ব্যক্তি স্বাধীনতার সঙ্গে রাষ্ট্রকর্তৃত্বের বিরোধের নিষ্পত্তি করিয়া ভাববাদ ব্যক্তি ও রাষ্ট্রের পারস্পরিক সম্পর্কে নির্ণয় করিয়াছে।

ভাবাবাদের মূল বক্তব্য হইল, সমস্ত বাহ্যবস্তুর মূলে রহিয়াছে ভাব বা idea। কারণ একমাত্র ভাবেরই অস্তিত্ব আছে। এমনি কি যে সমস্ত বাহ্যবস্তু ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে অনুভূত হয় তাহাও ভাবের সমাহারে গঠিত। রাষ্ট্রও ভাবের আধার। এই রাষ্ট্রের মধ্যেই মানুষ তার জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ উদ্দেশ্য ও পূর্ণ পরিণতি লাভ করিতে পারে। রাষ্ট্র ছাড়া পরিপূর্ণ জীবন যাপন বা আত্মোপলব্ধি সম্ভব নয়। সুতরাং রাষ্ট্রের আদর্শই চরম ও চূড়ান্ত এবং সেই কারনেই ইহা অবশ্য পালনীয়। অধ্যাপক গার্নার (Garner) মনে করেন যে, ভাববাদ হইতে নূতন এক রাষ্ট্রনৈতিক দর্শনের আবির্ভাব ঘটিল যাহা রাষ্ট্রকে একটি আদর্শ সংস্থা হিসাবে দেখিল এবং ইহাতে দেবত্ব আরোপ করিয়া ইহার স্তবস্তুতি শুরু করিল।

জার্মান দার্শনিকগন বিশেষ করিয়া হেগেল এই আদর্শবাদকে যে ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিলেন তাহা রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তার জগতে প্রভূত আলোড়ন সৃষ্টি করিয়াছে। হেগেলের মতে রাষ্ট্র হইল "ঈশ্বরের বিশ্বে জয়যাত্রা" (God's march on earth)। সুতরাং রাষ্ট্রের আদেশ নিভু‌ল সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং ইহা অলঙ্ঘনীয়। হেগেল রাষ্ট্রকে মানব জীবনের চরম পরিণতি বলিয়া মনে করিতেন। তাঁহার মতে, উদ্দেশ্যে উপনীত হইবার উপায় বা পথ হিসাবে রাষ্ট্রকে দেখা উচিত নয়; কেননা রাষ্ট্র হইল মানব সভ্যতার চরম পরিণতি। এই মতবাদ ব্যক্তির কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব স্বীকার করে না, ব্যক্তিকে রাষ্ট্রের অংশ মাত্র বলিয়া মনে করে। এই ধারণার বশবর্তী হইয়া হেগেল রাষ্ট্রকে স্বাধীনতার উপলব্ধি হিসাবে কল্পনা করিয়াছেন এবং স্বাধীনতাকে রাষ্ট্রীয় যূপকাষ্ঠে বলি দিয়াছেন। আদর্শবাদীগন আরও মনে করিতেন যে, রাষ্ট্র একটি চেতনশীল ও মননশীল সংস্থা, তাই ইহার ইচ্ছাশক্তি আছে। রাষ্ট্রের এই ইচ্ছাকে হেগেল 'যুক্তিমূলক ইচ্ছা' (Rational will) এবং রুশো 'সমষ্টিগত ইচ্ছা' (General

will) নামে অভিহিত করিয়াছেন। লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে, রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে ঐশ্বরিক মতবাদের সঙ্গে রাষ্ট্রের প্রকৃতি বিষয়ক হেগেলের ভাববাদের কিছু পরিমান মিল রহিয়াছে।

হেগেলের ভাববাদ পরবর্তীকালে ট্রিট্সকে ও বার্নহার্ডি প্রভৃতির দ্বারা যুদ্ধবাদে পরিণত হয়। ইঁহারা রাষ্ট্রকে শক্তির প্রতীক হিসাবে মনে করিতেন এবং এই শক্তি প্রয়োগ করিয়া রাষ্ট্রের শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখিবার প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। ইংলণ্ডের ভাববাদী দার্শনিকেরা জার্মান আদর্শবাদকে সম্পূর্ণরূপে স্বীকার করেন নাই। ইঁহারা রাষ্ট্রকে শক্তির মূল উৎস মনে করিলেও রাষ্ট্রীয় যূপকাষ্ঠে ব্যক্তিস্বাধীনতা বিসর্জন দেওয়ার পরিপন্থী ছিলেন। তাই হেগেলের মূল বক্তব্য গ্রহণ করিয়াও গ্রীন ব্যক্তি স্বাধীনতা ও ব্যক্তিগত অধিকার রক্ষার উপর গুরুত্ব দিয়াছেন।

সমস্ত ভাববাদী দার্শনিকগণই মোটামুটিভাবে কয়েকটি ব্যাপার ঐক্যমত ছিলেন। ইঁহারা প্রত্যেকেই রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে নীতিশাস্ত্র বা নৈতিক দর্শনের অংশ হিসাবে দেখিয়াছিলেন। নীতিশাস্ত্রের মত মানব-জাতির নৈতিক উন্নতিকে ইহারা রাষ্ট্রবিজ্ঞানেরও চরম লক্ষ্য বলিয়া মনে করিতেন। স্বাভাবিক-ভাবেই তাই অধিকার (Rights), শাস্তিদান (Punishment), সম্পত্তি (Property), আনুগত্য (Obligation) প্রভৃতি রাষ্ট্রনৈতিক তত্ত্ব বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে এই সমস্ত ভাববাদী দার্শনিকেরা নীতিবোধের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হইয়াছিলেন। দ্বিতীয়ত, ভাববাদী দার্শনিকেরা ব্যক্তিমানসের গুণ ও মূল্যবোধের উপর অত্যধিক গুরুত্ব দিয়াছেন। কারণ তাঁহাদের মতে, ইহা না থাকিলে ব্যক্তি কখনই সর্বোচ্চ নৈতিক স্বাধীনতা (highest moral freedom) লাভ করিতে পারে না। তৃতীয়ত, ভাববাদীরা রাষ্ট্রের বাস্তব অবস্থাকে উপেক্ষা করিয়া আদর্শগত দিক হইতে রাষ্ট্রের যাহা হওয়া উচিত সেই পরিপ্রেক্ষিতে তাঁহাদের সমস্ত আলোচনা উপস্থিত করিয়াছেন।

সমালোচনা : শুধুমাত্র ভাব ও কল্পনার আশ্রয় লইয়া বস্তু ও বাস্তবকে বিসর্জন দিয়া ভাববাদীগণ যেভাবে রাষ্ট্রের প্রকৃতি ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করিয়াছেন তাহা তীব্র সমালোচনার সম্মুখীন হইয়াছে। এই মতবাদের অবাস্তবতার সমালোচনা করিয়া অধ্যাপক বার্কার মন্তব্য করিয়াছেন যে, ভাববাদীগণের পরিকল্পিত রাষ্ট্র হয়ত স্বর্গরাজ্যে সম্ভবপর হইতে পারে, কিন্তু

মাটির পৃথিবীতে তাহা অসম্ভব।[4] কারণ, ভাববাদ বাস্তবতা ও বাস্তব উপাদানকে অগ্রাহ্য করিয়া কেবলমাত্র কল্পনা ভিত্তিক অবাস্তব মতবাদ হিসাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। বস্তুবাদী দৃষ্টিকে পরিহার করিয়া ভাববাদ সমস্ত কিছুকে ভাবের সমাহার হিসাবে দেখিয়াছে বলিয়া ইহার বক্তব্য যুক্তিগ্রাহ্য হইয়া উঠিতে পারে নাই। দ্বিতীয়ত,ভাববাদ রাষ্ট্রও সমাজকে অভিন্ন হিসাবে কল্পনা করিয়াছে। কিন্তু রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্রের বাইরে যে বিরাট সক্রিয় সামাজিক কর্মকেন্দ্র আছে তাহাকে এই মতবাদ উপলব্ধি করিতে পারে নাই। অথচ এই সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলির অবদান ও ভূমিকা মানবজীবনে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তৃতীয়ত, পূর্বেই আলোচনা করা হইয়াছে যে, ভাববাদ রাষ্ট্রকে মানব জীবনের চরম পরিণতি হিসাবে মনে করিয়া ব্যক্তি স্বাধীনতাকে রাষ্ট্রীয় যূপকাষ্ঠে বলি দিয়াছে। হবহাউস যথার্থ ই বলিয়াছেন যে, ভাববাদ যাহাকে প্রকৃত স্বাধীনতা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছে তাহা প্রকৃতপক্ষে স্বাধীনতার অস্বীকার মাত্র। চতুর্থত, ভাববাদের চরম পরিণতিতে দেখা যায় যে, ইহা যুদ্ধের নৈতিক মূল্যের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করে। ইহার মারাত্মক ফল হিসাবে পৃথিবীতে এই মতবাদকে বিভিন্ন সময় যুদ্ধের পক্ষে কাজে লাগানো হইয়াছে। পঞ্চমত, ভাববাদীরা মনে করেন, রাষ্ট্র সর্বপ্রকার বিধিনিষেধের উর্দ্ধে। এই বক্তব্য আভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক উভয় ক্ষেত্রেই রাষ্ট্রীয় স্বৈরাচারের প্রশ্রয় দেয় এবং রাষ্ট্রকে একটি মানবীয় প্রতিষ্ঠানের পরিবর্তে ঐশ্বরিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে মনে করে।

পরিশেষে বলা যাইতে পারে যে, যদিও ভাববাদের বিভিন্ন দোষত্রুটি রহিয়াছে এবং মতবাদ হিসাবে ইহা গ্রহণযোগ্য নয়, তথাপি এই মতবাদের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য অবদান রহিয়াছে যাহা অস্বীকার করা যায় না। রাষ্ট্রের প্রতি ব্যক্তির আনুগত্যের প্রয়োজনীয়তা, রাষ্ট্রীয় একতা এবং ব্যষ্টিস্বার্থে ব্যক্তির আত্মত্যাগের আদর্শ প্রচারের ভিতর এই মতবাদের সামাজিক, রাষ্ট্রনৈতিক ও ঐতিহাসিক মূল্য নিহিত আছে।

৩॥ মার্কসীয় মতবাদ (Marxian theory):

আধুনিক রাষ্ট্রচিন্তার জগতে জার্মান দার্শনিক কার্লমার্কস (Karl Marx) এক অবিস্মরণীয় মনীষী। ইহার কারণ মার্কসীয় জীবন দর্শনের বৈজ্ঞানিক

4. "The state of which it conceives may be laid up in heaven, but it is not established on Earth." —Barker.

সত্যতা ও বস্তুবাদী আবেদন। বস্তুতঃপক্ষে মার্কসীয় জীবন দর্শন না বুঝিলে আধুনিক জগতের গতি ও প্রকৃতি উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। বর্তমান পৃথিবীর এক-তৃতীয়াংশমানুষ মার্কসীয় দর্শনের ভিত্তিতে সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। পৃথিবীর ইতিহাসে কার্লমার্কস ছাড়া অন্য কোন দার্শনিক রাষ্ট্রচিন্তার ক্ষেত্রে এতখানি আলোড়ন সৃষ্টি করিতে পারেন নাই। মার্কসের রাষ্ট্রচিন্তা প্রধানত তাঁহার ইতিহাস প্রসিদ্ধ গ্রন্থ Communist Manifesto (১৮৪৮) ও Das Capital (১৮৬৭) এ প্রকাশিত হইয়াছে। মার্কসীয় মতবাদকে ব্যাখ্যা ও পরিপূর্ণ রূপ দানের ব্যাপারে মার্কসের বন্ধু ও সহকর্মী এঙ্গেলস্ (Engels) ও লেনিনের (Lenin) নাম সবিবেশ উল্লেখযোগ্য।

সমাজবিজ্ঞানের প্রতিটি স্তরে মার্কসীয় দর্শনের গুরুত্বপূর্ণ অবদানের কথা বলিতে যাইয়া এঙ্গেলস্ বলিয়াছেন: "ডারউইন যেমন জীবজগতের বিবর্তন নীতি আবিষ্কার করিয়াছিলেন, মার্কস তেমনি মানব ইতিহাসের বিবর্তনের সূত্র আবিষ্কার করিয়াছেন। তিনি যাহা আবিষ্কার করিয়াছেন তাহা চিরন্তন সত্য।" এঙ্গেলসের এই বক্তব্যের ভিতর দিয়া মার্কসবাদের বৈজ্ঞানিক ভিত্তি এবং ইহার গুরুত্ব সঠিকভাবে প্রকাশ করা হইয়াছে।

মার্কসীয় দৃষ্টিতে রাষ্ট্রের সংজ্ঞা ও প্রকৃতি আলোচনা করিয়া লেনিন বলিলেন, "যাহাদের মিলনের সম্ভাবনা নাই এইরূপ পারস্পরিক বিরোধীস্বার্থ-সম্পন্ন শ্রেণীর প্রকাশ ঘটিয়াছে রাষ্ট্রে। রাষ্ট্র একান্তভাবেই শ্রেণীশাসনের প্রতীক এবং ইহা একটি শ্রেণী দ্বারা অন্য শ্রেণী শোষিত হইবার যন্ত্র বিশেষ।"[5] এঙ্গেলস বলিলেন যে, কোনও সমাজের বিভিন্ন প্রকার প্রতিষ্ঠান, আইনব্যবস্থা, কলা এমনকি ধর্মও সেই সমাজের সেই সময়কার প্রচলিত অর্থ নৈতিক ভিত্তির উপর গড়িয়া উঠে এবং তাহারই দ্বারা প্রভাবিত হয়।

মার্কসের রাষ্ট্রদর্শন বুঝিতে হইলে প্রথমেই তাঁহার ইতিহাসের অর্থ নৈতিক ব্যাখ্যা (Economic Interpretation of History) আলোচনা করা প্রয়োজন। ভাববাদী দার্শনিক হেগেল মনে করেন যে, ভাব (Idea), আদর্শ ও ধ্যানধারণার পরিবর্তনের জন্যই ইতিহাসের ধারা বদলায় ও সমাজ পরিবর্তিত হয়। হেগেল মানুষের জীবনে ঈশ্বরের চৈতন্যের লীলা দেখিয়াছেন

5. "The state is the product and manifestation of the irreconcilability of class antagonism. It is an organ of class rule, an organ for the opperssion of one class by another." —Lenin.

এবং সেই লীলার সূত্রেই মানুষের প্রগতি ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। মার্কসের মতে বস্তু হইতে চৈতন্য বিবর্তিত হয়। মার্কস বলিলেন যে, অর্থনৈতিক পরিবর্তনের জন্যই সমাজ ও রাষ্ট্রের কাঠামো বদলায় এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গতি রাখিয়া ভাব, আদর্শ ও ধ্যানধারণা পরিবর্তিত হইতে থাকে। হেগেলের মতে, অর্থনীতি ভাবের অনুগামী ; মার্কসের মতে ভাব হইতেছে অর্থ নৈতিক অবস্থার অনুগামী। মার্কস ভাব, আদর্শ, নীতি, ধর্ম প্রভৃতিকে অস্বীকার করিতেছেন না। তাঁহার মতে ইহা সমসাময়িক অর্থ নৈতিক অবস্থার প্রতিফলন। এই প্রতিফলন হইতেই মানুষের মনে তত্ত্বমূলক ভাব বা আদর্শের সৃষ্টি হয়। সুতরাং মার্কস মনে করেন যে, রাজনীতি, বিজ্ঞান, কলা, ধর্ম ও অন্য কিছু চর্চায় নিযুক্ত হইবার পূর্বে মানুষকে তাহার খাদ্য, পানীয়, বস্ত্র ও আবাসের ব্যবস্থা করিতে হইবে। কিন্তু অলস ভাববিলাসিতা ও সৌখীন আদর্শবাদিতার আগাছার চাপে এই চরম সত্যটি এতদিন কেহ উপলব্ধি করে নাই। মার্কস তাঁহার বিশ্লেষণের ভিতর দিয়া প্রমান করিলেন যে, কোন সমাজের কোন সময়ের কোন এক প্রতিষ্ঠান, আইনব্যবস্থা সেই সমাজ ও যুগের অর্থ নৈতিক ভিত্তির উপর গড়িয়া উঠে এবং তাহার দ্বারাই প্রভাবিত হয়।[6]

মার্কসের রাষ্ট্রদর্শন ॥

রাষ্ট্রের ইতিহাস পর্যালোচনা করিয়া মার্কস দেখান যে, একমাত্র প্রাক্‌-ঐতিহাসিক সমাজ ছাড়া অন্যান্য যুগে ইতিহাস মূলত শ্রেণীসংগ্রামের ইতিহাস (The history of all hitherto existing society is the history of class struggle)। পশুপালনের যুগে যে শ্রেণীসংগ্রাম বা class war শুরু হইল সমস্ত যুগে তাহা আরও স্পষ্ট হইয়া দেখা দিল। শিল্পযুগে নূতন শ্রেণীর উদ্ভবের ভিতর দিয়া এই শ্রেণীসংঘর্ষ চূড়ান্ত পর্যায়ে উপনীত হইল। মার্কসের মতে উৎপাদন পদ্ধতির (mode of production) উপর ভিত্তি করিয়াই গড়িয়া উঠে নির্দিষ্ট ধরনের সমাজ ও শ্রেণী সম্পর্ক। এই উৎপাদন-পদ্ধতির আবার দুইটি দিক আছে। প্রথমত, উৎপাদন-শক্তি (the forces of production)। উৎপাদন শক্তি বলিতে উৎপাদনের যন্ত্রপাতি, শ্রমিক ও তাহার

6. "With me..............the ideal is nothing else than the material world reflected by the human mind, and translated into forms of thought."

—Marx.

দক্ষতাকে বুঝায়। দ্বিতীয়, হইতেছে উৎপাদন-সম্পর্ক (the relations of production)। উৎপাদন-সম্পর্ক বলিলে প্রচলিত সমাজ-ব্যবস্থার উপর ভিত্তি করিয়া শ্রেণীতে শ্রেণীতে যে সম্পর্ক তাহাকে বোঝায়। উৎপাদন-ব্যবস্থায় যে শ্রেণী উৎপাদন-শক্তির মালিক তাহারাই সমাজে প্রতিপত্তিশালী। তাই তাহারা এই প্রচলিত উৎপাদন সম্পর্ক অক্ষুন্ন রাখিবার চেষ্টা করিয়া অন্যান্য শ্রেণীর উপর তাহাদের শোষণকে অব্যাহত রাখে। কিন্তু নিত্য নতুন উৎপাদন শক্তি আবিষ্কারের ফলে নতুন উৎপাদন সম্পর্কে স্থাপনের প্রয়োজন দেখা দেয়। আধুনিক যুগে ধনোৎপাদনের ক্ষেত্রে নতুন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি প্রযুক্ত হইবার ফলে কলকারখানার মালিক বা ধনিক সম্প্রদায়ের উদ্ভব ঘটিল। এই শ্রেণী কিছুদিনের মধ্যে ধনোৎপাদনের ক্ষেত্রে সামন্তশ্রেণীকে পরাজিত করিয়া রাষ্ট্রক্ষমতা অধিকার করিল এবং আপন স্বার্থ বজায় রাখিবার উদ্দেশ্যে আইনকানুন প্রণয়ন ও রাষ্ট্রযন্ত্র ব্যবহার করিতে লাগিল।

ইহার ভিতর দিয়া মূলত দুইটি শ্রেণী জন্মলাভ করিল। প্রথমটি ধনিক শ্রেণী এবং দ্বিতীয়টি শ্রমিক শ্রেণী। সমাজের উৎপাদিত সম্পদের এক বিরাট অংশ এই ধনিক বা মালিক শ্রেণী আত্মসাৎ করিয়া শ্রমিককে তাহার উৎপাদনের ন্যায্য অংশ হইতে বঞ্চিত করিল। যে দ্রব্য শ্রমিকের শ্রমের বিনিময়ে উৎপন্ন হইল, অথচ মালিক উহার ন্যায্য অংশ হইতে শ্রমিককে বঞ্চিত করিয়া নিজে আত্মসাৎ করে মার্কস তাহাকে উদ্বৃত্ত মূল্য (surplus value) বলিয়া আখ্যা দিয়াছেন।

শোষিত শ্রেণীর সংঘবদ্ধ আন্দোলন ও ক্রমবর্ধমান অসন্তোষ হইতে আত্ম-রক্ষার জন্য সকল যুগেই মালিক শ্রেণী তাহাদের রক্ষার জন্য পুলিস, সৈন্য ও অন্যান্য শক্তি একত্রীভূত করিয়া এই বিরাট শক্তিপ্রয়োগের দ্বারা শ্রমিক শ্রেণীকে দাবাইয়া রাখার চেষ্টা করিয়াছে। মার্কসের মতে কেন্দ্রীভূত পশুশক্তির সাহায্যে গঠিত এই যে সংগঠন যাহা ধনিকের শ্রেণীস্বার্থ রক্ষা করে এবং শ্রমিক শ্রেণীকে দমন করে তাহাই রাষ্ট্র। তাই রাষ্ট্র শ্রেণীস্বার্থের ধারক ও বাহক এবং কেন্দ্রীভূত পশুশক্তির (coercive power) প্রকাশ। মার্কস ইতিহাস বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছেন যে, এইভাবে পশুপালনের যুগ হইতে শুরু করিয়া সামন্ত যুগ বা আধুনিক শিল্পযুগেও ঘটনা একই ধারায় প্রবাহিত হইতেছে। ক্ষমতার অধিকারী শ্রেণী প্রতি যুগেই পশুশক্তির দ্বারা গঠিত রাষ্ট্র নামক সংগঠনের দ্বারা নিজ শ্রেণীস্বার্থ অক্ষুন্ন রাখিবার চেষ্টা করিয়াছে। এই ক্ষমতাবান শ্রেণী নিজ

শ্রেণীস্বার্থ রক্ষা ও অন্যান্য বিরোধী স্বার্থসম্পন্ন শ্রেণীকে দমন করিবার জন্য রাষ্ট্র নামক সংগঠনের দ্বারা কতকগুলি রীতিনীতি কার্যকরী করে যাহাকে আইন নামে অভিহিত করা যায়।

মার্কস মনে করেন যে, ক্রমবর্ধমান বিরামহীন শোষণের সম্মুখীন ও বঞ্চিত শ্রমিক শ্রেণীকে বলিষ্ঠ সংগঠন সৃষ্টি করিয়া ন্যায় ও সাম্য প্রতিষ্ঠাকল্পে বৈপ্লবিক পন্থা গ্রহণ করিতে হইবে। মালিক শ্রেণী কোন অবস্থাতেই রাষ্ট্রীয় যন্ত্র তাহাদের হস্তচ্যুত করিবে না; তাহারা নিজেদের শ্রেণীস্বার্থ রক্ষার জন্য যথাসর্বস্ব পণ করিয়া ইহার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিবে। তাই মার্কস মনে করেন যে, সশস্ত্র সংগ্রামের দ্বারাই একমাত্র মালিক শ্রেণীকে পরাজিত করা সম্ভব। এই ভাবে সশস্ত্র সংগ্রামের ভিতর দিয়া ধনিক শ্রেণীকে পরাজিত করিয়া শ্রমিক শ্রেণী রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করিবে। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অধিকারী শ্রমিক শ্রেণী সর্বহারা শ্রেণীর একনায়কতন্ত্র (dictatorship of the proletariat) প্রতিষ্ঠা করিয়া প্রথমত, ধনিক শ্রেণী ও ধনতন্ত্রকে বিনষ্ট করিবে; দ্বিতীয়ত, রাষ্ট্রের ক্ষমতা প্রয়োগ করিয়া ধীরে ধীরে রাষ্ট্রীয় সমাজতন্ত্র (state socialism) প্রতিষ্ঠা করিবে; এবং তৃতীয়ত, রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত সমাজতন্ত্রের স্থানে ধীরে ধীরে সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠা করিবে। মার্কসের মতে এইরূপ সাম্যবাদী সমাজে প্রতি ব্যক্তি নিজ প্রয়োজন মত ভোগ করিবে এবং নিজ সাধ্যমত উৎপাদন করিবে (From each according to his capacity, to each according to his need)।

মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গীতে এইরূপ সাম্যবাদী সমাজে রাষ্ট্রের আর প্রয়োজনীয়তা থাকিবে না। কারণ সাম্যবাদী সমাজে পরস্পরবিরোধী স্বার্থসম্পন্ন শ্রেণী থাকিবে না—ইহা হইবে শ্রেণীহীন সমাজ। যখন সমাজে একাধিক শ্রেণী থাকে তখন ক্ষমতাবান শ্রেণী রাষ্ট্র নামক এক পশুশক্তিসম্পন্ন সংগঠন দ্বারা নিজের শ্রেণীস্বার্থ রক্ষা করে এবং অন্যান্য শোষিত শ্রেণীকে দমন করে। সুতরাং শ্রেণীহীন সমাজে রাষ্ট্রের কোন প্রয়োজনীয়তা থাকিবে না, কারণ এখানে শ্রেণী-স্বার্থ রক্ষা বা শোষিত শ্রেণীকে দমন করা, কোনটিরই প্রয়োজন নাই। তাই, মার্কসের মতে সাম্যবাদী সমাজের বিশেষ এক পর্যায়ে রাষ্ট্রের অবলুপ্তি ঘটিবে (the state will wither away)।

সমালোচনা: বস্তুবাদী ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টির ভিত্তিতে মার্কস যে রাষ্ট্র-দর্শনকে ব্যাখ্যা করিলেন তাহার পক্ষে ও বিপক্ষে বহু যুক্তি তর্কের অবতারণা করা হইয়াছে। বস্তুত মার্কসবাদ পৃথিবীতে যে ভাবে অভূতপূর্ব আলোড়ন সৃষ্টি

করিয়াছে এবং সমালোচকগণ দ্বারা প্রশংসিত ও নিন্দিত হইয়াছে এইরূপ অন্য কোন তত্ত্ব বা দর্শনের ক্ষেত্রে ঘটে নাই। মার্কসীয় রাষ্ট্রদর্শনকে যে সমস্ত কারণে সমালোচনা হইয়াছে তাহা নিম্নে আলোচনা করা হইল।

প্রথমত, সমালোচনা করিয়া বলা হইয়া থাকে যে, মার্কস ইতিহাসের অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা দ্বারা অর্থনৈতিক ঘটনার উপর অত্যধিক গুরুত্ব দিয়াছেন এবং ভাব, আদর্শ, ধর্ম, ধ্যান-ধারণা প্রভৃতি সূক্ষ্ম অনুভূতিগুলিকে বহুলাংশে উপেক্ষা করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে ভাব, আদর্শ, ধর্ম সর্বক্ষেত্রে অর্থনৈতিক অবস্থার প্রতিফলন নয়। বরং, বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে, স্নেহ, মায়া, মমতা প্রভৃতি অনুভূতিসমূহ অর্থনীতির উপর নির্ভরশীল নয়। ইহার উত্তরে মার্কসবাদীরা বলেন যে, মার্কস ধর্ম, নীতি, আদর্শ ভাব প্রভৃতিকে অস্বীকার করেন নাই, তিনি ইহাদের অর্থনৈতিক পারিপার্শ্বিক হইতে উদ্ভূত মনে করিয়াছেন।

দ্বিতীয়ত, বলা হইয়া থাকে যে, মার্কস শ্রেণীচরিত্র ও শ্রেণীসংঘর্ষের উপর অত্যধিক গুরুত্ব দিয়াছেন। তাঁহাদের মতে মার্কস শুধুমাত্র ইতিহাসে শ্রেণীসংঘর্ষকেই আবিষ্কার করিয়াছেন। কিন্তু তাহার পাশাপাশি শ্রেণী সহযোগিতার ঘটনা উপেক্ষা করিয়াছেন। ইহার উত্তরে বলা যায় যে, শ্রেণীস্বার্থের বিভিন্নতা ও শ্রেণীসংঘর্ষ একটি ঐতিহাসিক সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। এই ক্ষেত্রে মার্কসের বক্তব্য সম্পূর্ণ নির্ভুল।

তৃতীয়ত, সমালোচকেরা বলিয়া থাকেন যে, মার্কস ধর্ম ও নীতির আপেক্ষিকতায় বিশ্বাসী। তাই নীতিশাস্ত্রের চিরন্তনতা মার্কস উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। মার্কসপন্থীরা বলিয়া থাকেন নীতিশাস্ত্রের ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, পরস্পরবিরোধী নীতি বিভিন্ন দেশে আইনসিদ্ধভাবে প্রচলিত আছে। ইহার দ্বারা ধর্ম, নীতি প্রভৃতির আপেক্ষিকতাই প্রমাণিত হয়, অব্যয়বাদ নহে।

চতুর্থত, বলা হইয়া থাকে সাম্যবাদী সমাজে রাষ্ট্রের অবলুপ্তি (withering away of the state) সম্পর্কে মার্কসের ঘোষণা গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ রাশিয়াতে সাম্যবাদী সমাজ প্রতিষ্ঠিত হওয়া সত্ত্বেও রাষ্ট্রের অবসান ঘটে নাই। ইহার উত্তরে বলা যায় যে, রাশিয়াতে সমাজতন্ত্র হইতে সাম্যবাদে উত্তরণ ঘটিতেছে—সাম্যবাদ এখনও পুরাপুরি প্রতিষ্ঠা লাভ করে নাই। সুতরাং এখনই এই তত্ত্বকে অগ্রাহ্য করা যায় না। উপরন্তু লেনিনকে অনুসরণ করিয়া বলা

যায় যে সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রের অস্তিত্ব থাকা পর্যন্ত সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র কাঠামোর অবসান হইতে পারে না।

পঞ্চমত, সমালোচকেরা বলেন যে, মার্কস-নির্দেশিত সংঘর্ষ, হিংসা ও বিপ্লবের ভিতর দিয়া যে সমাজ গঠিত হইবে তাহা সুস্থ, শান্তিপ্রিয় ও সমৃদ্ধিশালী হইতে পারে না। ইহার উত্তরে বলা যায় যে, বিপ্লবের পরে বিরাট সামাজিক পরিবর্তনের ভিতর দিয়া যে-সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইবে তাহাকে স্বাভাবিক অবস্থায় আনিবার জন্য দীর্ঘ সময় প্রয়োজন। সুতরাং এত তাড়াতাড়ি নিরাশ হইবার কারণ ঘটে নাই।

মার্কসের রাষ্ট্রদর্শন সম্পর্কে যে সমস্ত সমালোচনা করা হইয়াছে তাহার বেশির ভাগই একদেশদর্শিতা দোষে দুষ্ট। এই সমস্ত বিরূপ সমালোচনা সত্বেও মার্কসীয় দর্শনের গুরুত্ব ও প্রভাব কমে নাই, বরং উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে। অধ্যাপক ল্যাস্কি যথার্থ ই বলিয়াছেন: পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে যেখানেই মানুষের সামাজিক অবস্থার উন্নতির প্রচেষ্টা হইয়াছে সেখানেই কার্ল মার্কসের বাণী মানুষকে প্রেরণা যোগাইয়াছে এবং মানুষ তাঁহাকে ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা বলিয়া পূজা করিয়াছে।[7]

৪ ॥ আইনমূলক মতবাদ (Juridical Theory) :

আইনমূলক মতবাদের সমর্থক অনেক রাষ্ট্রবিজ্ঞানী রাষ্ট্রকে আইন দ্বারা সৃষ্ট ও আইনমূলক প্রতিষ্ঠান হিসাবে কল্পনা করিয়াছেন। আর এক ধাপ অগ্রসর হইয়া কোন কোন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী রাষ্ট্রে আইনমূলক ব্যক্তিত্ব (Legal personality) আরোপ করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে আইন সৃষ্টি করা, আইন প্রয়োগ করা এবং অধিকার রক্ষা করা রাষ্ট্রের দায়িত্ব। আইনগত দৃষ্টিকোণ হইতে ব্যক্তির সঙ্গে রাষ্ট্রের সাদৃশ্য দেখাইয়া বলা হইয়াছে যে, ব্যক্তির যেমন অধিকার ও কর্তব্য আছে, রাষ্ট্রেরও তেমনি অধিকার ও কর্তব্য আছে। ব্যক্তির ন্যায় রাষ্ট্রও ধন সম্পত্তির অধিকারী হইতে পারে। ব্যক্তি যেমন বিশেষ কোন রাষ্ট্র বা অন্য ব্যক্তির বিরুদ্ধে আদালতের সাহায্য পাইতে পারে, রাষ্ট্র তেমনি ব্যক্তি ও সমষ্টির বিরুদ্ধে আদালতের সাহায্য গ্রহণ করিতে পারে। এইরূপ সাদৃশ্যের ভিত্তিতে দেখাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে ব্যক্তির

7 "In every country of the world where men have set themselves to the task of social improvement, Marx has been always the source of inspiration and prophecy."—Laski.

ন্যায় রাষ্ট্রেরও একটি আইনগত সত্ত্বা রহিয়াছে। আইন অনুযায়ী অধিকার ও কর্তব্যসম্পন্ন ব্যক্তির আইনগত সত্ত্বা বা Legal personality কে আইন শাস্ত্রে স্বীকার করা হইয়াছে। সুতরাং আইনমূলক মতবাদে বিশ্বাসী রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা মনে করেন যে, কর্তব্য ও অধিকার সমন্বিত রাষ্ট্রেরও আইনগত সত্ত্বার স্বীকৃতি হওয়া উচিত।

উপরোক্ত ধ্যানধারণার বশবর্তী হইয়া গিয়ার্কে (Gierke), মেইটল্যাণ্ড (Maitland) প্রভৃতি রাষ্ট্রের উপর প্রকৃত ব্যক্তিত্ব আরোপ করিয়া বলিতেছেন যে, আইনের ক্ষেত্রে রাষ্ট্র যখন ব্যক্তির ন্যায় আইনসম্মত কর্তব্য ও অধিকারের সমষ্টি, তখন ব্যবহার শাস্ত্রের দৃষ্টিকোণ হইতে এই দুই-এর মধ্যে কোন প্রকার পার্থক্য স্বীকার করা ঠিক নয়। তাঁহাদের মতে আইনগতভাবে ব্যক্তির ন্যায় রাষ্ট্রও চেতনশীল, ব্যক্তির ন্যায় রাষ্ট্রও ইচ্ছাশক্তির অধিকারী। সুতরাং স্বাভাবিকভাবেই রাষ্ট্র প্রকৃত ব্যক্তিত্বের (Real Personality) দাবী করিতে পারে।

রাষ্ট্রের প্রতি এইরূপ ব্যক্তিত্ব আরোপ করিবার নীতিকে বিভিন্ন ব্যবহার-শাস্ত্রবিদ ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানী কঠোর সমালোচনা করিয়াছেন। তাঁহারা মনে করেন, যে অর্থে ব্যক্তি চেতন ও মননশীল, ইচ্ছাশক্তি ও ব্যক্তিত্বের অধিকারী, সেই অর্থে রাষ্ট্রকে এই সমস্ত গুণের অধিকারী মনে করা যায় না। সুতরাং রাষ্ট্রের সঙ্গে ব্যক্তির আপাত সাদৃশ্য থাকিলেও প্রকৃত সাদৃশ্য নাই। রাষ্ট্রের কাল্পনিক সত্ত্বার কথা স্বীকার করিলেও ইহাকে প্রকৃত সত্ত্বার অধিকারী মনে করিবার কোন সঙ্গত কারণ নাই।

সপ্তম অধ্যায়

রাষ্ট্রের সার্বভৌমিকতা

(Sovereignty of the state)

সার্বভৌমিকতা সম্পর্কীয় ধারণা (concept) রাষ্ট্রবিজ্ঞানের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। পূর্বেই আলোচনা করা হইয়াছে যে, সার্বভৌমিকতা রাষ্ট্রের একটি উপাদান এবং বস্তুতপক্ষে ইহাই রাষ্ট্রের সর্বাপেক্ষা মৌলিক উপাদান। সার্বভৌমিকতাই রাষ্ট্রকে অন্যান্য সংস্থা হইতে পৃথক করিয়াছে। গেটেল (Gettell) যথার্থ ই বলিয়াছেন যে সার্বভৌমিকতার ধারণাই আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ভিত্তি। ইহাই সর্বপ্রকার আইনকে অনুমোদন দান করে এবং সর্বপ্রকার আন্তর্জাতিক সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণ করে।[1] সুতরাং রাষ্ট্রের প্রকৃতি বুঝিবার জন্য সার্বভৌমিকতার তত্ত্বটিকে বিশেষভাবে বিচার ও বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন।

১॥ সার্বভৌমিকতার সংজ্ঞা ও স্বরূপ (Definition and Nature of Sovereignty)

প্রথমেই আমাদের আলোচনার বিষয়বস্তু হইতেছে সার্বভৌমিকতা বলিতে কি বোঝায়। Sovereignty শব্দটির উৎপত্তি হইয়াছে ল্যাটিন শব্দ 'Supernus' হইতে। Supernus শব্দটির অর্থ Supreme বা সর্বশ্রেষ্ঠ।

সুতরাং, এই অর্থে সার্বভৌমিকতা হইতেছে রাষ্ট্রের চূড়ান্ত, চরম, সীমাহীন ও অপ্রতিহত ক্ষমতা। রাষ্ট্র যে সমস্ত নির্দেশ দান করে, বিধি নিষেধ আরোপ করে বা কর ধার্য করে, আমরা উহাদের ইচ্ছায় হউক বা অনিচ্ছায় হউক মান্য করিয়া থাকি। কোন ব্যক্তি বিশেষ কোন নির্দেশ দান করিলে বা বাধা নিষেধ আরোপ করিলে বা কর ধার্য করিলে আমরা উহা মানিতে বাধ্য নহি। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, রাষ্ট্রের একটি ক্ষমতা বা শক্তি আছে যাহা ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য না হইলেও ইহার অস্তিত্ব আমরা উপলব্ধি করি—এবং এই শক্তির অস্তিত্বের জন্যই আমরা কখনও ইচ্ছায়, কখনও ইচ্ছার বিরুদ্ধে রাষ্ট্র—অনুশাসন

1. "The concept of sovereignty is the basis of modern political science. It underlies the validity of all law and determines all international relations." —Gettell.

মানিয়া লই। রাষ্ট্রের এই চরম ও চূড়ান্ত শক্তি বা ক্ষমতাটিকেই আমরা সার্বভৌমিকতা নামে অভিহিত করিয়া থাকি। রাষ্ট্রের এই চরম ক্ষমতা থাকিবার ফলেই রাষ্ট্রীয় আইনকানুন, বিচার ও শাসন জনগনের উপর প্রয়োগ করা সম্ভব। এই ক্ষমতার জন্য রাষ্ট্র অন্যান্য সামাজিক প্রতিষ্ঠান হইতে স্বতন্ত্র ও ক্ষমতাশালী। বার্জেস (Burgess) সার্বভৌমিকতার সংজ্ঞা দিয়া বলিয়াছেন: "সমস্ত ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের উপর আদি, চরম ও সীমাহীন ক্ষমতাকে সার্বভৌমিকতা বলে।"[2] ব্লাকস্টোনের (Blackstone) মতে সার্বভৌমিকতা হইতেছে চরম, অপ্রতিরোধ্য, শর্তহীন, সীমাহীন কর্তৃত্ব (...the Supreme, irresistable, absolute, uncontrolled authority)। বার্কারও (Barker) মনে করেন যে, আইনানুসারে সংগঠিত জনসমাজ বা রাষ্ট্রের এলাকার মধ্যে সমস্তপ্রকার আইনসংগত দ্বন্দ্বের আইনসঙ্গত মীমাংসার জন্য যে চরম ও চূড়ান্ত ক্ষমতা থাকে, তাহাই সার্বভৌমিকতা।

সুতরাং এই সমস্ত সংজ্ঞা অনুযায়ী রাষ্ট্রের সার্বভৌমিকতা বলিতে আমরা রাষ্ট্রের সেই সমস্ত মৌলিক, সর্বোচ্চ ও অসীম ক্ষমতা, যাহা রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত যে কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের উপর প্রয়োগ করা চলে তাহাকে বোঝাই। রাষ্ট্রগত সার্বভৌমিকতার স্বরূপকে আরও সুন্দরভাবে তুলিয়া ধরিয়াছেন ষ্ট্রং (strong)। তাঁহার মতে, "শব্দগত অর্থে সার্বভৌমিকতা বলিতে শ্রেষ্ঠত্ব বুঝাইলেও, রাষ্ট্রের ব্যাপারে এই শব্দের ব্যবহার এক বিশেষ শ্রেষ্ঠত্বকে নির্দেশ করে।" রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা যে শুধুমাত্র সর্বশ্রেষ্ঠ তাহাই নয় জনগণ স্বেচ্ছায় ইহার কতৃত্ব স্বীকার করে এবং এই ক্ষমতা বিধিসঙ্গত ও আইনসঙ্গত।

সুতরাং সার্বভৌমিকতাকে একটি আইনানুগ ধারণা (legal concept) দ্বারা আখ্যায়িত করা যাইতে পারে। রাষ্ট্রের আদেশই আইন এবং ইহার পিছনে রহিয়াছে সার্বভৌমিকতার অনুমোদন। কোন নির্দিষ্ট শক্তি যখন রাষ্ট্রের আইনের রূপ ও তাহার চূড়ান্ত ক্ষমতা প্রকাশ করে তখনই হয় আইনসম্মত সার্বভৌমিকতার জন্ম। আইনসম্মত সার্বভৌমিকতার নির্দেশ অস্বীকার করিবার ক্ষমতা কাহারো থাকে না—নিজের শক্তিতে সে স্বপ্রকাশ। ম্যাকআইভারের (MacIver) মতে রাষ্ট্র আইন প্রণেতা অপেক্ষা অধিক পরিমাণে আইনসিদ্ধ

2. "Sovereignty is the original, absolute and unlimited power over the individual subject and over all associations of subjects."—Burgess

অভিভাবক[3] এবং ইহার প্রধান দায়িত্ব হইল আইনের অনুশাসন বজায় রাখা। সার্বভৌমিকতা স্বয়ং আইনের আয়ত্তাধীন। অর্থাৎ আইনগত যে মূল্যবোধ ইহা বজায় রাখিতে চায় তাহার দ্বারা নিজেও আবদ্ধ। মোটকথা রাষ্ট্র-সংগঠন বজায় রাখিতে হইলে রাষ্ট্রের চূড়ান্ত ক্ষমতা থাকা চাই। সুতরাং যতক্ষণ রাষ্ট্রের অস্তিত্ব বজায় রাখিতে চাহিব, ততক্ষণ এই ক্ষমতার কর্তৃত্ব ও অনুশাসন মানিয়া চলিতে হইবে। অর্থাৎ শক্তি ও সম্মতি—উভয় উপাদানের সংমিশ্রণে সার্বভৌমিকতার উদ্ভব ঘটিয়াছে এবং রাষ্ট্রীয় জীবনে আইনসিদ্ধ চরম কর্তৃত্বরূপে সার্বভৌমিকতা আত্মপ্রকাশ করে।

সার্বভৌমিকতার প্রকৃতি ও অবস্থান সম্পর্কে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মধ্যে মতভেদ লক্ষ্য করা যায়। এরই জন্য সার্বভৌমিকতাকে বিভিন্ন রূপে বিভক্ত করা যায়। কেহ কেহ আবার মনে করেন যে, সার্বভৌমিকতা একান্তভাবেই একটি তত্ত্বগত ধারণা—ইহার কোন বাস্তব ভিত্তি নাই। এই ব্যাপারে পরবর্তী পর্যায়ে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করিব।

২॥ সার্বভৌমিকতার তত্ত্বের বিকাশ (Development of the theory of Sovereignty)

ষোড়শ শতাব্দীর পূর্বে সার্বভৌমিকতা সম্পর্কে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের কোন সুস্পষ্ট ধারণা ছিল না। বর্তমান যুগের সার্বভৌম রাষ্ট্রের উদ্ভবের ফলে ষোড়শ শতাব্দীতে এই তত্ত্বের সুস্পষ্ট প্রকাশ ঘটে। ইহার পূর্বে সামন্তপ্রথা প্রচলিত থাকিবার জন্য জনগণের আনুগত্য মূলত সামন্তপ্রভুদের উপর বিচ্ছিন্নভাবে ছড়াইয়া ছিল। অপরপক্ষে শ্রেষ্ঠত্ব লইয়া রাজার সঙ্গে পোপের যে দ্বন্দ্ব বাঁধে তাহার জন্যও জনগণের আনুগত্য কেন্দ্রীভূত হইতে পারে নাই। যাহাই হউক মধ্যযুগের শেষের দিকে সামন্তপ্রথা দুর্বল হইয়া পড়িবার জন্য এবং পোপের বিরুদ্ধে রাজার প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা লাভ করিবার জন্য রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমিকতার উদ্ভব ঘটে।

ষোড়শ শতাব্দীতে ফরাসী দার্শনিক বোদাঁর (Jean Bodin) বক্তব্যের মধ্য দিয়াই সার্বভৌমিকতার তত্ত্বটির সুস্পষ্ট ও সুষ্ঠু প্রকাশ ঘটিয়াছে। ১৫৭৬ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত 'De Republica' নামক পুস্তকে বোদাঁ বলিলেন যে, নানা পরিবার ও তাহাদের সম্পত্তির লিখিত সংগঠন হইল রাষ্ট্র এবং এই সংগঠনটি চরম এবং ইহা

3. "At any moment, the state is more the official guardian than the maker of the law."—MacIver.

যুক্তি দ্বারা শাসিত। সার্বভৌমিকতা হইল সকল নাগরিক ও প্রজার উপর চূড়ান্ত ক্ষমতা, যাহার উপর আইনের কোনপ্রকার বাধানিষেধ প্রয়োগ করা যায় না।[4] বোদাঁর সেই বক্তব্যের মধ্য দিয়া জাতীয় রাষ্ট্রের (National State) আবির্ভাব ঘটিল এবং বোদাঁ প্রচার করিলেন যে সার্বভৌম ক্ষমতা রাজার হস্তে ন্যস্ত।

সপ্তদশ শতাব্দীতে আন্তর্জাতিক আইনবিদ গ্রোটিয়াস (Grotius) ও বিখ্যাত বৃটিশ রাষ্ট্রবিজ্ঞানী হবসের (Hobbes) দ্বারা সার্বভৌমিকতার তত্ত্বটির আরও বিকাশ ঘটিল। সপ্তদশ শতাব্দীতে ইংলণ্ডে রাজার সহিত পার্লামেন্টের সংঘর্ষকে কেন্দ্র করিয়া গৃহযুদ্ধের সূচনা ঘটে এবং হবস্ রাজার ক্ষমতা প্রতিষ্ঠাকল্পে রাষ্ট্রের অপরিহার্য উপাদান হিসাবে চরম ও চূড়ান্ত ক্ষমতাসম্পন্ন মানবীয় সার্বভৌম কর্তৃত্বের কল্পনা করিলেন। অপরপক্ষে গ্রোটিয়াস সকল রাষ্ট্রকে সমমর্যাদাসম্পন্ন ও বহির্নিয়ন্ত্রণ মুক্ত বলিয়া ঘোষণা করায় আন্তর্জাতিক আইনের দৃষ্টিকোণ হইতে রাষ্ট্র পুরোপুরি স্বাধীন ও সার্বভৌম হইয়া উঠিল। অপরপক্ষে লক্ (Locke) রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতাকে জনগণের ইচ্ছার অনুবর্তী করিয়া "জনগণের সার্বভৌমিকতা"-য় (Popular Sovereignty) ইহাকে রূপান্তরিত করিলেন। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ফরাসী দার্শনিক রুশো (Rousseau) প্রমাণ করিলেন যে সার্বভৌম ক্ষমতা চরম, অখণ্ড ও অবিচ্ছেদ্য। তবে সার্বভৌমিকতাকে তিনি রাজা বা শাসকের উপর ন্যস্ত না করিয়া প্রচার করিলেন যে জনগণের সমষ্টিগত ইচ্ছাই সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী।*

উনবিংশ শতাব্দীতে ইংরেজ আইনবিদ্ অষ্টিনের (Austin) লেখার মধ্য দিয়া সার্বভৌমিকতার তত্ত্বের পরিপূর্ণ ও যথাযথ প্রকাশ ঘটিয়াছে। বস্তুত সার্বভৌমিকতার তত্ত্বের ক্ষেত্রে অষ্টিনের অবদানই সর্বাপেক্ষা বেশি। অষ্টিন ঘোষণা করিলেন যে স্বাধীন ও রাষ্ট্রনৈতিক সমাজে নির্দিষ্ট ও মানবীয় সার্বভৌম অনিবার্য, যাহা সকলের নিকট হইতে আনুগত্য লাভ করে, কিন্তু কাহারও নিকট আনুগত্য প্রকাশ করে না। অষ্টিনের সার্বভৌমিকতার তত্ত্বকে পরবর্তীকালে বহুত্ববাদীরা (Pluralists) তীব্র ভাষায় সমালোচনা

4. "Sovereignty is the supreme power over citizens and subjects, unrestrained by laws."—Bodin.

* সামাজিক চুক্তি মতবাদকে কেন্দ্র করিয়া হবস্, লক ও রুশোর মতবাদের মধ্য দিয়া সার্বভৌমিকতার তত্ত্বের যে বিকাশ ঘটিয়াছে সেই সম্পর্কে এই পুস্তকের পঞ্চম অধ্যায়ের 'সামাজিক চুক্তি মতবাদ' সম্বন্ধীয় আলোচনা দ্রষ্টব্য।

করিয়াছেন। যাহাই হউক অষ্টিন ও বহুত্ববাদীদের বক্তব্য আমরা পরে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করিতেছি।

৩॥ সার্বভৌমিকতার বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Sovereignty) :

সার্বভৌমিকতার যে সমস্ত সংজ্ঞা পূর্বে আলোচনা করা হইয়াছে উহাদের বিশ্লেষণ করিলে সার্বভৌমিকতার কতকগুলি বৈশিষ্ট্য ধরা পড়ে। বিশেষ করিয়া বার্জেস (Burgess) সার্বভৌমিকতার যে সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা দিয়াছেন তাহা হইতে ইহার নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি প্রকাশ পায়।

১। **সার্বজনীনতা (Universality) :** রাষ্ট্রের অন্তর্গত সমস্ত ব্যক্তি, বস্তু, সংগঠন ও সমাজের সর্বস্তরে রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব সমভাবে প্রযোজ্য হয় এবং ইহাকেই সার্বভৌমিকতার সার্বজনীনতা বা সর্বব্যাপকতা বলা হয়। সার্বজনীনতা সার্বভৌম শক্তির একটি বৈশিষ্ট্য। এই বৈশিষ্ট্যের জন্যই সমাজের সর্বস্তরে সার্বভৌমিকতার গতি অবাধ ও অপ্রতিহত। অবশ্য রাষ্ট্র স্বেচ্ছায় ও আন্তর্জাতিক আইনের অনুশাসনে কিছু কিছু জিনিসকে তাহার এক্তিয়ার বহির্ভূত বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকে। উদাহরণস্বরূপ বৈদেশিক দূতাবাসের কথা বলা যাইতে পারে। কিন্তু ইহার দ্বারা রাষ্ট্রের সার্বজনীনতা ব্যাহত হয় না।

২। **স্থায়িত্ব (Permanence) :** রাষ্ট্রের পরিচালকবর্গ বা সরকারের পরিবর্তন হইলে অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা হস্তান্তরিত হইলে সার্বভৌমিকতার অবসান ঘটে না। কারণ সার্বভৌমিকতা রাষ্ট্রের ক্ষমতা, সরকারের নহে। তাই সরকারের উত্থান-পতনের সঙ্গে সার্বভৌমিকতার পরিবর্তন ঘটিতে পারে না। রাষ্ট্র যতক্ষণ থাকিবে ততক্ষণ সার্বভৌমিকতাও বজায় থাকিবে। সেই অর্থে সার্বভৌমিকতার স্থায়িত্ব আছে, ইহা সরকারের মত ক্ষীণজীবী নয়।

৩। **চরমত্ব (Absoluteness) :** সার্বভৌমিকতা রাষ্ট্রের চরম, আদি এবং অসীম ক্ষমতা। রাষ্ট্রের ভিতর আইনানুমোদিত আর কোন সংগঠন বা ক্ষমতা নাই যাহা সার্বভৌমিকতার উর্ধ্বে। এই ক্ষমতা অপরের দান হিসাবে জন্মলাভ করে নাই ; ইহা অপর কোন শক্তির উপর নির্ভরশীল নহে ; ইহা কোনরূপ সীমারেখা দ্বারা আবদ্ধ নয়। অর্থাৎ রাষ্ট্রের ভিতর সকল

বিষয়েই সর্বোচ্চ মীমাংসক হইল সার্বভৌমিকতা। কিন্তু হেনরী মেইন (Henry Maine) মনে করেন যে, সার্বভৌমিকতা আইনসঙ্গতভাবে সীমাবদ্ধ না হইলেও নৈতিক সূত্র দ্বারা সীমিত। ব্লুন্‌ৎস্লী (Bhuntschli) সার্বভৌমিকতার চরমতার সমালোচনা করিয়া বলিয়াছেন যে আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে সার্বভৌমিকতা তাহার নিজস্ব প্রকৃতি ও ব্যক্তিসমূহের অধিকার দ্বারা সীমাবদ্ধ, এবং বাহ্যিক দিক দিয়া অপরাপর রাষ্ট্রের অধিকারের দ্বারা ইহা সীমাবদ্ধ। নৈতিক বিধান ও নিজস্ব প্রকৃতি দ্বারা সার্বভৌমিকতা সীমাবদ্ধ হইলেও তাহা আমাদের বিচার্য বিষয় নহে। কারণ সার্বভৌমিকতা একটি আইনগত ধারণা, নীতিগত নহে। বার্কার (Barker) যথার্থভাবেই আইনসঙ্গতভাবে আইন সম্পর্কীয় প্রশ্নের চূড়ান্ত মীমাংসা করিবার আইন অনুমোদিত ক্ষমতা হিসাবে সার্বভৌমিকতাকে বর্ণনা করিয়াছেন। সুতরাং উপরোক্ত সমালোচনা সত্ত্বেও সার্বভৌমিকতার চূড়ান্ত এবং অসীম ক্ষমতা সম্পর্কীয় বক্তব্য বাতিল হইয়া যাইতেছে না।

৪। **অবিভাজ্যতা (Indivisibility)**: সার্বভৌমিকতার আর একটি বৈশিষ্ট্য ইহার অবিভাজ্যতা। সার্বভৌমিকতাকে ভাগ করিয়া বিভিন্ন স্থানে ছড়াইয়া দেওয়া যায় না। ইহা রাষ্ট্রের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত থাকে। রাষ্ট্র বিভক্ত হইলেও সার্বভৌমিকতা বিভক্ত হয় না, ইহা তাহার পূর্ণতা লইয়া বিরাজ করে। সার্বভৌমিকতা বিভক্ত করার অর্থ ইহার বিলোপ সাধন করা।

সার্বভৌমিকতার অবিভাজ্যতা সম্পর্কে এই মতবাদের তীব্র সমালোচনা করিয়া বলা হইয়া থাকে যে, যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় সার্বভৌমিকতা বিভক্ত। আন্তর্জাতিক আইনের প্রয়োগের দ্বারাও সার্বভৌমিকতা বিভক্ত হয় বলিয়া সমালোচনা করা হইয়া থাকে। এই সমস্ত সমালোচনার মধ্যে কিছু যুক্তি থাকিলেও ইহাকে পুরোপুরি স্বীকার করা যায় না।

৫। **হস্তান্তরযোগ্য নয় (Inalienability)**: সার্বভৌমিকতা হস্তান্তর বা অন্যকে সমর্পণ করা যায় না। সমর্পণ যোগ্যতা থাকিলে সার্বভৌমিকতার চূড়ান্ত রূপটি থাকিতে পারে না। সার্বভৌমিকতা হইতেছে রাষ্ট্রের প্রাণ। মানুষ যেমন তাহার প্রাণকে হস্তান্তরিত করিতে পারে না বা করিয়া বাঁচিয়া থাকিতে পারে না, সেইরূপ রাষ্ট্রও তাহার সার্বভৌমিকতা হস্তান্তর করিতে পারে না। সার্বভৌমিকতা হস্তান্তর করিবার অর্থ হইতেছে রাষ্ট্রের বিলুপ্তি। অংশ

যাঁহারা মনে করেন যে, প্রকৃতপক্ষে জনগণই চূড়ান্ত ক্ষমতার অধিকারী তাঁহাদের মতে এই ক্ষমতা শাসকের হাত হইতে জনগণের হাতে হস্তান্তর হইতে পারে। অপর পক্ষে সপ্তদশ শতাব্দীতে হবসের মত রাজতন্ত্রের সমর্থকগণ প্রচার করিলেন যে সার্বভৌমিকতা প্রথমে জনগণের হস্ত থাকিলেও সামাজিক চুক্তির মধ্য দিয়া ইহা রাজার নিকট হস্তান্তরিত হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে অধ্যাপক গার্নার বলিয়াছেন যে, এই বিতর্কের মূল্য যাহাই হউক না কেন বর্তমানে আইনবিদ্‌গণ প্রচার করিয়াছেন যে সার্বভৌমিকতা হস্তান্তরযোগ্য নয়।[৫]

৪॥ সার্বভৌমিকতার প্রকার ভেদ Kinds of sovereignty) :

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে সার্বভৌমিকতার প্রকৃত অবস্থান সম্পর্কে রাষ্ট্র-বিজ্ঞানীদের মধ্যে মতভেদ লক্ষ্য করা যায়। ফলে সার্বভৌমিকতা বিভিন্নরূপে আত্মপ্রকাশ এবং বিভিন্ন অর্থে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। কেহ কেহ আবার সার্ব-ভৌমিকতার এই বিভিন্ন রূপকে সার্বভৌমিকতার এক একটি ধরন বলিয়া মনে করেন। নিম্নে উহাদের সম্পর্কে পৃথকভাবে আলোচনা করিয়া উহাদের পার্থক্য নির্দেশ করা হইল।

(i) উপাধিসূচক বা নামসর্বস্ব সার্বভৌমিকতা (Titular Sovereignty) : উপাধিসূচক বা নামসর্বস্ব সার্বভৌমিকতা দ্বারা এমন সার্বভৌমকে নির্দেশ করা হইয়া থাকে যিনি উপাধিগত অধিকারের ভিত্তিতে সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। কিন্তু এই ক্ষমতা নামেমাত্র ক্ষমতা. কার্যত নাম সর্বস্ব সার্বভৌম চূড়ান্ত এবং প্রকৃত ক্ষমতার অধিকারী নন। প্রসঙ্গত উপাধিসূচক সার্বভৌমিকতার সঙ্গে প্রকৃত সার্বভৌমিকতার পার্থক্য নির্ণয় করা আবশ্যক। উপাধিসূচক সার্বভৌম শক্তি সর্বদাই দেশের চূড়ান্ত ক্ষমতার প্রতীক হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করেন, কিন্তু প্রকৃত ক্ষমতা অন্য কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিসমষ্টি দ্বারা ব্যবহৃত হয়। এই ব্যক্তি বা ব্যক্তিসমষ্টি যাঁহারা উপাধি সূচক সার্বভৌমের পশ্চাতে থাকিয়া প্রকৃত ক্ষমতাকে ব্যবহার করিয়া থাকেন সেই ব্যক্তিসমষ্টিকে প্রকৃত সার্বভৌম বলা হয়।

ইংলণ্ডের শাসনতন্ত্র দ্বারা এই বিষয়টি পরিষ্কার করা যাইতে পারে। ইংলণ্ডের সংবিধান অনুযায়ী সেখানকার রাজা বা রানী তাঁহাদের এই উপাধি বলে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অধিকারী। রাজা যিনি হইলেন, তাহার কোনরূপ ব্যক্তিগত গুণ বা

5. Whatever may have been the merits of the controversy, it is now generally tought by the jurists that sovereignty is inalienable."—Garner.

পরিচয়ের প্রয়োজন নাই, রাজা উপাধি দ্বারাই তিনি সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। এইজন্যই ইংলণ্ডের রাজাকে রাজা না বলিয়া অনেক সময় সার্বভৌম বা Sovereign এই নামে অভিহিত করা হয়। এইস্থানে দেখা যায় যে, ইংলণ্ডের রাজা হইতেছেন উপাধিসূচক সার্বভৌম। কার্যক্ষেত্রে বা বাস্তবদিক হইতে তাহার বিশেষ কোন ক্ষমতা নাই। অথচ তিনি উপাধিসূচক সার্বভৌম হইবার জন্য ইংলণ্ডে সমস্ত ক্ষমতাই তাঁহার নামে প্রয়োগ করা হইয়া থাকে। ইংলণ্ডে লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে, সেখানকার মন্ত্রিসভা বা cabinet হইতেছে প্রকৃত ক্ষমতার মালিক এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ভাষায় প্রকৃত সার্বভৌম। প্রকৃত সার্বভৌমিকতার অধিকারী হইয়াও ইহারা নিজেদের সার্বভৌম বলিয়া পরিচয় না দিয়া রাজাকে সার্বভৌম বলিয়া দাঁড় করাইয়াছেন।

(ii) **আইনসঙ্গত ও রাষ্ট্রনৈতিক সার্বভৌমিকতা (Legal and Political Sovereignty):** আইনসঙ্গত সার্বভৌমিকতা দ্বারা আইন প্রণয়নের চরম ক্ষমতাকে নির্দেশ করা হইয়া থাকে। অর্থাৎ এই বক্তব্য অনুযায়ী আইনসঙ্গত সার্বভৌমিকতার অবস্থান হইল সেই নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা ব্যক্তিসমষ্টিতে যিনি বা যাঁহারা রাষ্ট্রের চরমতম আজ্ঞাকে আইনের মাধ্যমে ঘোষণা করিতে সক্ষম। এই ক্ষমতা কোনরূপ ধর্মীয় নিয়ম, ন্যায়-অন্যায়ের নীতি, বাধা-নিষেধ বা জনমত দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় না, কারণ আইনসঙ্গত সার্বভৌমিকতা রাষ্ট্রের চরম ও চূড়ান্ত ক্ষমতা। এই দৃষ্টিকোণ হইতে বলা যায় যে, সার্বভৌমিকতার আজ্ঞাই হইতেছে আইন (Law is the command of the Sovereign)। অস্টিন তাঁহার তত্ত্বে এই আইনসঙ্গত সার্বভৌমিকতাকেই স্বীকার করিয়াছেন। উদাহরণ হিসাবে বলা যায় যে, ইংলণ্ডের রাজা সমেত পার্লামেণ্ট (King-in-Parliament) হইতেছে আইনসঙ্গত সার্বভৌমিকতা।

কিন্তু কোন কোন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী উপরোক্ত ব্যাখ্যার বিরোধিতা করিয়া বলিয়াছেন যে, আইনসঙ্গত সার্বভৌমিকতার চরম ক্ষমতা একটি কল্পনা মাত্র। বাস্তবে ইহার বিশেষ কোন অস্তিত্ব নাই। কারণ যে ব্যক্তি বা ব্যক্তিসমষ্টির হাতে আইনসঙ্গত সার্বভৌমিকতা থাকে তিনি বা তাঁহারা নিজের ইচ্ছা ও খুশিমত এই ক্ষমতাকে প্রয়োগ করিতে পারেন না। এই ক্ষমতা সর্বদাই নির্বাচকমণ্ডলীর ইচ্ছা এবং ব্যাপক জনসম্মতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। ইহাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে আইনসঙ্গত সার্বভৌমিকতা খুব বেশী ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারে না। সুতরাং দেখা যায় প্রকৃত ক্ষমতা নির্বাচকমণ্ডলীর ইচ্ছা অনুযায়ী

পরিচালিত হয়। নির্বাচকমণ্ডলীর এই সার্বভৌমিকতাকে রাষ্ট্রনৈতিক বা রাজনৈতিক সার্বভৌমিকতা বলিয়া অভিহিত করা হয়। রাষ্ট্রনৈতিক সার্বভৌমিকতা সমর্থন করিয়া ডাইসি (Dicey) বলিয়াছেন: "আইনবিদ্ যাহাকে সার্বভৌম বলিয়া স্বীকার করেন তাহার পশ্চাতে আরও একটি সার্বভৌম আছে যাহাকে আইনসঙ্গত সার্বভৌম মানিতে বাধ্য......... সেই জনসমষ্টিই হইতেছে রাষ্ট্রনৈতিক সার্বভৌম, যাহার ইচ্ছা চূড়ান্ত পর্যায়ে নাগরিকগণ মান্য করিয়া চলে।"[6] গার্ণারও (Garner) অনুরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন।

ইংলণ্ডের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে আমরা রাজা সহ পার্লামেণ্টকে আইনসম্মত-সার্বভৌম এবং নির্বাচকমণ্ডলীকে রাষ্ট্রনৈতিক সার্বভৌম বলিতে পারি। বলা হইয়া থাকে, ইংলণ্ডের পার্লামেন্টের ক্ষমতা অবাধ ও চরম। কিন্তু পার্লামেণ্ট নীতি, ধর্ম ও জনমতের ইচ্ছার বিরুদ্ধে ক্রমাগত আইন করিলে জনগণ পার্লামেন্টের ক্ষমতা মানিবে কী? পার্লামেণ্ট দূরে থাকুক, কোন স্বেচ্ছাচারী রাজা বা একনায়ক দীর্ঘকাল ধরিয়া নীতি, ধর্ম ও জনমতকে উপেক্ষা করিতে পারে না। সে ক্ষেত্রে নির্বাচকমণ্ডলীর ইচ্ছা বা রাষ্ট্রনৈতিক সার্বভৌমিকতাই প্রাধান্য বিস্তার করিবে। অর্থাৎ রাষ্ট্রনৈতিক সার্বভৌমিকতার ইচ্ছা প্রত্যক্ষ-ভাবে নির্দেশদানে অক্ষম। তাই তাহার ইচ্ছা বা নির্দেশ আইনসঙ্গত সার্বভৌমিকতার মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করে। এই প্রকার দৃষ্টিকোণ হইতে বিচার করিলে বলা যায় যে, প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় আইনসঙ্গত সার্বভৌম ও রাষ্ট্রনৈতিক সার্বভৌম একই বস্তু। এই জন্যই গেটেল (Gettell) বলিয়াছেন যে আইনসঙ্গত ও রাষ্ট্রনৈতিক সার্বভৌমিকতার মধ্যে প্রকৃত সম্পর্ক নির্ধারণ করা একটি সমস্যা।[7]

সর্বশেষে একটি কথা বলা প্রয়োজন, যেহেতু সার্বভৌমিকতা একটি আইনগত ধারণা এবং আইনের দৃষ্টিতে রাষ্ট্রনৈতিক সার্বভৌমিকতার কোন মূল্য নাই—সেইজন্য রাষ্ট্রনৈতিক সার্বভৌমিকতাকে সার্বভৌমিকতা নামে অভিহিত না করিয়া জনগণের সমষ্টিগত ইচ্ছার প্রকাশ বলা ভাল।

6. "Behind the sovereign which the lawyer recognises, there is another sovereign to whom the legal sovereign must bow......that body is politically sovereign the will of which is ultimately obeyed by the citizens of the state."
—Dicey.

7. "The problem of good Government is largly one of the proper relation betwean the legal and ultimate political sovereignty."—Gettell.

(iii) আইনানুমোদিত ও কার্যকরী সার্বভৌমিকতা (De Jure and De Facto Sovereignty): সার্বভৌমিকতাকে আইনানুমোদিত ও কার্যকারী এই দুইভাগে বিভক্ত করা হয়। বাস্তব ক্ষেত্রে ক্ষমতার প্রয়োগের ভিত্তিতেই সার্বভৌমিকতার এইরূপ শ্রেণীবিভাগ করা হইয়া থাকে। কখনও কখনও যুদ্ধ, বিপ্লব বা শাসনব্যবস্থা ভাঙ্গিয়া পড়িবার জন্য দেখা যায় যে, কোন এক দেশের আইনসঙ্গতভাবে সার্বভৌম ক্ষমতা-প্রয়োগের অধিকারী ব্যক্তি বা ব্যক্তিসমষ্টি এমন এক অবস্থার সম্মুখীন হয় যাহার জন্য তাহারা তাহাদের আইনসিদ্ধ ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারে না এবং অন্য দেশে আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়। আইনের দিক দিয়া ইহারাই সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী এবং ইহাদের নির্দেশই কার্যকরী হওয়া উচিত। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে দেখা যায়, আইনসঙ্গতভাবে সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক নয় এমন ব্যক্তি বা ব্যক্তিসমষ্টি দেশ শাসন করিতেছে এবং তাহাদের নির্দেশই কার্যকরী হইতেছে। এইরূপ অবস্থায় প্রথমোক্ত ব্যক্তি বা ব্যক্তিসমষ্টিকে আইনানুমোদিত সার্বভৌম এবং শেষোক্ত ব্যক্তি বা ব্যক্তিসমষ্টিকে কার্যকরী সার্বভৌম বলিয়া অভিহিত করা হয়। আইনানুমোদিত সার্বভৌমিকতার ক্ষমতার উৎস হইল আইনগত স্বীকৃতি; অপরপক্ষে কার্যকরী সার্বভৌমিকতার ভিত্তি হইতেছে শাসনতান্ত্রিক শক্তি ও বাস্তব অবস্থা। ইংলণ্ডে দ্বিতীয় চার্লসের বিরোধিতা করিয়া ক্রমওয়েল পার্লামেণ্ট ভাঙ্গিয়া দিয়া শাসনক্ষমতা হস্তগত করিয়া কার্যকরী সার্বভৌম বলিয়া পরিগণিত হইলেন, যদিও দ্বিতীয় চার্লস তখনও আইনানুমোদিত সার্বভৌম। লর্ড ব্রাইসকে অনুসরণ করিয়া বলা যায়, যে ব্যক্তি বা ব্যক্তি-সমষ্টি আইনসঙ্গত বা আইনবিরুদ্ধভাবে নিজেদের ইচ্ছা কার্যকর করিতে পারেন এবং জনগণের আনুগত্য লাভ করিয়া থাকেন, সেই ব্যক্তি বা ব্যক্তিসমষ্টিকে কার্যকরী সার্বভৌম বলা হয়।

অনেক সময় দেখা যায় যে, আইন অনুসারে গঠিত শাসনতন্ত্রকে বাতিল করিয়া দিয়া কোন সামরিক নেতা ক্ষমতা দখল করেন। তাঁহাকে প্রথমে কার্যকরী সার্বভৌম হিসাবে স্বীকার করা হয়। কিন্তু কিছুদিন পরে তিনি যখন ক্ষমতার আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত হন, তখন আর লোকে তথাকথিত আইনসঙ্গত সার্বভৌমিকতার কথা মনে রাখে না। তাহা ছাড়া অনেক ক্ষেত্রে কার্যকরী সার্বভৌম নির্বাচন বা আইনগত পদ্ধতির সাহায্যে তাঁহার শাসনব্যবস্থাকে আইনের মন্ত্রে অভিষিক্ত করিয়া যথাযোগ্য স্বীকৃতি আদায় করিয়া লয়। এইরূপ

অবস্থায় আইনানুমোদিত ও কার্যকরী সার্বভৌমিকতার পার্থক্য বিলীন হইয়া যায়।

অস্টিন সার্বভৌমিকতার এইরূপ শ্রেণীবিভাগের আপত্তি করিয়াছেন। কারণ, তাঁহার মত সার্বভৌমিকতাই আইনের উৎস। ইহা কখনই বে-আইনী হইতে পারে না। বে-আইনী সরকারের অস্তিত্ব থাকিতে পারে, কিন্তু সেই সরকারকে কোনরূপ সার্বভৌমিকতার দ্বারা অভিষিক্ত করা চলে না। তাই গেটেলের মতে আইনানুমোদিত ও কার্যকরী সার্বভৌমিকতার মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করা বাঞ্ছনীয়।

(iv) রাষ্ট্রবহিঃস্থ সার্বভৌমিকতা (External Sovereignty)

কেহ কেহ মনে করেন যে রাষ্ট্র শুধুমাত্র আভ্যন্তরীণ সার্বভৌম ক্ষমতার দ্বারা রাষ্ট্রের অধীনস্থ জনমণ্ডলী এবং ভূ-খণ্ডের উপরই চরম ও অপ্রতিহত ক্ষমতাই প্রয়োগ করে না, রাষ্ট্রবহিঃস্থ ক্ষেত্রেও ইহা স্বাধীন ও চরম কর্তৃত্বের অধিকারী এবং অপর কোন রাষ্ট্র বা শক্তিদ্বারা ইহার ক্ষমতা সীমিত নহে। রাষ্ট্রের এই ক্ষমতাকে রাষ্ট্রবহিঃস্থ সার্বভৌমিকতা বলে। রাষ্ট্রবহিঃস্থ সার্বভৌমিকতা থাকিবার জন্য রাষ্ট্রের ইচ্ছা, কর্ম এবং কর্তৃত্ব সম্পর্কে কোনরূপ বিরোধিতা করা চলে না এবং রাষ্ট্র অন্যের ইচ্ছা অনুযায়ী নিয়ন্ত্রিত হয় না।

আভ্যন্তরীণ সার্বভৌমিকতার ধারণাটি বহুত্ববাদীগণের সমালোচনার আঘাতে এবং জনগণের (Popular) সার্বভৌমিকতার আলোড়নে অনেকটা দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে বলিয়া রাষ্ট্রবহিঃস্থ সার্বভৌমিকতার নীতিও বর্তমান যুগে আন্তর্জাতিক আইন, অনুশাসন ও সংস্কার দ্বারা বহুল পরিমাণে পরিবর্তিত হইয়াছে। এই জন্যই ব্লুনৎস্লী বলিয়াছেন: "রাষ্ট্র বাহিরের দিকে অন্যান্য রাষ্ট্রের অধিকারের দ্বারা সীমাবদ্ধ এবং আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের নিজস্ব চরিত্র ও সাধারণ সদস্যদের অধিকারের দ্বারা সীমিত।" ডঃ গার্ণার মনে করেন যে অন্য রাষ্ট্রের ইচ্ছা ও নিয়ন্ত্রণ হইতে মুক্ত থাকা ছাড়া রাষ্ট্রবহিঃস্থ সার্বভৌমিকতা অন্য কোন অর্থ বহন করেন না। সেইদিন হইতে রাষ্ট্রবহিঃস্থ সার্বভৌমিকতাকে নেতিবাচক (negative) ক্ষমতা ব্যতীত কিছু বলা যায় না।

(v) জনগণের সার্বভৌমিকতা (Popular Sovereignty):

জনগণই প্রকৃতপক্ষে সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী, এই মতবাদ সপ্তদশ শতাব্দীতে দানা বাঁধিয়া উঠে। রাষ্ট্রনৈতিক সার্বভৌমিকতার (Political

Sovereignty) তত্ত্বই জনগণের সার্বভৌমিকতা সম্পর্কীয় চিন্তার উৎস—এই কথা বলা যাইতে পারে। জনগণের সার্বভৌমিকতার তত্ত্ব অনির্দিষ্ট জনতার (indeterminate mass) হস্তে সার্বভৌম ক্ষমতা ন্যস্ত থাকে বলিয়া মনে করে।[8]

জনগণের সার্বভৌমিকতার প্রকৃত স্বরূপ ও উৎস সন্ধান করিতে হইলে আমাদের ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীর ইউরোপের রাজনৈতিক ইতিহাস পর্যালোচনা করিতে হইবে। লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে, এই সময় ইউরোপে অবাধ রাজতন্ত্রের তাণ্ডবে তিক্তবিরক্ত হইয়া কিছু কিছু লেখক রাজতন্ত্রের ক্ষমতাকে দুর্বল ও সীমিত করিবার জন্য এই প্রচার শুরু করিলেন যে, সার্বভৌম ক্ষমতার প্রকৃত অধিকারী হইতেছে সাধারণ জনগণ, রাজা নয়। তাঁহাদের বক্তব্য এই কথাই ব্যাখ্যা করিল যে, যদিও রাজা দীর্ঘকাল ধরিয়া জনগণের ক্ষমতা অবাধে ব্যবহার করিতেছেন, তথাপি ইহার দ্বারা জনগণের ক্ষমতা নষ্ট হইয়া যায় নাই।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে এই ব্যাখ্যার সঙ্গে সঙ্গতি রাখিয়া রুশো (Rousseau) ঘোষণা করিলেন তাঁহার 'সমষ্টিগত ইচ্ছা' সম্পর্কীয় বক্তব্য, যাহা মূলত জনগণের সার্বভৌমিকতায় দাবীকেই সমর্থন করে। রুশোর মতে সাধারণ মানুষ চুক্তির ভিতর দিয়া রাষ্ট্র সৃষ্টি করিয়াছে এবং রাষ্ট্রের চরম ক্ষমতা অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে সমষ্টিগত ইচ্ছার ভিতর দিয়া। অষ্টাদশ শতাব্দীতে আমেরিকার চিন্তাবিদ জেফারসনও (Jefferson) একই বক্তব্য উপস্থিত করিলেন। ইহারা পৃথিবীর গণমানসকে প্রচণ্ডভাবে আলোড়িত করিলেন এবং জনগণের সার্বভৌমিকতার আদর্শের ভিত্তিতে ফরাসী বিপ্লব ও আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধের তত্ত্বগত যুক্তি প্রতিষ্ঠিত হইল। আমেরিকার স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে বলা হইল: "মানুষের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত সরকারগুলির শাসিতদের সম্মতি হইতেই তাহাদের ন্যায্য ক্ষমতা লাভ করিয়াছে।" অর্থাৎ এই ঘোষণা পরিষ্কারভাবে জনগণের সার্বভৌমতাকে গুরুত্ব ও স্বীকৃতি দিয়াছে। আরও এক ধাপ অগ্রসর হইয়া ১৭৯২ সালে ফরাসী আইনসভা ঘোষণা করিল: "এমন কার্যক্রম গ্রহণ করিতে হইবে যাহাতে জনসাধারণের সার্বভৌমত্ব, স্বাধীনতা ও সাম্যের

8. "From the discussion of political sovereignty we come naturally to the doctrine of popular sovereignty—a doctrine which attributes sovereignty to the vague and indeterminate mass called the people." —Garner

শাসন নিশ্চিত হয়।" লর্ড ব্রাইসের ভাষায় ফরাসী বিপ্লব ও আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় হইতেই জনগণের সার্বভৌমিকতা গণতন্ত্রের ভিত্তি ও মূলমন্ত্র (the basis and watchword of Democracy) হিসাবে দেখা দিয়াছে।

আধুনিককালে অধ্যাপক রিচি (Ritchie) জনগণের সার্বভৌমিকতার সমর্থনে বলিয়াছেন যে জনগণ প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচনী ক্ষমতা প্রয়োগ করিয়া এবং পরোক্ষভাবে প্রভাব বিস্তার করিয়া, শক্তি প্রদর্শন করিয়া অথবা বিপ্লবের সম্ভাব্যতার দ্বারা সার্বভৌম ক্ষমতা ব্যবহার করে। কিন্তু কিছু রাষ্ট্রবিজ্ঞানী এই ধরনের মতবাদ এবং জনগণের সার্বভৌমিকতার তত্ত্বটি গ্রহণ করিতে প্রস্তুত নহেন। তাঁহাদের মতে জনগণের সার্বভৌমিকতার তত্ত্বটির বিশেষ কোন বাস্তব ভিত্তি নাই। কারণ, প্রথমত জনমত বলিতে অনির্দিষ্ট জনসাধারণের অসংগঠিত মতামতকে বোঝায় যাহার উপর ভিত্তি করিয়া কোন প্রকার সার্বভৌম শক্তি গড়িয়া উঠিতে পারে না। দ্বিতীয়ত, জনগণের সার্বভৌমিকতা কোন নির্দিষ্ট বিজ্ঞানসম্মত অর্থে ব্যবহৃত হয় না।

এই সমস্ত কারণে প্রশ্ন দেখা দিয়াছে যে, জনগণের ইচ্ছা কিভাবে বোঝা যাইবে? তাহাদের ইচ্ছা প্রকাশের পদ্ধতিই বা কী? এবং জনগণের সকলের একমত হওয়া কী সম্ভব? এই প্রশ্নগুলির উত্তরদান প্রসঙ্গে ডঃ গার্নার বলিয়াছেন, যে দেশে মোটামুটিভাবে সার্বজনীন ভোটাধিকার প্রথা প্রচলিত আছে, যেখানে বেশি সংখ্যক নির্বাচকমণ্ডলী আইনসিদ্ধ পদ্ধতিতে নিজস্ব অভিমত প্রকাশ করেন এবং উহার প্রাধান্য নিশ্চিত করেন, সেখানেই বুঝিতে হইবে যে জনসাধারণের সার্বভৌমিকতা কার্যকরী হইল।[9] ডাঃ গার্নারের এই ব্যাখ্যা অনেকের নিকট সন্তোষজনক মনে হয় নাই এবং তাঁহারা বাস্তবে জনগণের কোন সার্বভৌমিকতা থাকিতে পারে কিনা সেই বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন।

এইরূপ সন্দেহ হইবার কারণ বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে, 'জনগণের সার্বভৌমিকতা' বিভিন্ন সময়ে অস্পষ্ট ও অনির্দিষ্ট অর্থে ব্যবহার করায় এই সম্পর্কে

9. "The sovereignty of the People can mean nothing more than the power of the majority of the electorate, in a country where a system of approximate universal suffrage prevails, acting through legally established channels, to express their will and to make it prevail."—Garner.

কোন স্পষ্ট ও নির্দিষ্ট ধারণা সৃষ্টি হয় নাই। দ্বিতীয়ত, বিপ্লব কখনই আইন সঙ্গত কার্যের মর্যাদা পায় না, তাই জনগণের বিপ্লব সংগঠিত করিবার ক্ষমতাকে সার্বভৌমিকতার সমপর্যায়ে গণ্য করা অনেকে মানিতে পারেন নাই। তৃতীয়ত, সার্বভৌমিকতার সংজ্ঞা অনুযায়ী ইহা সর্বদা নির্দিষ্ট ও সংগঠিত হইবে। কিন্তু জনমতের এইরূপ স্পষ্টতা ও নির্দিষ্টতা না থাকায় ইহাকে সার্বভৌমের আইনসঙ্গত মর্যাদা দেওয়া যায় না।

সিদ্ধান্ত : জনগণের সার্বভৌমিকতার ধারণাটি অস্পষ্ট, অনির্দিষ্ট এবং ইহার কোন বিজ্ঞানসম্মত অর্থ নাই, এইরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলেও এই তত্ত্বটির বাস্তব মূল্যকে অস্বীকার করা যায় না। বস্তুতপক্ষে জনগণের ইচ্ছা ও নির্দেশের বিরুদ্ধে গণতন্ত্রে কোন শাসনযন্ত্র সচল থাকিতে পারে না। পৃথিবীর ইতিহাস বার বার প্রমাণ করিয়াছে যে রাষ্ট্রের প্রকৃত ক্ষমতা জনগণের শক্তির ভিতরই লুক্কায়িত থাকে এবং জনগণের ইচ্ছাই রাষ্ট্রের ইচ্ছার ভিতর দিয়া অভিব্যক্তি লাভ করে। বর্তমান যুগে লিখিত শাসনতন্ত্র, ব্যাপক ভোটাধিকার, স্বায়ত্ত-শাসন, পার্লামেন্টের নিকট সরকারের দায়িত্বশীলতা, গণভোট (Referendum), গণউদ্যোগ (Initiative), প্রত্যাহারআজ্ঞা (Recall) প্রভৃতি ব্যাপকভাবে স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে এবং এই সমস্ত প্রথার ভিতর দিয়া জনগণ বহুলপরিমাণে রাষ্ট্রীয় শক্তি ও ইচ্ছাকে নিয়ন্ত্রণ করে। এই নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতাকে সার্বভৌমিকতা রূপে অভিহিত করিলে এই তত্ত্বকে অস্বীকার করা যায় না। এই প্রসঙ্গে গিলক্রাইস্টের (Gilchrist) মত উল্লেখ করা যাইতে পারে। তিনি বলিয়াছেন যে, 'জনগণের সার্বভৌমিকতা' দ্বারা 'জনগণের নিয়ন্ত্রণ' ক্ষমতাকেই নির্দেশ করা হয় (The phrase 'popular control' better indicates the idea underlying 'popular sovereignty')।

৫ ॥ যুক্তরাষ্ট্রে সার্বভৌমিকতার অবস্থান (Location of sovereignty in a Federation)

সার্বভৌমিকতার সংজ্ঞা নির্দিষ্ট চরিত্র ও বৈশিষ্ট্যগুলি মনে রাখিলে স্বভাবতই প্রশ্ন ওঠে যে সার্বভৌমিকতা প্রকৃতপক্ষে কোথায় অবস্থান করে। এই প্রশ্ন আরও জটিল হইয়া দেখা দেয় যখন আমরা যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় সার্ব ভৌমত্বের স্থান নির্দেশ করিবার চেষ্টা করি। তাই অধ্যাপক ল্যাস্কি বলিয়াছেন

যে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় সার্বভৌমিকতার অবস্থান নির্ণয় করা সম্পূর্ণ অসম্ভব ব্যাপার।[10]

সার্বভৌমিকতার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হইতেছে অবিভাজ্যতা। যুক্তরাষ্ট্রে ক্ষমতার এই অবিভাজ্যতা থাকে না। কারণ, যুক্তরাষ্ট্রে ক্ষমতা বিভক্ত থাকে। কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারগুলি নিজ নিজ এক্তিয়ারের মধ্যে নির্দিষ্ট ক্ষমতার অধিকারী। যুক্তরাষ্ট্রে অঙ্গরাজ্যগুলি যদিও স্বাধীন নয় কিন্তু কিছু পরিমাণ স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিতে পারে। শাসনতন্ত্রের বিধান অনুযায়ী যুক্তরাষ্ট্রে কেন্দ্রীয় সরকার ও অঙ্গরাজ্যগুলির ক্ষমতা নির্দিষ্ট ও সীমাবদ্ধ থাকে। এইজন্য কোন সরকারই সেখানে চরম, অপ্রতিহত ও চূড়ান্ত ক্ষমতার অধিকারী নয়। এই প্রসঙ্গে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে।

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় আইনসভা ও অঙ্গরাজ্যগুলির আইনসভার আইন প্রণয়ন করিবার ক্ষমতা শাসনতন্ত্র দ্বারা নির্দিষ্ট এবং সেইজন্য সীমাবদ্ধ। শাসনতন্ত্র কর্তৃক নির্দেশিত সীমা অতিক্রম করিয়া সেখানকার কেন্দ্রীয় বা অঙ্গ রাজ্যগুলির কোন আইনসভা যদি আইন প্রণয়ন করে তবে উক্ত আইনকে সর্বোচ্চ আদালত অবৈধ বলিয়া ঘোষণা করিতে পারে। অতএব দেখা যাইতেছে যে আমেরিকায় রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা বিভক্ত ও বন্টিত। সেইজন্য সেখানে চূড়ান্ত সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী কেহ নয়। সোবিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান পর্যালোচনা করিলে দেখা যাইবে যে সেখানেও সংবিধানের ১৪-১৮ ধারা অনুযায়ী কেন্দ্রীয় সরকার ও ইউনিয়ন রিপাবলিকগুলির মধ্যে ক্ষমতা বন্টিত হইয়াছে।

এই সমস্ত জটিলতা লক্ষ্য করিয়া কেহ কেহ মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, যুক্তরাষ্ট্রে আইনসভাই সার্বভৌম। কিন্তু এই মত গ্রহণ করা যায় না। কারণ পূর্বের আলোচনা হইতে লক্ষ্য করা গিয়াছে যে যুক্তরাষ্ট্রে আইনসভার ক্ষমতা সীমিত ও নির্দিষ্ট। তাই আইনসভা অপ্রতিহত সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী হইতে পারে না।

আবার কেহ কেহ বলেন, রাষ্ট্রের মধ্যে যে কর্তৃপক্ষ আইন প্রণয়ন ও তাহার সংশোধন করিবার অধিকারী সেই কর্তৃপক্ষই যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় প্রকৃত সার্বভৌম শক্তির অধিকারী। কিন্তু এই যুক্তিও গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের আইনসভাগুলি এককভাবে শাসনতন্ত্র পরিবর্তন করিবার

10. "Discovery of Sovereignty in a Federal State is.........an impossible adventure."—Laski

অধিকারী নয়,—সেখানে অত্যন্ত জটিল প্রক্রিয়ার ভিতর দিয়া শাসনতন্ত্র পরিবর্তিত হয়।

এই সমস্ত অসুবিধা লক্ষ্য করিয়া কেহ কেহ বলিয়াছেন যে যুক্তরাষ্ট্রে সংবিধান বা শাসনতন্ত্রই সার্বভৌম। এই বক্তব্য সত্য হইলে অষ্টিনের সার্বভৌমিকতার তত্ত্ব ভুল প্রমাণিত হয়। কারণ সংবিধান একটি দলিলমাত্র, ইহার দ্বারা কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা ব্যক্তি সমষ্টিকে বোঝায় না। তাহা ছাড়া যুক্তরাষ্ট্রে সংবিধান চরম হইলেও ইহা পরিবর্তনীয়। সুতরাং সেইক্ষেত্রে সংবিধান পরিবর্তনের ক্ষমতাকেই সার্বভৌম বলা উচিৎ। অর্থাৎ দেখা যাইতেছে এই মতবাদও গ্রহণযোগ্য নয়। কেহ কেহ মত পোষণ করিয়া বলেন যে, যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় সার্বভৌম ক্ষমতা বিভাজ্য। এই মত গ্রহণ করিলেও অষ্টিনের সার্বভৌমিকতার মতবাদ বাতিল হইয়া যায়।

যুক্তরাষ্ট্রে সার্বভৌমিকতার অবস্থান সম্পর্কীয় প্রশ্নের উত্তর দিয়া উইলোবি (Willoughby) বলিয়াছেন যে, একই ব্যক্তির মধ্যে দুইটি ইচ্ছা থাকিলে—দুই-ই চূড়ান্ত হইতে পারে না। যদিও রাষ্ট্রের চরম ইচ্ছা খণ্ডিত হইতে পারে না, কিন্তু সেই ইচ্ছা একাধিক আইন-প্রণয়ণী সভা হইতে প্রকাশিত হইতে পারে এবং তাহার আজ্ঞাকে কার্যকরী করিবার ভারও বহুতর কর্মসম্পাদনী বিভাগের উপর ন্যস্ত হইতে পারে। যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে একই কথা বলা যাইতে পারে। আইন প্রণয়ন ও তাহাকে সংশোধন করিবার অধিকারী কর্তৃপক্ষের হস্তেই যুক্তরাষ্ট্রে সার্বভৌম ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত থাকে। প্রকৃতপক্ষে সেখানে যাহা ভাগ করা হয় তাহা সার্বভৌম ক্ষমতা প্রয়োগের বিষয় ও পদ্ধতি, সার্বভৌম ক্ষমতা নয়।

৬॥ অষ্টিনের সার্বভৌমিকতার মতবাদ (Austinian theory of Sovereignty)

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে সার্বভৌমিকতার তত্ত্বের প্রথম পরিপূর্ণ এবং বিজ্ঞান-সম্মত প্রকাশ ঘটিয়াছে ইংরেজ আইনশাস্ত্রবিদ জন অষ্টিনের লেখার মধ্য দিয়া। ১৮৩২ সালে জন অষ্টিন তাঁহার "Lecturers on Jurisprudence" নামক গ্রন্থে আইন ও সার্বভৌমিকতা সম্বন্ধে নিজস্ব মতবাদ উপস্থিত করেন। হবস ও হিতবাদী (utilitarian) বেন্থামের (Bentham) শিক্ষায় অনুপ্রাণিত হইয়া

আইনের দৃষ্টিতে অষ্টিন সার্বভৌমিকতা সম্বন্ধে যে মতবাদ প্রচার করিলেন তাহা ব্যবহারশাস্ত্র ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে প্রভূত পরিমাণে প্রভাবিত করিয়াছে।

অষ্টিন সার্বভৌমিকতার সংজ্ঞা দিয়া বলিলেন: "যদি কোন সুনির্দিষ্ট মানবীয় কর্তৃপক্ষ (যাহা ব্যক্তি বা ব্যক্তিসমষ্টি হইতে পারে) অন্য কোন অনুরূপ কর্তৃপক্ষের বশ্যতা স্বীকারে অভ্যস্ত না হয়, অথচ সমাজের অধিকাংশ ব্যক্তির আনুগত্য সাধারণত লাভ করে, তাহা হইলে সেই সুনির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষকে সার্বভৌম বলা হইবে এবং উক্ত কর্তৃপক্ষসহ ঐ সমাজকে রাজনৈতিকভাবে গঠিত ও স্বাধীন সমাজ বলা হইবে।" [If a determinate human superior, not in the habit of obedience to a like superior, receives habitual obedience from the bulk of a given society, that determinate superior is sovereign in that society and the society (including the superior) is a society political and independent.]

অষ্টিনের বক্তব্য হইতে আইনের দৃষ্টিতে সার্বভৌমিকতার যে ধারণা অভিব্যক্ত হইয়াছে তাহা পর্যালোচনা করিলে আমরা নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি দেখিতে পাই।

(ক) সার্বভৌমিকতা সম্পর্কে কোন প্রকার অস্পষ্টতা না রাখিয়া অষ্টিন ইহাকে সুস্পষ্ট ও নির্দিষ্ট করিয়া তুলিয়াছেন। তাঁহার মতে প্রতিটি স্বাধীন রাষ্ট্রনৈতিক সমাজ সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী।

(খ) এই সার্বভৌমিকতা কোন ব্যক্তিবিশেষ বা ব্যক্তিসমষ্টি অর্থাৎ মানবীয় কর্তৃপক্ষের হাতে ন্যস্ত থাকে। ইহা নৈর্ব্যক্তিক নয়। সুতরাং সার্বভৌমিকতার নির্দিষ্ট অধিকারীর সন্ধান পাওয়া যায়।

(গ) সার্বভৌমিকতার নির্ধারিতরূপে সংগঠিত, যথাযথরূপে নির্দিষ্ট এবং আইনদ্বারা স্বীকৃত।

(ঘ) সেই ব্যক্তি বা ব্যক্তিসমষ্টি, যাহার হাতে সার্বভৌমিকতা ন্যস্ত থাকে, কাহারো কাছে আনুগত্য প্রকাশ করে না, কিন্তু মোটামুটিভাবে সকলের নিকট হইতে আনুগত্য লাভ করে। সুতরাং সার্বভৌমিকতার ইচ্ছা কোন কিছু দ্বারা সীমাবদ্ধ নয়—ইহা চরম, চূড়ান্ত ও অসীম।

(ঙ) আইনের ভাষায় রাষ্ট্রের ইচ্ছাকে প্রকাশ করিবার একমাত্র অধিকার সার্বভৌম শক্তির। সার্বভৌমিকতার আজ্ঞা অমান্য করিবার অর্থ আইনভঙ্গ করা এবং সেই ক্ষেত্রে শাস্তিভোগ করিতেই হইবে।

(চ) সার্বভৌমিকতাই সর্বপ্রকার অধিকারের উৎস। নাগরিকগণ যে অধিকার ভোগ করেন তাহা সার্বভৌমই তাহাদিগকে প্রদান করে।

সার্বভৌমিকতার এই সংজ্ঞার ভিতর দিয়া অষ্টিন আইনগত সার্বভৌমিকতার সমস্ত লক্ষণই সংক্ষেপে অথচ সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত করিয়াছেন। এই সার্বভৌম সর্বপ্রকার আইনগত নিয়ম-কানুনের উৎস। এই সমস্ত নিয়ম-কানুনকে বিনা দ্বিধায় অভ্যাসগতভাবে মানিয়া চলিতে হইবে।

এই সমস্ত নিয়ম-কানুন প্রথমত বিধিবদ্ধ আইনের রূপে আসিতে পারে। সেই ক্ষেত্রে ইহাকে সার্বভৌমের প্রত্যক্ষ ইচ্ছা ও আজ্ঞা হিসাবে ধরিতে হইবে। যে সমস্ত ক্ষেত্রে বিচারকের বিচারের ভিতর দিয়া নিয়ম-কানুন ও আইনের উৎপত্তি ঘটে, সেইখানে বুঝিতে হইবে যে সার্বভৌমের বিচার বিভাগীয় প্রতিনিধির মাধ্যমে ইহা ঘোষিত হইল। যদি অপর পক্ষে প্রথাগত নিয়মের মধ্যে দিয়া আইনের উৎপত্তি হয় তাহা হইলে ইহাকে সার্বভৌমের আজ্ঞা হিসাবে মনে করিতে হইবে। কারণ, সার্বভৌম এইগুলিকে চালু থাকিতে দিয়াছে, তাহার অর্থ সেইগুলি প্রচলিত থাকুক ইহাই সাবভৌমের ইচ্ছা। এক কথায়, অষ্টিন বর্ণিত এই সার্বভৌম ক্ষমতা হইতেছে চরম ও অবাধ, সর্ববিধ আইনের উর্ধ্বে, সকল আইনের স্রষ্টা।

বহুত্ববাদী দার্শনিক ল্যাস্কি অষ্টিনের মতবাদের তিনটি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করিয়াছেন। প্রথমত, অষ্টিনের মতে রাষ্ট্র হইতেছে আইন অনুসারে সংগঠিত প্রতিষ্ঠান। দ্বিতীয়ত, রাষ্ট্রের এই সার্বভৌমিকতা অসীম ও অপ্রতিহত। সুতরাং সার্বভৌম অন্যায়ভাবে, অযৌক্তিকভাবে ও নীতিবহির্ভূত যে কোন কাজ করিতে পারে। তৃতীয়ত, সার্বভৌমিকতার আদেশই হইতেছে আইন। এই আদেশ পালন করা বাধ্যতামূলক।

সমালোচনা: সার্বভৌমিকতা সম্পর্কে অষ্টিনের বক্তব্যকে তীব্র সমালোচনার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে। হেনরী মেইন (Henry Maine), সিজ্উইক (Sidgwick), ক্লার্ক (Clark), প্রভৃতি পণ্ডিতগণ ইতিহাস, নীতিশাস্ত্র, আইন, সামাজিক প্রথা প্রভৃতির দৃষ্টিকোণ হইতে অষ্টিনের মতবাদকে তীব্র সমালোচনা করিয়াছেন।

হেনরী মেইন সমালোচনা করিয়া বলিয়াছেন যে, আইন সম্পর্কে অষ্টিনের ধারণা ত্রুটিপূর্ণ। কারণ, প্রচলিত ধর্মীয় ও প্রথাগত আইনগুলি সার্বভৌমের আদেশ দ্বারা কার্যকরী হয় নাই। চরম ক্ষমতাশালী রাজারাও (যেমন পাঞ্জাব-

কেশরী রণজিৎ সিংহ) এই সমস্ত প্রথা ভঙ্গ করিতে সাহস পান নাই। ইহার দ্বারা প্রমাণিত হয় সারভৌমিকতার ক্ষমতা প্রকৃতপক্ষে অবাধ এবং অসীম নহে। এই সীমাবদ্ধতা শুধুমাত্র নরপতিদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য নয়, ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের মত ক্ষমতাশালী সার্বভৌম সংস্থাও যে কোন প্রথাগত বিধানের বিষয় আইন করিতে সাহসী হন নাই। অষ্টিনের সমর্থকগণ অবশ্য প্রথাগত আইনকেও সার্বভৌমের আদেশ বলিয়া মনে করেন। কিন্তু ইহাকে যুক্তি হিসাবে গ্রহণ করা চলে না।

দ্বিতীয়তঃ, অষ্টিন যেভাবে সার্বভৌমিকতাকে চরম, চূড়ান্ত, অপ্রতিহত এবং অসীম ক্ষমতা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, ল্যাস্কি তাহার বিরোধিতা করিয়া বলিয়াছেন যে আইনের দিক হইতে বাধা না থাকিলেও কার্যত কোন সার্বভৌম জনগণের পরস্পরকে হত্যা, ব্যাপক লুণ্ঠন ও ভোটাধিকার হরণের জন্য আইন প্রণয়ন করিতে পারে না। সমাজ জীবনের সে অসংখ্য প্রভাব সার্বভৌমের ক্ষমতাকে সীমিত রাখে অষ্টিন তাহাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়াছেন।

তৃতীয়ত, অষ্টিন সার্বভৌমিকতার সংজ্ঞা যেইভাবে উপস্থিত করিয়াছেন তাহাতে 'রাষ্ট্রনৈতিক সার্বভৌমিকতা' ও 'জনসাধারণের সার্বভৌমিকতা'র তত্ত্বের কোন স্থান নাই। এই তত্ত্ব দুইটিকে অস্বীকার করিয়া অষ্টিন গণতন্ত্রের মূলে কুঠারাঘাত করিয়াছে। জনগণের ইচ্ছা, শক্তি ও অধিকার অষ্টিনের মতবাদে অবহেলিত হইয়াছে।

চতুর্থত, বাস্তব রাষ্ট্রনীতির সমস্ত ঘটানাকে অস্বীকার করিয়া শুধুমাত্র পীড়ন মূলক শক্তির উপর দৃষ্টি আবদ্ধ রাখিয়া অষ্টিন তাঁহার বক্তব্য উপস্থিত করিয়াছেন। অষ্টিন বলপ্রয়োগকে নিয়ম শৃঙ্খলার পূর্ববর্তী বলিয়া কল্পনা করিয়াছেন। অষ্টিনের মতে বলপ্রয়োগ করিয়া নিয়ম শৃঙ্খলা বজায় রাখা হয়। কিন্তু বর্তমান যুগে ইহা প্রমাণিত হইয়াছে যে মানুষ মূলত অভ্যাস ও ইচ্ছাবশতঃ আইন মান্য করে—শাস্তির ভয়ে নয়।

পঞ্চমত, অষ্টিনের মতবাদের তীব্র সমালোচনা করিয়া বহুত্ববাদীগণ (Pluralists) বলিয়াছেন যে, রাষ্ট্র চূড়ান্ত, অবিভাজ্য ক্ষমতার অধিকারী হইতে পারে না। কারণ রাষ্ট্রের অন্তর্গত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, সংস্থা এবং সংঘগুলির মানবজীবনে বিশেষ ভূমিকা রহিয়াছে এবং স্বাভাবিকভাবেই ইহারাও কিছু কিছু সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। সর্বোপরি অষ্টিনের সার্বভৌমিকতার তত্ত্বকে অসম্পূর্ণতার দোষে দুষ্ট বলা হইয়াছে। ইহার কারণ আইনগত দিকে

অত্যধিক গুরুত্ব দিবার ফলে অন্যান্য সামাজিক প্রভাবগুলির কার্যকরী ভূমিকাকে অষ্টিন উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। অষ্টিনের তত্ত্বের বিরুদ্ধে বহুত্ববাদীদের বক্তব্য আমরা পরে স্বতন্ত্রভাবে আলোচনা করিতেছি।

উপসংহারে বলা যাইতে পারে যে, এই সমস্ত সমালোচনা সত্ত্বেও স্বীকার করিতে হইবে যে সার্বভৌমিকতার আইনগত ব্যাখ্যা হিসাবে এই মতবাদের বিশেষ মূল্য রহিয়াছে। আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের অনেকেই মনে করেন যে সমালোচকেরা অনেক ক্ষেত্রেই অষ্টিনের প্রতি অবিচার করিয়াছেন। ডঃ গার্ণার স্বীকার করিয়াছেন যে সার্বভৌমিকতার আইনগত চরিত্র সম্বন্ধে অষ্টিনের তত্ত্ব মোটের উপর সুস্পষ্ট ও যুক্তিসঙ্গত।[11] অষ্টিনের বিরুদ্ধে পাশবিক শক্তি এবং সার্বভৌমিকতাকে অভিন্ন বলিয়া গণ্য করিবার যে অভিযোগ এবং সমালোচনার ঝড় উঠিয়াছে তাহা একান্তভাবেই ভিত্তিহীন। কোকার (Coker) যথার্থভাবেই বলিয়াছেন যে অষ্টিনের মতবাদে পাশবিক শক্তি ও সার্বভৌমিকতাকে অভিন্নভাবে কল্পনা করিবার কোন ইঙ্গিত নাই।

৭ ॥ সীমাবদ্ধ সার্বভৌমিকতার তত্ত্ব (Theory of limited Sovereignty)

সার্বভৌমিকতা সম্পর্কিত অষ্টিনের বক্তব্য এই কথাই ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করিয়াছে যে সার্বভৌমিকতার শক্তি চরম, অসীম ও অপ্রতিহত। সার্বভৌম শক্তি থাকিবার জন্য রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব অযৌক্তিকভাবে, অন্যায়ভাবে এবং নীতিহীনভাবে নিজ ইচ্ছা অনুযায়ী কাজ করিতে পারে। রাষ্ট্রের এই সমস্ত কার্যকে আইনানুমোদিতভাবে বাধা দেওয়া যায় না, কারণ রাষ্ট্রের আদেশ ও নির্দেশই আইন। এইভাবে অষ্টিন ও তাঁহার সমর্থকেরা সার্বভৌমিকতাকে এমন স্তরে উন্নীত করিলেন যাহার ফলে মনে হইল যে কি আভ্যন্তরীণ, কি রাষ্ট্র বহিঃস্থ, সর্বক্ষেত্রেই ইহার ক্ষমতা চূড়ান্ত ও অসীম; কোনরূপ আইন কানুন বা বাধা নিষেধের দ্বারা ইহাকে প্রতিহত করা যায় না।

সার্বভৌমিকতার এইরূপ চূড়ান্ত ক্ষমতা সম্পর্কীয় ধারণার বিরোধিতা করিয়া সীমাবদ্ধ সার্বভৌমিকতার তত্ত্ব (Theory of limited Sovereignty) আত্মপ্রকাশ করিল এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞানীগণ দেখাইবার চেষ্টা করিলেন যে আভ্যন্তরীণ

11. "......as a conception of strict legal nature of Sovereignty, Austin's theory is on the whole, clear and logical."—Garner.

ও বাহ্যিক উভয় ক্ষেত্রেই সার্বভৌমিকতা একান্তভাবে সীমাবদ্ধ। গেটেল বলিয়াছেন, যে আন্তর্জাতিকতাবাদীরা সার্বভৌম রাষ্ট্রকে শৃঙ্খলের দ্বারা আবদ্ধ রাখিয়া এবং বহুত্ববাদীরা আভ্যন্তরীণ অস্ত্রপচার করিয়া সার্বভৌম ক্ষমতাকে সীমিত রাখেন।[12] লর্ড ব্রাইস (Bryce) বলিলেন যে সর্বদিক দিয়া বাধা-বন্ধনহীন অসীম, চূড়ান্ত ক্ষমতাশালী সার্বভৌমককে বাস্তবজীবনে কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না। ব্লুনৎস্লী আর একটু পরিষ্কার করিয়া বলিলেন: রাষ্ট্র বাহিরের দিক হইতে অন্যান্য রাষ্ট্রের অধিকারের দ্বারা এবং আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে ইহার নিজস্ব চরিত্র ও ব্যক্তি সমষ্টির অধিকারের দ্বারা সীমাবদ্ধ। "It (state) is limited externally by the right of other states and internally by its own nature and the rights of its individual members."

ব্লুনৎস্লীর মতে আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে সার্বভৌমিকতাকে মূলত দুইটি সীমা মানিয়া চলিতে হয়। প্রথমত শাসনতন্ত্রের বাধা। শাসনতান্ত্রিক বাধা সৃষ্টি হইবার কারণ এই যে, রাষ্ট্র যে শাসনতন্ত্র রচনা করে, সেই শাসনতন্ত্র দ্বারা নিজেই সীমাবদ্ধ হয়। তাই রাষ্ট্রেব সার্বভৌমিকতাও এই শাসনতন্ত্রের দ্বারা সীমিত। কিন্তু অনেকে মনে করেন যে শাসনতান্ত্রিক আইনের দ্বারা সার্বভৌমিকতা সীমিত হয় না। কারণ, শাসনতন্ত্র যিনি প্রণয়ন করেন তিনি প্রয়োজনবোধে ইহাকে সংশোধন ও পরিবর্তনের ক্ষমতাও রাখেন। সুতরাং শাসনতন্ত্র যখনই রাষ্ট্রের সার্বভৌমিকতাকে সীমিত করিতে যাইবে তখনই রাষ্ট্রের সার্বভৌম শক্তি শাসনতন্ত্রের প্রয়োজনীয় সংশোধন করিয়া নিজের ক্ষমতাকে অক্ষুণ্ণ রাখিবার চেষ্টা করিবে।

দ্বিতীয়ত, প্রজাসাধারণের অধিকার দ্বারা আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে সার্বভৌমিকতা কি ভাবে সীমিত হয় তাহা আলোচনা করা যাইতে পারে। অধিকার সম্পর্কে বক্তব্য হইতেছে এই যে, স্বাভাবিক অধিকার বলিয়া কোন বস্তু নাই। রাষ্ট্রই অধিকার সৃষ্টি করে। সমাজ অধিকারকে মানিয়া লয়, রাষ্ট্র তাহার বিধিবদ্ধ রূপদান করিয়া রক্ষণাবেক্ষণের ভার গ্রহণ করে এবং এইভাবেই অধিকার স্বকীয় মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে, সামাজিক চেতনা হইতে যে

12. "The Internationalist would shakle the Leviathan with chains while the Pluralists would perform the necessary operations in the interior."—Gettell

অধিকারের দাবী উত্থাপিত হয়, সার্বভৌম সেই অধিকারকে মানিয়া লয়। যাঁহারা মনে করেন যে প্রজাসাধারণের অধিকার দ্বারা আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে সার্বভৌমিকতা সীমাবদ্ধ তাঁহারা বলেন যে, সার্বভৌম সামাজিক চিন্তা ও চেতনার বিরুদ্ধে বিধিবদ্ধ আইন প্রণয়ন করিতে পারে না। এই প্রসঙ্গে ল্যাস্কি বলিয়াছেন যে, প্রতিযুগের মানুষের নিকটই সরকারের আইন প্রণয়নের তথাকথিত অসীম ক্ষমতার সীমারেখা সুপরিচিত। কিন্তু লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে রাষ্ট্র কর্তৃক সামাজিক চেতনার বিরুদ্ধে আইন প্রণয়ন ও হস্তক্ষেপের ঘটনা বিরল নহে।

রাষ্ট্র বহিঃস্থ (external) বা অন্যান্য রাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের সার্বভৌমিকতা একান্তভাবেই সীমিত এই কথা প্রমাণ করিবার জন্য বলা হইয়া থাকে যে, আন্তর্জাতিক আইন, আন্তর্জাতিক সংস্কার অনুশাসন, অন্যান্য রাষ্ট্রের ইচ্ছা এবং পৃথিবীর জনমনের দ্বারা বিভিন্ন রাষ্ট্রের কার্যাবলী বহুল পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত হয়। রাষ্ট্র বহিঃস্থ ব্যাপারে বা অন্যান্য রাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে সার্বভৌমিকতার অজুহাতে রাষ্ট্র তাহার চূড়ান্ত ইচ্ছাকে প্রয়োগ করিতে পারে না। প্রতি রাষ্ট্রই যদি সার্বভৌমিকতার দম্ভে নিজের নিজের চূড়ান্ত ইচ্ছাকে কার্যকরী করে তাহা হইলে পৃথিবী হইতে যুক্তি, ন্যায় ও নীতি লুপ্ত হইবে এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এক চরম অরাজকতা দেখা দিবে।

রাষ্ট্রাভ্যন্তরে যেমন যে কোন ব্যক্তির ইচ্ছাই চূড়ান্ত নয়, তেমনি বিভিন্ন রাষ্ট্র মিলিত হইয়া যে বৃহৎ মানবসমাজ বা রাষ্ট্রগোষ্ঠি সৃষ্টি করিয়াছে, সেখানেও কোন একটি বিশেষ রাষ্ট্রের ইচ্ছা চূড়ান্ত হইতে পারে না। কোন রাষ্ট্র আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে নিজের ইচ্ছামত ক্ষমতা প্রয়োগ করিলে অন্যান্য রাষ্ট্রের অধিকার নষ্ট হইবে। তাই বিভিন্ন রাষ্ট্রের পারস্পরিক স্বার্থ ও অধিকার রক্ষার জন্যই রাষ্ট্রবহিঃস্থ সার্বভৌমিকতা সীমাবদ্ধ হইতে বাধ্য।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, আইনানুগ সার্বভৌমিকতার ধারণা, যাহা মনে করে যে রাষ্ট্রাভ্যন্তরে এবং রাষ্ট্রবহিঃস্থ সমস্ত ক্ষেত্রেই সার্বভৌমিকতা একটি চরম ও অসীম ক্ষমতা, বহুল পরিমাণে তাহার স্বকীয় বৈশিষ্ট্য হারাইয়াছে এবং বস্তুত এই প্রকারের সার্বভৌমিকতা কোথাও দেখা যায় না। তাই উইলসন (Wilson) বলিয়াছেন: আইনের দৃষ্টিতে সার্বভৌমিকতার যে ধারণা বাস্তবে তাহা কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না।[13] ব্যবহারিক জগতে এবং

13. "Sovereignty as ideally conceived in legal theory, no where actually exists."—Wilson

পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে কোন রাষ্ট্র স্বেচ্ছাচারীভাবে চলে না, এইরূপ চলা সম্ভবও নয়। কারণ রাষ্ট্রের ক্ষমতা ভিতরে এবং বাহিরে অন্যের বিভিন্ন প্রকার অধিকার ও ইচ্ছা দ্বারা সীমাবদ্ধ (The state is limited within, it is limited without)।

৮॥ বহুত্ববাদী সমালোচনা (Pluralistic attacks on Sovereignty)

পূর্বেই আলোচনা করা হইয়াছে যে অষ্টিনের সার্বভৌমিকতার তত্ত্বকে বহুত্ববাদীরা তীব্র ভাষায় সমালোচনা করিয়াছেন। অষ্টিন প্রদত্ত অবাধ, অসীম ও চূড়ান্ত ক্ষমতাসম্পন্ন সার্বভৌমিকতার যে তত্ত্ব লইয়া এতক্ষণ আলোচনা করা হইয়াছে তাহাই একাত্মবাদ (Monism) নামে অভিহিত। এই তত্ত্বের সমর্থকদের একাত্মবাদী (Monists) বলা হয়। অপরপক্ষে সার্বভৌমের অবাধ ও অসীম কর্তৃত্বের ঐকাত্মবাদী মতবাদের বিরুদ্ধাচারণ করিয়া যাঁহারা প্রচার করিলেন যে মানুষের বহুমুখী জীবনের পরিপূর্ণতার জন্য রাষ্ট্র ব্যতীত অন্যান্য সংগঠনেরও ভূমিকা আছে এবং ইহারাও সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী, তাহারাই বহুত্ববাদী (Pluralists) নামে পরিচিত। বহুত্ববাদী মতবাদ শুধুমাত্র একটি গুরুত্বপূর্ণ সমালোচনাই নহে, ইহা একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্রনৈতিক আদর্শ হিসাবে (Pluralism as a political ideal) ক্রমশ স্বীকৃতিলাভ করিতেছে বলিয়া আমরা বহুত্ববাদকে স্বতন্ত্রভাবে আলোচনা করিতেছি। একত্ববাদীরা রাষ্ট্রের সার্বভৌমিকতাকে অবাধ, অসীম, অপ্রতিহত ও অনিয়ন্ত্রিত বলিয়া প্রচার করিবার ফলে সর্বশক্তিমান রাষ্ট্রের কর্তৃত্বাধীনে ব্যক্তিস্বাধীনতা ও সমাজের অন্যান্য সংঘগুলির অস্তিত্ব বিপন্ন হইয়া উঠিল। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্ত রাষ্ট্রচিন্তা জগতে এই মতবাদ বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিবার ফলে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য লুপ্ত হইতে লাগিল। একাত্মবাদীদের চিন্তাধারার এই আতিশয্যের ফলে কেন্দ্রীভূত, সর্বাত্মক ও অপ্রতিহত রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে স্বাভাবিক কারণেই এক প্রবল প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। গিয়ার্কে (Gierke), মেইটল্যাণ্ড (Maitland), বার্কার (Barker), ল্যাস্কি, কোল (Cole), ম্যাক-আইভার (MacIver) প্রভৃতি বহুত্ববাদীগণ তাহাদের মতবাদের ভিতর দিয়া একাত্মবাদের ত্রুটি উদ্‌ঘাটন করিয়া রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাকে সীমিত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

একাত্ববাদীদের মতবাদকে বহুত্ববাদীরা তিনটি দৃষ্টিকোণ হইতে সমালোচনা করিয়াছেন। প্রথমত, রাষ্ট্র ও অন্যান্য সংস্থার সম্পর্কের পরিপ্রেক্ষিতে; দ্বিতীয়ত, রাষ্ট্র ও আন্তর্জাতিক সম্পর্কের পরিপ্রেক্ষিতে এবং তৃতীয়ত, রাষ্ট্র ও আইনের পারস্পরিক সম্পর্কের ভিত্তিতে এই সমালোচনা করা হইয়াছে।

বহুত্ববাদীগণের মতে মানুষের বহুমুখী জীবনের পরিপূর্ণতা ও স্বভাবসুলভ বৈশিষ্ট্যের পূর্ণবিকাশের জন্য রাষ্ট্রের যেরূপ প্রয়োজনীয়তা আছে, সমাজের অন্যান্য সংগঠন ও সংস্থারও এ ব্যাপারে বিশেষ ভূমিকা রহিয়াছে। মানুষের বহুমুখী জীবনকে শুধুমাত্র রাষ্ট্র পরিচালনা করিতে পারে না। সেইজন্য প্রয়োজনের তাগিদে মানুষকে পরিবার, ধর্মসংস্থা, সংঘ, বিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয় শ্রমিকসংঘ প্রভৃতি সৃষ্টি করিতে হইয়াছে। এই প্রতিষ্ঠানগুলি প্রত্যেকটির একটি স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ও উদ্দেশ্য রহিয়াছে যাহা রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। মানুষের ব্যক্তিত্বের প্রকাশ ও বিকাশের জন্য এই সমস্ত প্রতিষ্ঠান অপরিহার্য। তাই মানুষ শুধুমাত্র রাষ্ট্র লইয়া বা ইহার নাগরিক জীবন লইয়া সন্তুষ্ট থাকিতে পারে না। মানুষের সামাজিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয় ও কৃষ্টিগত প্রয়োজনের তাগিদেই সমাজের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি হইয়াছে। এই প্রতিষ্ঠানগুলি বিভিন্নভাবে মানুষের জীবনে উপযোগিতা সৃষ্টি করিয়া তাহার ব্যক্তিত্ব বিকাশে সাহায্য করে। সুতরাং ব্যক্তির আনুগত্য শুধুমাত্র রাষ্ট্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিতে পারে না। এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানগুলির প্রতিও তাহাকে আনুগত্য প্রকাশ করিতে হয়। সুতরাং একাত্ববাদীগণের এই দাবী যে রাষ্ট্রই চরম ক্ষমতার অধিকারী একমাত্র প্রতিষ্ঠান—যাহার নিকট জনগণ পূর্ণ আনুগত্য প্রকাশ করিবেন, বহুত্ববাদীগণ স্বীকার করেন না। তাঁহাদের মতে সমাজের মধ্যে রাষ্ট্র একটি বিরাট প্রতিষ্ঠান সন্দেহ নাই, কিন্তু রাষ্ট্র একমাত্র প্রতিষ্ঠান নয়।

সুতরাং দেখা যাইতেছে, মানুষের পরিপূর্ণ জীবনের জন্য রাষ্ট্রের যেমন প্রয়োজন আছে তেমনি অন্যান্য সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলিরও বিশেষ প্রয়োজন ও ভূমিকা রহিয়াছে। তাই বহুত্ববাদগীণ শুধুমাত্র রাষ্ট্রকে সার্বভৌম ক্ষমতার একক-অধিকারী করিতে আপত্তি প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে, প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ এবং প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলী দ্বারা এই সীমা নির্ধারিত হইয়া থাকে। সুতরাং বহুত্ববাদীগণ শুধুমাত্র রাষ্ট্রকে অসীম ক্ষমতা হইতে বঞ্চিত করিতেই চাহিতেছেন না, তাঁহাদের মতে রাষ্ট্রই সার্বভৌম

ক্ষমতার একমাত্র মালিক নয়। সমাজের অন্যান্য উপযোগী ও প্রয়োজনীয় সংগঠনগুলি নিজ নিজ কার্যক্ষেত্রে সম্পূর্ণ স্বাধীন ও স্বাবলম্বী—ইহাদের উপর রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার কোন প্রয়োজন নাই।

এইরূপ বিশ্লেষণের দ্বারা বহুত্ববাদীগণ প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিলেন যে, রাষ্ট্রের কার্যকলাপ একটা নির্দিষ্ট গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ। ক্ষমতা যদি কার্যের আনুপাতিক হয় তবে রাষ্ট্রের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ হইতে বাধ্য, কারণ ইহার কার্যকলাপের নির্দিষ্ট সীমা আছে। সেই অনুযায়ী সমাজের প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের কিছু পরিমাণ ক্ষমতা আছে, কারণ মানুষের জীবনের বহুমুখী বিকাশের জন্য ইহাদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রহিয়াছে। এইরূপে বহুত্ববাদীগণ রাষ্ট্রকে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলির সমপর্যায়ভুক্ত করিলেন।

দ্বিতীয়ত, বহুত্ববাদীগণের মতে রাষ্ট্রের ক্ষমতা শুধুমাত্র আভ্যন্তরীণ ব্যাপারেই সীমাবদ্ধ নয়—বৈদেশিক ক্ষেত্রেও ইহা একান্তভাবেই সীমাবদ্ধ। তাঁহাদের মতে আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে যেমন রাষ্ট্রের ক্ষমতা অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের অধিকারের দ্বারা সীমাবদ্ধ, ঠিক তেমনি বাহ্যিক বা বৈদেশিক ক্ষেত্রেও ইহা অন্যান্য রাষ্ট্রের অধিকারের দ্বারা সীমিত। আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে রাষ্ট্রকে অসীম ও অপ্রতিহত ক্ষমতার অধিকারী করিয়া তুলিলে ব্যক্তিস্বাধীনতা ও সমাজের অন্যান্য সংঘগুলির অস্তিত্ব যেরূপ বিপন্ন হইবার সম্ভাবনা দেখা দেয়, বৈদেশিক ক্ষেত্রেও রাষ্ট্রের এই ক্ষমতা স্বীকৃত হইলে অরাজকতা দেখা দিবার এবং বিশ্বশান্তি বিঘ্নিত হইবার সম্ভাবনা থাকে। কারণ আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে অবাধ ক্ষমতা প্রয়োগের ফলে যুদ্ধ অনিবার্য হইয়া উঠে এবং মানবসভ্যতা ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। এইজন্যই বহুত্ববাদীগণ রাষ্ট্রের ক্ষমতাকে আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক উভয় ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ বলিয়া মনে করেন।

তৃতীয়ত, আইন সার্বভৌমের আদেশ—অষ্টিনের এই বক্তব্যের বিরোধিতা করিয়া বহুত্ববাদীগণ প্রচার করিলেন যে রাষ্ট্র আইনের ঊর্ধ্বে নয়—রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা আইন দ্বারা সীমাবদ্ধ। আইন এক প্রকারের সামাজিক বিধিনিষেধ যাহার উৎপত্তি রাষ্ট্রের পূর্বে ঘটিয়াছে। একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে রাষ্ট্র এই সমস্ত নিয়ম বা আইনের কর্তৃত্বাধীন। সুতরাং রাষ্ট্র আইন সৃষ্টি করিয়াছে এ কথা স্বীকার করা যায় না। আইনের উৎপত্তি ঘটিয়াছে সামাজিক প্রয়োজনীয়তা ও অধিকারবোধের মধ্য দিয়া।[14]

14. "There is only one source of law—the feeling or sense of right."
—Spahr (Readings in Political Philosophy)

বহুত্ববাদের সমর্থনে রাষ্ট্রের কার্যাবলী ও প্রকৃতি বিশ্লেষণ করিয়া ম্যাকআইভার দেখাইবার চেষ্টা করিলেন যে, রাষ্ট্র মানুষের বহির্জীবন নিয়ন্ত্রিত করে বটে, কিন্তু ইহার আভ্যন্তরীণ জীবন পরিচালনা করিবার শক্তি ও যোগ্যতা ইহার নাই। মানুষের আভ্যন্তরীণ জীবনের সূক্ষ্ম অনুভূতিগুলির প্রকাশ ও বিকাশের ক্ষেত্রে রাষ্ট্র প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না। সে ব্যাপারে রাষ্ট্র একান্তভাবেই অনুপযোগী। এই প্রসঙ্গে ম্যাকআইভার বলিয়াছেন যে, একটি পেন্সিল কাটিবার পক্ষে একখানি কুঠার যেমন অনুপযোগী রাষ্ট্রও মানুষের আভ্যন্তরীণ জীবনের সূক্ষ্ম অনুভূতিগুলি নিয়ন্ত্রণের পক্ষে ঠিক তেমনি অনুপযোগী অস্ত্র। বার্কারের মতে নাগরিক শুধুমাত্র ব্যক্তি নয়—গোষ্ঠীভূক্ত জীব, হিসাবেও তাহার একটি অস্তিত্ব রহিয়াছে। এই সমস্ত দল বা গোষ্ঠীর নিজস্ব ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের অধিকারকে সীমাবদ্ধ রাখিবার প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে। কিন্তু রাষ্ট্রের ক্ষমতাকে অবাধ, চরম ও অসীম করিয়া তুলিলে সার্বভৌমিকতার চাপে এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানের গোষ্ঠীস্বাধীনতা বিঘ্নিত হইবে। বহুত্ববাদীগণের মতে বর্তমান জটিল অর্থনৈতিক জীবনের নিখুঁত সমাধান করা রাষ্ট্রের পক্ষে সম্ভব নয়। তাই বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণ ও রাষ্ট্রনৈতিক প্রতিনিধিত্বের ভার অর্পণ করা প্রয়োজন। লিণ্ডসে (Lindsay) ঘোষণা করিলেন যে, ঘটনার দিকে তাকাইলে পরিষ্কার বোঝা যায় যে রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমকতার তত্ত্ব ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে।[15]

বহুত্ববাদের অন্যতম সমর্থক অধ্যাপক ল্যাস্কির মতে বিবেকের অনুশাসন দ্বারা পরিচালিত হওয়াই মানুষের কর্তব্য। সুতরাং মানুষের বিবেকই রাষ্ট্রের ক্ষমতার সীমা নির্ধারণ করিবে, রাষ্ট্র মানুষের নিকট হইতে চরম আনুগত্য দাবী করিতে পারে না। রাষ্ট্রের আইনসঙ্গত সার্বভৌমিকতাকে ল্যাস্কি আইনের কল্পনা ও শূন্যগর্ভ ধারণা বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।[16] ল্যাস্কির মতে, সমাজের সমস্ত কার্য রাষ্ট্রের দ্বারা সম্পাদিত হইতে পারে না। এই সমস্ত কার্য সম্পাদনের জন্য অন্যান্য সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলির প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে। সুতরাং রাষ্ট্র এবং অন্যান্য সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলি স্ব স্ব ক্ষেত্রে সার্বভৌম। একত্ববাদীদের সার্বভৌমিকতার স্বরূপ বিশ্লেষণ করিয়া ল্যাস্কি বলিলেন:

15. "If we look at the facts, it is clear enough that theory of the Sovereign State has broken away."—Lindsay

16. "The doctrine of Sovereignty is a legal fiction and a barren concept."—Laski

"সার্বভৌমিকতার সমগ্র ধারণাটিকে পরিত্যাগ করিলে রাষ্ট্রবিভাগের চিরস্থায়ী উপকার সাধিত হইবে" (If would be of lasting benefit to political science if the whole concept of sovereignty were surrendered) ।

সমালোচনা : বহুত্ববাদীগণ যে সমস্ত বক্তব্য উত্থাপন করিয়াছেন তাহাকে সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করা যায় না। বহুত্ববাদীদের মতে সমাজের অন্তর্গত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানগুলি স্বাধীন, ক্ষমতাশালী ও রাষ্ট্রপ্রভাবমুক্ত। কিন্তু সমস্যা হইতেছে এই যে, সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলির সম্ভাব্য প্রতিদ্বন্দ্বিতার সময় সার্বভৌম ক্ষমতাসম্পন্ন রাষ্ট্রের অবর্তমানে কোন প্রতিষ্ঠান এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা প্রশমিত করিবার জন্য যথাযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করিবে। বহুত্ববাদীদের মতে এই সমস্ত বিশেষ অবস্থায় রাষ্ট্র নিরপেক্ষ বিচারকের ভূমিকা গ্রহণ করিয়া শান্তি স্থাপন করিবে। সুতরাং বহুত্ববাদীগণ পরোক্ষভাবে রাষ্ট্রের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিতেছেন।

দ্বিতীয়ত, বহুত্ববাদীগণ রাষ্ট্র ও অন্যান্য সামাজিক প্রতিষ্ঠানকে সমপর্যায়ভুক্ত করিয়া সার্বভৌম ক্ষমতাকে বিভক্ত করিয়াছেন। অর্থাৎ তাঁহারা রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতাকে সীমিত করিয়া অন্যান্য সামাজিক প্রতিষ্ঠানকে ইহার অংশীদার করিয়াছেন। কিন্তু শতধা বিভক্ত সার্বভৌমকতার এইরূপ কোন অস্তিত্ব থাকিতে পারে কিনা সেই বিষয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা সংশয় প্রকাশ করিয়াছেন।

তৃতীয়ত, রাষ্ট্রের প্রতি জনগণের আনুগত্য বিভক্ত করিয়া বহুত্ববাদীগণ অরাজকতা, বিশৃঙ্খলা ও নৈরাজ্যবাদ সৃষ্টিতে সাহায্য করিয়াছেন।

চতুর্থত, নৈতিক ধ্যান-ধারণার পরিপ্রেক্ষিতে বহুত্ববাদীগণ তাহাদের বক্তব্য উপস্থিত করিয়া সার্বভৌমিকতার আইনগত দিককে সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করিয়াছেন। একত্ববাদীগণের মতে সার্বভৌমিকতা একান্তভাবেই একটি আইনগত ধারণা যাহার সঙ্গে নীতিশাস্ত্রের কোন সম্পর্ক নাই। কিন্তু বহুত্ববাদীগণ আইনগত ও নৈতিক ধারণার মধ্যে পার্থক্যের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিতে পারেন নাই।

পঞ্চমত, বহুত্ববাদী ল্যাস্কি নিজেই বহুত্ববাদের সমালোচনা করিয়া বলিয়াছেন, রাষ্ট্র যে শ্রেণী সম্পর্কের প্রকাশ-ইহা বহুত্ববাদ উপলব্ধি করিতে পারে নাই।[17] বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত রাষ্ট্রের এই শ্রেণী সম্পর্কের গুরুত্ব উপলব্ধি করিতে না

17. "It does not sufficiently realise the nature of the state as an expression of class-relations."—Laski

পারিলে বহুত্ববাদী সার্বভৌমিকতার তত্ত্ব বাস্তবধর্মী হইতে পারে না। এই সমস্ত সমালোচনা সত্ত্বেও বহুত্ববাদের বাস্তব গুরুত্ব অস্বীকার করা যায় না। বহুত্ববাদীদের মত সম্পূর্ণ সত্য না হইলেও ইহা যে আংশিক সত্য এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। মনে রাখিতে হইবে যে, ঐতিহাসিক প্রয়োজনেই বহুত্ববাদ সমাজের অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলির কার্যকারিতার উপর যথাযোগ্য গুরুত্ব আরোপের দ্বারা উহাদের উপযোগিতা প্রমাণিত করিয়া এক ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করিয়াছে। তবে বর্তমানে সংঘস্বাতন্ত্র্যবহুল পরিমাণে রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃতি লাভ করায় বহুত্ববাদের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অনেকাংশে হ্রাস পাইয়াছে।

৯। সার্বভৌমিকতার ভবিষ্যৎ (The future of Sovereignty)

সার্বভৌমিকতার তত্ত্ব আলোচনার শেষাংশে আমরা বহুত্ববাদী সমালোচনা উপস্থিত করিয়া দেখাইয়াছি যে বহুত্ববাদীরা মনে করেন যে সার্বভৌমিকতার সম্পর্কীয় ধ্যান ধারণা ক্রমশ ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে এবং ইহা একটি শূন্যগর্ভ কল্পনায় পর্যবেষিত হইতেছে। সার্বভৌমিকতার তত্ত্বটি যথাশীঘ্র বিসর্জন দেওয়া যায় ততই রাষ্ট্রবিজ্ঞানের কল্যাণ হইবে বলিয়াও অনেকে দাবী করিয়াছেন। এই সমস্ত সমালোচনা ও বাস্তব অবস্থা সার্বভৌমিকতার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সংশয় সৃষ্টি করিয়াছে।

সার্বভৌমিকতার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত করা সম্ভব নহে বা ইহা করিবার সময়ও আসে নাই। মনে রাখিতে হইবে যে, ঐতিহাসিক প্রয়োজনেই সার্বভৌমিকতার তত্ত্বের উৎপত্তি হইয়াছে এবং ইহা বর্তমান রাষ্ট্র ব্যবস্থার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। সুতরাং অনেকে মনে করেন যে রাষ্ট্রীয় সংস্থার যতদিন অস্তিত্ব থাকিবে, রাষ্ট্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হিসাবে সার্বভৌমিকতাও ততদিন বাঁচিয়া থাকিবে।

দ্বিতীয়ত, সার্বভৌমিকতা কতকগুলি মূল্যবোধকে তুলিয়া ধরে যাহাদের গুরুত্ব অস্বীকার করা যায় না। রাষ্ট্রের স্বাধীনতা, আত্মসম্মান ও অন্যান্য রাষ্ট্রের সঙ্গে সমানাধিকারের প্রতীক হইল রাষ্ট্রের সার্বভৌমিকতা। তাই লক্ষ্য করা গিয়াছে যে যখনই সমসাময়িককালে দুর্বল বা ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের উপর সাম্রাজ্যবাদী বা আগ্রাসী আক্রমণ সংঘটিত হইয়াছে, তখনই ইহাকে সার্বভৌম শক্তির উপর হস্তক্ষেপ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে এবং সেই দৃষ্টিকোণ হইতে প্রতিকারের চেষ্টা করা হইয়াছে। সুতরাং রাষ্ট্রের স্বাধীনতা, স্বাতন্ত্র্য ও আত্মসম্মান রক্ষার ক্ষেত্রে এই তত্ত্বের এখনও বিরাট ভূমিকা রহিয়াছে।

তৃতীয়ত, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, আন্তর্জাতিক আইন প্রভৃতির ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের সার্বভৌমিকতার তত্ত্বের মূল্য নিঃশেষ হইয়া যায় নাই। রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতাকে স্বীকার করিয়া উহার পরিপ্রেক্ষিতে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা চলিতেছে এবং আন্তর্জাতিক আইনের বিকাশ ঘটিতেছে।

অপরপক্ষে, শাসনতন্ত্রের বাধা ও জনমতের চাপে একত্ববাদীদের অসীম ক্ষমতা সম্পন্ন আভ্যন্তরীণ সার্বভৌমিকতার ধ্যান-ধারণা ভাঙ্গিয়া যাইতেছে এবং আন্তর্জাতিক আইন, অনুশাসন ও সম্পর্কের অগ্রগতির ফলে রাষ্ট্রবহিঃস্থ সার্বভৌমকতা ক্রমশ সীমাবদ্ধ হইয়া উঠিতেছে। অর্থাৎ সার্বভৌমিকতার গুরুত্ব ও অবদানকে যেমন অস্বীকার করা যায় না, তেমনি ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে সার্বভৌমিকতার একাত্ববাদী মতবাদ ক্রমশ শিথিল হইতেছে। এই পটভূমিকায় অনেকে মনে করেন যে একত্ববাদী ও বহুত্ববাদী মতবাদের সংমিশ্রণের মধ্য দিয়া আগামী দিনে সার্বভৌমিকতার যুগোপযোগী তত্ত্ব বিকাশের সম্ভাবনা রহিয়াছে।

অষ্টম অধ্যায়

আইন

(Law)

সার্বভৌমিকতার ধারণা (concept) হইতে আসে আইনের আলোচনা। আইনের প্রকৃতি উপলব্ধির মধ্য দিয়া রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিভিন্ন তত্ত্বের উপর ইহার প্রভাব ও ইহাদের পারস্পরিক সম্পর্ক অনুধাবন করা যাইতে পারে। ইতিপূর্বে আইনের দৃষ্টিকোণ হইতে সার্বভৌমিকতা আলোচনা করা হইয়াছে। এইবার নৈতিক বিধি আন্তর্জাতিক আইন, অধিকার প্রভৃতির সঙ্গে আইনের পারস্পরিক সম্পর্ক আলোচনার মধ্য দিয়া আমরা রাষ্ট্রীয় আইন সম্বন্ধীয় ধ্যান-ধারণাটিকে পরিস্ফুটন করিব।

১॥ **আইনের প্রকৃতি ও সংজ্ঞা (Nature and definition of Law):** বিশ্বব্যবস্থা নিয়মের রাজত্ব। বিশ্ব প্রকৃতি হইতে সুরু করিয়া মনুষ্য সমাজব্যবস্থা সমস্ত কিছুই নিয়মাধীন—সর্বত্রই আইনের নিয়ন্ত্রণ, বন্ধন ও শাসন। সুতরাং 'আইন' শব্দটি ব্যাপক ও বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সমাজ জীবনে মানুষকে যে সমস্ত বিধিনিষেধ মানিয়া চলিতে হয় তাহাকে সামাজিক আইন (Social Laws) বলে। সভ্য জীবন যাপনের প্রয়োজনে মানুষকে যে সমস্ত নৈতিক বিধি মানিতে হয় তাহাকে নৈতিক আইন (Moral Laws) বলা হয়। বিভিন্ন বিজ্ঞান বিষয়ের কার্য ও কারণের সম্পর্কের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত সূত্রকে বৈজ্ঞানিক আইন (Scientific Laws) বলা হয়। কিন্তু রাষ্ট্রবিজ্ঞানে 'আইন' শব্দটিকে সম্পূর্ণ ভিন্ন অর্থে ব্যবহার করা হয়। আবার, দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্যের জন্য রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের আইন সম্পর্কীয় প্রদত্ত সংজ্ঞার ভিতরও গভীর পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়।

সুস্থ রাষ্ট্রীয় জীবন যাপনের উদ্দেশ্যে যে সমস্ত বিধিনিষেধ ও নিয়মাবলী মানুষকে মানিয়া চলিতে হয় ব্যাপক অর্থে তাহাকেই রাষ্ট্রের আইন বলা যাইতে পারে। বিশ্বপ্রকৃতির নিয়মাবলী যেরূপ অব্যয় ও অপরিবর্তনশীল, রাষ্ট্রীয় বিধিনিষেধ বা আইন সেইরূপ অপরিবর্তনশীল নয়। বিবর্তিত ও পরিবর্তনশীল জীবন ও সমাজের সঙ্গে সঙ্গতি রাখিয়া রাষ্ট্রীয় আইনের আত্মপ্রকাশ ঘটে বলিয়া ইহা গতিশীল ও বহুমুখী এবং দেশ-কাল পাত্র ভেদে পরিবর্তনশীল।

আইনের প্রকৃতিতত্ত্ব জানিতে হইলে আমাদের অনুসন্ধান করিতে হইবে, আইনের উদ্দেশ্য কি, লক্ষ্যই বা কি এবং কেন সেই লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্যকে রাষ্ট্র আমাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যর সঙ্গে এক মনে করে। বার্কার (Barker) আইনের প্রকৃতি আলোচনা করিতে যাইয়া বলিয়াছেন যে, প্রয়োজনীয়তা ও আইনের অনুমোদন না থাকিলে কোন কিছুকে আইন বলা যায় না (Law ought to have both value and validity)। কোনও রাষ্ট্রের আইনের প্রকৃতি আবার নির্ভর করে সেই রাষ্ট্রের নাগরিকদের দাবি পূরণে ইহা কতটা সক্ষম তাহার উপর। ল্যাস্কি (Laski) বলিয়াছেন যে ফরাসী বিপ্লবের কারণ নির্দেশ করিতে যাইয়া বলা যায় যে সেই যুগের ফরাসী রাষ্ট্র তাহার আইন দিয়া নাগরিকদের দাবি পূরণ করিতে পারে নাই বলিয়াই ফরাসী বিপ্লব ঘটিয়াছিল।

মানুষের সর্বাঙ্গীন জীবন রাষ্ট্রীয় আইনের অন্তর্ভুক্ত নয়। তাই মানুষের আত্মিক ও আধ্যাত্মিক জীবন, এবং তাহার ভাবনা, চিন্তা, ধারণা, অনুভূতি প্রভৃতির সঙ্গে আইনের প্রত্যক্ষ কোন সম্পর্ক নাই। মানুষের জীবনের বাহ্যিক কার্যকলাপ, আচার-আচরণ প্রভৃতির সঙ্গে রাষ্ট্র প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত, তাই এই সমস্ত আচার-আচরণ রাষ্ট্রীয় আইনের অন্তর্গত।

সর্বপ্রকার আইনের প্রকৃতি হইল নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা এবং নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে উদ্দেশ্যকে কার্যকরী করা। রাষ্ট্রীয় আইনও তাহাই। ইহাও এক প্রকারের নিয়ন্ত্রণ যাহার ভিতর দিয়া একটি নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে পৌছিবার জন্য চেষ্টা করা হয়। অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় আইন নিজে কোন প্রকার লক্ষ্য বা আদর্শ নয়, ইহা লক্ষ্যে বা আদর্শে পৌছিবার পাথেয় মাত্র। কিন্তু অন্যান্য আইন হইতে রাষ্ট্রীয় আইনের প্রকৃতি স্বতন্ত্র। সমাজে রাষ্ট্রীয় আইন ছাড়া অন্যান্য বিধিনিষেধ বল-প্রয়োগের মাধ্যমে কার্যকরী করা সম্ভবপর হয় না। রাষ্ট্রীয় আইন মানিতে বাধ্য করিবার জন্য রাষ্ট্র বলপ্রয়োগ করিয়া থাকে। অন্যান্য ক্ষেত্রে আইন মান্য করা বা না করা সম্পূর্ণভাবে ব্যক্তির ইচ্ছা ও সামাজিক চাপ ও প্রভাবের উপর নির্ভর করে। কিন্তু রাষ্ট্রীয় আইনকে প্রয়োজনবোধে শক্তি প্রয়োগ করিয়া বাধ্যতামূলক-ভাবে মান্য করানো হয়।[1] ল্যাস্কি মনে করেন যে রাষ্ট্রের আইন চালু করার জন্য যত কম বল প্রয়োগ করা যায় ততই ভাল, তবুও একথা সত্য যে আধুনিক সমাজে অন্তত কিছু লোকের উপর বলপ্রয়োগ না করলে রাষ্ট্র তার উদ্দেশ্য সাধন করিতে পারে না।

1. "The last resort of enforcement lies behind law."—McIver.

আইন একদিকে মানুষের অধিকার ও কর্তব্য সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা সৃষ্টি করিয়া সুস্থ ও শৃঙ্খলাবদ্ধ জীবন যাপন সম্ভবপর করিয়া তোলে। অন্যদিকে ইহা আদর্শ জীবন যাপনের উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি করে। এই দুই এর সমন্বয় আইনে না থাকিলে রাষ্ট্র শিথিল, বিচ্ছিন্ন ও শক্তিহীন হইত এবং ফলে মানুষের জীবন এবং সম্পত্তি বিপন্ন হওয়ায় রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইবার সম্ভাবনা দেখা দিত। আইনই রাষ্ট্রীয় জীবনের উদ্দেশ্য ও ঐক্য বজায় রাখিয়াছে।

আইন মানুষকে সুখী করিবার পরিবেশ রচনা করিতে পারে—কিন্তু ইহার মানুষকে সুখী করিবার ক্ষমতা নাই। যে রাষ্ট্রনৈতিক আবহাওয়ায় মানুষ সুখী জীবন যাপন করিতে পারে, আইন সে আবহাওয়া সৃষ্টি করে। কিন্তু কোন ব্যক্তিবিশেষ সুখী হইবে কি হইবে না, তাহা একান্তভাবেই তাহার আত্মগত অনুভূতির উপর নির্ভর করে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, আইনের সঙ্গে মানুষের সুখ-দুঃখের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক না থাকিলেও, রাষ্ট্রীয় আইন দ্বারা সুখের পরিবেশ স্থাপিত হইতে পারে।

আইনের আপেক্ষিকতার তত্ত্ব আইনের প্রকৃতির অন্য একটি দিকে আলোক-পাত করে। আইন রাষ্ট্রের অন্তর্গত সমাজের সমস্ত জড় উপাদান এবং বস্তু-নিরপেক্ষ ভাব ও নীতির উপর নির্ভরশীল। অর্থাৎ রাষ্ট্রের ভৌগোলিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক প্রভৃতি জড় উপাদান এবং বস্তুনিরপেক্ষনীতি ও ধর্ম প্রভৃতি উপাদানের প্রভাব আইনের ক্ষেত্রে অনস্বীকার্য। সমসাময়িক এই সমস্ত উপাদানই আইনের ভিতর দিয়া প্রতিফলিত হইয়া থাকে। অর্থাৎ, বৃহত্তর সমাজ জীবন ও রাষ্ট্রীয় কাঠামো আইনের প্রকৃতি নিধারণ করে। উদাহরণ হিসাবে বলা যাইতে পারে, সোবিয়েত ইউনিয়ন ও আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের আইন বিশ্লেষণ করিলে এই দুই দেশের সমাজ ও রাষ্ট্রের মৌলিক আদর্শ ও চরিত্রের সন্ধান পাওয়া যাইবে। সুতরাং আইন সমাজদেহের দর্পণ।

পূর্বেই বলিয়াছি যে আইনের প্রকৃতি সম্বন্ধে বিভিন্ন ধারণা প্রচলিত থাকিবার জন্য রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ও আইনবিদেরা আইনের বিভিন্ন প্রকার সংজ্ঞা দিয়াছেন। অস্টিন (Austin) সহ এক শ্রেণীর আইনবিদ মনে করেন যে আইনকে বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে শেষপর্যায়ে ইহা সার্বভৌমের আজ্ঞা ছাড়া কিছুই নয় (Law is the command of the sovereign)। হেনরী মেইন (Henry Maine) প্রভৃতি এক শ্রেণীর রাষ্ট্র-বিজ্ঞানী ঐতিহাসিক

বিবর্তনের ফলশ্রুতি হিসাবে আইনকে অভিহিত করিয়াছেন। কেহ কেহ আবার আইনকে সমাজ মনের প্রতিফলন বলিয়া মনে করেন। দার্শনিকগণের মতে আইন সর্বোচ্চ নীতি বা আদর্শের প্রকাশ। আরিস্টটল (Aristotle) আইনকে সামাজিক প্রজ্ঞার (reason) প্রকাশরূপে অভিহিত করিয়াছেন। উডরো উইলসন (Woodrow wilson) উপরোক্ত মতগুলির মোটামুটি সামঞ্জস্য সাধন করিয়া যে সংজ্ঞা উপস্থিত করিয়াছেন তাহাতে বলা হইয়াছে যে, সমাজে যে সমস্ত প্রচলিত চিন্তাধারা ও অভ্যাস রাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ স্বীকৃতি ও রাষ্ট্র কর্তৃত্বের সমর্থন লাভ করিয়াছে তাহাকে আইন বলে।[2] উইলসন আইনের এই সংজ্ঞা দ্বারা রাষ্ট্রের সার্বভৌমিকতা, ইতিহাস, সামাজিক চিন্তাধারা, রীতি-নীতি, জনমত প্রভৃতির সমন্বয় করিয়াছেন।

প্রখ্যাত আইনবিদ অধ্যাপক হল্যাণ্ডের (Holland) মতে মানুষের বহির্জীবন নিয়ন্ত্রণ করিবার রাষ্ট্রনৈতিক নিয়মাবলী যাহা সার্বভৌম ক্ষমতার সাহায্যে কার্য্যকরী হয়, তাহাকে আইন বলে।[3] মার্কসবাদীরা আইনকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র দৃষ্টিকোণ হইতে বিচার করিয়া বলিয়াছেন যে আইন শ্রেণীস্বার্থের রাষ্ট্রীক প্রকাশ মাত্র। ইহাদের মতে ধনিক ও সমাজের সম্পদশালী শ্রেণীর স্বার্থরক্ষার হাতিয়ার হইল আইন। নিম্নে আইন সম্বন্ধে বিভিন্ন মতবাদের আলোচনাকালে এই ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করা হইল।

২ ॥ আইন সম্বন্ধে বিভিন্ন মতবাদ (Different theories of law)

আইন সম্বন্ধে পরিপূর্ণ ধারণা সৃষ্টি করিতে হইলে এই সম্পর্কে বিভিন্ন চিন্তা গোষ্ঠীর মতবাদ (school of thought) আমাদের আলোচনা করা প্রয়োজন। ইহারা হইল:

(ক) বিশ্লেষণমূলক (Analytical)
(খ) ঐতিহাসিক (Historical)
(গ) সমাজবিজ্ঞানমূলক (Sociological)
(ঘ) দার্শনিক (Philosophical)
(ঙ) মার্কসবাদী (Marxian)

2. "Law is that portion of established thought and habit which has gained distinct and formal recognition in the shape of uniform rules backed by the authority and power of Government."—Wilson.

3. "Law is a political rule of external control enforced by a sovereign political authority."—Holland.

(ক) **বিশ্লেষণমূলক মতবাদ:** পূর্বেই বলা হইয়াছে যে অষ্টিন আইনকে সার্বভৌমের আদেশ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। আইন সম্পর্কীয় এই ধারণাকে বিশ্লেষণমূলক মতবাদ বলা হইয়া থাকে। অষ্টিন ব্যতীত মেকিয়াভেলি (Machiavelli), হবস্ (Hobbes) প্রভৃতি দার্শনিকগণ এই মতাবলম্বী। তাঁহাদের মতে কতকগুলি কার্য সম্পাদন করা এবং কতকগুলি সম্পাদন করা হইতে বিরত থাকিবার যে নির্দেশ সার্বভৌম জ্ঞাপন করে তাহাই আইন। অষ্টিন বলিয়াছেন সার্বভৌম যে সমস্ত নির্দেশ অনুমোদন করেন তাহাই সার্বভৌমের নির্দেশ হিসাবে গণ্য করিতে হইবে।[4] অর্থাৎ সার্বভৌমই আইনের উৎস এবং ইহাই আইনের ধারক ও বাহক।

বিশ্লেষণমূলক মতবাদ পর্যালোচনা করিলে দেখা যাইবে যে সমাজের অন্যান্য যে সমস্ত শক্তি ও উপাদান আইন সৃষ্টির ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিয়া থাকে এই মতবাদ তাহাদের অগ্রাহ্য করিয়াছে। তাই স্বাভাবিক ভাবেই মেইন, ল্যাস্কি প্রভৃতিরা এই মতবাদের বিরোধিতা করিয়া বলিয়াছেন যে আইন নিছকমাত্র সার্বভৌমিকতার আদেশ নয়। যে সমস্ত সামাজিক প্রথাকে সার্বভৌম আইন হিসাবে স্বীকার করিয়াছে তাহাদের অধিকাংশের ক্ষেত্রেই দেখা যাইবে যে এই সমস্ত প্রথার অবলুপ্তি ঘটাইতে সার্বভৌম সম্মত নয় বলিয়াই ইহাদের অনুমোদন করিয়াছে। ইহার দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আইন সৃষ্টির ক্ষেত্রে সার্বভৌমই একমাত্র ক্ষমতার অধিকারী নয়, সমাজের অন্যান্য শক্তির এই ব্যাপারে অবদান আছে।

দ্বিতীয়ত, সর্বপ্রকার আইনের সাফল্য জনমতের সমর্থনের উপর নির্ভর করে। সার্বভৌম যতই শক্তিশালী হউক না কেন, জনমত গ্রহণ না করিলে আইনকে কার্যকরী করা খুবই কষ্টকর। সুতরাং জনমতের গুরুত্বকে অস্বীকার করিয়া আইনকে নিছক সার্বভৌমের আজ্ঞা বলিয়া প্রচার করার অর্থ বাস্তবকে অস্বীকার করা।

তৃতীয়ত, ইংল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশে প্রথাগত বিধানের (conventions) প্রাধান্য বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। এই সমস্ত প্রথাগত বিধানগুলি আইনের ন্যায়ই কার্যকরী যদিও ইহাদের সার্বভৌমের আদেশ হিসাবে স্বীকার করা যায় না। এমন কি ইংলণ্ডের ক্ষেত্রে এই সমস্ত প্রথাগত বিধানের পশ্চাতে সার্বভৌমিকতার অপ্রত্যক্ষ অনুমোদন আছে বলিয়াও যদি ধরিয়া লওয়া হয়,

4. "What the sovereign permits he commands."—Austin.

তাহা হইলেও বলিতে হইবে যে, ইহাদের অস্বীকার করিবার শক্তি সার্বভৌমের নাই।

চতুর্থত, বর্তমান যুগে জনগণের সার্বভৌমিকতার তত্ত্ব বহুল পরিমাণে স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে। আইনকে সার্বভৌমের আদেশ হিসাবে স্বীকার করিলে জনগণের সার্বভৌমিকতার তত্ত্ব ও গণতান্ত্রিক আদর্শ উপেক্ষিত হইবে। অষ্টিনের সার্বভৌম, যাহার আজ্ঞাকে তিনি আইন বলিয়া প্রচার করিয়াছেন, শক্তির প্রতিভূ। কিন্তু অনেকের মতে শুধুমাত্র সার্বভৌমের শক্তি নয়, জনগণের ইচ্ছা ও সমর্থন অনেকটা পরিমাণে আইনের উৎস।

পঞ্চমত, বিশ্লেষণমূলক মতবাদ মনে করে, যেহেতু সার্বভৌমিকতার আদেশ আইন এবং ইহার পশ্চাতে রাষ্ট্রীয় শক্তির সমর্থন থাকে, সেইজন্যই জনগণ আইন মানিতে বাধ্য থাকেন। জনগণ কেন আইন মান্য করে তাহা বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে আইন শুধুমাত্র শাস্তির ভয়েই মান্য করা হয় না, ইহার পশ্চাতে অভ্যাস, উপযোগিতা, অনুকরণপ্রিয়তা, শ্রদ্ধা ইত্যাদি কারণও রহিয়াছে।

সুতরাং আইনকে নিছক সার্বভৌমিকতার আদেশ হিসাবে বর্ণনা করা যুক্তিসঙ্গত নয়, ইহা কিছুটা পরিমাণে অসম্পূর্ণতা দোষে দুষ্ট। আইন সৃষ্টির ক্ষেত্রে সার্বভৌমের ভূমিকা নিশ্চয়ই স্বীকার করিতে হইবে, কিন্তু অন্যান্য সামাজিক শক্তির এ ব্যাপারে অবদান আছে তাহাদের অস্বীকার করিবার কোন সঙ্গত কারণ নাই। বিশ্লেষণমূলক মতবাদ এই ভুলই করিয়াছে। এই ক্ষেত্রে তাহারা একটি বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গীর দ্বারা পরিচালিত হইয়াছেন বলিয়া সার্বভৌমকে অনাবশ্যক গুরুত্ব দিয়াছেন। রাষ্ট্র সমস্ত আইন সৃষ্টি করে না। প্রতি রাষ্ট্রেই কিছু কিছু প্রথাগত আইন প্রচলিত থাকে যাহা সার্বভৌম বাতিল করিতে পারে না। এই সত্যটি অস্টিন ও তাঁহার সমর্থকগণ উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। হেনরী মেইন যথার্থই বলিয়াছেন যে, রণজিৎ সিংহের মত ক্ষমতাশালী সার্বভৌম শক্তি প্রথাগত আইনকে বাতিল করিতে সাহসী হন নাই। সুতরাং সার্বভৌম শক্তির পশ্চাতে আরও একটি শক্তি আছে যাহাকে সার্বভৌম ইচ্ছায় হউক বা অনিচ্ছায় হউক মানিতে বাধ্য, এবং আইন সৃষ্টি ও কার্যকরী করিবার ব্যাপারেএই শক্তির অবদান অবশ্য স্বীকার্য্য।

(খ) **ঐতিহাসিক মতবাদ:** কোন কোন ব্যবহারশাস্ত্রবিদের মতে রাষ্ট্রের ঐতিহাসিক বিবর্তনের মধ্য দিয়াই আইনের জন্ম এবং ইহার সহিত আইন অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। অর্থাৎ এই মতবাদ অনুযায়ী সার্বভৌমের নির্দেশে

আকস্মিকভাবে আইনের সৃষ্টি হয় না, ঐতিহাসিক বিবর্তনের মধ্য দিয়া যে সমস্ত রীতি-নীতি, প্রথা ইত্যাদি গড়িয়া উঠে—তাহা হইতেই আইনের জন্ম। ঠিক তেমনি এই মতবাদ মনে করে যে সার্বভৌম শক্তির নির্দেশে মানুষ আইন মান্য করে না স্বভাবগত বা অভ্যাসগত কারণে এবং আইন ন্যায়ের প্রতীক বলিয়া আইন মান্য করা হয়। হেনরী মেইন, মেইটল্যাণ্ড, (Maitland) পোলক (Pollock) প্রভৃতি এই মতের সমর্থক।

ইতিহাসের সঙ্গে আইনের সম্পর্ক স্বীকার করিয়া এবং অনেক ক্ষেত্রে ইতিহাস যে আইনের উৎস তাহা মানিয়া লইয়াও প্রশ্ন থাকিয়া যায় যে আইনের ক্ষেত্রে সার্বভৌমিকতার ভূমিকা সম্পর্কে এই মতবাদ প্রকৃত মূল্যায়ণ করিতে পারে নাই। সুতরাং আইন সম্পর্কে ঐতিহাসিক মতবাদ অসম্পূর্ণ।

(গ) **সমাজবিজ্ঞানমূলক মতবাদ :** এই মতবাদ সমাজবিজ্ঞান ও সমাজিক মনোবিজ্ঞানের আলোতে আইনের ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করিয়াছে। এই মতবাদ মনে করে যে সমাজীবনের সহায়ক হিসাবে বিভিন্ন সামাজিক প্রভাবের মধ্য দিয়া আইনের উৎপত্তি ঘটে। অন্যভাবে বলা যাইতে পারে যে আইন সমাজমনের প্রতিফলন। সমাজ বিবর্তনের প্রভাবে যে সমস্ত নিয়ম-কানুন জন্মলাভ করে তাহাদের সার্বভৌম কর্তৃক স্বীকৃতি একান্তভাবেই প্রয়োজনীয় ও অনিবার্য হইয়া দেখা দেয় এবং ফলে সার্বভৌম ইহাদের আইনের স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হয়। সুতরাং সার্বভৌম কর্তৃত্বের স্বীকৃতিকে আনুষ্ঠানিক বলা যাইতে পারে। ডুগোয়া (Duguit), ক্রাব (Crabte) প্রভৃতি লেখকরা এ মতবাদকে সমর্থন করেন।

সুতরাং আইন সম্বন্ধীয় বিশ্লেষণমূলক বা ঐতিহাসিক মতবাদকে সমাজ-বিজ্ঞানীরা স্বীকার করেন না। ইঁহাদের মতে আইন সার্বভৌমের নির্দেশ নহে এবং আইন সম্পর্কে ঐতিহাসিক ব্যাখ্যাও অসম্পূর্ণ। আইন সমাজজীবনের পক্ষে প্রয়োজনীয় তাই সামাজিক স্বার্থবোধ হইতেই আইনের উৎপত্তি ঘটে।

(ঘ) **দার্শনিক মতবাদ :** আইন বস্তুনিরপেক্ষ এবং ইহার মধ্য দিয়া সর্বোচ্চ আদর্শের প্রকাশ ঘটে বলিয়া দার্শনিক মতবাদ মনে করে। তাই এই মতবাদ নৈতিক সূত্রের মূল্যবোধের দ্বারা ন্যায়-অন্যায় বিচার করেন এবং তাহারই পরিপ্রেক্ষিতে আদর্শের প্রতীকরূপী আইনের ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। আইনের দার্শনিক ব্যাখ্যা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নরূপে দেখা দিয়াছে।

অ্যারিস্টটল আইনকে সমাজিক প্রজ্ঞার প্রকাশ বলিয়া অভিহিত

করিয়াছেন। প্রাচীন গ্রীসের স্টোইক (Stoics) দার্শনিকগণ প্রাকৃতিক বিধানকেই আদর্শ আইন বলিয়া প্রচার করিয়াছেন। অপরপক্ষে অষ্টাদশ শতাব্দীতে রুশো (Rousseau) আইনকে সমষ্টিগত ইচ্ছার প্রকাশ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। হেগেলের (Hegel) মতে আইন হইল সর্বোচ্চ নীতির প্রকাশ।

আইন সম্পর্কীয় দার্শনিক মতবাদ একান্তভাবেই কল্পনাপ্রসূত—ইহাদের সঙ্গে বাস্তবজীবনের বিশেষ কোন সম্পর্ক নাই।

(৬) **মার্কসবাদী মতবাদ:** বস্তুবাদী দৃষ্টিকোণ হইতে মার্কস ও তাঁহার অনুগামীরা আইনের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে মার্কস-বাদীরা মনে করেন যে আইন শ্রেণীস্বার্থের রাষ্ট্রীক প্রকাশ এবং সমাজের সম্পদ-শালী শ্রেণীর স্বার্থবাহী নিয়ম-কানুন মাত্র। ইহারা নিজেদের শ্রেণীস্বার্থ রক্ষা করার জন্য রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা প্রয়োগ করিয়া নিজেদের স্বার্থের অনুকূলে যে সমস্ত বিধিনিষেধ প্রবর্তন করেন তাহাই আইন। অধ্যাপক ল্যাস্কিও এই মতবাদ স্বীকার করিয়া বলিয়াছেন যে অর্থনৈতিক দিক হইতে যাহারা ক্ষমতা ও সম্পদের অধিকারী শ্রেণী, আইনের আবরণের ভিতর দিয়া তাঁহাদেরই স্বার্থরক্ষা করা হইয়া থাকে।[5]

আইনের মার্কসবাদী ব্যাখ্যা সমালোচনার উর্ধ্বে নহে। সমালোচকদের মতে মার্কসীয় আইনের ব্যাখ্যা গ্রহণযোগ্য নহে—কারণ মার্কস সমাজদেহের সহযোগিতার দিকটিকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করিয়া রাষ্ট্রকে শুধুমাত্র বিরুদ্ধ শ্রেণী-স্বার্থের প্রকাশ হিসাবেই দেখিয়াছেন। এই সমস্ত সমালোচনার উত্তরে বলা যাইতে পারে যে, শ্রেণীস্বার্থের ধারক ও বাহক আইন কোন প্রকারেই সর্ব-সাধারণের স্বার্থে প্রযুক্ত হয় না—ইহা একান্তভাবেই জনগণের স্বার্থের পরিপন্থী। বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা, সম্পদ সৃষ্টির উপাদান ও শ্রেণীস্বার্থ রক্ষা করিবার জন্য আইনকে একটি হাতিয়ার হিসাবে বিভিন্ন দেশে ব্যবহার করা হইয়াছে। সুতরাং আইন শ্রেণীস্বার্থের রাষ্ট্রীক প্রকাশ ব্যতীত কিছু নহে।

৩॥ আইন ও সমষ্টিগত ইচ্ছা (Law and the general will of the community):

আইনের স্বরূপ বিশ্লেষণ করিতে যাইয়া অনেকে রুশোকে অনুসরণ করিয়া

5. "The legal order is a mask behind which a dominant economic interest secures the benefit of political authority."—Laski.

বলিয়াছেন যে জনগণের সমষ্টিগত ইচ্ছার প্রকাশ হইতেছে আইন। রুশো জনগণের সর্বাধিক সাধারণ কল্যাণকামী শুভ ইচ্ছার সমন্বয়কে সমষ্টিগত ইচ্ছা (general will) নামে অভিহিত করিয়াছেন। ইহা এক প্রকারের যৌথ সার্বভৌম ক্ষমতার প্রকাশ। রুশোর মতে এই সার্বভৌম যখন সাধারণের স্বার্থে কোন কাজ করে, তখন ইহাকে সমষ্টিগত ইচ্ছার প্রকাশ হিসাবে দেখিতে হইবে। রুশো মনে করেন আইন এই সমষ্টিগত ইচ্ছারই সৃষ্টি, বাহিরের কোন শক্তি ইহা জনগণের উপর চাপাইয়া দেয় নাই। জনগণের যৌথ সার্বভৌম ক্ষমতা ব্যাপক কল্যাণের জন্যই ইহা সৃষ্টি করিয়াছে। তাই দেখা যায়, জনগণ নিজেদের সৃষ্ট আইনকে প্রেরণার বশবর্তী হইয়া মান্য করে।

রুশো সমষ্টিগত ইচ্ছার স্বরূপ বিশ্লেষণ করিয়া বলিয়াছেন যে, সাধারণ স্বার্থ বা জনগণের স্বার্থকে বজায় রাখিবার ইচ্ছাই হইতেছে সমষ্টিগত ইচ্ছা। আইনের ভিতর দিয়া এই সাধারণ স্বার্থ ও জনগণের কল্যাণ মূর্ত হইয়া উঠে। সুতরাং, যেহেতু আইন হইতেছে কল্যাণের প্রতীক ও প্রকাশ, তাই ইহা কখনও অমঙ্গলকর বা জনগণের স্বার্থের পরিপন্থী হইতে পারে না। ইহা সর্বব্যাপক ও সর্বকল্যাণকর। অর্থাৎ, রুশো এখানে বুঝাইতে চাহিয়াছেন যে আইন যদি সমষ্টিগত স্বার্থের পরিপন্থী না হয়, তবে ধরিয়া লইতে হইবে যে আইন সমষ্টিগত ইচ্ছার প্রকাশ। সুতরাং রুশোর মতে ব্যক্তিগত ইচ্ছার সমন্বয়ে যে সমষ্টিগত ইচ্ছার আত্মপ্রকাশ ঘটে, তাহাই আইনের মূল ভিত্তি।

সুতরাং রুশো ও তাঁহার অনুগামীদের এই মতবাদ আইনের একটি মাত্র উৎসকেই স্বীকার করে—তাহা হইতেছে সমষ্টিগত ইচ্ছা। সার্বভৌমের আদেশকে বা অন্য কোন সূত্র হইতে উদ্ভূত আদেশ বা নিয়মকে তাঁহারা আইন হিসাবে গ্রহণ করিতে প্রস্তুত নন। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা প্রয়োজন যে আইন সম্পর্কীয় রুশো ও অস্টিনের বক্তব্য পরস্পরবিরোধী।

সমালোচনা: আইন সম্বন্ধে রুশোর সংজ্ঞা আলোচনা প্রসঙ্গে অধ্যাপক ল্যাস্কি বলিয়াছেন যে আইনকে যদি সমষ্টিগত ইচ্ছার প্রকাশ হিসাবে গ্রহণ করা হয়, তাহা হইলে ধরিতে হইবে যে এই সমষ্টিগত ইচ্ছা সর্বদাই কার্য করিতেছে এবং সে ক্ষেত্রে রাষ্ট্র স্থায়ী ও চিরন্তন গণভোট (permanent referendum) দ্বারা পরিচালিত হইতেছে। কিন্তু একমাত্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রেই এইরূপভাবে আইন প্রণয়ন করা সম্ভব। আধুনিক যুগের বৃহৎ রাষ্ট্রে এই প্রকারের শাসনব্যবস্থা

অসম্ভব। এইরূপ অবস্থায় আইনকে সমষ্টিগত ইচ্ছার প্রকাশ হিসাবে দেখা সঙ্গত হইবে কিনা সেই বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ রহিয়াছে।

দ্বিতীয়ত, সমষ্টিগত ইচ্ছার অস্তিত্ব স্বীকার করিলে ধরিতে হইবে যে, তাহা বর্তমান যুগে প্রতিনিধিত্বমূলক আইনসভার মাধ্যমে প্রকাশ পাইতেছে। কিন্তু লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে বিভিন্ন দেশের সংবিধান অনুযায়ী আইনসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দলই আইন প্রণয়ন ও অনুমোদন করে। এই ক্ষেত্রে আইনসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের প্রতিনিধিবর্গের ইচ্ছাই প্রকাশ লাভ করিতেছে। সুতরাং আইনকে সংখ্যাগরিষ্ঠের ইচ্ছার প্রকাশ বলিয়া অভিহিত করা যায়, কিন্তু ইহাকে সর্বসাধারণের ইচ্ছা বা সমষ্টিগত ইচ্ছার প্রকাশ বলিয়া গণ্য করা যায় না।

তৃতীয়ত, 'আইন সমষ্টিগত ইচ্ছার প্রকাশ' মতবাদটি ন্যায়, আদর্শ ও গণতন্ত্রের নামে প্রকৃতপক্ষে দলীয় স্বৈরাচারিতাকেই প্রতিষ্ঠা করে।

চতুর্থত, আইন সমষ্টিগত ইচ্ছার প্রতীক ও প্রকাশ হইলে, ইহা সর্বসাধারণের কল্যাণ ও মঙ্গলকে মূর্ত করিয়া তুলিবে। সেই ক্ষেত্রে জনগণ স্বতঃপ্রণোদিত ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে আইনকে স্বীকার ও মান্য করিবে। কিন্তু ল্যাস্কিকে অনুসরণ করিয়া বলা যায়: "আইনগত সার্বভৌম প্রণীত আইন মানুষ প্রায় সমস্ত ক্ষেত্রেই মান্য করিলেও, ইতিহাসে এমন ঘটনা বিরল নয় যে জনসাধারণ প্রচণ্ড দুঃখ বরণ করিয়া এমনকি প্রাণ দিয়াও আইনের বিরোধিতা করিয়াছে।" ইহার দ্বারা প্রমাণিত হয় যে আইন সমষ্টিগত ইচ্ছার প্রকাশ নয়।

এই সমস্ত আলোচনার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে যে, আদর্শের দিক হইতে, সমষ্টিগত ইচ্ছার প্রকাশ হিসাবেই আইনের আত্মপ্রকাশ করা উচিত, এই কথা স্বীকার করা যাইতে পারে। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে যে অবস্থায় এবং যে পারিপার্শ্বিকতার ভিতর আইন সৃষ্ট হয়, তাহাকে কোনমতেই সমষ্টিগত ইচ্ছার প্রকাশ বলিয়া অভিহিত করা যায় না।

৪॥ স্বাভাবিক আইন (Natural Law):

সামাজিক চুক্তি মতবাদের প্রবক্তাগণ রাষ্ট্র সৃষ্টির পূর্বে প্রাকৃতিক পরিবেশে (State of Nature) মানুষ স্বাভাবিক বা প্রাকৃতিক আইন মান্য করিত বলিয়া মনে করিতেন। স্বাভাবিক আইনের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে ইহা সার্বভৌমের আদেশ নহে বা প্রচলিত আচার ব্যবহারও নহে। ইহাকে মোটামুটিভাবে প্রাকৃতিক বিধান বলিয়া অভিহিত করা যায়। মানুষের

সামাজিক প্রকৃতি হইতেই ইহার উৎপত্তি এবং রাষ্ট্রের অনুমোদন ব্যতীতই ইহা প্রতিষ্ঠিত ও কার্যকরী থাকে। বস্তুত, রাষ্ট্র অপেক্ষা স্বাভাবিক আইন প্রাচীন, কারণ রাষ্ট্র সৃষ্ট হইবার পুর্বেই স্বাভাবিক আইন প্রচলিত ছিল বলিয়া চুক্তিবাদীগণ ধারণা পোষণ করিয়াছেন।

স্বাভাবিক আইনের ধারণা চুক্তিবাদীগণের ভাষ্য প্রকাশিত হইবার বহু পুর্ব হইতে দেখিতে পাওয়া যায়। অরিষ্টটল বিশেষ আইন (particular law) ও সার্বজনীন আইনের (universal law) মধ্য পার্থক্য নির্দেশ করিয়া সার্বজনীন আইনকে স্বাভাবিক আইন হিসাবে অভিহিত করিয়াছেন। প্রাচীন গ্রীসের দার্শনিক জেনো (Zeno) মনে করিতেন যে সত্য ও ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত কতকগুলি শাশ্বত নীতি আছে যাহা কোন প্রকার মনুষ্য সৃষ্টি বিধি নিষেধ দ্বারা আবদ্ধ নহে। এই সমস্ত শাশ্বত নীতিকেই তিনি স্বাভাবিক আইন বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।

প্রখ্যাত রোমক প্রাচীন দার্শনিক সিসেরোও (Cicero) স্বাভাবিক আইন সম্পর্কে এই ধারণাই পোষণ করিতেন। মধ্য যুগে খ্রীষ্টান ধর্মপ্রচারকগণ প্রাকৃতিক আইনের ধারণাকে সমর্থন করিয়াছিলেন, তবে তাঁহারা স্বাভাবিক আইনকে ঐশ্বরিক বিধান হিসাবেই মনে করিতেন। বোঁদা (Bodin), হবস, লক, রুশো প্রভৃতি রাষ্ট্র বিজ্ঞানীগণ নিজ নিজ দৃষ্টিকোণ হইতে স্বাভাবিক আইনের ধারণা পোষণ করিতেন।

স্বাভাবিক আইনের একটি সার্বজনীন আবেদন থাকা সত্ত্বেও মধ্য যুগের পুর্ব পর্যন্ত ইহা নির্দিষ্ট আইনের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হইয়া আইনের মর্যাদা লাভ করিতে পারে নাই। প্রাচীনকালে যদিও বিচারালয়ে এই আইন গৃহীত এবং প্রয়োগ করা হইত না, কিন্তু বিচারপতিগণ স্বাভাবিক আইনের দ্বারা বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত হইতেন।

আমেরিকা ও ফরাসী বিপ্লবে স্বাভাবিক আইনের আবেদন মানুষকে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করিয়া প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। এই সময় মানুষ নির্দিষ্ট আইনকে উপেক্ষা করিয়া স্বাভাবিক আইনের ধারণার দ্বারা পরিচালিত হইয়াছিল। ঠিক তেমনি মধ্যযুগে রাজার স্বেচ্ছাচারিতা ও বলপ্রয়োগ আবার এই স্বাভাবিক আইনকে ভিত্তি করিয়াই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। তাই কোকার (Coker) বলিয়াছেন যে স্বাভাবিক আইনের ব্যবহারিক ফল বিভিন্ন যুগে বিভিন্নভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে।

(Coke) যুক্তরাষ্ট্রের স্টোরী (J. Story) আমাদের দেশের রাসবিহারী ঘোষ প্রভৃতি ন্যায়শাস্ত্রীগণ আইনের বৈজ্ঞানিক আলোচনার ভিতর দিয়া আইনকে সমৃদ্ধিশালী করিয়া তুলিয়াছেন।

(ঙ) ন্যায়নীতি (Equity): প্রচলিত আইনের ভিত্তিতে বিচার করিয়া সর্বদা অভীপ্সিত ন্যায় ও আদর্শকে প্রতিষ্ঠা করা যায় না। রাষ্ট্র কর্তৃক প্রচলিত ও স্বীকৃতি আইনের উর্ধ্বে কতকগুলি নীতি আছে যাহার প্রয়োগে ন্যায় বিচার করা সম্ভব। কিন্তু এই নীতিগুলি কোনরূপ বাঁধাধরা আইনের গণ্ডীতে পড়ে না, অথচ ইহারা শাশ্বত ন্যায় ও আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই সমস্ত নীতি, যাহা প্রচলিত আইন হিসাবে স্বীকৃত নয়, কিন্তু শাশ্বত আদর্শের প্রতীক, ন্যায়-নীতি (Equity) বলিয়া অভিহিত। এইরূপ অব্যয়, অক্ষয় নীতিগুলি প্রয়োগের দ্বারা রোমে সর্বপ্রথম শাশ্বত নীতির প্রবর্তন ঘটিল। ব্রিটেনে এই শাশ্বত নীতির প্রয়োগ আইনসঙ্গত করিয়া ন্যায়বিচারের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ন্যায়-নীতির সঙ্গে বিচারক কৃত আইনের (Judicial Decisions) কিছু পরিমাণ সাদৃশ্য রহিয়াছে।

(চ) আইনপ্রণয়ন (Legislation): আধুনিক কালে রাষ্ট্রীয় আইনের অধিকাংশই আইনপরিষদ কর্তৃক গৃহীত হয় এবং সেইজন্যই আইনপরিষদ আইনের প্রধান উৎস হিসাবে বর্তমানকালে পরিচিত। কর্তৃত্ব ও ক্ষমতার পরিধি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন ব্যাপারে রাষ্ট্রকে যুগের সঙ্গে তাল রাখিয়া আইন প্রণয়ন করিতে হয়। সুতরাং আইনপরিষদ কর্তৃক প্রণীত আইনই রাষ্ট্রীয় আইনের প্রধান অংশ এবং প্রধান উৎস। আইনপরিষদ যে-সমস্ত আইন সৃষ্টি করে তাহাকে জনমতের অভিব্যক্তি বলিয়া মনে করা হয়।

প্রসঙ্গত মনে রাখা প্রয়োজন যে, রাষ্ট্র শাসন পদ্ধতির উন্নত-পর্য্যায়ে বিচার সংক্রান্ত রায়, বৈজ্ঞানিক আলোচনা এবং আইনসভা কর্তৃক আইন প্রণয়ন আইনের উৎস হিসাবে কার্য্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে।

ওপেনহাইম, হল্‌ প্রভৃতি পণ্ডিতগণ উপরোক্ত সমস্ত উপাদানকে আইনের উৎস বলিয়া স্বীকার প্রস্তুত নন। তাঁহারা মনে করেন জনগণের সমবেত ইচ্ছাই আইনের উৎস। জনগণের এই ইচ্ছা প্রথা বা ধর্মীয় অনুশাসনে ভিতর দিয়া আত্মপ্রকাশ করিতে পারে। আবার, প্রতিনিধিত্বমূলক আইন পরিষদের মাধ্যমে সমবেত ইচ্ছা আইনরূপে প্রকাশ লাভ করিতে পারে। কিন্তু যে-সমস্ত

উপাদান প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জনগণের ইচ্ছা প্রকাশ করে না। তাহারা আইনের উৎস হইতে পারেনা বলিয়া তাঁহারা মনে করেন।

৬॥ আইনের শ্রেণীবিভাগ (Classification of Laws)

হল্যাণ্ড (Holland), ম্যাকআইভার (MacIver) প্রভৃতিরা বিষয়বস্তু ও প্রকৃতিভেদে রাষ্ট্রীয় আইনের শ্রেণীবিভাগ করিয়াছেন। আইনের শ্রেণীবিভাগ লইয়া রাষ্ট্রবিজ্ঞানী, ব্যবহার শাস্ত্রবিদ প্রভৃতিরা ঐক্যমত নহেন—ইহাদের মধ্যে মত পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। যাহাই হউক আমরা আইনের বিষয়বস্তু ও প্রকৃতির উপর লক্ষ্য রাখিয়া রাষ্ট্রনৈতিক আইনকে প্রথমে দুইটি ভাগে বিভক্ত করিতেছি: (১) রাষ্ট্রীয় বা জাতীয় আইন এবং (২) আন্তর্জাতিক আইন।

রাষ্ট্রনৈতিক আইন
(Political Law)

রাষ্ট্রীয় বা জাতীয় আইন (State, Municipal or National Law)	আন্তর্জাতিক আইন (International Law)

রাষ্ট্রীয় বা জাতীয় আইন: রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ জীবন নিয়ন্ত্রণ করে রাষ্ট্রীয় বা জাতীয়আইন। হল্যাণ্ডকে অনুসরণ করিয়া বলিতে পারি যে ইহা মানুষের বাহ্যিক আচার আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য সার্বভৌম কর্তৃক বিধিবদ্ধ আইন।[6] আরও পরিষ্কার করিয়া বলা যায় যে আন্তর্জাতিক ক্রিয়াকলাপ নিয়ন্ত্রণের বাহিরে যে ব্যাপক রাষ্ট্রনৈতিক আইন অবশিষ্ট থাকে তাহাই রাষ্ট্রীয় বা জাতীয় আইন। রাষ্ট্রীয় বা জাতীয় আইনের সমস্ত কিছু একই প্রকারের নহে। তাই প্রকৃতিভেদে ইহাদের শ্রেণীবিভাগ করা হইয়া থাকে।

আন্তর্জাতিক আইন: একটি জাতি বা রাষ্ট্রের সঙ্গে অন্য জাতি বা রাষ্ট্রের পারস্পরিক ব্যবহার সম্পর্কীয় নিয়ম-কানুনকে আন্তর্জাতিক আইন বলে। যেহেতু বর্তমান যুগে কোন রাষ্ট্রই স্বয়ংসম্পূর্ণ ও আত্মনির্ভরশীল নহে, তাই বিভিন্ন রাষ্ট্র পারস্পরিক ব্যবসা-বাণিজ্য, বিনিময় ও বিভিন্ন প্রকার আদান-

6 "General rule of external human action enforced by a Soveriegn political authority." —Holland

প্রদানের সম্পর্কে জড়িত। এই সমস্ত সম্পর্কগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করে আন্তর্জাতিক আইন। আন্তর্জাতিক আইনও বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত। আন্তর্জাতিক আইনকে প্রকৃতপক্ষে আইন বলা যায় কি না সেই ব্যাপারে অবশ্য একটি মৌলিক সংশয় আছে। সেই সংশয়ের মীমাংসা আমরা কিছু পরে করিতেছি।

এইবার রাষ্ট্রীয় বা জাতীয় আইনকে কিভাবে শ্রেণীবিভক্ত করা হয় তাহা আলোচনা করা হইল :

রাষ্ট্রীয় বা জাতীয় আইন
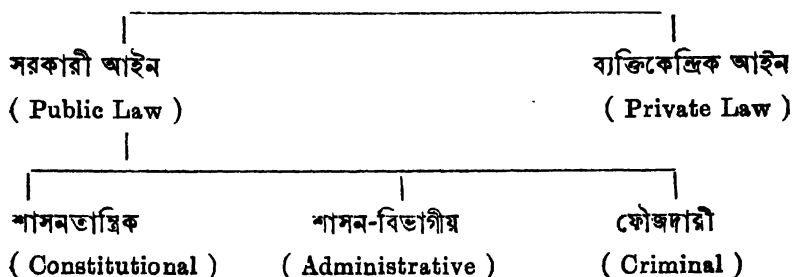
দেখা যাইতেছে যে, রাষ্ট্রীয় আইন প্রথমত সরকারী ও ব্যক্তিকেন্দ্রিক এই দুই ভাগে বিভক্ত। রাষ্ট্রের সঙ্গে ব্যক্তির সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণ বা যে আইনের বিষয়বস্তুর সঙ্গে রাষ্ট্র জড়িত থাকে তাহাকে সরকারী আইন বলে। অপরপক্ষে যে আইন ব্যক্তি বিশেষ বা ব্যক্তিসমষ্টির অধিকার, স্বার্থ ও কর্তব্যের সঙ্গে জড়িত তাহাকে ব্যক্তিকেন্দ্রিক আইন বলে।

সরকারী আইনকে আবার তিনটি ভাগে বিভক্ত করা হয়—শাসনতান্ত্রিক, শাসনবিভাগীয় এবং ফৌজদারী।

শাসনতান্ত্রিক আইন : রাষ্ট্রীয় আইনের মধ্যে সর্বাপেক্ষা মৌলিক হইল শাসনতান্ত্রিক আইন। বিভিন্ন রাষ্ট্রের শাসনপদ্ধতি ও তাহার স্বরূপ জানা যায় শাসনতান্ত্রিক আইন হইতে। ডাইসীকে (Dicey) অনুসরণ করিয়া বলা যায়, যে সমস্ত নিয়ম-কানুন প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে রাষ্ট্রের ক্ষমতা ব্যবহার ও বণ্টনের রীতিকে প্রভাবিত করে তাহাই শাসনতান্ত্রিক আইন। গেটেল (Gettell) আরও পরিষ্কার করিয়া বলিয়াছেন যে শাসনতান্ত্রিক আইন রাষ্ট্রের মধ্যে সার্বভৌম শক্তির অবস্থান নির্ণয় ও আইনের উৎস নির্দেশ করে।

অন্যান্য আইন হইতে শাসনতান্ত্রিক আইন অনেক বেশি মর্যাদা ও গুরুত্বের অধিকারী। অন্যান্য আইন প্রয়োগ, পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের ক্ষেত্রে যে নীতি গ্রহণ করা হয়, শাসনতান্ত্রিক আইনের ক্ষেত্রে তাহা অপেক্ষা জটিল ও দুরূহ পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়। জনগণের অধিকারের মৌলিক ভিত্তি এই শাসনতান্ত্রিক আইন। শাসনতান্ত্রিক আইনের মধ্যে শুধুমাত্র লিখিত ও লিপিবদ্ধ আইনও স্থান পায় না, অলিখিত এবং প্রথাগত রীতিও (conventions) স্থান পাইয়া থাকে। উদাহরণ হিসাবে ইংল্যাণ্ডের শাসনতান্ত্রিক আইনের কথা বলা যাইতে পারে।

শাসনবিভাগীয় আইন: শাসনবিভাগীয় আইন মূলত শাসন কর্তৃপক্ষের ক্ষমতা, কর্তব্য ও সংগঠন নিয়ন্ত্রণ ও নির্ধারণ করে। শাসনকার্য পরিচালনার জন্য সরকারের কার্য বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত। এই সমস্ত বিভাগের কার্য সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য যে সমস্ত বিধি নিষেধ প্রয়োগ করা হয় তাহা শাসনবিভাগীয় আইনের অন্তর্ভূক্ত। ফরাসী দেশের বহুল পরিচিত Droit Administratiff. এক প্রকারের শাসনবিভাগীয় আইন। সরকারী কর্মচারীদের আইন ভঙ্গ সংক্রান্ত বিচার এই আইনের দ্বারা করা হয়।

বিধিবদ্ধ আইন (statute), বিচারালয়ের সিদ্ধান্ত এবং আইন প্রদত্ত ক্ষমতাবলে শাসন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রণীত নিয়ম, কানুন ও নির্দেশের মধ্য দিয়া শাসনবিভাগীয় আইনের উৎপত্তি ঘটে।

ফৌজদারী আইন: আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার মাধ্যমে নাগরিকদের সুস্থ জীবনের পথকে সুগম করিয়া তোলা রাষ্ট্রের অন্যতম প্রধান কার্য। অপরাধ সংক্রান্ত বিধিনিষেধ, বিচার পদ্ধতি ও শাস্তি প্রয়োগ সম্পর্কে আইন প্রণয়ন করিয়া ফৌজদারী আইন রাষ্ট্রের শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করে।

আন্তর্জাতিক আইন (International Law):

একশ ত্রিশ-চল্লিশ বৎসর আগে রাষ্ট্রের সীমার মধ্যেই আইনের আলোচনাকে সীমাবদ্ধ রাখা অষ্টিনের পক্ষে স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু বর্তমান যুগে তাহা সম্ভব নয়। আরিষ্টটলের ধারণামত বর্তমানে কোন রাষ্ট্রই স্বয়ং সম্পূর্ণভাবে বাঁচিতে পারে না—অন্যান্য রাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্ক ও সহযোগিতার মাধ্যমেই তাহাকে বাঁচিয়া থাকিতে হয়। এই প্রয়োজনের মধ্য দিয়াই আত্ম-প্রকাশ করিয়াছে আন্তর্জাতিক আইন।

একটি জাতি বা রাষ্ট্রের সঙ্গে অন্য জাতি বা রাষ্ট্রের পারস্পরিক ব্যবহার সম্পর্কীয় নিয়ম-কানুনকে আন্তর্জাতিক আইন বলে। যেহেতু বর্তমান যুগে কোন রাষ্ট্রই স্বয়ংসম্পূর্ণ ও আত্মনির্ভরশীল নহে, তাই বিভিন্ন রাষ্ট্র পারস্পরিক ব্যবসা, বাণিজ্য, বিনিময় ও বিবিধ প্রকারের আদান-প্রদানের মধ্য দিয়া ক্রমশ পরস্পরের ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছে। আন্তর্জাতিক আইনের দ্বারাই বিভিন্ন রাষ্ট্রের সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণ করা হইয়া থাকে। অর্থাৎ বিভিন্ন রাষ্ট্র যে নীতি ও আদর্শের দ্বারা তাহাদের পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণ করে তাহাকে আন্তর্জাতিক আইন বলা হয়। ব্যবসা বাণিজ্য, যুদ্ধবিগ্রহ, রাজনৈতিক সম্পর্ক ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণের জন্য বিভিন্ন রাষ্ট্রের পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে যে-সমস্ত স্বীকৃত আন্তর্জাতিক নিয়মাবলী প্রচলিত তাহাই আন্তর্জাতিক আইন হিসাবে পরিচিত। আন্তর্জাতিক আইন কোন প্রকার সার্বভৌম চূড়ান্ত শক্তির দ্বারা বিধিবদ্ধ হয় নাই। বিভিন্ন রাষ্ট্রের ব্যবহারিক প্রথা, আন্তর্জাতিক বৈঠক, বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত বিচারের সিদ্ধান্ত, আন্তর্জাতিক আইনের বৈজ্ঞানিক আলোচনা, শাশ্বত ন্যায়-নীতির আদর্শ ইত্যাদি আন্তর্জাতিক আইনের উৎস হিসাবে দেখা দিয়াছে।

এইবার আন্তর্জাতিক আইনের শ্রেণীবিভাগ করিয়া উহাদের সম্পর্কে আলোচনা করা যাইতেছে:

৭ ॥ আন্তর্জাতিক আইন কি আইন?

আন্তর্জাতিক আইন

- সরকারী আন্তর্জাতিক আইন (Public International Law)
  - শান্তিকালীন আইন (Law of Peace)
  - যুদ্ধ সংক্রান্ত আইন (Law of War)
  - নিরপেক্ষতার আইন (Law of Neutrality)
- ব্যক্তিকেন্দ্রিক আন্তর্জাতিক আইন (Private International Law)

আন্তর্জাতিক আইনকে প্রথমত সরকারী আন্তর্জাতিক আইন (Public International Law) ও ব্যক্তিকেন্দ্রিক আন্তর্জাতিক আইন (Private International Law) এই দুইভাগে বিভক্ত করা যায়। বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে যুদ্ধকালীন ও শান্তিকালীন অবস্থায় এবং নিরপেক্ষ রাষ্ট্রের সঙ্গে যুদ্ধমান রাষ্ট্রের পারস্পরিক সম্পর্ক সরকারী আন্তর্জাতিক আইন নিয়ন্ত্রণ করে। অপরপক্ষে

যে আন্তর্জাতিক আইনের একপক্ষে একটি রাষ্ট্রের নাগরিক এবং অপরদিকে অন্য রাষ্ট্র উহার নাগরিক যুক্ত থাকে তাহাকে ব্যক্তিকেন্দ্রিক আন্তর্জাতিক আইন বলে।

সরকারী আন্তর্জাতিক আইন আবার তিনভাগে বিভক্ত। (১) শান্তিকালীন অবস্থায় বিভিন্ন রাষ্ট্রের পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণের জন্য যে আইন প্রচলিত থাকে তাহাকে শান্তিকালীন আন্তর্জাতিক আইন বলে। (২) দুই বা ততোধিক রাষ্ট্রের মধ্য যুদ্ধ চলাকালীন অবস্থায় যে আইনের দ্বারা উহাদের সম্পর্ক নিয়ন্ত্রিত হয়, তাহা যুদ্ধ সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক আইন। (৩) যুদ্ধ চলাকালীন যে সমস্ত রাষ্ট্র যুদ্ধের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট না থাকিয়া নিরপেক্ষতা অবলম্বন করে, তাহাদের সঙ্গে যুদ্ধমান রাষ্ট্রের সম্পর্ক আন্তর্জাতিক নিরপেক্ষতার আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে।

আইনের উপরোক্ত শ্রেণীবিভাগের বাহিরেও কয়েক প্রকারের আইন দেখিতে পাওয়া যায়। উদাহরণ হিসাবে বিভিন্ন রাষ্ট্রের আইনসভা কর্তৃক গৃহীত বিধিবদ্ধ আইন (Statute), ইংলণ্ডের প্রথাগত আইন (Common Law), হুকুম আইন (Ordinances) প্রভৃতির উল্লেখ করা যাইতে পারে।

আন্তর্জাতিক আইন প্রকৃতপক্ষে 'আইন' পদবাচ্য কিনা সে বিষয়ে বিতর্কের যথেষ্ট অবকাশ আছে। কারণ, রাষ্ট্রবিজ্ঞানিগণ এ বিষয়ে কোন সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন নাই। কোন কোন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ও ব্যবহার-শাস্ত্রবিদ্ যুক্তিতর্কের সাহায্যে আন্তর্জাতিক আইনকে শাশ্বত আইন হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। ইহার তীব্র বিরোধিতা করিয়া আর এক শ্রেণীর রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ও ব্যবহারশাস্ত্রবিদ্ প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন যে, আইনের সংজ্ঞানুসারে আন্তর্জাতিক নিয়মাবলীকে কোনপ্রকারেই 'আইন' হিসাবে চিহ্নিত করা যায় না।

হবস্, অস্টিন, হল্যাণ্ড প্রভৃতি পণ্ডিতগণ আন্তর্জাতিক আইনকে প্রকৃত আইন হিসাবে গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিয়া যে-সমস্ত যুক্তি ও বক্তব্য উত্থাপন করিয়াছেন তাহা নিম্নে আলোচনা করা হইল।

১। ইহারা মনে করেন যে আইন হইল সার্বভৌমের আদেশ; কিন্তু আন্তর্জাতিক আইন কোন চরম ক্ষমতাসম্পন্ন সার্বভৌম শক্তি দ্বারা সৃষ্ট ও প্রযুক্ত হয় না, ইহার ভিত্তিতে আছে শুধুমাত্র মানসিক শক্তি।[7] কারণ,

7. "There is force, the force of minds which made up these rules, but these minds are not organised into a single organ of compulsion."—Gilchrist.

আন্তর্জাতিক আইনের ক্ষেত্রে কোন সার্বভৌম শক্তির অস্তিত্ব নাই। সুতরাং এই মৌলিক অসঙ্গতির জন্য ইহাকে আইন-এর পর্যায়ে ফেলা যায় না।

২। আইন তাহাকেই বলা যায় যাহা ভঙ্গ হইলে আইনানুযায়ী প্রতিকার ও শাস্তিদানের ব্যবস্থা নিশ্চিত থাকে। আন্তর্জাতিক আইনের ক্ষেত্রে দেখা যাইবে যে, আইনকে যথাযোগ্যভাবে প্রয়োগ এবং আইনভঙ্গকারীকে শাস্তি দিবার জন্য সার্বভৌম শক্তি সর্বদাই সক্রিয় থাকে। কিন্তু আন্তর্জাতিক আইন ভঙ্গ হইলে ইহার প্রতিকার ও আইন ভঙ্গকারী রাষ্ট্রকে শাস্তি দিবার কোন ব্যবস্থা নাই। সুতরাং আন্তর্জাতিক আইনকে আইনের মর্যাদা দেওয়া যায় না।

৩। আন্তর্জাতিক আইন বিশেষ করিয়া ইহার যুদ্ধসংক্রান্ত বিধি-নিষেধ প্রায়শঃই অমান্য করা হয়। যে বিধিনিষেধ সাধারণতঃ মান্য ও প্রতিপালিত হয় না তাহাকে আইন পদবাচ্য করা যায় না।

৪। আন্তর্জাতিক আইনের কোন সর্বসম্মতরূপ ও নির্দিষ্টতা নাই। অবস্থা, ইচ্ছা ও স্বার্থ অনুযায়ী বিভিন্ন রাষ্ট্র ইহার প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা এবং ইহাকে প্রয়োগ করিয়া থাকে। যে নিয়মের সর্বসম্মতরূপ ও নির্দিষ্টতা নাই তাহাকে আইন হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া যায় না।

এই সমস্ত ত্রুটির জন্য অস্টিন প্রমুখ পণ্ডিতগণ আন্তর্জাতিক আইনকে আইনের পর্যায়ে অন্তর্ভুক্ত করিতে প্রস্তুত নন। লর্ড সলস্‌বেরী বলিয়াছেন: আইন শব্দটি যে-অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে আন্তর্জাতিক আইন সেই অর্থে আইন নয়।[৪] কেহ কেহ নিছক সৌজন্য, সুবিধাদান ও অনুগ্রহ (courtesy, concession and grace)-এর ভিত্তিতে ইহাকে আইন বলিয়া স্বীকৃতি দিতে প্রস্তুত। আইনবিশারদ হল্যাণ্ডের মতে ব্যবহারিক শাস্ত্রের মৌলিকতার বিচারে অন্তর্জাতিক আইন কোন প্রকারেই আইন নয়। তাই তিনি বলিয়াছেন আন্তর্জাতিক আইনকে আইন বলিলে আইনশাস্ত্রের অস্তিত্বই থাকে না। (International law is the vanishing point of Jurisprudence).

অন্যদিকে হেন্‌রী মেইন, হল, ওপেনহাইম প্রভৃতি পণ্ডিত ও আন্তর্জাতিক আইনবিশারদগণের মতে আন্তর্জাতিক আইন শাশ্বত ন্যায় ও নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত যথার্থ আইন। নিজেদের বক্তব্যের সমর্থনে তাঁহারা নিম্নলিখিত যুক্তিকে উপস্থিত করিয়াছেন।

৪ "International law has not any existence in the sense in which the term is usually used."

১। রাষ্ট্রীয় আইনের মত আন্তর্জাতিক আইনও কতকগুলি প্রথা ও চিরন্তন নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত।

২। অনেক সময় রাষ্ট্রগুলি আন্তর্জাতিক আইন মান্য করে না এই যুক্তিতে ইহাকে আইনের মর্যাদা দিতে অস্বীকার করা সঙ্গত নয়। কারণ, রাষ্ট্রীয় আইনও অনেক সময় ভঙ্গ করা হয়। রাষ্ট্রীয় আইন ক্ষেত্রবিশেষে ভঙ্গ হইলেও যদি আইন হিসাবে স্বীকার করিতে আপত্তি না থাকে তবে আন্তর্জাতিক আইন সময় সময় ভঙ্গ হয় বলিয়া ইহাকে আইনের পর্যায়ে না ফেলিবার কোন যুক্তি ও সঙ্গত কারণ নাই।

৩। আন্তর্জাতিক আইন ক্ষেত্র-বিশেষে ভঙ্গ করা হইলেও কোন রাষ্ট্রই স্বীকার করে না যে সে ইচ্ছাপূর্বক আন্তর্জাতিক আইন ভঙ্গ করিয়াছে। আন্তর্জাতিক আইন ভঙ্গ করা হইয়াছে বলিয়া যখনই কোন রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করা হয়, তখনই দেখা যায় যে অভিযুক্ত রাষ্ট্র আন্তর্জাতিক আইনের অন্যপ্রকার ব্যাখ্যা করিয়া প্রমাণ করিবার চেষ্টা করে যে সে আইনভঙ্গ করে নাই। সুতরাং দেখা যাইতেছে আন্তর্জাতিক আইনের প্রতি শ্রদ্ধা ও আনুগত্য দেখাইতে রাষ্ট্রগুলির চেষ্টার কোন ত্রুটি নাই।

৪। আন্তর্জাতিক আইনের পশ্চাতে সার্বভৌম শক্তির অস্তিত্ব নাই, সুতরাং ইহা যথার্থ আইন নয় বলিয়া যাহা প্রচার করা হইয়া থাকে, তাহার বিরোধিতা করিয়া বলা হইয়াছে যে, সার্বভৌম শক্তির প্রয়োজন হয় আইনকে প্রয়োগ করিবার জন্য, আইনের অস্তিত্বের জন্য সার্বভৌম শক্তির প্রয়োজন অপরিহার্য নয়। আন্তর্জাতিক আইনকে প্রয়োগ ও বলবৎ করিবার জন্য আন্তর্জাতিক সংস্থা রহিয়াছে। সুতরাং সার্বভৌম শক্তির অভাবের জন্য ইহাকে আইনের মর্যাদা না দিবার সঙ্গত কারণ নাই।

৫। আন্তর্জাতিক আইন বেশি দিনের নয়। গেটেলের মতে আন্তর্জাতিক আইনের যে সমস্ত ত্রুটি আছে তাহা যে-কোন আইনের প্রথম পর্যায়ে পরিলক্ষিত হয়। বিপক্ষবাদীদের মতে আন্তর্জাতিক আইন ভঙ্গ করিলে কোনপ্রকার শাস্তি হয় না। কিন্তু ইহা সম্পূর্ণভাবে গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সনদে আন্তর্জাতিক আইনভঙ্গকারীর বিরুদ্ধে শাস্তিদানের কথা লিপিবদ্ধ আছে।

উপসংহার: উপরোক্ত দুইটি মতবাদের ভিতরই যথেষ্ট যুক্তি রহিয়াছে। কিন্তু ইহারা এতটা পরস্পরবিরোধী যে ইহাদের ভিতর কোন প্রকার সামঞ্জস্য

সাধন করা সম্ভবপর নয়। বস্তুতঃ এই পরস্পরবিরোধী মতবাদের কারণ হইতেছে আইনের সংজ্ঞা লইয়া মতান্তর। আইনের প্রকৃত সংজ্ঞা কী সে-ব্যাপারে ব্যবহারশাস্ত্রবিদ্‌গণ কোন সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন নাই। আইনের সংজ্ঞা লইয়া যেখানে বিতর্কের অবকাশ আছে সেখানে আন্তর্জাতিক আইন প্রকৃতপক্ষে আইন কিনা সে বিষয়ে মতভেদ

(আইনে সম্পর্কে) অস্টিন এবং তাঁহার অনুগামীদের সংজ্ঞা অনুযায়ী আন্তর্জাতিক আইন নিছক কতগুলি আন্তর্জাতিক নৈতিক বিধিনিষেধ (International ethics) ছাড়া কিছু নয়। এই বক্তব্যকে অন্যভাবে প্রকাশ করিয়া বলা হইয়া থাকে যে, আন্তর্জাতিক প্রথা ও জনমতের সমষ্টি হইতেছে আন্তর্জাতিক আইন। কিন্তু ইহাও অনস্বীকার্য যে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ, আন্তর্জাতিক বিচারালয়, পৃথিবীর সুস্থ জনমত প্রভৃতির প্রভাবে আন্তর্জাতিক আইন ক্রমশ আইনের মর্যাদালাভের পথে অগ্রসর হইতেছে (Law in the making), ইহা আর নিছক নৈতিক বিধি নিষেধের গণ্ডীতে আবদ্ধ নয়। সাম্প্রতিক রাজনৈতিক ঘটনাবলী বিশ্লেষণ করিলে ইহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাইবে। জাতীয় স্বার্থসংরক্ষণ, বিশ্বশান্তি ও বিশ্বমানবের কল্যাণের উদ্দেশ্যে আন্তর্জাতিক আইনের বাধ্যবাধকতা যে রাষ্ট্রীয় আইনের মতই কাম্য সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

৮ ॥ আইনের অনুমোদন (Sanction of Law):

এইবার মানুষ কেন স্বভাবগত দিক হইতে আইন মান্য করে তাহা আলোচনা করা যাইতে পারে। কোন কিছুকে মানুষ সহজভাবে মানিয়া লইলে ধরিতে হইবে যে, তাহার পশ্চাতে কোন শক্তির অনুমোদন রহিয়াছে। সাধারণত আইন মানুষ মান্য করে, বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই বিনা দ্বিধায়, বিনা প্রতিবাদে। সুতরাং আইনের পশ্চাতেও নিশ্চয়ই কোন শক্তির অনুমোদন (sanction) রহিয়াছে যাহার জন্য আইন মান্য করা হয়। প্রাচীনযুগে আইন সম্বন্ধে মানুষের ধারণা ছিল ধর্মগত। আইন অমান্য করলে দেবতা ক্রুদ্ধ হবেন এই যুক্তিতেই মানুষ আইন মান্য করিত। অর্থাৎ দেবশক্তির অনুমোদনে সেইযুগে আইন মান্য করা হইত। বর্তমানে আইনের অনুমোদন সম্পর্কে মূলত দুইটি মতবাদ আছে। পূর্বেই বলা হইয়াছে হবস্, অস্টিন প্রভৃতি মনে করেন, যেহেতু আইন সার্বভৌমের আদেশ, তাই আইনের পশ্চাতে

সার্বভৌম শক্তির অনুমোদন রহিয়াছে। তাঁহাদের মতে এই অনুমোদন থাকিবার জন্যই মানুষ সার্বভৌম শক্তির ভয়ে আইন মান্য করে।

কিন্তু রুশো ও তাঁহার সমর্থকগণ উপরোক্ত মতবাদে বিশ্বাসী নন। আইনকে তাঁহারা সমষ্টিগত ইচ্ছার প্রকাশ বলিয়া মনে করেন। সুতরাং সেই ক্ষেত্রে আইনের ভিত্তি বা অনুমোদন হইতেছে ব্যাপক জনমত। আইনের প্রয়োজন ও উপযোগিতার ভিত্তিতে আইনের স্বপক্ষে জনমত সৃষ্ট হয় যাহা আইনের প্রতি মানুষকে অনুগত করে। বর্তমানে ইহা প্রায় সর্বজন-স্বীকৃত যে জনমতকে উপেক্ষা করিয়া রাষ্ট্রকর্তৃত্ব বজায় রাখা বা আইনকে বলবৎ ও কার্যকরী করা সম্ভব নয়।

ল্যাস্কিও মনে করেন যে আইন যাহাদের উপর প্রযোজ্য তাহাদের সম্মতি ব্যতীত আইন প্রয়োগ করা যায় না। সুতরাং যে কোন রাষ্ট্রের আইনের অনুমোদন নির্ভর করে মানুষের সম্মতির উপর। এই তত্ত্বের একটা অসম্পূর্ণরূপ প্রকাশ পাইয়াছে সামাজিক মতবাদে। সেইখানে বলা হইয়াছে, রাষ্ট্র গঠন করিতে ও আদেশ বা আইন জারী করিবার ক্ষমতা দিতে মানুষই একদিন সম্মতি দিয়াছিল।

এই দুই মতবাদের মধ্যে সমন্বয় সাধন করিয়া হেনরী মেইন প্রভৃতি বলিয়াছেন যে, আইনের পশ্চাতে জনমত ও সার্বভৌম শক্তি উভয়েরই অনু-মোদন রহিয়াছে। আইনের অনুমোদনের একটি ভিত্তি হইতেছে ইহা মান্য করিবার আইনগত বাধ্যবাধকতা। কিন্তু তাহা অপেক্ষাও শক্তিশালী অনু-মোদন আসিতেছে জনমতের নিকট হইতে। রাষ্ট্রকে আইনের প্রতি জনগণের আনুগত্য আদায়ের জন্য শক্তি প্রয়োগ করিবার প্রয়োজন হয় না, যদি সেই আইন জনসাধারণের আশা-আকাঙ্ক্ষাগুলির বাস্তবে রূপায়িত হইবার পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি না করে। সেই ক্ষেত্রে জনমত স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া আইনের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে। সুতরাং আইনের প্রতি আনুগত্য ও ইহার অনুমোদন শুধুমাত্র রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতার উপর নির্ভর করে না। জনমতই হইতেছে আইন অনুমোদনের প্রধান শক্তি।

৯॥ আইন ও নৈতিকবিধি (Law and Morality):

রাষ্ট্রবিজ্ঞানে যাহাকে আমরা 'আইন' বলি সেই সমস্ত প্রত্যক্ষ এবং সার্বভৌম কর্তৃক স্বীকৃত নিয়মগুলি ব্যতীত আরও কতকগুলি বিধি-নিষেধের কল্পনা করা

যায়, যাহার ভিত্তিতে মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক একটা নৈতিক ও আদর্শ ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। শেষোক্ত এই নিয়মাবলী যাহার পিছনে সার্বভৌম শক্তির কোন সমর্থন নাই, অথচ মানুষের বিবেক, নীতিবোধ ঔচিত্যবোধের উপর ভিত্তি করিয়া যাহা প্রতিষ্ঠিত, তাহাকে নৈতিক আইন বা নৈতিকতা (Morality) বলা হয়।

প্রকৃতিগতভাবে রাষ্ট্রীয় আইন ও নৈতিকবিধান স্বতন্ত্র, তাই ইহাদের কার্য-ক্ষেত্রও (sphere) পৃথক। আইন শুধুমাত্র মানুষের বহির্জীবন এবং বাহ্যিক আচার-আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে। মানুষের আভ্যন্তরীণ জগতের চিন্তা ও কার্য-কলাপের উপর ইহার কোন এক্তিয়ার নাই। অপরপক্ষে নৈতিক বিধান মানুষের সমগ্র ক্রিয়াকর্ম, চিন্তা, অনুভূতি, কার্যকলাপের উদ্দেশ্য ও বাস্তব কার্যকলাপকে নিয়ন্ত্রিত করে। মানুষের চিত্তশুদ্ধি ও তাহাকে নৈতিক আদর্শে পরিচালিত করাই নীতিশাস্ত্রের উদ্দেশ্য। নৈতিক বিধি মানুষের বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ উভয় কার্যকলাপকেই নিয়ন্ত্রিত করে। সুতরাং রাষ্ট্রনৈতিক আইন হইতে নৈতিক আইনের ক্ষেত্র অনেকটা ব্যাপকতর। উদাহরণ হিসাবে বলা যাইতে পারে যে, স্বার্থপরতা, অকৃতজ্ঞতা ইত্যাদি মানুষের আভ্যন্তরীণ প্রবণতা-গুলি নৈতিক আইনে দূষণীয়—যদিও এইগুলি রাষ্ট্রীয় আইনের দ্বারা দণ্ডনীয় নয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রেই শুধুমাত্র নৈতিক আইন রাষ্ট্রীয় আইন হইতে ব্যাপকতর নয়, ইহার গতিবিধিও অনেক সূক্ষ্ম ও বহুদূর প্রসারিত।

আইন ও নৈতিক বিধানের পারস্পরিক সম্পর্ক আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, একদিকে যেমন উহাদের ভিতর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রহিয়াছে, ঠিক তেমনি অপরদিকে রাষ্ট্রীয় আইন ও নৈতিক বিধানের মধ্যে গভীর পার্থক্যও রহিয়াছে। নিম্নে উহাদের ভিতরকার অসাদৃশ্য ও অসঙ্গতি আলোচনা করা হইল।

প্রথমত, রাষ্ট্রীয় আইন সার্বভৌম শক্তি দ্বারা প্রয়োগ করা হয়। কিন্তু নৈতিক আইন বলবৎ বা কার্যকরী করার জন্য এইরূপ কোন শক্তি নাই। বিবেকের দংশন, ঔচিত্যবোধ, লোকনিন্দা প্রভৃতির জন্যই নৈতিক আইন সাধারণত কার্যকরী হয়।

দ্বিতীয়ত, নীতিগতভাবে যাহা অন্যায় তাহা রাষ্ট্রনৈতিক আইনের দৃষ্টিতে অপরাধ নাও হইতে পারে। ঠিক তেমনি রাষ্ট্রীয় আইনের চোখে যাহা অপরাধ নৈতিক মানে তাহা দূষণীয় বলিয়া মনে নাও হইতে পারে। উদাহরণ হিসাবে

বলা যাইতে পারে যে, মদ্যপান করা নৈতিক অপরাধ, কিন্তু সর্বদা আইনত দণ্ডনীয় নয়। ঠিক তেমনি সমানাধিকারের দাবীতে নিগ্রোরা যে আন্দোলন করেন তাহা আইনত দণ্ডনীয় হইলেও নীতিগতভাবে দোষনীয় নয়।

তৃতীয়ত, রাষ্ট্রীয় আইন ভঙ্গ করিলে তাহা দণ্ডনীয়। কিন্তু নৈতিক বিধান ভঙ্গ করিলেই শাস্তি পাইতে হয় না। নৈতিক অপরাধ যে-সমস্ত ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় আইনের দৃষ্টিতে অপরাধ বলিয়া বিবেচিত হয়, একমাত্র সেই ক্ষেত্রেই ইহা দণ্ডনীয়।

চতুর্থত, পূর্বেই বলা হইয়াছে রাষ্ট্রীয় আইন শুধুমাত্র মানুষের বহির্জীবন নিয়ন্ত্রণ করে। অপরপক্ষে নৈতিক আইন মানুষের সমগ্র জীবনকে—তাহার চিন্তা, অনুভূতি, কার্যাবলী ইত্যাদি সমুদয় বিষয়কে নিয়ন্ত্রিত করে।

পঞ্চমত, রাষ্ট্রীয় আইন অনেকটা পরিমাণে নির্দিষ্ট, সুস্পষ্ট ও সুসম্বদ্ধ। কিন্তু নৈতিক বিধান মানুষের আভ্যন্তরীণ জীবনের চিন্তা, অনুভূতি, বোধ প্রভৃতি সূক্ষ্ম প্রবণতাকে আশ্রয় করিয়া সৃষ্ট হয় বলিয়া ইহা এতটা সুস্পষ্ট ও নির্দিষ্ট নয়।

ষষ্ঠত, নৈতিক বিধান ন্যায়-অন্যায়, ঔচিত্য-অনৌচিত্য প্রভৃতি বোধের উপর ভিত্তি করিয়া গঠিত। কিন্তু রাষ্ট্রীয় আইনের ক্ষেত্রে এই সমস্ত চিন্তা বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না। রাষ্ট্রীয় আইন মূলত রাষ্ট্রের অস্তিত্ব, নিরাপত্তা, প্রয়োজন ও জনকল্যাণের কথা চিন্তা করিয়া রচিত হয়। তাই রাষ্ট্র এমন আইনও সৃষ্টি করে যাহা রাষ্ট্রের অস্তিত্বের জন্য প্রয়োজনীয়, যদিও তাহা ন্যায়নীতি বিরোধী হইতে পারে। অবশ্য অনেকে মনে করেন যে, বিশেষ অবস্থায় হইলেও স্বাভাবিক অবস্থায় রাষ্ট্রীয় আইনের নীতি বহির্ভূত হওয়া ঠিক নয়। সুতরাং রাষ্ট্রের নীতিজ্ঞানবিরোধী আইন করিবার অধিকারটি চূড়ান্ত নয়—শর্তসাপেক্ষ।

রাষ্ট্রীয় আইনের সঙ্গে নৈতিকতার এই গভীর পার্থক্য স্বীকার করিয়াও বলিতে হইবে যে, ইহাদের ভিতর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রহিয়াছে। মানব সভ্যতার আদিম স্তরে আইন ও নৈতিক বিধানের মধ্যে কোনরূপ পার্থক্য ছিল না। প্রাচীন গ্রীক্ দার্শনিকগণ ইহাদের স্বতন্ত্র করিয়া দেখেন নাই। ষোড়শ শতাব্দীতে সর্বপ্রথম ম্যাকিয়াভেলী রাষ্ট্রনীতিকে নীতিশাস্ত্র হইতে পৃথক করিলেন।

আইন ও নৈতিকতার ভিতর এইরূপ ঘনিষ্ঠতার কারণ হইতেছে এই যে,

উভয়ই মানুষের সুষ্ঠু, সুসংবদ্ধ সমাজজীবন যাপনের উদ্দেশে সৃষ্ট হইয়াছে। একদিকে আইনের মধ্য দিয়া দেশের নৈতিক অবস্থার উন্নতির চেষ্টা অনেক সময় পরিলক্ষিত হয়। যেমন, হিন্দুসমাজে বহু বিবাহ বে-আইনী করিয়া জনগণের নৈতিক উন্নয়নের প্রচেষ্টা চালানো হইতেছে। এই ক্ষেত্রে আইন প্রচলিত নৈতিক বিধানের পরিবর্তনে সাহায্য করিতেছে। অপরদিকে, নীতিবোধের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখিয়া আইন সৃষ্টি করার চেষ্টাও একটি লক্ষ্যণীয় ঘটনা। যেমন, একসময়ে ভারতবর্ষে সহমরণ ও বাল্যবিবাহের প্রচলন ছিল। কিন্তু ইহা সেই যুগে নীতিবিরোধী ছিল না বলিয়া এই সমস্ত ঘটনাকে আইন করিয়া বন্ধ করা সম্ভব হয় নাই। কিন্তু ধীরে ধীরে যখন বাল্য বিবাহ ও সহমরণ অন্যায় বলিয়া বিবেচিত হইল তখনই ইহা নিরোধ করিবার উপযোগী আইন প্রণয়ন সম্ভবপর হইয়াছে। এই কারণেই অধ্যাপক গেটেল বলিয়াছেন: "রাষ্ট্রীয় আইন যদি প্রচলিত নীতিজ্ঞান হইতে বেশি পরিমাণ অগ্রবর্তী বা পশ্চাদ্‌পদ হয়, তবে তাহাকে কার্যকরী করা কষ্টকর"।

ইহার কারণ সর্বপ্রকার আইনের সাফল্য মূলত নির্ভর করে জনমতের উপর। আইনের ভিতর দিয়া দেশের নৈতিক মান উন্নয়ন করিবার প্রচেষ্টাকে যদি জনমত গ্রহণ না করে বা বিরোধিতা করে তবে তাহা কার্যকরী হইতে পারে না। যুক্তরাষ্ট্রে এই কারণেই মদ্যপান নিরোধ আইন বাতিল করিতে হইয়াছিল। সুতরাং নৈতিক আইনকে রাষ্ট্রীয় আইনের পর্যায়ে উন্নীত করিতে হইলে বা রাষ্ট্রীয় আইনের সাহায্যে দেশের নৈতিক অবস্থার উন্নতি করিবার জন্য জনমতের আনুকূল্য ও সমর্থন একান্ত প্রয়োজনীয়।

সুতরাং রাষ্ট্রীয় আইনের সঙ্গে নৈতিক আইনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রহিয়াছে। এবং রাষ্ট্র সর্বোচ্চ নীতিগুলিকে জনমতানুযায়ী রাষ্ট্রীয় আইনের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করে। কিন্তু স্মরণ রাখিতে হইবে যে রাষ্ট্র নীতিমূলক প্রতিষ্ঠান নয়। তাই উভয়ের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক থাকা সত্ত্বেও স্বীকার করিতে হইবে যে, নীতি ও আইনের ক্ষেত্র স্বতন্ত্র, যদিও ইহাদের ভিতরকার সীমারেখা সর্বত্র সুস্পষ্ট নয়।

নবম অধ্যায়

জাতিতত্ত্ব

Theories of the Nation

বর্তমান যুগে রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তার ক্ষেত্রে জাতিতত্ত্বটি বিশেষ গুরুত্বলাভ করিয়াছে। বস্তুত বিভিন্ন জাতির পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে জাতীয়তাবাদ একটি আবেগপূর্ণ প্রভাবশালী উপাদান হিসাবে দেখা দিয়াছে। অর্থাৎ আমাদের যুগে জাতীয়তাবাদ একটি চরম চলমান শক্তি হিসাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে এবং প্রতিটি ব্যক্তি ও জাতি কম-বেশি পরিমাণে এই বোধের দ্বারা প্রভাবান্বিত।

১॥ জনসমাজ, জাতীয় জনসমাজ, জাতি ও জাতীয়তাবাদ (People, Nationality, Nation and Nationalism) : বাংলা ভাষায় 'জাতি' শব্দটিকে আমরা বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার করিয়া থাকি। ইংরাজীতে যাহাকে caste বলে আমরা তাহাকে জাতি বলি। ইংরাজী Race কথাটিকেও আমরা জাতি নামেই অভিহিত করি। ইংরাজী Clan বা Tribeকেও আমরা অনেক সময় গোষ্ঠী না বলিয়া জাতি বলি। আবার ইংরাজীতে 'নেশন' বলিতে যাহা বুঝায় তাহাকেও আমরা জাতি বলি। এই বিভ্রান্তি হইতে মুক্ত হইবার জন্যই রবীন্দ্রনাথ 'নেশন' জাতি না বলিয়া বাংলায় নেশনই বলিয়াছেন। এমনকি 'রাষ্ট্র' ও 'জাতি' শব্দ দুইটিকে আমরা বিভিন্ন সময়ে একই অর্থে ব্যবহার করিয়া থাকি।[1] যেমন 'সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ' বলিতে আমরা বিভিন্ন রাষ্ট্রের সম্মিলিত সংস্থাকে বুঝি। যাহাই হউক জাতিতত্ত্বের আলোচনার ক্ষেত্রে জনসমাজ (People), জাতীয় জনসমাজ (Nationality), জাতি (Nation) ও জাতীয়তাবাদ (Nationalism) শব্দগুলিকে আমাদের ব্যবহার করিতে হইবে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানে এই শব্দগুলি একই অর্থে ব্যবহৃত হয় না—বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার করা হইয়া থাকে। সুতরাং প্রথমেই আমরা উপরোক্ত শব্দগুলির ভিতরকার পার্থক্য আলোচনা করিলাম।

---

1. "The terms 'state' and 'nation' are frequently identified both in popular usage and in scientific discussion."—Garner.

একই ভূখণ্ডে বসবাসকারী কিছু সংখ্যক লোকের ভাষায়, সাহিত্যে, ইতিহাসে, আচার-ব্যবহারে, অধিকারবোধে যদি একটি ঐক্যের সন্ধান পাওয়া যায়, তবে তাহাকে **জনসমাজ** (People) নামে অভিহিত করা যায়। অর্থাৎ সঙ্ঘবদ্ধ সমাজজীবনের বৈশিষ্ট্যগুলি সর্বপ্রথম আত্মপ্রকাশ করে জনসমাজের মধ্য দিয়া। অনেকে মনে করেন যে উপরোক্ত ঐক্যগুলিই যথেষ্ট নয়, জনসমাজ গঠনের জন্য উৎসগত ঐক্যও প্রয়োজন।

জনসমাজের মধ্য রাষ্ট্রনৈতিক চেতনা জাগ্রত হইলে জাতীয় জনসমাজ-এর উদ্ভব হয়। যখন কোন মানবসমাজ পরস্পরের সহিত রক্তের সম্পর্ক বা কুলগত (Raial) ঐক্যের দ্বারা আবদ্ধ থাকে, যখন তাহাদের ধর্ম ও ভাষা এক হয়, যখন তাহারা একই ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে বাস করে এবং একই ধরনের অর্থনৈতিক স্বার্থবন্ধনে যুক্ত থাকে, তখন জাতীয় জনসমাজের জন্ম হইয়াছে বলা যাইতে পারে। লর্ড ব্রাইসের ভাষায় বলা যায়: "জাতীয় জনসমাজ হইল ভাষা, সাহিত্য, ধ্যান-ধারণা, রীতিনীতি ও ঐতিহ্য প্রভৃতির শত শত বৎসরের বন্ধনে আবদ্ধ এমন এক জনসমষ্টি যাহা অনুরূপভাবে ঐক্যবদ্ধ অন্যান্য জনসমষ্টি হইতে নিজেকে পৃথক বলিয়া মনে করে।[2] জনসমাজের এক উন্নততস্তর হিসাবে জাতীয় জনসমাজকে মনে করা যাইতে পারে। অর্থাৎ একই অতীত ইতিহাস, সংস্কৃতি, সভ্যতা ও ঐতিহ্যের বন্ধনে আবদ্ধ, একই ধরনের আদর্শে উদ্বুদ্ধ, একই রকমের চিন্তা করিতে অভ্যস্ত, একই প্রকারের মানসিক গঠনে চিহ্নিত এক ঐক্যবদ্ধ ও গভীর রাষ্ট্রনৈতিক চেতনাসম্পন্ন জনসমাজই হইতেছে **জাতীয় জন সমাজ** বা nationality।

জাতীয় জনসমাজের মধ্যে ঐক্য ও রাষ্ট্রনৈতিক চেতনা যখন আরও গভীরতর হয়, তখন জন্ম হয় জাতি বা নেশন-এর। জনসমাজের সঙ্গে জাতীয় জনসমাজের পার্থক্য নির্দেশ করিয়া ব্রাইস বলিয়াছেন যে ভাষা, সাহিত্য, ধ্যান-ধারণা, রীতি-নীতি, ঐতিহ্য প্রভৃতির বন্ধনে ঐক্যবদ্ধ জনসমষ্টিকে জনসমাজ বলে। অপরপক্ষে রাষ্ট্রনৈতিকভাবে সংগঠিত জনসমাজ যাহা বহিঃশাসন হইতে মুক্ত হইবার চেষ্টা করিতেছে তাহাকে জাতি (Nation) বলে।

2. "A nationality is a population held together centuries, *by* as for example, language and literature, ideas, customs, and traditions, in such way so to feel itself a coherent unity distinct from other populations similarly held together by like ties of their own."—Bryce.

ম্যাটসিনি (Mazzini) উৎসগত ঐক্য ও রক্তগত সচেতনাসম্পন্ন জনসমাজকে জাতি বলিয়াছেন।[৪]

জাতি একটি সজীব সত্তা, একটি মানস পদার্থ। ফরাসী মণীষী রেণাঁকে (Renan) অনুসরণ করিয়া বলা যায়, "অনেকগুলি সংযতমনা ও ভাবোত্তপ্তহৃদয় মনুষ্যের মহাসংঘ যে একটি সচেতন চরিত্র সৃজন করে, তাহাই নেশন বা জাতি।" অনেকে মনে করেন যে জাতি সৃষ্টির ক্ষেত্রে কতকগুলি উপাদান অপরিহার্য। কিন্তু রেঁণার মনে করেন মানুষ কুল, ধর্ম, ভাষা, ধর্ম বা নদ নদীর দাস নয়। তাই ইহাদের নির্দেশিত পথে জাতি সৃষ্টি হয় না। তাঁহার মতে জাতীয়তা-বোধ সৃষ্টির জন্য কোন বাস্তব উপাদানের প্রয়োজন নাই। অতীত স্মৃতি ও ভবিষ্যতের আশা—এই মানসিক অনুভূতিই যথেষ্ট। অনুরূপভাবে জিমার্নও মনে করেন যে, কোন জনসমাজের মধ্যে যদি জাতীয় জনসমাজের উপলব্ধি দেখা যায় তবে তাহাই জাতীয় জনসমাজ (If a people feels itself to be a nationality, it is a nationality)।

প্রসঙ্গত একটা কথা বলা প্রয়োজন যে মানব ইতিহাসের সর্বপর্যায়ে এবং বিশেষ করিয়া প্রথম স্তরে জাতির অস্তিত্ব খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। আর রাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে জাতীয়তাবাদ তো একটি সাম্প্রতিক ঘটনা; প্রাচীন গ্রীক্ নগর রাষ্ট্র, রোমান সাম্রাজ্য বা মধ্যযুগীয় সামন্তপ্রথা ও পবিত্র রোমান সাম্রাজ্য-এর (Holy Roman Empire) সময় জনসমষ্টি 'জাতি হিসাবে নিজেদের মনে করিত না। ইতিহাসে পর্যালোচনা করিলে দেখা যাইবে যে ইংলণ্ডে টিউডর রাজ বংশের অধীনে, ফ্রান্সে বুর্বো বংশের শাসনকালে এবং স্পেনে কার্ডিন্যাণ্ড ইসাবেলার রাজত্বকালে জাতিভিত্তিক রাষ্ট্র গড়িয়া উঠিতে আরম্ভ করে। 'জাতি'-এর অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়া পুরাতন সমাজ ব্যবস্থা ভাঙ্গিয়া নতুন সমাজ ব্যবস্থা গড়িয়া উঠিল।

জাতির স্বাজাত্যবোধের অনুভূতির প্রকাশ ঘটে জাতীয়তাবাদ বা ন্যাশনালিজমের ভিতর দিয়া। (**জাতীয়তাবাদ**) হইতেছে এক প্রকারের মানসিক অনুভূতি যাহা রাষ্ট্রনৈতিক আশা-আকাঙ্ক্ষার ভিতর দিয়া মূর্ত হইয়া উঠে। কেহ কেহ মনে করেন, ইহা শুধুমাত্র মানসিক অনুভূতিই নয়,—ইহার পিছনে কিছু কিছু বাস্তব উপাদান রহিয়াছে। রেঁনার মত অনুসরণ

৪. "A nation is a race, decended from common ancestors, and sharing some kind of blood conciousness."—Mazzini.

করিয়া বলা যায় যে, জাতীয়তাবোধ সৃষ্টির জন্য কোন বাস্তব উপাদানের প্রয়োজন নাই। অতীত স্মৃতি ও ভবিষ্যতের আশা—এই মানসিক প্রবণতাই যথেষ্ট।[4]

ম্যাকআইভারের মতে "জাতীয়তাবোধ হইল সেই সামাজিকবোধ যাহা এক বিশেষ সামাজিক যুগের ঐতিহাসিক পরিবেশের ভিতরে রাষ্ট্র গঠন করিয়াছে অথবা রাষ্ট্রের মাধ্যমে আপন অভিব্যক্তির এখনও অনুসন্ধান করিতেছে।"[5] ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, সামাজিক পরিবেশের মৌলিক পরিবর্তনের ভিতর দিয়া "জাতীয় রাষ্ট্র" এবং জাতীয়তাবাদ জন্মলাভ করিয়াছে। সমাজ পরিবর্তনের সংগ্রামে এক একটি বিশেষ ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে অবস্থিত মানবসমাজের নিজস্ব সংস্কৃতিগত ঐক্য এবং ভিন্ন ভিন্ন স্তরের সামাজিক বিকাশের ভিতর দিয়া বিভিন্ন জাতি গড়িয়া উঠিয়াছে এবং তাহার ভিতর দিয়া জাতীয়তাবাদ আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। জাতি ও জাতীয়তাবাদের উৎপত্তি সম্পর্কীয় এই দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে মার্কসবাদী চিন্তার মৌলিক সাদৃশ্য রহিয়াছে।

২॥ **জাতীয় জনসমাজের উপাদান (Elements of Nationality)**: পূর্বেই বলা হইয়াছে যে জাতীয় জনসমাজ বা জাতি গঠনের ব্যাপারে কয়েকটি উপাদান অপরিহার্য বলিয়া অনেকে মনে করেন। তাঁহাদের মতে যে সমস্ত উপাদান এইরূপ ঐক্য সৃষ্টিতে সাহায্য করে তাহারা হইতেছে জনগোষ্ঠি ও তাহার কুলগত ঐক্য, ভাষা, ভৌগোলিক নৈকট্য, ধর্মবোধ, সাংস্কৃতিক ঐক্য, রাষ্ট্রনৈতিক চেতনার ঐক্য, অর্থনৈতিক সমস্বার্থ ইত্যাদি।

জাতীয়তার প্রথম উপাদান নিঃসন্দেহেই **কুলগত ঐক্য**। যখন মানুষ মনে করে যে, তাহাদের ধমণীতে একই রক্ত প্রবাহিত এবং তাহাদের আকৃতিতে একই ধরনের কতকগুলি বৈশিষ্ট্য বর্তমান, তখন তাহারা স্বভাবতঃই সমগ্র গোষ্ঠিকে স্বজন বলিয়া মনে করে। এবং এই কুলগত ঐক্যবোধ জাতীয়তাবোধ সৃষ্টি করিতে প্রভূত পরিমাণে সাহায্য করে। উদাহরণ হিসাবে বলা যাইতে পারে যে, 'নর্ডিক' (Nordic) জাতির লোকেরাই শ্রেষ্ঠ এবং তাহাদের দেহেই একমাত্র বিশুদ্ধ আর্যরক্ত প্রবাহিত—এই দাবীর ভিত্তিতেই হিটলার ও তাহার

---

4. "What constitutes a nation is not speaking the same tongue or belonging to the same ethnic group having accomplished great things in common in the past and the wish to accomplish them in future."—Renan.

5. "Nationality is the sense of community which under the historical conditions of a particular social epoch, has possessed or still seeks expression through the unit of a state."—Mac Iver.

দল জাতীয়তাবোধ দ্বারা উদ্বুদ্ধ করিয়া জার্মানীর ঐক্য গঠনে সমর্থ হইয়াছিলেন। কিন্তু কোন কোন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী এই কুলগত ঐক্যের উপাদানকে অপরিহার্য বলিয়া মনে করেন না। কারণ আধুনিক বিজ্ঞান সংশয়াতীতভাবে প্রমাণ করিয়াছে যে, কুলগত পবিত্রতা (Racial purity) পৃথিবীতে কোথাও রক্ষিত হয় নাই।

কুলগত ঐক্যের পরেই হইতেছে **ভাষার ঐক্য**। ভাষা হইল মানুষের মনোভাব প্রকাশের মূলবাহন। যাহারা এক ভাষায় কথা বলে, তাহাদের প্রকাশভঙ্গি এক, তাহাদের রঙ্গরসিকতা এক, তাহাদের ইঙ্গিত, ইশারা প্রভৃতি একই প্রকারের। তাই তাহারা পরস্পরের মনের ভাব সহজে বোঝে ও বোঝাইতে পারে। ইহার ভিতর হইতে একটি ঐক্যবোধ সৃষ্টি হয় যাহা সমভাবাপন্ন পরিবারসমূহ ও গোষ্ঠীকে অবিচ্ছিন্ন বন্ধনে আবদ্ধ করে। ভাষার ঐক্যের জন্য সাহিত্য ও সংস্কৃতির মধ্যেও ঐক্য লক্ষ্য করা যায়।

তৃতীয় উপাদান **ভৌগোলিক সান্নিধ্য**ও গোষ্ঠিসমূহের মধ্যে জাতীয়তাবোধ জাগ্রত করিয়া ঐক্য সৃষ্টিতে সাহায্য করে। যখন শিশুকাল হইতে একদল লোক একই ভৌগোলিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে বাস করে, যখন তাহারা দেখে যে একই দেশের জমি, জল ও বায়ু হইতে তাহারা আহার্য সংগ্রহ করিতেছে, এবং যখন তাহারা অনুভব করে যে এই দেশের মাটির সহিত তাহাদের পিতৃপুরুষগণের অতীত জড়িত রহিয়াছে, তখন স্বাভাবিকভাবেই তাহাদের ভিতর গভীর ঐক্য স্থাপিত হয়। তাহারা উপলব্ধি করে যে, দেশের জল, বায়ু, মাটি, আলো তাহাদের দেহের ভিতর মিশিয়া গিয়া তাহাদের আকৃতি ও প্রকৃতি একটি বিশিষ্ট রূপ গ্রহণ করিয়াছে। ভৌগোলিক সান্নিধ্য এইভাবে সেই দেশের মানুষের ভিতর স্বভাবজাত ঐক্য সৃষ্টি করিয়া গভীর বন্ধনে আবদ্ধ করে।

চতুর্থত, একই প্রকারের **অর্থনৈতিক চেতনা,** সংগ্রাম, সুখ-সুবিধা ও অধিকারের ভিত্তিতে গোষ্ঠীজীবনে যে ঐক্য সৃষ্টি হয় জাতীয়তার উপাদান হিসাবে তাহার এক বিরাট অবদান রহিয়াছে। বর্তমানে সারা পৃথিবীতে শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনের ক্ষেত্রে এই অর্থনৈতিক উপাদান বিরাট ঐক্য সৃষ্টি করিয়াছে। প্রগাঢ় ঐক্যবোধ জাগ্রত করিবার ব্যাপারে অর্থনৈতিক উপাদানের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

পঞ্চমত, **ধর্মগত ঐক্য** জাতীয়তার আর একটি উপাদান। কিছুদিন আগে

পর্যন্ত ধর্মবোধ মানুষকে ঐক্যবদ্ধ ও নিয়ন্ত্রণ করিবার পক্ষে সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী উপাদান হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করিয়াছিল। যদিও বর্তমান কালে ইহার প্রভাব কিছু পরিমাণে কমিয়াছে কিন্তু আজও একই ঈশ্বরের উপাসনা ও একই ধর্মবোধ-এর ভিত্তিতে মানুষ ঐক্যবদ্ধ এবং ধর্মবিশ্বাসের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হইতেছে।

সাংস্কৃতিক ও ভাবগত ঐক্যও মানুষের কৃষ্টি, শিল্প, সাহিত্য, রুচি, ভাব ও ধ্যান-ধারণার ঐক্যের ভিত্তিতে একাত্মবোধ সৃষ্টি করে। এই একাত্মবোধ জাতীয়তার অনুভূতি দ্বারা মানুষকে আবদ্ধ করে।

এখন প্রশ্ন হইতেছে যে, জাতীয়তার অনুভূতি সৃষ্টি করিবার জন্য এই সমস্ত উপাদান কী-একান্তই অপরিহার্য? বিভিন্ন জাতি সৃষ্টির ইতিহাস বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে, উপাদানগুলি সর্বক্ষেত্রেই প্রযোজ্য নয়। কুলগত ঐক্যের কথা আগেই আলোচনা করিয়া বলা হইয়াছে যে, কুলগত পবিত্রতা কোথাও রক্ষিত হয় নাই, বিভিন্ন জাতি বিভিন্ন কুলের মিশ্রণেই গঠিত হইয়াছে। ধর্ম সম্পর্কেও অনুরূপ বক্তব্য প্রযোজ্য। কোথাও কোথাও দেখা যাইবে, একই জাতির মধ্যে বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায় মিশিয়া এক হইয়া গিয়াছে। আবার কোথাও দেখা যায় ধর্মমত এক হওয়া সত্ত্বেও বিভিন্ন জাতির সৃষ্টি হইয়াছে। ভাষার ক্ষেত্রে দেখা যাইবে বিভিন্ন ভাষাভাষী গোষ্ঠী লইয়া একটি জাতির উৎপত্তি হইয়াছে সুইজারল্যাণ্ড, ভারতবর্ষ প্রভৃতি দেশে। আবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইংলণ্ডের জনগণ একই ভাষায় কথা বলিলেও দুইটি জাতি গঠিত হইয়াছে। অনুরূপভাবে ভৌগোলিক সান্নিধ্য ও অর্থ নৈতিক সমস্বার্থকেও জাতিগঠনের অপরিহার্য উপাদান হিসাবে স্বীকার করা যায় না। কারণ, নদ-নদী, পাহাড়-পর্বত, মরুভূমি, সাগর প্রভৃতি ভৌগোলিক অবস্থা সর্বত্র জাতিগুলিতে বিভক্ত করে নাই। একই ভৌগোলিক পরিবেশের মধ্যে যেমন একাধিক জাতির অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়, তেমনি বিভিন্ন ভৌগোলিক পরিবেশের মধ্যে একই জাতির নিদর্শনও পাওয়া যায়।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, উল্লেখিত উপাদানসমূহ গোষ্ঠীকে ঐক্যবদ্ধ করিয়া জাতীয়তার অনুভূতি সৃষ্টিতে সাহায্য করিয়াছে সন্দেহ নাই কিন্তু ইহারা একান্তভাবেই অপরিহার্য নয়।

পৃথিবীর ইতিহাস লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে, বিভিন্ন জাতীয় জনসমাজের সমন্বয়ে অনেকগুলি জাতি গঠিত হইয়াছে। বিভিন্ন জাতীয় সমাজের পৃথক অস্তিত্ব থাকিলেও ইহাদের রাষ্ট্রনৈতিক আশা ও আকাঙ্ক্ষা যদি এক এবং অভিন্ন

হয় তবে বিভিন্ন জাতীয় জনসমাজ সমন্বিত দেশে একটিমাত্র জাতির উদ্ভব ঘটিতে পারে। কারণ পূর্বের আলোচনা হইতে ইহা জানা গিয়াছে যে, জাতীয় জনসমাজ গঠনের জন্য কুল, ধর্ম, ভৌগোলিক সান্নিধ্য, অর্থনৈতিক সমস্বার্থ প্রভৃতি উপাদানগুলি অপরিহার্য নয়। বাস্তব উপাদান ছাড়াও ভাবগত ঐক্য জাতীয় জনসমাজ সৃষ্টি করিতে পারে। আর এই ভাবগত ঐক্যবোধ যখন তাহার সঙ্কীর্ণ গণ্ডী অতিক্রম করিয়া বিভিন্ন জাতীয়সমাজের ভিতর প্রসারিত হয়, তখন বিভিন্ন জাতীয় জনসমাজের সমন্বয়ে জাতি আত্মপ্রকাশ করে। এই ভাবগত ঐক্যের ভিত্তির উপর জাতীয়তাবোধের প্রসার ঘটে এবং বিভিন্ন জাতীয় সমাজের সমন্বয়ে গঠিত জাতি তখন তাহাদের সর্বপ্রকার পার্থক্য ভুলিয়া গিয়া নিজেদের রাষ্ট্রনৈতিক আকাঙ্ক্ষাকে রূপ দিবার উদ্দেশ্যে স্বতন্ত্র রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠে। এই ক্ষেত্রে ভাবগত ঐক্য, সম-চেতনা ও মানসিক প্রবণতার ব্যাপক প্রসারের ফলে বিভিন্ন জাতীয় সমাজের ভিতর দিয়া একটি জাতি আত্মপ্রকাশ করে।

ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে দেখা যাইবে যে, কুলগত, ধর্মগত, কৃষ্টি-ঐতিহ্যগত, ভৌগোলিক পরিবেশগত পার্থক্যের জন্য ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলের জীবনযাত্রা বিভিন্ন প্রকারের। ইহাদের এক একটি জাতীয় জনসমাজ হিসাবে আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু এই সমস্ত বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়া যে ভাবগত ঐক্য, সামাজিক বোধ এবং রাষ্ট্রীয় চেতনা প্রকাশ পাইয়াছে তাহাই সামগ্রিকভাবে ভারতীয়দের একটি জাতিতে পরিণত করিয়াছে। যেখানে একটি রাষ্ট্রে অবস্থিত বিভিন্ন জাতীয় জনসমাজের ভিতর এইরূপ ঐক্য আত্মপ্রকাশ করে না— সেখানেই আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবী উত্থিত হয়।

৩॥ আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার (Theory of self determination) :

প্রতিটি জাতিরই একটি নিজস্ব সত্তা, বৈশিষ্ট্য এবং আশা-আকাঙ্ক্ষা আছে। এই সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা এবং বৈশিষ্ট মূর্ত হইয়া উঠিতে চায় স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের ভিতর দিয়া। অর্থাৎ একটি জাতির বৈশিষ্ট্যের বিকাশ এবং পূর্ণতা লাভ সম্ভবপর তখনই, যখন ঐ জাতির নিজস্ব একটি স্বাধীন রাষ্ট্র থাকে। প্রতিটি জাতির এই জাতিভিত্তিক স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গঠনের অধিকারকে বলা হয় আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার। এক জাতি, এক রাষ্ট্র (One Nation, One State) নীতির দ্বারা আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারকেই স্বীকার করা হইতেছে। বহুজাতিক রাষ্ট্রের

নীতিকে বিরোধিতা করিয়া 'এক জাতি, এক রাষ্ট্র' নীতি প্রতিটি রাষ্ট্রের জন্য স্বতন্ত্র রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করিবার দাবী উত্থাপন করিয়া আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের স্বপক্ষে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে।

ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, স্বাধীনতালাভের আকাঙ্ক্ষা, স্বাধীনতা অর্জনের সংগ্রাম ও স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রবল ইচ্ছার ভিতর দিয়াই বিভিন্ন জাতি ও তাহাদের সত্তার আত্মপ্রকাশ ঘটিয়াছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, উত্তর আমেরিকার বৃটিশ উপনিবেশগুলি চূড়ান্ত সংগ্রামের ভিতর দিয়া ১৭৭৬ খৃষ্টাব্দে স্বাধীনতা লাভ করে। ১৮৩০ সালে বেলজিয়াম ওলন্দাজ শাসন অস্বীকার করিয়া স্বাধীনতা ঘোষণা করিল। তুর্কী সাম্রাজ্যের অবসান ঘটাইয়া গ্রীক্ স্বাধীন হইল। ১৮৪৯ সালে ঐক্যবদ্ধ জার্মান রাষ্ট্রের আবির্ভাব ঘটিল। তীব্র আন্দোলনের সাহায্যে বৈদেশিক শাসন ছিন্নভিন্ন করিয়া ইতালী ঐক্যবদ্ধ হইল। উনবিংশ শতাব্দীতে আমেরিকা মহাদেশে আরও অনেক জাতীয় রাষ্ট্রের আবির্ভাব ঘটিল। বিংশ শতাব্দীতে প্রথম মহাযুদ্ধের পরিসমাপ্তির পর ইউরোপে বহু স্বাধীন জাতীয় রাষ্ট্র জন্মগ্রহণ করিয়াছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরবর্তী সময়ে প্রথমে এশিয়া ও পরে আফ্রিকায় বিভিন্ন জাতির স্বাধীন রাষ্ট্র গঠন নিরবচ্ছিন্নভাবে ও অনিবার্য গতিতে আগাইয়া চলিয়াছে। আত্ম-নিয়ন্ত্রণের অধিকারের ভিত্তিতে জাতিসমূহের এই প্রবল আন্দোলন ইতিহাসে প্রমাণিত হইয়াছে।

নিজস্ব আশা-আকাঙ্ক্ষাকে বাস্তবে রূপদান করিয়া জাতীয় ঐতিহ্যের পরিপ্রেক্ষিতে শক্তিশালী রাষ্ট্র গঠনের প্রবণতা ও ইচ্ছা যে একান্ত স্বাভাবিক ও বাস্তবসম্মত তাহাই আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের দাবী প্রমাণ করিতেছে। যাঁহারা আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার প্রয়োগের পক্ষে তাঁহারা মনে করেন যে, রাষ্ট্র-গঠনের ভিতর দিয়াই একমাত্র জাতিগত পরিপূর্ণতা লাভ করা সম্ভব। আত্ম-নিয়ন্ত্রণ অধিকারবোধকেই আর একটু ব্যাপকভাবে প্রয়োগ করিয়া 'এক জাতি, এক রাষ্ট্র' এই নীতির আবির্ভাব ঘটিয়াছে। 'এক জাতি, এক রাষ্ট্র' বা জাতিভিত্তিক রাষ্ট্র গঠনের প্রয়োজনীয়তার কথা ব্যক্ত করিতে যাইয়া জন স্টুয়ার্ট মিল (John Stuart Mill) বলিয়াছেন: "যেখানে জাতীয়তাবোধ কিছুটা পরিমাণে শক্তিশালী, সেখানেই জাতীয় জনসমাজের সকল মানুষকে একটি স্বতন্ত্র সরকারের শাসনাধীনে ঐক্যবদ্ধ করিবার প্রাথমিক যুক্তি রহিয়াছে।"

একথা ঠিক যে, আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার বা জাতিগত রাষ্ট্র গঠনের অধিকারকে একটি সুস্থ ও স্বাভাবিক দাবী বলিয়া মনে হয় এবং এই অধিকার প্রয়োগের জন্য অনেক সার্থক সংগ্রামের কাহিনী আমরা ইতিহাসে দেখিতে পাই। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও এই নীতির প্রকৃতি বিশ্লেষণের জন্য আমাদের ইহার স্বপক্ষে ও বিপক্ষে যে-সমস্ত যুক্তি রহিয়াছে তাহা বিচার করা প্রয়োজন।

আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের স্বপক্ষে যুক্তি উত্থাপন করিয়া প্রথমত বলা যায় যে, স্বাধীনতার জন্য জাতীয় চেতনা এত বিরাট এবং প্রবল যে, ইহাকে অস্বীকার করা যায় না। স্বাধীনতার প্রতি মানুষের এবং প্রতিটি জাতির একটা অনিবার্য জন্মগত প্রবণতা রহিয়াছে, যাহাকে কোন প্রকার যুক্তির দ্বারা বাতিল করা চলে না। ম্যাকআইভার বলিয়াছেন: "যে চেতনা এত ব্যাপক, এত জটিল, এত সূক্ষ্ম, তথাপি এত প্রবল, তাহা কোন সংগঠনের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করিতে চায়, যে সংগঠন অনিবার্যরূপেই রাষ্ট্ররূপ ধারণ করে।"

দ্বিতীয়ত, প্রতিটি জাতিরই নিজস্ব কিছু বৈশিষ্ট্য ও স্বতন্ত্র সত্তা রহিয়াছে। দেখা গিয়াছে যে, যখন কোন জাতি অপরের হস্তক্ষেপ হইতে মুক্ত থাকে, কেবল সে স্বকীয় চেষ্টায়, স্বকীয় পদ্ধতিতে নিজস্ব বৈশিষ্ট্যকে বিকশিত করিতে পারে। সুতরাং প্রতিটি জাতির সামগ্রিক বিকাশের জন্য স্বাধীন, স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গঠনের প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে।

তৃতীয়ত, ব্যক্তিস্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের চিন্তাধারা হইতেও জাতীয় স্বাধীনতার দাবী সমর্থন করিতে হয়। কারণ গণতান্ত্রিক নীতি অনুযায়ী রাষ্ট্রক্ষমতা কে বা কাহারা পরিচালনা করিবে তাহা সাধারণ জনগণই স্থির করিবে। সুতরাং কোন জাতীয় জনসমাজ যদি নিজের আত্মবিকাশের জন্য স্বতন্ত্র ও স্বাধীন হইতে চায় তবে তাহা কীভাবে উপেক্ষা করা হইবে?

চতুর্থত, জন স্টুয়ার্ট মিলের মতে গণতন্ত্রের সংজ্ঞা অনুযায়ী বিভিন্ন জাতীয়তাবোধসম্পন্ন গণসমষ্টি অধ্যুষিত অঞ্চলগুলির এবং রাষ্ট্রগুলির সীমা এক হওয়া উচিত।[6] অর্থাৎ মিল এক জাতি, এক রাষ্ট্র এই নীতিকে গণতন্ত্রের একান্ত প্রয়োজনীয় শর্ত হিসাবে গ্রহণ করিয়াছেন। প্রখ্যাত দার্শনিক বার্ট্রাণ্ড

6. "It is in general a necessay condition of free institution that the bounderies of Government should coincide with those of nationalities."
—John Stuart Mill

রাসেলও (Bertrand Russell) রাষ্ট্রের সীমানাকে যতটা সম্ভব জাতীগত সীমানার সঙ্গে এক করিবার প্রয়োজনীয়তার কথা বলিয়াছেন।[7]

পঞ্চমত, রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মধ্যে অনেকে মনে করেন যে, জাতির আত্ম-নিয়ন্ত্রণাধিকার স্বীকৃত হইলেই এক রাষ্ট্রের সহিত অপরাপর রাষ্ট্রের সংঘর্ষ অনিবার্য হইয়া উঠিবে, একথা ঠিক নয়। বরং ইতিহাস প্রমাণ করে যে, আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার স্বীকৃত হইলে জাতিগুলি বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই বিরোধ ও হস্তক্ষেপের পরিবর্তে সহযোগিতার মনোভাব লইয়া বসবাস করে।

ষষ্ঠত, আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার স্বীকৃত হইলে প্রতিটি জাতি স্বকীয় বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্যের ভিতর দিয়া বিকাশ লাভ করিবে এবং বিভিন্ন জাতির নানা বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্যের বিকাশ মানব সভ্যতাকে অধিকতর সম্পদময় করিয়া তুলিবে।

সপ্তমত, জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের সমর্থনে বাট্রাণ্ড রাসেলের বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলিয়াছেন: "কোন জনসমাজকে তাহাদের নিজস্ব জাতীয় সরকার ব্যতীত অন্য কোন সরকারের শাসনাধীনে থাকিতে বাধ্য করা, আর একটি নারীকে, যে পুরুষকে সে ঘৃণা করে, তাহাকে বিবাহ করিতে বাধ্য করা, একই কথা।"[8]

এইবার জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের বিরুদ্ধে যে-সমস্ত যুক্তি উপস্থিত করা হয় সেইগুলি আলোচনা করা যাইতে পারে।

১। জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারকে স্বীকার করিয়া 'এক জাতি, এক রাষ্ট্র'-এর নীতি অনুযায়ী জাতিভিত্তিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করিলে দীর্ঘকালের সুপ্রতিষ্ঠিত সুশৃঙ্খল রাষ্ট্রগুলি ভাঙ্গিয়া যাইবে এবং এক তীব্র ভৌগোলিক অসুবিধার সম্মুখীন হইতে হইবে। উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, এই নীতি অনুযায়ী ক্ষুদ্র আয়তন-বিশিষ্ট গ্রেটব্রিটেন এবং সুইজারল্যাণ্ড চারিটি করিয়া রাষ্ট্রে বিভক্ত হইবে। এই নীতি প্রয়োগ করিলে ভারতবর্ষে অনেকগুলি রাষ্ট্রের সৃষ্টি হইবে, ইউরোপে কমপক্ষে ষাটটি রাষ্ট্র আত্মপ্রকাশ করিবে এবং পৃথিবীতে রাষ্ট্রের সংখ্যা অপ্রত্যাশিতভাবে বৃদ্ধি পাইবে।

7. "There can be no good international system until the boundaries of states coincide as nearly as possible with the bounderies of nations." —Russell

8. "To force a people to live under a Government not that of their own nation was felt to be like forcing a woman to marry a man whom she hates." —Russell.

২। এইভাবে অজস্র রাষ্ট্র সৃষ্টি করিয়াও সমস্যার সমাধান হইবে না। কারণ দেখা যাইবে বিভিন্ন জাতির মানুষ অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক-ভাবে এমনভাবে মিশিয়া আছে যে, রাষ্ট্রসীমানার প্রাচীর দ্বারা তাহাদের বিভক্ত করা যায় না। তাহা ছাড়া এই সমস্ত রাষ্ট্রেও সংখ্যালঘুর সমস্যা থাকিবে এবং তাহার সমাধান করিতে হইলে পাড়া বা গ্রামভিত্তিক রাষ্ট্র সৃষ্টি করিতে হইবে অথবা লোক স্থানান্তরিত (Transfer of population) করিতে হইবে। কিন্তু ইহার কোনটাই কাম্য নয়।

৩। জাতিভিত্তিক রাষ্ট্র স্থাপিত হইলে রাষ্ট্রগুলি এত ক্ষুদ্র হইবে যে, রাষ্ট্রগুলি অর্থনীতিতে আত্মনির্ভরশীল হইতে পারিবে না।

৪। আত্মরক্ষার ক্ষেত্রেও ইহারা যথেষ্ট পরিমাণে শক্তিশালী হইতে না পারিবার ফলে তাহাদিগকে শক্তিশালী রাষ্ট্রের সাহায্যে চলিতে হইবে। এইরূপ হইলে তাহারা নিজেদের স্বাধীনতা ও নিরাপত্তা অক্ষুণ্ন রাখিতে পারিবে না। তাই লর্ড অ্যাকটন বলিয়াছেন: "জাতিতত্ত্ব হইতেছে ইতিহাসের পশ্চাতগামী পদক্ষেপ" (The theory of nationality is a retrogade step in history)।

৫। অভিজ্ঞতা হইতে দেখা গিয়াছে যে, একাধিক জাতীয় জনসমাজ একই রাষ্ট্রে পরস্পরের সান্নিধ্যে বসবাস করায় উন্নত জাতির সংস্পর্শে আসিয়া অপেক্ষাকৃত অনগ্রসর জাতিগুলি উন্নত ও উপকৃত হইয়াছে।

৬। লর্ড কার্জনের (Lord Curzon) মতে আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার এমন একটি অস্ত্র যাহার দুই দিকে ধার আছে। একদিকে ইহা ঐক্যবদ্ধ হইবার যেমন প্রেরণা জোগায়, অন্যদিকে ইহা বিচ্ছিন্ন করিতেও সাহায্য করে।[9]

এই সমস্ত আলোচনা হইতে দেখা যাইতেছে যে, আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার অবিমিশ্র আশীর্বাদ নয়। নীতিগতভাবে এই তত্ত্ব সম্পূর্ণভাবে গ্রহণযোগ্য হইলেও বাস্তব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ইহা সর্বদা গ্রহণ করা যায় না। একটি জাতিকে স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে পরিপূর্ণ করিয়া প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের বিরাট ভূমিকা ও অবদান রহিয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু প্রতিটি রাষ্ট্রে জাতির ক্ষেত্রে এই নীতি প্রয়োগ করিলে পৃথিবী অসংখ্য রাষ্ট্রে বিভক্ত হইয়া এক নিদারুণ

9. The right of self-determination is a double edged sword, it is and has been in the past a unifying force but it may be, and has recently become also a disintegrating force.—Lord Curzon.

সমস্যা সৃষ্টি করিবে। তাই রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা মনে করেন যে, বিরাট জাতিগুলির ক্ষেত্রে এই নীতি প্রযুক্ত হওয়া উচিত এবং আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের ভিত্তিতে তাহাদের জন্য স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গঠন করা যাইতে পারে। কিন্তু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতির ক্ষেত্রে ইহা জাতিভিত্তিক রাষ্ট্র গঠন না করিয়া যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা কায়েম করা যাইতে পারে। যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনতন্ত্র (Federation) এর মাধ্যমে বিভিন্ন জাতি নিজ নিজ এলাকায় ক্ষমতা প্রয়োগের দ্বারা জাতিগত সত্তাকে উন্নত ও পরিপূর্ণ করিয়া তুলিতে পারে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতির ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে 'এক জাতি, এক রাষ্ট্র' নীতি চালু না করিয়া যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার মাধ্যমে আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের সমস্যা সমাধানের ইংগিত রাষ্ট্রবিজ্ঞানিগণ দিয়া থাকেন।

৪॥ জাতীয়তাবাদের গুণ ও সীমাবদ্ধতা (Value and limitations of Nationalism)

আধুনিক যুগে জাতীয়তাবাদ যে-ভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে তাহাকে শুধুমাত্র একটি মানসিক অনুভূতি বলিয়া আখ্যা দেওয়া যায় না। সুস্থ ও পরিমিত জাতীয়তাবোধ কিছু পরিমাণ থাকিলেও বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যাইতেছে যে জাতীয়তাবাদের নামে এক শ্রেণীর জাত্যাভিমান, অহমিকা ও বর্ণাভিজাত্য বিকৃত ভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। জাতীয়তাবাদের স্বপক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তি উপস্থিত করিয়া আলোচনা করিলে জাতীয়তাবাদের স্বরূপ পরিষ্কারভাবে ধরা দিবে।

জাতীয়তাবাদের গুণ : জাতীয়তার স্বপক্ষে বলা যায় যে, সুস্থ ও পরিমিত জাতীয়তাবাদের দ্বারা উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত হইয়া পৃথিবীর অনেক দেশের দুর্বল ও পরাধীন জাতি স্বাধীনতা সংগ্রামের সামিল হইয়াছে এবং স্বাধীন, শক্তিশালী ও উন্নত রাষ্ট্র সৃষ্টি করিয়াছে। খণ্ড, ক্ষুদ্র ও বিভক্ত জাতিকে এবং পরাধীন দেশকে জাতীয়তাবোধ এক সুদৃঢ় ঐক্যের বন্ধনে আবদ্ধ করিয়া স্বকীয় বৈশিষ্ট্য ও ঐতিহ্যে উজ্জ্বল করিয়াছে এবং সর্বাঙ্গীন উন্নতির ভিতর দিয়া সুখী, বলিষ্ঠ ও সমৃদ্ধশালী জাতি হিসাবে আত্মপ্রকাশে সাহায্য করিয়াছে।

দ্বিতীয়ত, জাতীয়তাবাদের মূলনীতি হইতেছে 'নিজে বাঁচ ও অপরকে বাঁচিতে দাও'। এই আদর্শের ভিত্তিতে পরস্পর নির্ভরশীল রাষ্ট্রগুলি অপরাপর রাষ্ট্রের সহিত সৌহার্দ্যপূর্ণ ও প্রতিপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করিয়া নিজেদের অগ্রগতি

ত্বরান্বিত করিতে পারে। জাতীয়তাবাদের এই আদর্শ বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে বিচ্ছেদের পরিবর্তে ঐক্য স্থাপন করিয়া এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

তৃতীয়ত, জাতীয়তাবাদের জনক ইতালীয় দার্শনিক ম্যাটসিনির মতে, প্রত্যেক জাতিরই কিছু কিছু বিশেষ প্রতিভা আছে যাহার সমন্বয়ে মানব-সমাজের সম্পদ সৃষ্টি হয় (each nation possessed certain talents which taken together, formed the wealth of the human race)। সুতরাং ম্যাট্‌সিনির মতে জাতীয়তাবাদ বিভিন্ন জাতির প্রতিভার বিকাশ ঘটাইয়া উহাকে সর্বমানবের কল্যাণে নিয়োগ করিতে পারে।

চতুর্থত, ইতিহাস হইতে আমরা এই শিক্ষাই পাই যে, জাতীয়তাবাদ অনেক রাষ্ট্রের একনায়কতন্ত্রের অবসান ঘটাইয়া গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। একনায়কতন্ত্র অবসানের ক্ষেত্রে ইহা জাতীয়তাবাদের একটি মহান অবদান।

পঞ্চমত, জাতীয়তার ভিত্তিতে রাষ্ট্র গঠিত হইলে ইহার অস্তিত্ব অনেক দৃঢ় হয় এবং স্থায়িত্বের সম্ভাবনাও বেশি থাকে। কারণ, এই অবস্থায় রাষ্ট্রের নাগরিকেরা জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্রের রক্ষার জন্য আইন ও শৃঙ্খলা রজায় রাখিবার চেষ্টা করে। বার্জেস মনে করেন, জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে রাষ্ট্র গঠিত হইলে সার্বভৌমত্ব ও স্বাধীনতার ভিতরকার বিরোধের মীমাংসার অনেক সহজেই সমাধান হয়।

জাতীয়তাবাদের ত্রুটি : কিন্তু জাতীয়তাবাদ শুধুমাত্র অবিমিশ্র আশীর্বাদ হিসাবে দেখা দেয় নাই। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় জাতীয়তাবোধ সুস্থ চেতনা ছাড়াইয়া এক মানসিক সংকীর্ণতার বেড়াজালে নিজেকে আবদ্ধ করিয়া অন্য জাতির প্রতি ঘৃণা, বিদ্বেষ প্রভৃতি সৃষ্টি করে। এরই জন্য যে সমস্ত জাতি তাহার প্রাধান্য মানিতে অস্বীকার করে তাহার বিরুদ্ধে শক্তি প্রয়োগ করিয়া উহাকে দমন করে। জাতীয়তাবাদ এইরূপ আত্মপ্রকাশ ও স্বজাতি-প্রীতির ভিতর দিয়া বিকৃত জাতীয়তাবাদে রূপান্তরিত হয়।

দ্বিতীয়ত, অন্ধ আবেগ দ্বারা পরিচালিত জাতীয়তাবাদ রাষ্ট্রের সমস্ত কিছু জাতীয় চরিত্রের অনুগামী করিবার এক হাস্যকর প্রচেষ্টা চালাইয়া যন্ত্র-চালিত 'ইউনিফর্মিটি'-এর একাধিপত্য দ্বারা সমস্ত মত ও পথ দমন করিয়া এক অস্বস্তিকর পরিবেশ সৃষ্টি করিয়া থাকে।

তৃতীয়ত, উগ্র জাতীয়তাবাদ সমস্ত প্রকার যুক্তি, তর্ক ও পরমতসহিষ্ণুতাকে

বিসর্জন দিয়া এক প্রকারের আত্মশ্লাঘা, অসহিষ্ণুতা, অন্ধ আবেগ ও উন্মত্ততা সৃষ্টি করিয়া মানুষের সুস্থ চেতনা দূষিত করিয়া তোলে।

চতুর্থত, এই অবস্থা চলিতে থাকিলে জনগণের ভিতর একদিকে দেখা যায় ত্রাস ও আতঙ্ক, অন্যদিকে বশ্যতা স্বীকার করিবার প্রবণতা। জাতীয়তাবাদের অনুপ্রেরণায় জাতীয় জীবনে যে বৈচিত্র্য ও বিকাশের সম্ভাবনা থাকে, তাহা বিকৃত জাতীয়তাবাদের এই নিদারুণ চাপে বিলীন হইয়া যাইতে থাকে।

পঞ্চমত, মানবতাকে অস্বীকার করিয়া জাতীয়তাবাদ যে দ্বেষ হিংসা ও আক্রমণকারী ভূমিকা গ্রহণ করে, তাহার অনিবার্য পরিণাম হইল যুদ্ধ সাম্রাজ্য-বিস্তার, গণতান্ত্রিক অধিকারের হত্যা ও ফ্যাসীবাদের প্রতিষ্ঠা। এইরূপ জাতীয়তাবাদ যুক্তি ও আলোচনাকে অস্বীকার করিয়া নিজের দেশের দাবীকেই সর্বাগ্রে স্থান দেয় এবং সর্বপ্রকার বিরোধের মীমাংসার জন্য যুদ্ধকে একান্ত প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে করে। বিগত মহাযুদ্ধের সময় ফ্যাসীবাদ এইভাবে অন্যজাতিকে সভ্য করিবার জন্য নর্ডিক জাতির প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করিবার অজুহাতে পৃথিবীর বুকে এক সর্বনাশা যুদ্ধ চাপাইয়া দিয়া প্রাচীন সভ্যতা ও সংস্কৃতির বার্তাবাহী জাতিগুলিকে নিষ্ঠুর শাসন ও পীড়নে নিঃস্ব ও হতবল করিয়া তুলিয়াছিল। ফ্যাসীবাদের এই ভয়াবহ উত্থানের মূলে রহিয়াছে বিকৃত জাতীয়তাবাদ।

ষষ্ঠত, অধ্যাপক হেইজের (Hayes) মতে জাতীয়তাবাদের আদর্শ আংশিক-ভাবে দেশপ্রেমের আদর্শ বলিয়া মনে হইলেও প্রকৃতপক্ষে ইহা হইল জাতির এক গর্বময়, ঔদ্ধত্যপূর্ণ মানসিক স্বভাব। এই মানসিক স্বভাবের জন্যই এক জাতি অন্য জাতির প্রতি বিরুদ্ধ মনোভাব প্রকাশ করে, অন্যকে ঘৃণা করিতে শেখে এবং নিজেদের সবকাজকেই সর্বদা ন্যায়সঙ্গত বলিয়া মনে করে। জাতীয়তাবাদ হইতেছে এক বাতিকগ্রস্ত রোগ বিশেষ, একপ্রকারের অতিরঞ্জিত অহমিকা।

সপ্তমত, জাতীয়তাবাদের এই হিংস্র, বীভৎস ও উগ্ররূপ দেখিয়া রবীন্দ্রনাথ মন্তব্য করিয়াছেন, জাতীয়তাবাদ সভ্যতার সংকট সৃষ্টিকারী। বিগত মহাযুদ্ধের প্রলয়ঙ্কর দিনগুলিতে জাতীয়তাবাদের অত্যাচারে অপমানিত ও পদদলিত মনুষ্যত্বের ক্রন্দনে ব্যথিত কবি জাতীয়তাবাদের হিংস্র পৌত্তলিকতাকে আক্রমণ করিয়া ঘোষণা করিয়াছেন আন্তর্জাতিকতার আদর্শ। জাতীয়তাবাদকে

রবীন্দ্রনাথ সভ্যতা, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি হত্যাকারী এক বীভৎস অহমিকা হিসাবে চিত্রিত করিয়াছেন।

৫ ॥ জাতীয়তাবাদ ও সভ্যতা (Nationalism and Civilization)

দেখা যাইতেছে যে, সুস্থ ও পরিমিত জাতীয়তাবাদের দ্বারা উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত হইয়া একদিকে যেমন পৃথিবীর অনেক জাতি সর্বাঙ্গীন উন্নতির ভিতর দিয়া সুখী, বলিষ্ঠ ও সমৃদ্ধশালী রাষ্ট্র সৃষ্টি করিয়াছে ঠিক তেমনি অপর-পক্ষে এই জাতীয়তাবাদ সুস্থ চেতনা ও পরিমিতিবোধের গণ্ডী ছাড়াইয়া যুক্তি তর্ক, পরমতসহিষ্ণুতা ও মানবতাকে অস্বীকার করিয়াছে এবং অযৌক্তিক আত্মশ্লাঘা, অসহিষ্ণুতা, দ্বেষ, হিংসা ও আক্রমণমুখী এক অন্ধ আবেগপূর্ণ বিকৃত জাতীয়তাবাদে রূপান্তরিত হইয়া সভ্যতার সংকট সৃষ্টি করিয়াছে।

বিগত মহাযুদ্ধে ও অন্যান্য দুর্যোগের সময় দেখা গিয়াছে যে 'নেশন দানবের' নৃশংস অত্যাচারের যূপকাষ্ঠে পরাধীন, দুর্বল ও দরিদ্র দেশগুলি একের পর এক বলি হইয়াছে। সার্বজনীন ন্যায়বোধ, মহত্ত্ব, মানবিকতা ও আদর্শ এই জাতীয়তাবোধের জোয়ারে পৃথিবী হইতে লুপ্ত হইল। জাতীয়তাবাদের আশীর্বাদে পুষ্ট হইয়া বাণিজ্যিক সভ্যতা হিংস্র সাম্রাজ্যবাদের রূপ লইয়া এশিয়া মহাদেশের প্রাচীন সভ্যতা ও সংস্কৃতির বার্তাবাহী জাতিগুলিকে নিষ্ঠুর শাসন ও পীড়নে নিঃস্ব, হতবল ও মুমূর্ষু করিয়া তুলিল। জাতীয়তাবোধের অত্যাচারে অপমানিত ও পদদলিত মনুষ্যত্বের ক্রন্দনে তৎকালীন অনেক মনীষীই ব্যথিত হইলেন এবং জাতীয়তাবাদের এইরূপের বিরুদ্ধে প্রতিবাদমুখর হইলেন। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে মানবতাপূজারী রবীন্দ্রনাথ জাতীয়বোধের এই হিংস্র পৌত্ত-লিকতাকে (fierce selfidolatry of nation-worship) তীব্রভাবে আক্রমণ করিয়া ঘোষণা করিলেন, জাতীয়বাদ সভ্যতার শত্রু (nationalism is a menace to civilization)।

উগ্র ও অপরিমিত জাতীয়তাবোধের অবশ্যম্ভাবী ফল হইতেছে সভ্যতার সংকট ও বিনাশ। মানুষের যাহা কিছু প্রিয়, যাহা কিছু মহৎ ও কল্যাণকর এবং যাহা কিছু মানবিকতার উপর প্রতিষ্ঠিত তাহারই বিরুদ্ধে জাতীয়তাবাদের আক্রমণ। বিকৃত জাতীয়তাবোধ কিভাবে সভ্যতার সংকটকে ঘনীভূত করিয়া তোলে তাহা ইতিহাসের পটভূমিকায় বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। মূলত সামন্ত-তন্ত্রের অবসান করিয়া ধনতন্ত্রের উদ্ভবের ভিতর দিয়া জাতীয়তাবাদ বিকাশ লাভ

করে। সামন্তযুগের অরাজকতা ও বিচ্ছিন্নতার বিরুদ্ধে যে সংগ্রাম শুরু হয় তাহা জাতীয়তাবাদকে অনেকাংশে প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। বিদেশ হইতে মুনাফা লাভের লোভ কাঁচামাল সংগ্রহ এবং প্রতিপত্তি বিস্তারের জন্য ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলি সাম্রাজ্যবিস্তারের দিকে মনোনিবেশ করে। ইহার জন্য নিজ নিজ দেশকে উগ্র জাতীয়তাবোধ দ্বারা উদ্বুদ্ধ করিয়া সাম্রাজ্যবিস্তারের জন্য যুদ্ধ বিগ্রহ শুরু করিতে হইল। অধ্যাপক ল্যাস্কি বলিয়াছেন যে ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইবার সঙ্গে সঙ্গে জাতীয়তাবাদ সাম্রাজ্যবাদে রূপান্তরিত হয়।[11] প্রথম স্তরে অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যবাদ রূপে আত্মপ্রকাশ করিলেও ক্রমান্বয়ে রাজনৈতিক সাম্রাজ্যবাদে রূপান্তরিত হইয়া দুর্বল ও পরাধীন দেশগুলির উপর ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থা কায়েম করে।

কিন্তু ঘটনা এখানেই পরিসমাপ্তি লাভ করে না। উগ্র জাতীয়তাবাদ যে সংকটকে ডাকিয়া আনে তাহার ফলাফল আরও বহুদূর পর্যন্ত প্রসারিত হয়। ইহা লক্ষ্য করা গিয়াছে যে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রলয়ঙ্কর দিনগুলিতে একদিকে ইউরোপ, আমেরিকা ও জাপানের জাতীয়তাবাদ ভারতবর্ষ, চীন, ইন্দোনেশিয়া, পশ্চিম এশিয়া ও আফ্রিকা মহাদেশকে নখদন্তে ছিন্ন করিয়া পৃথিবীর শান্তি ও সভ্যতাকে কলুষিত করিয়াছে এবং অপরপক্ষে জাতিগত যুক্তিজালভিত্তিক জাতীয়তাবাদ ও বর্ণাভিমান পৃথিবীতে ফ্যাসীবাদ ও নাৎসীবাদের জন্ম দিয়া পাশবিক শক্তির এই আরণ্যক হিংস্রতা মানব সভ্যতাকে এক প্রকাণ্ড দুর্দৈবের মধ্যে নিক্ষেপ করিয়াছে। জাতীয়তাবাদের এই আক্রমণমুখী রূপের অনিবার্য পরিণাম হইতেছে যুদ্ধ, সাম্রাজ্যবিস্তার ও গণতান্ত্রিক অধিকারের হত্যা করিয়া ফ্যাসীবাদ প্রতিষ্ঠা। ফ্যাসীবাদ ও নাৎসীবাদ প্রচার করিল যে, অন্যান্য জাতিকে সভ্য করিবার জন্য তাহাদের প্রাধান্য বিস্তার প্রয়োজন। কিপলিং-কথিত 'White Man's burden' এবং হিটলার কথিত' 'Superiority of the Nordic race' প্রভৃতির অজুহাতে জাতীয়তাবাদ তাহার জয়গান গাহিয়া ফ্যাসীবাদকে প্রতিষ্ঠা করিল। ইহারই ফলে দেখা গেল স্পর্ধিত ইটালী গ্রাস করিল অ্যাবিসীনিয়াকে, জার্মানীর বুটের তলায় নিষ্পেষিত হইতে দেখা গেল চেকোস্লোভাকিয়াকে ও আরো অনেক দেশকে, নন্-ইণ্টারভেনশনের কুটীল প্রণালীতে স্পেনের রিপাবলিককে দেউলিয়া হইতে দেখা গেল। এই অপরিমিত গ্লানি, অধঃপতন ও সভ্যতার সংকটের জন্য দায়ী পশ্চিমের ন্যাশনাল স্টেট বা

---

11. "As powers exceeds nationalism becomes transformed into imperialism."—Laski.

জাতীয় রাষ্ট্রগুলি, তাহাদের বিকৃত জাতীয়তাবাদ ও বর্ণাভিজাত্য। জাতীয়তাবাদের এই রক্তক্ষয়ী ও প্রাণঘাতী অভিযান মূলত সভ্যতা-বিধ্বংসী অভিযান।

একদিকে ইউরোপীয় নেশন-দানবের আক্রমণ অপরপক্ষে নেশনত্বের নূতন মদে মত্ত জাপানের অত্যাচারে ব্যথিত কবি রবীন্দ্রনাথ ঘোষণা করিলেন: "Neither the colourless vagueness of cosmopolitanism, nor the fierce self-idolatry of nation worship is the goal of human history."। সভ্যতার সংকট সৃষ্টিকারী ইউরোপীয় জাতীয়তাবাদের স্বরূপ বিশ্লেষণ করিয়া তিনি বলিলেন: "......তারপর মহাযুদ্ধ এসে অকস্মাৎ পাশ্চাত্য ইতিহাসের একটি পর্দা দিল তুলে। যেন কোন মাতালের আব্রু গেল ঘুচে। এত মিথ্যা এত বীভৎস হিংস্রতা নিবিড় হয়ে বহু পুর্বেকার অন্ধযুগে ক্ষণকালের জন্য হয়তো মাঝে মাঝে উৎপাত করেছে, কিন্তু এমন ভীষণ উদগ্র মূর্তিতে আপনাকে প্রকাশ করেন।......আজকাল দেখছি আপনাকে সভ্য প্রমাণ করবার জন্য সভ্যতার দায়িত্ববোধ যাচ্ছে চলে। অমানবিক নিষ্ঠুরতা দেখা দিচ্ছে বুক ফুলিয়ে। যে ইউরোপ একদিন তৎকালীন তুর্কিকে অমানুষ বলে গঞ্জনা দিয়েছে তারই উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে প্রকাশ পেল ফ্যাসিজমের নির্বিচার নিদারুণতা।"

জাতীয়তাবাদের এই মনুষ্যত্ব বিরোধী ভূমিকা লক্ষ্য করিয়া রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন: "মনুষ্যত্বের মঙ্গলকে যদি ন্যাশনালত্ব বিকাইয়া দেয়, তবে ন্যাশনালত্বের মঙ্গলকেও একদিন ব্যক্তিগত স্বার্থ বিকাইতে আরম্ভ করিবে।"

জাতীয়তাবাদের বিষময় পরিণতির কথা আলোচনা প্রসঙ্গে অধ্যাপক হেইজ মন্তব্য করিয়াছেন যে, জাতীয়তাবাদের আদর্শ আংশিকভাবে দেশ প্রেমের আদর্শ বলিয়া মনে হইলেও প্রকৃতপক্ষে ইহা হইল জাতির এক অহঙ্কারময় ঔদ্ধত্যপূর্ণ মানসিক স্বভাব। এই মানসিক স্বভাবের জন্যই একজাতি অন্য জাতির প্রতি বিরুদ্ধ মনোভাব প্রকাশ করে, অন্যকে ঘৃণা করিতে শেখে এবং নিজেদের সব কাজকে সর্বদাই ন্যায়সঙ্গত বলিয়া মনে করে। জাতীয়তাবাদ হইতেছে এক ব্যতিকগ্রস্ত রোগ বিশেষ, একপ্রকার অতিরঞ্জিত অহমিকা।

হেজকে অনুসরণ করিয়া বলা যায় যে উগ্র, অনুদার ও বিকৃত মনোভাবের ঊর্ধ্বে যদি নিষ্কলঙ্ক ও সুস্থ স্বদেশপ্রেমের ভিত্তিতে জাতীয়তাবাদ সৃষ্টি হয় তবে তাহা মানবজাতি ও পৃথিবীর পক্ষে আশীর্বাদ হিসাবে গণ্য হইবে।[12]

---

12. "Nationalism when it becomes synonymous with the purest patriotism will prove a unique blessing to humanity and to the world."—Hayes.

৬॥ জাতীয়তাবাদ ও আন্তর্জাতিকতা (Nationalism and Internationalism.)

জাতীয়তাবাদের বিকৃত পরিণতির ফলে সভ্যতা, সংস্কৃতি ও সমাজের যে সংকট দেখা দিয়াছে তাহা হইতে বিশ্বসভ্যতাকে রক্ষা করিতে পারে আন্তর্জাতিকতার আদর্শ। জাতীয়তাবাদ সভ্যতার উপরে যে আবর্জনার স্তূপ জড় করিয়া তুলিয়াছে তাহা হইতে সভ্যতাকে মুক্ত করিতে না পারিলে মানুষেরও মুক্তি নাই। সে মুক্তি আনিতে পারে আন্তর্জাতিকতাবোধ। মানুষের প্রতি মানুষের ভালবাসা, নৈকট্যবোধ ও সৌভ্রাতৃত্বমূলক মনোভাবকে জাতীয় গণ্ডী অতিক্রম করিয়া সমগ্র পৃথিবীতে পরিব্যপ্ত করাকে আমরা 'আন্তর্জাতিকতা' নামে অভিহিত করিতে পারি। অর্থাৎ জাতি সত্বার সংকীর্ণ গণ্ডী অতিক্রম করিয়া বিশ্ব মানবের কল্যাণবোধে উদ্বুদ্ধ হওয়াকে আন্তর্জাতিকতা বলা হয়। জাতীয়তাবোধের বিকৃতরূপ জন্ম দেয় সাম্রাজ্যবাদ ও সামরিকবাদ। বিকৃত জাতীয়তাবাদ, সাম্রাজ্যবাদ ও সাময়িকবাদের বিকল্প হিসাবে দেখা দিয়াছে আন্তর্জাতিকতা। 'নিজে বাঁচো ও অপরকে বাঁচিতে দাও'—ইহাই আন্তর্জাতিকতার মূল সুর। অন্য জাতির ভাষা, সাহিত্য, ঐতিহ্য ও সৃষ্টিকে অস্বীকার করিয়া শুধুমাত্র নিজের জাতির সমস্ত কিছুকে চরম ও চূড়ান্ত বলিয়া মনে করার অহমিকা আন্তর্জাতিকতা বিরোধী।[13]

বর্তমানযুগে আন্তর্জাতিক নির্ভরশীলতা ক্রমশ বৃদ্ধি পাইতেছে। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই যে বর্তমান যুগে আরিষ্টটলের ধারণামত কোন রাষ্ট্র স্বয়ংসম্পূর্ণভাবে বাঁচিতে পারে না। তাই প্রতিযোগিতার পরিবর্তে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সহযোগিতার প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে অনুভূত হইতেছে। শ্রীনেহেরুর ভাষায় বলা যায়, "শান্তিপূর্ণ সহ অবস্থানের বিকল্প হইতেছে সম্মিলিত

13. রবীন্দ্রনাথকে অনুসরণ করিয়া বলা যায় যে, বিশ্বমানবের বেদীতে যে নৈবেদ্য দেওয়া হয়, জ্ঞানের, প্রেমের, কর্মের, তাতে সকল মানুষেরই সমানাধিকার। জাতিগত ও ধর্মগত সত্বাকে ক্ষুদ্র ও অনুদার গণ্ডী হইতে মুক্ত করিয়া ব্যাপক বিশ্ববোধে পরিণত করিবার অপূর্ব প্রকাশ ঘটিয়াছে রবীন্দ্রনাথের 'গোরা' উপন্যাসে। বিশ্বজনীন আবেদনের এক অপূর্ব অভিব্যক্তি রবীন্দ্রনাথের গোরার ভাষায় রূপ পাইয়াছে, "আমার মধ্যে হিন্দু, মুসলমান খৃষ্টান, কোন সমাজের কোন বিরোধ নেই। আজ এই ভারতবর্ষের সকল জাতই আমার জাত, সকলের অন্নই আমার অন্ন।" বা "আপনি আমাকে আজ সেই দেবতারই মন্ত্র দিন, যিনি হিন্দু মুসলমান খৃষ্টান ব্রাহ্মণ সকলেরই—যাঁর মন্দিরের দ্বার কোন জাতির কাছে কোন ব্যক্তির কাছে, কোনদিন অবরুদ্ধ হয় না।" এই সর্বজনীন মানবীয় আবেদন আন্তর্জাতিকতার মূল ভিত্তি।

ধ্বংস।"[14] তাই মানুষের ভালবাসা ও আনুগত্য নিছক রাষ্ট্র ও জাতিগত সীমানার মধ্যে আবদ্ধ না থাকিয়া ক্রমশ পরিব্যাপ্তি লাভ করিতেছে। এই জন্যই আন্তর্জাতিক আইনের অনুশাসনে জাতিভিত্তিক রাষ্ট্রগুলি লইয়া বিশ্ব-যুক্তরাষ্ট্র গঠনের প্রয়োজনীয়তা মানুষ উপলব্ধি করিতেছে। আন্তর্জাতিকতার প্রথম সংগঠনগত প্রকাশ ঘটিয়াছে প্রথম মহাযুদ্ধের পরে জাতিসংঘের (League of Nations) মধ্য দিয়া। আরও সুগঠিত ও সুসংহত আন্তর্জাতিক সংগঠন হিসাবে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে আত্মপ্রকাশ ঘটিয়াছে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের (United Nations Organization)। জাতিগত সার্বভৌমিকতার কিছু পরিমাণ ত্যাগের মধ্য দিয়াই এই ধরণের আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান সফল হইতে পারে। অর্থাৎ জাতিগত রাষ্ট্রগুলিকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ও পরিপূর্ণ পরাধীনতার মধ্যবর্তী অবস্থা গ্রহণ করিতে পারিলে আন্তর্জাতিক সংস্থার গঠন ও উহার কার্যকরী ভূমিকা পালন সম্ভবপর।[15]

এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই যে আন্তর্জাতিকতা একটি মহান ও উচ্চস্তরের আদর্শ। বর্তমান বৈজ্ঞানিক যুগে বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যকার সমসাময়িক সমস্যাবলী সমাধানে এই আদর্শই একমাত্র কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করিতে পারে। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও মনে রাখিতে হইবে যে আন্তর্জাতিকতা আজও সর্বজনীন আদর্শ হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করিতে পারে নাই। তাই অনেকে আন্তর্জাতিকতার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আশান্বিত হইতে পারিতেছেন না। কারণ হিসাবে বলা যাইতে পারে যে উগ্র জাতীয়তাবাদের প্লাবনে নিমজ্জিত রাষ্ট্র-নায়কগণ আন্তর্জাতিকতার আদর্শ গ্রহণ করিতে প্রস্তুত নয়। বিশেষ করিয়া তাঁহারা আন্তর্জাতিকতাকে জাতীয়তাবাদের বিরোধী আদর্শ বলিয়া মনে করেন।

এখন প্রশ্ন হইল, জাতীয়তাবাদ ও আন্তর্জাতিকতা কী পরস্পরের বিরোধী আদর্শ, অথবা উহারা পরস্পরের পরিপূরক ? আমরা তো মনে করি জাতীয়তাবাদের পরিপূর্ণতা ঘটে আন্তর্জাতিকতার মধ্য দিয়া। জিমার্ন (Zimmern) যথার্থই বলিয়াছেন যে জাতীয়তাবাদের মধ্য দিয়াই আন্ত-র্জাতিকতায় পৌছানো সম্ভব।[16]

14. "The alternative to peaceful co-existence is co-destruction."—Nehru.

15. "We have to find middle terms between complete dependence and complete independence."—Laski.

16. "The road to Internationalism lies through nationalism."—Zimmern.

অর্থাৎ আমরা বলিতে চাই যে, জাতীয়তাবাদের সঙ্গে আন্তর্জাতিকতার লক্ষ্যের দিক হইতে কোন বিরোধ নাই। উনবিংশ শতাব্দীর ইতালীর দেশপ্রেমিক ম্যাট্‌সিনি (Mazzini) মানবসমাজকে জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ বিভিন্ন জাতির সমবায় বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। তাঁহার মতে জাতীয়তাবাদে অনুপ্রাণিত বিভিন্ন জাতির মধ্যে বিরোধ বা সংঘাতের কোন সম্ভাবনা নাই, বরং প্রতিটি জাতিই স্বকীয় প্রতিভা ও বৈশিষ্ট্যের বিকাশের মধ্য দিয়া আন্তর্জাতিক শান্তি ও সৌভ্রাতৃত্ব গঠনে সক্ষম হইবে। সুতরাং দেখা যাইতেছে ম্যাটসিনির জাতীয়তাবাদ মূলত আন্তর্জাতিকতারই পরিপূরক। অন্যদিক হইতে বলা যায় যে জাতীয়তাবাদের ভিত্তি না থাকিলে আন্তর্জাতিকতাবাদ বিকাশ লাভ করিতে পারে না। কারণ নিজে বাঁচা নিজের শ্রীবৃদ্ধির মধ্য দিয়াই অপরকে বাঁচান ও অপরের শ্রীবৃদ্ধির পথ উন্মুক্ত করা সম্ভবপর। বিভিন্ন জাতির জাতিগত ও জাতিগত সার্বভৌমিকতার অস্তিত্ব যতদিন থাকিবে ততদিন জাতীয়তাবাদের মধ্য দিয়াই আন্তর্জাতিকতায় পৌছাইতে হইবে।

কিন্তু সমস্যা অন্যস্থানে। পূর্ববর্তী আলোচনায় বলা হইয়াছে যে বিভিন্ন স্বার্থ ও উপাদানের সংমিশ্রণে জাতীয়তাবাদ আমাদের সমসাময়িক যুগে সুস্থ ও উদারতার পথ পরিত্যাগ করিয়া বিকৃত ও অনুদার হইয়া দেখা দিয়াছে। এই সংকীর্ণ ও বিকৃত জাতীয়তাবাদ সভ্যতার ও আন্তর্জাতিকতাকে লুপ্ত করিয়া সাম্রাজ্যবাদ ও সামরিকবাদ প্রতিষ্ঠায় উৎসাহী। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে একটি জাতির মহত্ত্ব ও বৈশিষ্ট্যের ঐতিহ্যের মধ্য দিয়াই জাতীয়তাবাদের উন্মেষ ঘটিয়া থাকে। সুতরাং জাতির ইচ্ছা ও ঐতিহ্যকে অস্বীকার করিয়া কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠি-বিশেষ জাতীয়তাবাদকে বিকৃত ও সংকীর্ণ করিয়া বেশিদিন রাখিতে পারে না। আমরা পুস্তকের ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথকে অনুসরণ করিয়া বলিয়াছি যে পৃথিবীর অপরাজিত মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ এবং সেই বিশ্বাস রাখিয়া বলিতে চাই যে জাতীয়তাবাদের এই বিকৃতি সাময়িক। পৃথিবীতে সুস্থ জাতীয়তাবাদের ক্রমবিকাশ ঘটিবে—জাতীয়তাবাদ আন্তর্জাতিকতার পাথেয়।

দশম অধ্যায়

অধিকার, স্বাধীনতা ও সাম্য

(Rights, Liberty and Equality)

রাষ্ট্রের প্রতি ব্যক্তির আনুগত্য আদায়ের ক্ষেত্রে আইনের একটি কার্যকরী ভূমিকা আছে, কারণ আইনের সাহায্যেই রাষ্ট্র নাগরিকের আনুগত্য লাভের চেষ্টা করে। কিন্তু ব্যক্তি ও রাষ্ট্রের পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ণয় একমাত্র আইনের দ্বারা সম্ভবপর নয়। নাগরিকের ব্যক্তিগত অধিকার ও স্বাধীনতা ব্যক্তি ও রাষ্ট্রের পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। ল্যাস্কি যথার্থই বলিয়াছেন যে, ফরাসী বিপ্লবের কারণ নির্দেশ করিতে গেলে শুধু এই কথাই বলা যায় যে প্রাচীন ফরাসী রাষ্ট্র তাহার আইনের দ্বারা সে যুগের নাগরিকের দাবী মেটাইতে পারে নাই। নাগরিকদের দাবী মূলতঃ তাহাদের ব্যক্তিগত অধিকার ও স্বাধীনতার মধ্য দিয়াই আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকে। রাষ্ট্রের প্রতি ব্যক্তির আনুগত্যের ভিত্তি ও উহার সীমারেখা এবং ইহারই পরিপ্রেক্ষিতে রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত ব্যক্তির অধিকার ও স্বাধীনতা রাষ্ট্রবিজ্ঞান আলোচনার মূল ভিত্তি। বস্তুত জনগণের অধিকার ও স্বাধীনতা রাষ্ট্রকর্তৃক স্বীকৃতিদান এই কথাই প্রমাণ করে যে রাষ্ট্রের অস্তিত্ব ব্যক্তির জন্যে, ব্যক্তির অস্তিত্ব রাষ্ট্রের জন্য নহে। জনগণের অধিকার, স্বাধীনতা ও সাম্যের দাবীকে বাস্তবে রূপায়িত করিবার পশ্চাতে রহিয়াছে রক্তাক্ত ও ঘটনাবহুল ইতিহাস। বর্তমানে রাষ্ট্রচিন্তার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে জনগণের অধিকার, স্বাধীনতা এবং সাম্যের দাবী ব্যাপকভাবে স্বীকৃতিলাভ করিতেছে। এই অধ্যায়ে আমরা অধিকার স্বাধীনতা ও সাম্যের তত্ত্বগুলিকে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিতেছি।

১ ॥ অধিকারের সংজ্ঞা ও স্বরূপ : (Definition and nature of Rights)

সমাজ ও রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃতি এবং সংরক্ষিত নাগরিকদের স্বত্ব বা দাবীকে 'অধিকার' বলা হয়। রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত ও সংরক্ষিত না হইলে অধিকারের বিশেষ কোন মূল্য থাকে না। নাগরিক বহুপ্রকার অধিকারের অস্তিত্ব কল্পনা

করিতে পারে কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত ইহা রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত না হইতেছে, ততক্ষণ ইহার কোন রাষ্ট্রনৈতিক মূল্য নাই। এই দিক হইতে বিচার করিয়া অধিকারকে একটি রাষ্ট্রনৈতিক ধারণা বলিয়া অভিহিত করা যায়।

দ্বিতীয়ত, অধিকার একান্তভাবে একটি সামাজিক ধারণা, সমাজজীবনের বাহিরে ইহা ভোগ করা সম্ভব নহে। সামাজিক জীবনে পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্য দিয়াই অধিকারের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ এবং স্বভাবতই এই কারণে সমাজবদ্ধ মানুষের পক্ষেই ইহা ভোগ করা সম্ভব। জনশূন্য দ্বীপবাসী রবিন্‌সন্ ক্রুশো সেই দ্বীপের সমস্ত কিছুর অধিকারী ছিলেন এবং তাহার অধিকার বিরোধিতা করিবার মত কেহ ছিল না। কিন্তু রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রে রবিন্‌সন্ ক্রুশোর কোন অধিকার ছিল না। কারণ, সেখানে অধিকার স্বীকার ও প্রয়োগ করিবার মত কোন ব্যক্তি, সমাজ বা রাষ্ট্রের অস্তিত্ব ছিল না।

তৃতীয়ত, রাষ্ট্রবিজ্ঞানে 'অধিকার' শব্দটি শুধুমাত্র স্বত্বই প্রতিষ্ঠা করে না, ইহা অন্যের স্বত্বে হস্তক্ষেপের অধিকারকে অস্বীকারও করে। একের অধিকার স্বীকার করার অর্থ হইল অপরের সেই নির্দিষ্ট ব্যাপারে হস্তক্ষেপের অধিকার অস্বীকার করা এবং সমাজ সামগ্রিকভাবে দায়িত্ববদ্ধ থাকে যাহাতে অধিকার লঙ্ঘিত না হয়।

'অধিকার' সম্পর্কে আলোচনা করিতে যাইয়া অধ্যাপক ল্যাস্কি বলিয়াছেন যে, অধিকার হইতেছে সমাজ জীবনের এমন কতকগুলি অবস্থা যাহা ছাড়া মানুষ সাধারণভাবে, তাহার সম্পূর্ণ উন্নতি সাধন করিতে পারে না।[1] সুতরাং ল্যাস্কির মতে মানুষের জীবনের পরিপূর্ণতা ও বিকাশের জন্য অধিকারের প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে এবং মানুষের জীবনের কল্যাণের সহায়ক 'অবস্থা'কেই তিনি অধিকার বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। এই সহায়ক বা সামাজিক অবস্থা কোন ব্যক্তি বিশেষের ব্যক্তিত্ব বিকাশের উপযোগী হইলেই চলিবে না, ইহা হইবে সমষ্টির কল্যাণের উপযোগী। তাই বার্কার বলিয়াছেন যে, প্রতিটি ব্যক্তির গুণ ও ব্যক্তিত্বের সম্ভাব্য বিকাশের অবস্থাকেই অধিকার বলে।[2]

1. 'Rights are those conditions of social life without which no man can seek, in general, to be himself at his best.'—Laski.

2. Rights are those necessary conditions of the greatest possible development of the capacities of all individuals, which are secured and guaranteed by the state.—Barker.

ভাববাদী দার্শনিক গ্রীন বলিয়াছেন যে, সমষ্টিগত কল্যাণ সম্পর্কে নৈতিক চেতনা ব্যতীত অধিকারের অস্তিত্ব থাকিতে পারে না।[3]

'অধিকার'কে সমস্ত প্রকার সামাজিক অবস্থা ও দায়দায়িত্ব নিরপেক্ষ একটি ধারণা হিসাবে কেহ কেহ মনে করেন। কিন্তু আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে, 'অধিকার' ও 'দায়িত্ব' অঙ্গাঙ্গীভাবে পারস্পরিক সম্পর্কের দ্বারা জড়িত। দায়িত্বের মধ্য দিয়াই অধিকারের উৎপত্তি ও প্রকাশ। দায়িত্ব ব্যতীত কোন প্রকার অধিকারের অস্তিত্ব থাকিতে পারে না। তাই ল্যাস্কি বলিয়াছেন যে, যিনি দায়িত্ব পালন করিবেন না, তিনি অধিকারও ভোগ করিতে পারিবেন না।[4]

অনেক সময় 'অধিকার' ও 'স্বাধীনতা'কে সমার্থক শব্দ হিসাবে ব্যবহার করা হইয়া থাকে। কিন্তু ইহা বাস্তব ঘটনা নহে। অধিকার হইল কতকগুলি বাস্তব সুযোগ সুবিধা এবং সেই সুযোগ সুবিধা মিলিয়া সামগ্রিকভাবে যে পরিবেশ রচনা করে তাহাকেই স্বাধীনতা বলে। অধিকারের অস্তিত্বের মধ্য দিয়াই স্বাধীনতার সৃষ্টি। সুতরাং ইহারা পরস্পর হইতে পৃথক নয়।

২ ॥ স্বাভাবিক অধিকারের তত্ত্ব (Theory of Natural Rights)

পূর্বে আলোচনা করা হইয়াছে যে রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃতিলাভ করিতে না পারিলে অধিকারের বিশেষ কোন অস্তিত্ব থাকিতে পারে না। কিন্তু অনেকে মনে করেন যে কিছু কিছু অধিকার লইয়া মানুষ জন্মগ্রহণ করে এবং স্বভাবতই ইহা রাষ্ট্র স্বীকৃতির উর্ধ্বে। যে সমস্ত অধিকার মানুষ জন্মগতভাবে লাভ করে এবং অন্যের এইরূপ অধিকারের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত না হইয়া ভোগ করিতে পারে তাহাকে স্বাভাবিক অধিকার নামে অভিহিত করা হইয়াছে। তাই তত্ত্বের সমর্থকগণ মনে করেন যে কিছু কিছু সার্বজনীন অধিকার ও ন্যায়বোধ লইয়া মানুষ জন্মগ্রহণ করে এবং এই সমস্ত অধিকার ভোগ ও প্রয়োগের জন্য রাষ্ট্র কর্তৃত্বের অনুমোদন প্রয়োজনীয় নয়। এই সমস্ত অধিকারকে রাষ্ট্র সৃষ্টি বা অনুমোদন করে না এবং সেইজন্য ইহা রাষ্ট্র কর্তৃক পরিবর্তিত হইতে পারে না।

3. Without a society conscious of common moral interests, there can be no rights.—Green.

4. 'He that will not perform functions, cannot enjoy rights.........'

—Laski.

অর্থাৎ স্বাভাবিক অধিকার রাষ্ট্র নিরপেক্ষ, কারণ রাষ্ট্রের উৎপত্তির পূর্ব হইতেই স্বাভাবিক অধিকারের অস্তিত্ব ছিল বলিয়া মনে করা হয়।

সিসিরো (Cicero) হইতে সুরু করিয়া বিভিন্ন রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর লেখায় স্বাভাবিক অধিকারের তত্ত্বের সমর্থন দেখিতে পাওয়া যায় ; তবে চুক্তবাদী হব্‌স্‌, এবং বিশেষ করিয়া লক্‌ ও রুশোর তত্ত্বের মধ্য দিয়াই স্বাভাবিক অধিকারের ধারণাটি মূলত বিকাশ লাভ করিয়াছে। ঐশ্বরিক অধিকারের তত্ত্বের বিরোধিতা করিয়া অষ্টাদশ শতাব্দীতে লক্‌ ও রুশো স্বাভাবিক অধিকারের কথা প্রচার করিলেন। আমেরিকার জনগণের অধিকারের সনদের মধ্য দিয়া স্বাভাবিক অধিকারের দাবী এবং ইহার সমর্থনে বক্তব্য উপস্থাপিত হইল।

রুশো বলিয়াছিলেন : স্বাধীনতা লইয়া মানুষের জন্ম, কিন্তু সর্বত্রই সে শৃঙ্খলে বাঁধা (Man is born free, but everywhere he is in chains)। রুশোর এই বক্তব্যের মধ্য দিয়া স্বাভাবিক অধিকারের ধ্যান ধারণাই অত্যন্ত বলিষ্ঠভাবে ব্যক্ত হইয়াছে। আমেরিকার জনগণের অধিকারের সনদের মধ্য দিয়া জেফারসন (Jefferson) ঘোষণা করিলেন : স্রষ্টা মানুষকে কতকগুলি অবিচ্ছেদ্য অধিকারে মণ্ডিত করিয়াছেন।[5] এই অবিচ্ছেদ্য অধিকাগুলিই স্বাভাবিক এবং ইহা রাষ্ট্রের স্বীকৃতি ও সংরক্ষণ ব্যতিরেকেই উৎপত্তি লাভ করিয়াছে। ফরাসী বিপ্লবের 'মানুষের অধিকারের সনদের' মধ্য দিয়াও এই স্বাভাবিক অধিকারের তত্ত্বই মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে।

চুক্তিবাদী দার্শনিক লক ও রুশো মনে করেন যে, স্বাভাবিক অধিকার লইয়াই মানুষের জন্ম এবং রাষ্ট্র সৃষ্টির প্রাক্কালে এই স্বাভাবিক অধিকারের কিছু অংশ মানুষ সমর্পণ করিয়াছিল অবশিষ্ট অধিকারকে সংরক্ষিত করিবার জন্য। অর্থাৎ রাষ্ট্রের আবির্ভাবে স্বাভাবিক অধিকার বিলুপ্ত হইল না—বরং ইহাকে রক্ষা করিবার দায়িত্ব রাষ্ট্রের উপর বর্তাইল।

বর্তমানকালে সমাজবিজ্ঞানীরা স্বাভাবিক অধিকারের ধারণাটিকে নূতনভাবে ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে স্বাভাবিক অধিকার চিরন্তন, সহজাত ও অপরিত্যাজ্য নহে। তাঁহারা মনে করেন যে, সামাজিক নীতির সহায়ক এবং সামাজিক সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণের নিয়ামক হইল এই স্বাভাবিক

5. "(Men are) endowed by their creator with certain inalienable rights."
—American Declaration of Rights.

অধিকার। সমাজবিজ্ঞানী গিডিংসের কথায় বলা যায় সামাজিক সম্বন্ধের ক্ষেত্রে স্বাভাবিক নির্বাচনের সূত্র দ্বারা প্রযুক্ত সমাজ জীবনের পক্ষে প্রয়োজনীয় অধিকারকেই স্বাভাবিক অধিকার বলে।[৫]

সামাজিক অধিকারের তত্ত্বকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ হইতে তীব্র সমালোচনার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে। প্রথমত বলা যায় স্বাভাবিক অধিকার বলিয়া কোন অধিকার থাকিতে পারে না। কারণ, অধিকার হইল এক প্রকারের স্বত্ব বা দাবী যাহা কর্তব্যের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। সুতরাং দায়-দায়িত্ব নিরপেক্ষ কোন প্রকার অধিকারের ধারণা রাষ্ট্রবিজ্ঞানে স্থান পাইতে পারে না। অর্থাৎ চিরন্তন, সহজাত এবং অপরিত্যাজ্য কোন স্বাভাবিক অধিকার থাকিতে পারে না।

দ্বিতীয়ত, 'স্বাভাবিক' শব্দটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয় বলিয়া স্বাভাবিক অধিকারের কোন নির্দিষ্ট ও সর্বজনগ্রাহ্য সংজ্ঞা নাই। তাই বিভিন্ন সময়ে 'স্বাভাবিক' অর্থে বিভিন্ন প্রকার অধিকারকে দেখানো হইয়াছে।

তৃতীয়ত, যেহেতু স্বাভাবিক অধিকার রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রণের উর্ধ্বে, তাই একদিকে স্বাভাবিক অধিকার সংরক্ষণের নামে রাষ্ট্রীয় কর্মপরিধিকে সীমিত করার চেষ্টা হইয়াছে এবং অপরদিকে স্বাভাবিক অধিকারের নামে নীতিবহির্ভূত, অকাম্য এবং ব্যক্তিকেন্দ্রিক অধিকারকে চালাইবার চেষ্টা হইয়াছে।

উপরোক্ত সমালোচনার জন্যে স্বাভাবিক অধিকারের ধারণা কিছুটা দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু অন্যায়, অবিচার ও শোষণের বিরুদ্ধে মানুষকে উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত করিবার ক্ষেত্রে স্বাভাবিক অধিকারের তত্ত্বের ঐতিহাসিক ভূমিকা ও গুরুত্ব অস্বীকার করা যায় না।

৩ ॥ বিভিন্ন প্রকারের অধিকার (Different kinds of Rights)

অধিকারের প্রকৃতি ও চরিত্র বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে, অধিকার মূলত তিনটি ভাগে বিভক্ত—সামাজিক (Civil), রাজনৈতিক (Political) এবং অর্থ নৈতিক (Economic) অধিকার।

(ক) সামাজিক অধিকার : আরিস্টটল বলিয়াছেন, মানুষ সামাজিক জীব। সমাজবদ্ধ জীবনের পূর্ণতা এবং ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্য কতকগুলি অধিকারের প্রয়োজন দেখা দেয়। এই অধিকারগুলি না থাকিলে সামাজিক

৫. "Socially necessary forms of right, enforced by natural selection in the sphere of social relations"—Giddings.

জীবন ব্যর্থ ও নিরর্থক হইয়া পড়ে। সুতরাং যে সমস্ত অধিকারের সাহায্যে মানুষ তাহার ব্যক্তিত্বকে বিকশিত এবং সমাজজীবনকে পরিপূর্ণ ও কল্যাণকর করিয়া তোলে তাহাকেই সামাজিক অধিকার বলে। এই সমস্ত অধিকার আইনের দ্বারা সমর্থিত হইয়াই কেবলমাত্র অধিকার হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করিতে পারে। অর্থাৎ রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত ও সংরক্ষিত হইলেই ইহা অধিকারের মর্যাদা লাভ করিতে পারে। সামাজিক অধিকারগুলি অব্যয় বা অপরিবর্তনশীল নয়। দেশ-কাল ভেদে সামাজিক অধিকারের ভিতর পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। তাহা সত্বেও, জীবনের অধিকার, স্বাধীনতার অধিকার, মত প্রকাশের অধিকার, সম্পত্তির অধিকার, পরিবার গঠনের অধিকার আইনের দৃষ্টিতে সমানাধিকার প্রভৃতি মৌলিক অধিকারগুলি মোটামুটিভাবে প্রায় প্রত্যেক দেশেরই সংবিধান কর্তৃক স্বীকৃত ও সংরক্ষিত থাকে।

(খ) রাজনৈতিক অধিকার: এই সমস্ত সামাজিক অধিকার ব্যতীত রাষ্ট্রীয় কার্যে সক্রিয় অংশ গ্রহণের সুযোগ-সুবিধা সংক্রান্ত নাগরিকগণের আর এক প্রকারের অধিকার আছে যাহাকে রাজনৈতিক অধিকার বলা হয়। ব্যক্তির আত্মনিয়ন্ত্রণ ও ব্যক্তিত্ব বিকাশের দাবী হইতে এই অধিকারের উদ্ভব ঘটে। যেখানে নির্দিষ্ট সাংবিধানিক শাসনব্যবস্থা আছে সেখানেই আইনসঙ্গত রাজনৈতিক অধিকার থাকা সম্ভব।

রাষ্ট্র তাহার আইন-কানুন প্রভৃতি দ্বারা ব্যক্তিজীবনকে নিয়ন্ত্রিত করিবার চেষ্টা করিয়া থাকে। সেইজন্য ব্যক্তির পক্ষেও রাষ্ট্রের কার্যক্রমকে নিয়ন্ত্রিত করা অপরিহার্য হইয়া দেখা দেয়। রাজনৈতিক অধিকারের দ্বারাই ব্যক্তি একদিকে রাষ্ট্রীয় কার্যে অংশ গ্রহণের সুযোগ লাভ করে, অন্যদিকে প্রয়োজনে রাষ্ট্রের অন্যায় কার্যকে রোধ ও নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে। বর্তমান যুগে ভোট দিয়া প্রতিনিধি নির্বাচনের অধিকার, নির্বাচিত হওয়ার অধিকার, সরকারী কার্যে নিয়োগাধিকার প্রভৃতি রাজনৈতিক অধিকার সমূহ বিভিন্ন রাষ্ট্রে ব্যাপকভাবে স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে।

(গ) অর্থনৈতিক অধিকার: নিছক সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকার জীবনের পরিপূর্ণতা আনিতে পারে না, তাহার জন্য প্রয়োজন অর্থনৈতিক অধিকার। অধ্যাপক ল্যাস্কি দৈনন্দিন অন্নসংস্থানের ব্যাপারে যুক্তিসঙ্গত

অর্থ খুঁজিয়া পাইবার সুযোগকে অর্থনৈতিক অধিকার বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। প্রথম দিকে কেবলমাত্র স্বাধীনভাবে রুজি রোজগারের দাবীই অর্থনৈতিক অধিকারের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, কিন্তু বর্তমানে অর্থনৈতিক অধিকার শোষণ ও অনিশ্চয়তার বিরুদ্ধে নতুন অধিকারের রূপ লইয়া আবির্ভূত হইয়াছে। বস্তুত অর্থনৈতিক অধিকার সামাজিক অধিকারেরই অংশ। কিন্তু বর্তমান যুগে ইহার গুরুত্ব বিশেষভাবে বৃদ্ধি পাওয়ায় অর্থনৈতিক অধিকারকে স্বতন্ত্রভাবে আলোচনা করা হয়। অনেকে মনে করেন যে, অর্থনৈতিক অধিকার না থাকিলে রাজনৈতিক অধিকার অর্থহীন এবং শূন্যগর্ভ কল্পনায় পর্যবসিত হয়। কর্মে অধিকার, পর্যাপ্ত পারিশ্রমিকের অধিকার, অবকাশের অধিকার প্রভৃতি অধিকারকে অর্থনৈতিক অধিকার বলে। সোবিয়েত ইউনিয়নে অর্থনৈতিক অধিকারকে সংবিধানগত স্বীকৃতি দেওয়া হইয়াছে।

৪ ॥- মৌলিক অধিকার (Fundamental Rights)

জনগণের যে-সমস্ত অধিকার আধুনিককালে ব্যাপকভাবে স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে তাহাদের মধ্যে কতকগুলি ব্যক্তিত্ব বিকাশ ও জীবন ধারণের জন্য একান্ত অপরিহার্য। এই সমস্ত অধিকারগুলি ব্যতীত নাগরিক জীবন পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় না। তাই বিভিন্ন দেশে এই সমস্ত অধিকারকে রাষ্ট্র স্বীকার করিয়া লইয়াছে। এই সমস্ত অধিকার, যাহা নাগরিক জীবনের জন্য একান্ত প্রয়োজনীয় এবং রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত, তাহাকে মৌলিক অধিকার বা Fundamental Rights বলা হয়। রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত ও অনুমোদিত না হইলে এই সমস্ত অধিকারের নৈতিক ভিত্তি থাকিলেও ইহা কার্যকরী হইতে পারে না। কারণ, একের অধিকার অন্যের অধিকারকে কিছু পরিমাণে খর্ব করে। উদাহরণ হিসাবে বলা যাইতে পারে যে, নিম্নতম মজুরির অধিকার শ্রমিককে যেমন সর্বনিম্ন মজুরি দাবী করিতে অধিকার দেয়, তেমনি ইহা মালিককে নিজ ইচ্ছামত মজুরি দিবার অধিকার হইতে বঞ্চিত করে। সুতরাং এই অধিকার যদি রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত না হয় তবে সমাজের বিশেষ প্রতিপত্তি ও শক্তিশালী মালিকশ্রেণী শ্রমিককে এই অধিকার হইতে বঞ্চিত করিবে। তাই, জীবনধারণ ও ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্য যে অধিকারগুলি একান্তই মৌলিক তাহাদের 'মৌলিক অধিকার' হিসাবে রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকার করিবার একটি নীতি প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে। বস্তুত পক্ষে, কোন রাষ্ট্রে কোন কোন মৌলিক অধিকার স্বীকৃত,

অনুমোদিত ও রক্ষিত হইয়াছে, তাহা জানিলে সেই রাষ্ট্রের চরিত্র, শাসক সম্প্রদায়ের দৃষ্টিভঙ্গী ও জনচেতনার ব্যাপ্তি পরিমাণ করা যায়। তাই ল্যাস্কি বলিয়াছেন যে রাষ্ট্র স্বীকৃত অধিকারের মধ্য দিয়াই রাষ্ট্রচরিত্র প্রকাশমান।[7] সেইজন্যই কোন রাষ্ট্র কোন কোন অধিকারকে মৌলিক অধিকারের স্বীকৃতি দান করিবে এবং কোন কোন অধিকারকে মৌলিক বলিয়া বিবেচনা করিবে না তাহা একান্তভাবেই সেই রাষ্ট্রের চরিত্র ও দৃষ্টিভঙ্গীর উপর নির্ভর করে। তাই সর্বরাষ্ট্র-গ্রাহ্য ও স্বীকৃত কোন মৌলিক অধিকারাবলী খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না।

ভারতবর্ষ ও সোবিয়েত ইউনিয়নে জনগণের মৌলিক অধিকারকে বিস্তারিতভাবে সংবিধানে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। সোবিয়েত ইউনিয়নে মৌলিক অধিকারের সঙ্গে জনগণের কর্তব্যকেও একই সঙ্গে অন্তর্ভূক্ত করা হইয়াছে। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দের সংবিধানে মৌলিক অধিকারের উল্লেখ না থাকায় পরবর্তীকালে সংবিধান সংশোধন করিয়া ইহা লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। সমস্ত রাষ্ট্রেই মৌলিক অধিকার লিখিতভাবে সংবিধানের অন্তর্ভূক্ত করা হয় না। কোন কোন রাষ্ট্রে বিশেষ সনদ (Charter of Rights or Bill of Rights) হিসাবে মৌলিক অধিকার গৃহীত হইয়াছে। মৌলিক অধিকারের উৎস হইতেছে সংবিধান। তাই সরকার এই সমস্ত অধিকারকে অস্বীকার করিতে পারে না। সেই ক্ষেত্রে নাগরিকগণ সরকারের বিরুদ্ধে বিচারালয়ের আবেদন জানাইয়া মৌলিক অধিকার ফিরিয়া পাইতে পারেন। তবে বিশেষ অবস্থার সাময়িকভাবে মৌলিক অধিকারকে বাতিল করা যায়।

যে সমস্ত মৌলিক অধিকারগুলি মোটামুটিভাবে বিভিন্ন রাষ্ট্রে স্বীকৃত এবং ব্যাপকভাবে পরিচিত তাহাদের সম্পর্কে আলোচনা করা হইল।

১। **জীবনের অধিকার (Right of Life):** জীবন ধারণের অধিকার একটি মৌলিক অধিকার। সেইজন্য প্রত্যেক রাষ্ট্রকে নাগরিকদের জীবনের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করিতে হয়। রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ গোলযোগ বা বহিঃশত্রুর আক্রমণ হইতে দেশ ও নাগরিকদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা রাষ্ট্রের কর্তব্য। পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্রে এই মূল অধিকারটিকে স্বীকার করা হইয়া থাকে।

7. "The State is known by the rights it maintains." —Laski.

২। **সম্পত্তির অধিকার (Right to Property) :** নাগরিকগণের সম্পত্তি গ্রহণ ও রক্ষা করিবার অধিকার অনেক রাষ্ট্রই স্বীকার করিয়া লইয়াছে। ব্যক্তিগত ধনসম্পত্তি রক্ষা করিবার অধিকার প্রত্যেক নাগরিককে রাষ্ট্র প্রদান করিয়া থাকে। তবে সামাজিক কল্যাণ বা বৃহত্তর স্বার্থের জন্য ক্ষতিপূরণ দিয়া রাষ্ট্র কোন ব্যক্তি বিশেষের সম্পত্তি নিজে গ্রহণ করিতে পারে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, সোবিয়েত ইউনিয়নে মার্কসবাদী দৃষ্টির পরিপ্রেক্ষিতে সম্পত্তির অধিকারকে মৌলিক অধিকার হিসাবে স্বীকার করা হয় নাই। ভারতের সংবিধানে অবশ্য সম্পত্তির অধিকার স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে।

৩। **কাজ করিবার অধিকার (Right to work) :** কাজ করিয়া অর্থ উপায়ের দ্বারা জীবন ধারণের অধিকার সমস্ত নাগরিকেরই আছে। কাজ করিবার অধিকারকে স্বীকার দ্বারা নাগরিকগণের জীবন ধারণের অধিকারকে মানিয়া লওয়া হইতেছে। ভারতবর্ষে সংবিধানগতভাবে এই অধিকারকে স্বীকার করা হইতেছে। সোবিয়েত ইউনিয়নে কাজ করবার অধিকার শুধুমাত্র বাধ্যতামূলক নয়, সেখানে কাজ না করিয়া কেহ জীবনধারণ করিতে পারিবে না (He who does not work, neither shall he eat)।

৪। **স্বাধীনভাবে চলাফেরা করিবার অধিকার (Right to move) :** রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে যে কোন জায়গায় প্রত্যেক নাগরিকের স্বাধীনভাবে চলাফেরা করিবার অধিকার আছে। অর্থাৎ রাষ্ট্রের ভিতরে নাগরিকের গতিবিধি রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে না। ভারতবর্ষ ও অন্যান্য অনেক দেশে এই মৌলিক অধিকার স্বীকৃত।

৫। **স্বাধীন মত প্রকাশের অধিকার (Right to freedom of speech) :** বাক্‌স্বাধীনতা ও স্বাধীনভাবে মত প্রকাশের অধিকারকে আধুনিক কালে গণতন্ত্রের পক্ষে অপরিহার্য মনে করা হয়। মানুষের ব্যক্তিত্ব বিকাশ ও প্রকাশের জন্য ইহার বিশেষ প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে। বস্তুতপক্ষে রাজনৈতিক দলীয় প্রথা সম্বলিত রাষ্ট্রে জনগণের মতপ্রকাশের স্বাধীনতা না থাকিলে জনগণের গণতান্ত্রিক চেতনা বিকাশ লাভ করিতে পারে না এবং উহার ফলে রাষ্ট্রে সুস্থ জনমত সৃষ্টি হইতে পারে না। স্বাধীন মতামত প্রকাশের অধিকার বলিতে অবশ্য দায়িত্বহীন, অন্যের প্রতি অপমানজনক এবং রাষ্ট্রের পক্ষে ক্ষতিকর

বক্তব্য প্রকাশের অধিকার বোঝায় না। ভারতবর্ষের সংবিধানে স্বাধীন মতামত প্রকাশের অধিকার স্বীকৃত। সোবিয়েত ইউনিয়নেও এই অধিকার স্বীকার করা হইয়াছে, তবে অনেকের মতে সেই দেশে এই অধিকারের কোন বাস্তব ভিত্তি নাই।

(৬) সংবাদপত্রের স্বাধীনতা (Freedom of the Press): সুস্থ নাগরিক জীবন ও গণতন্ত্রের সাফল্যের জন্য সংবাদপত্রের স্বাধীনতার প্রয়োজন রহিয়াছে। একনায়কতন্ত্রে জনমতকে দমন করিবার জন্য সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হরণ করা হয়। সরকারের কার্যকলাপ ও রাষ্ট্রীয় জীবনের বিভিন্ন দিকে আলোকপাত করিয়া সংবাদপত্র একটি বিরাট ভূমিকা পালন করিয়া থাকে। সেইজন্য সংবাদপত্রের স্বাধীনতাকে জনগণের মৌলিক অধিকার হিসাবে ভারতবর্ষ ও অন্যান্য দেশে স্বীকার করা হইয়াছে।

(৭) ধর্মাচরণ ও বিবেকের স্বাধীনতা (Freedom of worship and conscience): মানুষের চিন্তা, বিবেক-বুদ্ধি ও ধর্মীয় আচরণের স্বাধীনতা জনগণের আর একটি মৌলিক অধিকার। ভারতবর্ষ সহ বিভিন্ন ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে জনগণের ধর্মাচরণ ও বিবেকের স্বাধীনতাকে সংবিধানে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। সোবিয়েত ইউনিয়নে ধর্মীয় আচরণকে যেমন স্বীকার করা হইয়াছে, তেমনি ধর্মীয় সংস্কারের বিরুদ্ধে মতপ্রকাশের অধিকারকেও স্বীকার করা হইয়াছে।

এই সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক অধিকার ছাড়াও অনেক রাষ্ট্রে শিক্ষার অধিকারী, পরিবার গঠনের অধিকার, সভা-সমিতি গঠনের অধিকার, নিজেদের কৃষ্টি ও ভাষা রক্ষা করিবার অধিকার, কর্মানুযায়ী বেতন পাইবার অধিকার, আইনের চোখে সমানাধিকার প্রভৃতিকে মৌলিক অধিকার হিসাবে স্বীকার করা হয়।

৫॥ অধিকার ও সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ (Human Rights and United Nations)

মানুষের অধিকারের তত্ত্বটি রাষ্ট্রের একটি আভ্যন্তরীণ ব্যাপার হিসাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। কোন রাষ্ট্র তাহার নাগরিকগণের জন্য কি কি অধিকার স্বীকার করিবে ইহার সার্বভৌমের একান্তই নিজস্ব ব্যাপার বলিয়া আন্তর্জাতিক আইনও মনে করিত। কিন্তু বিভিন্ন দেশে সংখ্যালঘিষ্ঠ

সম্প্রদায়কে নাগরিক অধিকার হইতে বঞ্চিত করিবার ঘটনা এবং বিশেষ করিয়া হিট্‌লার কর্তৃক ইহুদী সম্প্রদায়ের উপর নির্যাতন আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করিল। ক্রমে ক্রমে ইহা বিশেষভাবে অনুভূত হইতে লাগিল যে, নাগরিকদের অধিকারের মত একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে রাষ্ট্র সার্বভৌমের উপর সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত থাকা যায় না। জনগণের অধিকার রক্ষা এবং প্রতিষ্ঠার জন্য আন্তর্জাতিক প্রচেষ্টা একান্ত অপরিহার্য। ইহারই ফলশ্রুতি হিসাবে দেখা গেল সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের নেতৃত্বে মানবিক অধিকার রক্ষা ও প্রয়োগের প্রচেষ্টা।

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ কর্তৃক 'মানুষের অধিকারের সার্বজনীন ঘোষণা' (Universal Declaration of Human Rights)-কে এ ব্যাপারে একটি নবদিগন্ত বলিয়া অভিহিত করা যায়। বস্তুত মানবজাতির নিকট ইহা নতুন 'ম্যাগনাকার্টা' নামে স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে।

মানুষের অধিকারের সার্বজনীন ঘোষণা ৩০টি ধারার মধ্য দিয়া সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক প্রভৃতি অধিকারকে বিস্তারিতভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছে। ইহা উদাত্তভাবে ঘোষণা করিয়াছে যে, প্রতিটি মানুষই এই 'ঘোষণার' অন্তর্গত অধিকার ও স্বাধীনতা লাভ করিতে পারিবে।[৪] মানুষের অধিকারের এই ঘোষণার যদিও আইনগত বিশেষ কোন বাধ্যবাধকতা নাই, কিন্তু ইহার নৈতিক মূল্য অপরিসীম। পৃথিবীর জনমতকে উপেক্ষা করিয়া এই ঘোষণার অন্তর্গত অধিকারগুলিকে বাতিল করা কোন রাষ্ট্রের পক্ষেই বাস্তবে সম্ভবপর নহে। বস্তুত আধুনিককালে যে সমস্ত রাষ্ট্র সংবিধান তৈয়ারি করা হইয়াছে, সেই সমস্ত দেশের সংবিধান প্রণেতাগণ এই ঘোষণার দ্বারা বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত হইয়াছেন।

মানুষের অধিকারের সার্বজনীন ঘোষণাকে সহনশীলতা, গণতন্ত্র, মানবিকতা ও সভ্যতার প্রতীক হিসাবে বর্ণনা করা যাইতে পারে। মানুষের অধিকার ও জয়গানের এইরূপ আন্তর্জাতিক সনদ ইহার পূর্বে দেখা যায় নাই। 'সার্বজনীন অধিকার' শুধুমাত্র মানুষের অধিকারের কথাই ঘোষণা করে নাই, ইহা মানুষের নিরাপত্তার সর্তগুলিকেও তুলিয়া ধরিয়াছে। অর্থাৎ মনুষ্যত্ব ও মানবিকতার পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য অধিকার ও নিরাপত্তা সংরক্ষণ করিবার যুগপৎ প্রচেষ্টা

৪. "Everyone is entitled to a social and international order in which the rights and freedoms set forth in this Declaration can be fully realised." —Universal Declaration of Human Rights. (Article 28)

ইহাতে লক্ষ্য করা যায়। এই ঘোষণাপত্রে মানুষের অধিকারের ক্ষেত্রে যুদ্ধকে বিপজ্জনক শত্রু বলা হইয়াছে। দ্বিতীয়ত, 'ঠাণ্ডা যুদ্ধের' (Cold war) সমাপ্তির মধ্য দিয়াই সুস্থ আন্তর্জাতিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা ও মানুষের অধিকার রক্ষা করা সম্ভব বলিয়া মনে করা হইয়াছে। তৃতীয়ত, ঔপনিবেশিকতা ও সাম্রাজ্য বিস্তারের প্রচেষ্টাকে মানুষের অধিকারের পরিপন্থী বলিয়া মনে করা হইয়াছে। চতুর্থত, সমস্ত প্রকারের জাতিভেদ প্রথাও মানুষের অধিকারের বিরোধী। সুতরাং আন্তর্জাতিক অবস্থায় এই পরিবর্তনগুলি না আসিলে মানুষের অধিকারের এই মহৎ ঘোষণা কল্পনাতেই থাকিয়া যাইবে, কোনদিন বাস্তবে রূপায়িত হইতে পারিবে না। অধিকারের ঘোষণাকে বাস্তবে রূপায়িত করার ক্ষেত্রে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ তাহার যথাযোগ্য ভূমিকা পালন করিতে সমর্থ হইবে কিনা এই ব্যাপারে অবশ্য বিতর্কের অবকাশ আছে।

৬॥ স্বাধীনতার সংজ্ঞা ও স্বরূপ : (Definition and nature of Liberty)।

"স্বাধীনতা' শব্দটি বিভিন্ন এবং ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করা হইয়া থাকে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানে রাষ্ট্র এবং ব্যক্তির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার ও ক্ষমতাকে স্বাধীনতা বলা হয়। প্রথমটি জাতীয় স্বাধীনতা এবং দ্বিতীয়টি ব্যক্তিগত স্বাধীনতা নামে পরিচিত। বর্তমান ক্ষেত্রে আমরা ব্যক্তিগত স্বাধীনতা লইয়া আলোচনা করিব।

প্রত্যেক ব্যক্তির নিজ ইচ্ছানুযায়ী জীবন নিয়ন্ত্রিত করিবার ক্ষমতাকে স্বাধীনতা বলে। স্বাধীনতা মানুষের অদম্য ও চিরন্তন স্পৃহা। কিন্তু এই স্বাধীনতা সর্বপ্রকার কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণের উর্ধ্বে নয়, কারণ অবাধ স্বাধীনতা বলিয়া কিছু থাকিতে পারে না। স্বাধীনতা বলিতে যদি বাহিরের সকল প্রকার অধীনতা হইতে মুক্তি বোঝায়, তবে এই ধরনের স্বাধীনতা সমাজে কোথাও দেখা যাইবে না। প্রত্যেকে যদি অবাধ ও সীমাহীন স্বাধীনতা ভোগ করিতে চায়, তাহা হইলে একের ইচ্ছার সঙ্গে অন্যের ইচ্ছার বিরোধ অবশ্যম্ভাবী হইয়া দেখা দিবে। সেইজন্যই স্বাধীনতা ভোগের ইচ্ছা ও সামাজিক দায়িত্ব পালনবোধের ভিতর সামঞ্জস্য রক্ষা করা স্বাধীনতা ভোগের একটি অন্যতম শর্ত।

জন স্টুয়ার্ট মিল (J. S. Mill) তাঁহার বিখ্যাত স্বাধীনতা সংক্রান্ত আলোচনা গ্রন্থে (Essay on Liberty) মানুষের মৌলিক মানসিক শক্তির বলিষ্ঠ, অব্যাহত ও বিভিন্নমুখী প্রকাশকে স্বাধীনতা বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। মিল নিজস্বমতে কল্যাণের অনুধাবন করাকে স্বাধীনতা বলিয়াছেন।[9] কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে অধিকার ব্যতীত স্বাধীনতা নিরর্থক।[10] বস্তুত অধিকারের মাধ্যমেই ব্যক্তিগত স্বাধীনতার প্রকাশ ঘটে। তাই স্বাধীনতা সম্পর্কীয় মিলের বক্তব্যের ত্রুটি লক্ষ্য করিয়া বার্কার (Barker) ইহাকে শূন্যগর্ভ স্বাধীনতা বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। বর্তমানে মনে করা হয় যে, স্বাধীনতা হইতেই অধিকারের উৎপত্তি (liberty is the product of rights)। কারণ অধিকার ও স্বাধীনতার স্বরূপ বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে, অধিকার হইতেছে কতকগুলি বাস্তব সুযোগ-সুবিধা এবং সেই সুযোগ সুবিধা মিলিয়া সামগ্রিকভাবে যে পরিবেশ রচনা করে তাহাই স্বাধীনতা নামে পরিচিত।

অধ্যাপক ল্যাস্কি স্বাধীনতা বলিতে এমন কতকগুলি পরিবেশের সযত্ন সংরক্ষণের কথা বলিয়াছেন যাহার ভিতর দিয়া মানুষ তাহার সর্বোৎকৃষ্ট অভি-ব্যক্তির সুযোগ লাভ করে।[11] স্বাধীনতার স্বরূপ আলোচনা করিতে যাইয়া তিনি আরও বলিয়াছেন যে, স্বাধীনতা বলিতে তিনি বন্ধনহীন একপ্রকারের সামাজিক অবস্থার কথা বলিতেছেন, যাহা বর্তমান সভ্যতায় ব্যক্তির সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের নিশ্চায়ক হিসাবে প্রয়োজন। এই স্থানে ল্যাস্কি যে পরিবেশ ও সামাজিক অবস্থার কথা বলিয়াছেন তাহা সৃষ্ট হইতে পারে যখন মানুষের অধিকার সমূহ রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত ও সংরক্ষিত হয়। সুতরাং অধিকার সংরক্ষণ করিতে যাইয়া যে পরিবেশ সৃষ্ট হয় তাহাই ব্যক্তির স্বাধীনতা।

স্বাধীনতা একটি আদর্শ সন্দেহ নাই, কিন্তু ইহা মানুষের জীবনের মূল লক্ষ্য নয়। স্বাধীনতা একটি পন্থা যাহার দ্বারা মানুষ সুখী ও পরিপূর্ণ জীবনের লক্ষ্যে উপনীত হইতে পারে। বর্তমান যুগে পৃথিবীতে বিভিন্ন যুগান্তকারী ঘটনা ও আদর্শের প্রভাবে ব্যক্তির স্বাধীনতা সম্পর্কীয় চিন্তাটি প্রভূত গুরুত্ব লাভ করিয়াছে।

9. "The only freedom which deserves the name, is that of pursuing of our own good in our own way."—J. S. Mill.

10. "Liberty is ......a product of rights."—Laski.

11. "By liberty I mean the eager maintenance of that atmosphere in which men have the opportunity to be their best selves."—Laski.

৭ ॥ স্বাধীনতার রক্ষাকবচ (Safeguards of Liberty)

জনগণের স্বাধীনতাকে রক্ষা ও সংরক্ষণ একটি চিরন্তন সমস্যা। কারণ অভিজ্ঞতা হইতে দেখা দিয়াছে, ক্ষমতার আসনে অধিষ্ঠিত শ্রেণী নিজেদের স্বার্থের অনুকূলে রাষ্ট্রক্ষমতা ব্যবহার করিবার ফলে জনগণের স্বাধীনতা ও স্বার্থ বহুল পরিমাণে নষ্ট হইয়াছে। এমতাবস্থায় জনগণের স্বাধীনতাকে অক্ষুন্ন রাখিবার জন্য কিছু কিছু বিধিনিষেধ স্থাপনের কথা অনেকদিন হইতেই চিন্তা করা হইতেছে। ব্যক্তির স্বাধীনতা রক্ষার দায়িত্ব শুধুমাত্র ব্যক্তির নহে রাষ্ট্রেরও। ব্যক্তি যেমন অবাধ আচরণের দ্বারা স্বাধীনতার সীমা লঙ্ঘন করিতেপারে, রাষ্ট্রও তেমনি অনাবশ্যক নিয়ন্ত্রণ দ্বারা স্বাধীনতাকে সীমিত করিতে পারে। এইরূপ সম্ভাবনা হইতে মুক্ত করিয়া স্বাধীনতাকে অক্ষুণ্ণ ও সংরক্ষিত করিবার জন্য রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা কতকগুলি নির্দেশ দিয়াছেন যাহাকে স্বাধীনতার রক্ষাকবচ (safegauards) বলা হয়। স্বাধীনতার রক্ষাকবচগুলি নিম্নে আলোচনা করা হইল।

১। জনগণের মৌলিক অধিকার (fumclamental right) সংবিধানে লিপিবদ্ধ করিয়া ব্যক্তি স্বাধীনতা নিশ্চিত করা যাইতে পারে। এইরূপ ভাবে মৌলিক অধিকার সংবিধানে বিধিবদ্ধ হইলে অধিকারগুলি আইনগত ও শাসনতান্ত্রিক স্বীকৃতি লাভ করে। সংবিধানে বিধিবদ্ধ মৌলিক অধিকার থাকিলে নাগরিকগণ তাহাদের অধিকার সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকিতে পারে এবং সেই ক্ষেত্রে রাষ্ট্র এই অধিকার ভঙ্গ করিলে নাগরিকগণ সুবিচারের জন্য আদালতের সাহায্য প্রার্থনা করিতে পারে। বিধিবদ্ধ অধিকারগুলি সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তার জন্যও বিশেষ প্রয়োজন। ডাইসী (Dicey) অবশ্য লিখিতভাবে মৌলিক অধিকারকে এইরূপ লিপিবদ্ধ করিবার বিরোধী। কিন্তু বর্তমান সংবিধানে মৌলিক অধিকার লিপিবদ্ধ করিবার প্রয়োজনীয়তা অনেকেই স্বীকার করেন। ভারতবর্ষ ও সোভিয়েত ইউনিয়নের সংবিধানে এইরূপ মৌলিক অধিকার বিধিবদ্ধ আছে।

২। মঁতেসক্যুর মতে ক্ষমতাবিভাজন নীতি স্বাধীনতা রক্ষার একটি শক্তিশালী হাতিয়ার ও রক্ষাকবচ। তিনি মনে করেন যে, ক্ষমতা কোনরূপ বিভক্ত না হইয়া যদি একটি কেন্দ্রে বিরাজ করে তবে ব্যক্তিস্বাধীনতা লুপ্ত হইতে বাধ্য। তাই সরকারের ক্ষমতাকে শাসন, বিচার ও আইন এত তিনটি বিভাগে বিভক্ত করা উচিত। এই তিনটি বিভাগ পরস্পর হইতে স্বতন্ত্র ও পারস্পরিক প্রভাবমুক্ত থাকিবে। এইরূপে যদি ক্ষমতাবিভাজন নীতিকে প্রকৃতভাবে কার্যকরী করা যায় তবে

ব্যক্তিস্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখা সম্ভবপর হয়। একই ব্যক্তি যদি শাসন বিভাগীয়, আইন বিভাগীয় এবং বিচার বিভাগীয় ক্ষমতার অধিকার লাভ করে তবে স্বৈরাচারিতা প্রতিষ্ঠিত হইবে এবং ব্যক্তিস্বাধীনতার ধ্বংস ঘটিবে। সুতরাং অনেক রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ক্ষমতাবিভাজন নীতি প্রবর্তন করিয়া ব্যক্তিস্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখিবার কথা বলেন। কিন্তু বর্তমান যুগে রাজনৈতিক দলীয় ব্যবস্থা প্রবর্তনের ফলে শাসনব্যবস্থার উপরোক্ত তিনটি বিভাগীয় শক্তিই একই হস্তে কেন্দ্রীভূত থাকে এবং ইহার ফলে ক্ষমতা পৃথকীকরণ নীতি কার্যকরী হইতে পারে না।

৩। নিছক ক্ষমতা পৃথকীকরণ যথেষ্ট নয়, বিচার বিভাগকে যদি সত্য সত্যই স্বাধীন, নিরপেক্ষ ও ক্ষমতাশালী করিয়া গঠন করা যায় তবে ব্যক্তিস্বাধীনতাকে রাষ্ট্রীয় স্বেচ্ছাচারিতার হাত হইতে রক্ষা করা অনেকাংশ সম্ভবপর।

৪। আইনের অনুশাসনকে (Rule of Law) অনেকে স্বাধীনতার রক্ষা-কবচ হিসাবে মনে করেন। এই বক্তব্যের সমর্থনে ইংলণ্ডের কথা সাধারণত উল্লেখ করা হয়। আইনের অনুশাসন বলিতে প্রথমত আইনের প্রাধান্য এবং দ্বিতীয়ত আইনের চোখে সাম্য বোঝায়। আইনের অনুশাসন যদি যথার্থভাবে প্রয়োগ করা হয় তবে ব্যক্তির স্বাধীনতা বহুল পরিমাণে নিরাপদ থাকে। কিন্তু বর্তমানে আইন বিভাগের উপর শাসন বিভাগের প্রাধান্য এবং কর্তৃত্ব যে ভাবে সর্বগ্রাসী রূপ লইয়া পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে প্রতিষ্ঠিত হইতেছে, তাহাতে আইনের অনুশাসন কতটা পরিমাণে স্বাধীনতা রক্ষা করিতে সমর্থ হইবে বলা কষ্টকর।

৫। বিশিষ্ট আইনজ্ঞ আইভার জেনিংসের মতে দায়িত্বশীল দলীয় শাসন-ব্যবস্থায় স্বাধীনতার রক্ষাকবচ নিহিত থাকে। তিনি ইংলণ্ডের প্রসঙ্গ উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন : "শাসন বিভাগের অত্যাচারের বিরুদ্ধে রক্ষাকবচের সন্ধান পাওয়া যায় কমন্স সভার দলীয় ব্যবস্থার ভিতর।" এই বক্তব্য অনেকাংশে সত্য। কারণ দলীয় ব্যবস্থার বিরোধী দল স্বাধীনতার রক্ষক হিসাবে কোথাও কোথাও কার্য করিয়া থাকে। কিন্তু জেনিংসের এই মত সর্বত্র সঠিক নয়। দলপ্রথা সমন্বিত বেশির ভাগ শাসনব্যবস্থায় সংখ্যাগরিষ্ঠের একাধিপত্য লক্ষ্য করা যায়। সে ক্ষেত্রে সরকার পক্ষ ও বিরোধী পক্ষের দৃষ্টিভঙ্গীর মৌলিক

পার্থক্য না থাকিলে এবং ব্যক্তিস্বাধীনতা রক্ষায় সরকার পক্ষকে বাধ্য করার মত শক্তি বিরোধী দলের না থাকিলে দায়িত্বশীল দলীয় শাসনব্যবস্থা স্বাধীনতার রক্ষাকবচ হিসাবে আত্মপ্রকাশ করিতে পারে না।

৬। অনেকে মনে করেন যে, সুইজারল্যাণ্ডের মত গণভোট, গণউদ্যোগ, পদচ্যুতি প্রভৃতি প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক পদ্ধতিগুলি প্রয়োগ করিয়া স্বাধীনতা রক্ষা করা যায়। কিন্তু বর্তমানে রাষ্ট্রগুলি যেভাবে বৃহদাকার ধারণ করিয়াছে তাহাতে এইরূপ প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক পদ্ধতিগুলি প্রয়োগ করা খুবই কষ্টকর।

৭। অধ্যাপক ল্যাস্কি প্রমুখেরা জনগণের সদাজাগ্রত দৃষ্টি ও সাহসিকতাকে স্বাধীনতার অন্যতম রক্ষাকবচ হিসাবে অভিহিত করিয়াছেন।[12] ল্যাস্কি বলিয়াছেন যে জনগণ যদি নির্লিপ্ত না হইয়া নিজেদের অধিকার ও স্বাধীনতা সম্পর্কে সচেতন ও সতর্ক থাকে এবং রাজনৈতিক চেতনার দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়, তবে ব্যক্তিস্বাধীনতা রক্ষা করা অনেকটা সহজ হয়।

৮॥ স্বাধীনতার বিভিন্নরূপ (Different Kinds of Liberty)

ব্যাপক অর্থে 'স্বাধীনতা' শব্দটি ব্যবহার করিলে ইহার কতকগুলি প্রকারভেদ লক্ষ্য করা যায়। নিম্নে স্বাধীনতার বিভিন্ন রূপ লইয়া আলোচনা করা হইল।

(ক) জাতীয় ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতা (National and Individual Liberty): পূর্বেই আলোচনা করা হইয়াছে যে রাষ্ট্রবিজ্ঞান রাষ্ট্র ও ব্যক্তির উভয়েরই আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার, ক্ষমতা এবং স্বাধীনতা লইয়া আলোচনা করে। কোন একটি রাষ্ট্র এবং উহার অন্তর্গত সম্প্রদায়ের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারকে আমরা জাতীয় স্বাধীনতা (National Liberty) বলিয়া অভিহিত করি। একটি জাতির সর্বপ্রকার উন্নতি, অগ্রগতি ও বিকাশের ভিত্তি হইল জাতীয় স্বাধীনতা। এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকার বিভিন্ন জাতি পরাধীনতার হাত হইতে মুক্তি লাভ করিয়া জাতীয় স্বাধীনতা লাভের জন্য এখনও সংগ্রাম করিতেছে। জাতিগত স্বাধীনতা ব্যতীত একটি জাতির আত্মিক, মানসিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উন্নতি সম্ভবপর নয়।

12. "Eternal vigilance is the price of liberty". —Laski

নিজ ইচ্ছানুযায়ী ব্যক্তি জীবনকে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করিবার অধিকারকে 'ব্যক্তিগত স্বাধীনতা' (Individual Liberty) বলা যাইতে পারে। কতকগুলি পরিবেশের সংরক্ষণের মধ্য দিয়াই ব্যক্তি স্বাধীনতার অভিব্যক্তি ঘটিতে পারে।

(খ) স্বাভাবিক ও আইনসঙ্গত স্বাধীনতা (Natural and legal Liberty) : রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত ও সংরক্ষিত আত্মনিয়ন্ত্রনের অধিকার ব্যতীতও আর এক প্রকারের অধিকারের কথা কল্পনা করা হইয়া থাকে, যাহা রাষ্ট্র-নিরপেক্ষ এবং প্রাকৃতিক অবস্থা হইতে মানুষ ভোগ করিয়া আসিতেছে বলিয়া মনে করা হইয়া থাকে। অর্থাৎ রাষ্ট্রের উৎপত্তির পূর্ব হইতেই প্রাকৃতিক অবস্থায় যথেচ্ছাচারণের যে ক্ষমতা মানুষ ভোগ করিত তাহাকেই স্বাভাবিক অধিকার (Natural Liberty) বলা হয়। স্বাভাবিক অধিকারের প্রধান মন্ত্রগুরু হইলেন রুশো। তাঁহার মতে মানুষ স্বাধীন হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে, অর্থাৎ স্বাভাবিক স্বাধীনতা লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে। নৈরাজ্যবাদীগণও স্বাভাবিক অধিকারের ধারণাকে সমর্থন করে এবং তাহারা মনে করে যে রাষ্ট্রিক আইনের বন্ধনে স্বাভাবিক অধিকার ক্রমশ লুপ্ত হইতে চলিয়াছে।

স্বাভাবিক স্বাধীনতার তত্ত্বের বিরোধীতা করিয়া বলা হইয়া থাকে যে রাষ্ট্রের দ্বারা স্বীকৃত, সংরক্ষিত ও নিয়ন্ত্রিত না হইলে স্বাধীনতার অস্তিত্ব থাকিতে পারে না। রাষ্ট্রের দ্বারা স্বীকৃত এবং সংরক্ষিত এইরূপ স্বাধীনতাকেই আইনসঙ্গত স্বাধীনতা (Legal Liberty) বলা হইয়া থাকে। অর্থাৎ আইনের অনুমোদনের মধ্য দিয়াই স্বাধীনতা মূর্ত হইয়া ওঠে বলিয়া তাহারা মনে করেন। আইনসঙ্গত স্বাধীনতাকে প্রধানত তিনভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে—ব্যক্তি স্বাধীনতা, রাজনৈতিক স্বাধীনতা এবং অর্থ নৈতিক স্বাধীনতা।

১। ব্যক্তি স্বাধীনতা (civil liberty)—ব্যক্তিমানসের পরিপূর্ণতা ও বিকাশের জন্য যে সমস্ত স্বাধীনতা প্রয়োজনীয় তাহাকে স্বাধীনতা বা ব্যক্তিগত স্বাধীনতা বলা হয়। ব্যক্তিগত নিরাপত্তা, ব্যক্তির গতিবিধির স্বাধীনতা এবং ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকারকে ব্লাকষ্টোন (Blackstone) ব্যক্তিস্বাধীনতার অন্তর্গত করিয়াছেন। এই তিনটি ক্ষেত্র ব্যতীত চিন্তা ও মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা, সংঘবদ্ধ হইবার স্বাধীনতা প্রভৃতিও ব্যক্তিগত স্বাধীনতার পর্যায়ে পড়ে।

২। রাজনৈতিক স্বাধীনতা (Political Liberty) রাজনৈতিক জীব হিসাবে বাঁচিয়া থাকিবার জন্য মানুষের কতকগুলি স্বাধীনতা প্রয়োজন এবং এই স্বাধীনতাগুলিকেই রাজনৈতিক স্বাধীনতা বলে। ব্লাকষ্টোন রাজনৈতিক স্বাধীনতাকে খুবই সংকীর্ণ অর্থে প্রয়োগ করিয়া বলিয়াছেন যে সরকারকে দমিত রাখিবার জন্য যে স্বাধীনতা প্রয়োজন তাহাকে রাজনৈতিক স্বাধীনতা বলে। কিন্তু বর্তমানে রাজনৈতিক স্বাধীনতার পরিধি ব্যাপকতা লাভ করিয়াছে। তাই শুধুমাত্র সরকারকে দমন নহে, সরকার গঠন ও নিয়ন্ত্রণ করিবার স্বাধীনতাও রাজনৈতিক স্বাধীনতার অঙ্গীভূত হইয়াছে। ল্যাস্কি যথার্থ ই বলিয়াছেন যে রাষ্ট্রীয় ক্রিয়াকর্মে ভূমিকা পালনের ক্ষমতাকে রাজনৈতিক স্বাধীনতা বলে।[13] নির্বাচনে ভোটদান করা, নির্বাচিত হওয়া, রাজনৈতিক দল গঠন করা, সরকার পরিচালনা প্রভৃতি দ্বারা নাগরিক রাষ্ট্রীয় ক্রিয়াকর্মে তাহার যথাযোগ্য ভূমিকা পালন করিতে পারে।

৩। অর্থনৈতিক স্বাধীনতা (Economic Liberty)—সমস্ত প্রকারের স্বাধীনতার ভিত্তি হইল অর্থনৈতিক স্বাধীনতা। অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ব্যতীত অন্যান্য সমস্ত স্বাধীনতা অর্থহীন ও প্রহসনে পরিণত হয়। কোন ব্যক্তিবিশেষের যদি অন্নসংস্থানের ক্ষমতা না থাকে, দিনের পর দিন স্ত্রী-পুত্র পরিবার লইয়া সে যদি অনশনে দিন কাটায়, তবে চার বা পাঁচ বৎসর পরে একবার করিয়া ভোটদানের স্বাধীনতা তাহার নিকট কোন বিশেষ অর্থ বা তাৎপর্য বহন করে কি ? সুতরাং অর্থনৈতিক স্বাধীনতাই সমস্ত স্বাধীনতার মূলভিত্তি। ল্যাস্কি প্রাত্যহিক অন্নসংস্থানের ব্যাপারে যুক্তিগত অর্থ খুঁজিয়া পাইবার সুযোগ ও নিরাপত্তাকে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা বলিয়াছেন।[14] চাকুরীর স্বাধীনতা, চাকুরীর পরিবর্তে জীবন ধারণ করিবার মত অর্থ পাইবার স্বাধীনতা, বেকার ভাতা পাইবার স্বাধীনতা প্রভৃতি অর্থনৈতিক স্বাধীনতার অন্তর্ভুক্ত।

(গ) সামাজিক স্বাধীনতা (Social Liberty)

রাষ্ট্রীয় জীবনের বাহিরে যে বৃহৎ সমাজ জীবন প্রবাহিত তাহাতে বিচরণ করিতে যাইয়া মানুষ যে স্বাধীনতা ভোগ করে তাহাকে সামাজিক স্বাধীনতা

---

13. Political liberty means the power to be active in affairs of the state."
—Laski.

14. "......Security and the apportunities to find reasonable significance in he earning of one's daily bread."—Laski

বা (Social Liberty) বলা হয়। ইহা কোনরূপ রাষ্ট্রীয় অনুমোদনের দ্বারা অনুমোদিত বা স্বীকৃত নহে সামাজিক ন্যায়—অন্যায়বোধের দ্বারাই ইহা স্বীকৃত ও সংরক্ষিত। সামাজিক ও আইনসঙ্গত স্বাধীনতার মধ্যকার পার্থক্যকে বেশিদূর টানিয়া না লইয়া যাওয়াই ভাল। কারণ ইহাদের মধ্যে পার্থক্য ক্রমশই লোপ পাইতেছে এবং প্রয়োজনবোধে অনেক ক্ষেত্রেই রাষ্ট্র সামাজিক স্বাধীনতাকে আইনসঙ্গত স্বাধীনতায় স্বীকৃত দিতেছে। ধর্মাচরণের স্বাধীনতা এতদিন সামাজিক স্বাধীনতা হিসেবেই পরিগণিত হইত। কিন্তু বর্তমানে ইহা আইনসঙ্গত স্বাধীনতায় পরিণত হইয়াছে।

৯ ॥ স্বাধীনতা, আইন ও কর্তৃত্ব (Liberty, law and authority)

সাধারণভাবে এইরূপ একটি ধারণা প্রচলিত আছে যে, স্বাধীনতা বলিতে অবাধ, অসীম ও বল্গাহীন আচার-আচরণের অধিকারকে বোঝায় এবং রাষ্ট্র-কর্তৃত্ব ও সার্বভৌমিকতার অস্তিত্ব পদে পদে এইরূপ অবাধ আচরণের অধিকারকে অর্থাৎ স্বাধীনতাকে খণ্ড, ক্ষুদ্র ও সীমিত করিয়া তুলিতেছে। সুতরাং এই ধারণা অনুযায়ী সার্বভৌমিকতা ও স্বাধীনতাকে পরস্পরবিরোধী দুইটি সত্ত্বাহিসাবে কল্পনা করা হয়। তাই বলা হইয়া থাকে যে, সার্বভৌমিকতার অবস্থানের ভিতর পূর্ণ স্বাধীনতা উপলব্ধি করা সম্ভবপর নয়। অর্থাৎ স্বাধীনতার পরিপূর্ণতার জন্য সার্বভৌম শক্তির অস্তিত্ব না থাকাই কাম্য বলিয়া এই মতবাদ মনে করে। একটু সতর্কতার সহিত স্বাধীনতার প্রকৃতি বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে, এই মতবাদটি শুধুমাত্র ভুলই নয়, পরন্তু স্বাধীনতা উপলব্ধি ও উপভোগের জন্য সার্বভৌমের নির্দেশ এবং আইনের অস্তিত্ব একান্তভাবেই অপরিহার্য। বস্তুতপক্ষে সার্বভৌম শক্তি এবং রাষ্ট্রীয় আইন না থাকিলে সার্বভৌমিকতার অস্তিত্ব থাকিতে পারে না। তাই বলা হয়: "Law is the condition of liberty"। আইনই স্বাধীনতার রক্ষক।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানে স্বাধীনতার দ্বারা অবাধ ও ইচ্ছামত কার্য করিবার অধিকারকে বোঝায় না। স্বাধীনতাকে এইরূপ অবাধভাবে প্রয়োগ করিলে স্বাধীনতা স্বেচ্ছাচারিতায় পরিণত হয়। স্বাধীনতা কোন ব্যক্তিবিশেষের উপভোগের জন্য সৃষ্ট হয় নাই, ইহা কাহারো একচেটিয়া অধিকারকে স্বীকার করে না। রাষ্ট্রের প্রতিটি নাগরিক স্বাধীনতার সমান অংশীদার। তাই কোন ব্যক্তি-বিশেষের স্বাধীনতার অন্য কেহ যেমন হস্তক্ষেপ করিতে পারে না, তেমনি

তিনিও অন্যের স্বাধীনতার হস্তক্ষেপ করিবার অধিকারী নন। তাই বার্কার বলিয়াছেন যে,* প্রত্যেকের স্বাধীনতার প্রয়োজন অন্য সকলের স্বাধীনতার প্রয়োজনীয়তা দ্বারা স্বীকৃত ও সীমাবদ্ধ[15]। সুতরাং একজনের স্বাধীনতা আছে বলিয়াই তিনি ইহাকে যথেচ্ছভাবে প্রয়োগ করিতে পারিবেন না, বরং তিনি তাহার স্বাধীনতা এইরূপভাবে প্রয়োগ করিবেন যাহাতে সমাজের অন্যের নিজের স্বাধীনতা উপভোগে কোনরূপ ব্যাঘাত সৃষ্টি না হয়।

সুতরাং প্রত্যেকে যাহাতে নিজ নিজ অধিকারের মধ্যে স্বাধীনতাকে প্রয়োগ করে তাহা নিয়ন্ত্রণের জন্য কিছু কিছু বিধি নিষেধ প্রয়োজন। এই সমস্ত বিধি-নিষেধ প্রত্যেকের স্বাধীনতার সীমা নির্ধারণ ও উহাকে নিয়ন্ত্রণ করিয়া স্বাধীনতা উপভোগ ও উপলব্ধির যোগ্য পরিবেশ সৃষ্টি করে। কোন ব্যক্তি বিশেষের অবাধ স্বাধীনতা প্রয়োগের ফলে যাহাতে অপরের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ না হয় তাহার জন্য রাষ্ট্রকে কতকগুলি বিধিনিষেধ দ্বারা স্বাধীনতাকে সীমিত ও নিয়ন্ত্রিত করিতে হয়। এই সমস্ত বিধিনিষেধকেই রাষ্ট্রীয় আইন বলা হয়। সুতরাং স্বাধীনতা প্রত্যক্ষভাবে আইনের উপর এবং পরোক্ষভাবে সার্বভৌমিকতার উপর নির্ভরশীল। তাই সার্বভৌমিকতা ও স্বাধীনতা কখনই পরস্পরবিরোধী হইতে পারে না। ব্যক্তিস্বাধীনতার নামে যে স্বেচ্ছাচার সমাজে প্রচলিত থাকিতে দেখা যায় সার্বভৌমিকতা তাহা নিয়ন্ত্রণ করিয়া পারস্পরিক সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্যের ভিত্তির উপর প্রকৃত স্বাধীনতাকে প্রতিষ্ঠা করে।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, আইন হইল একটি উপাদান যাহার সাহায্যে রাষ্ট্র এমন একটা পরিবেশ সৃষ্টি করে যেখানে প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ নিজ অধিকারের ভিতর স্বাধীনতাকে পরিপূর্ণভাবে উপভোগ করিতে পারে। তাই আইন ও স্বাধীনতার ভিতর কোন বিরোধ থাকিতে পারে না, বরং স্বাধীনতা ও আইন পরস্পরের পরিপূরক। অধ্যাপক ল্যাস্কিও বলিয়াছেন: স্বাধীনতার প্রকৃতিতেই রহিয়াছে নিয়ন্ত্রণ (Liberty involves in its nature restraints)।

বস্তুতপক্ষে নিয়ন্ত্রণ আছে বলিয়াই স্বাধীনতার মূল্য আছে। স্বাধীনতাকে যদি নিয়ন্ত্রণহীনভাবে প্রয়োগ করিতে দেওয়া হয় তবে প্রত্যেকেরই অবাধ ও বল্গাহীনভাবে কার্য করিবার অধিকার থাকিবে এবং ইহার দ্বারা সামাজিক

15. "The need of Liberty for each is necessarily qualified and conditioned by the need of liberty by all".—Barker

জীবন সম্পূর্ণভাবে বিপর্যস্ত হইবে। অর্থাৎ স্বাধীনতা উপভোগের ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ যদি তুলিয়া দেওয়া হয় তাহা হইলে হবস্ কল্পিত প্রাকৃতিক অবস্থা বা ভীষ্ম কথিত মাৎস্যন্যায় (বড় মাছ ছোট মাছকে আত্মসাৎ করে) দেখা দিবে। এই অবস্থায় 'জোর যার মুল্লুক তার' নীতি অনুসৃত হইবে এবং ব্যক্তির জীবন, সম্পত্তি ও স্বাধীনতা লুপ্ত হইবে। তাই উইলোবি (Willoughby) বলিয়াছেন যে নিয়ন্ত্রণ আছে বলিয়াই স্বাধীনতার মূল্য আছে।

এ কথা ঠিক যে, আইন এবং রাষ্ট্র-কর্তৃত্ব স্বাধীনতাকে নিয়ন্ত্রণ করিতে যাইয়া ইহাকে কিছু পরিমাণ সীমিত করে। অবাধ, অসীম ও অন্যের পক্ষে ক্ষতিকর স্বাধীনতা আইন স্বীকার করে না। কিন্তু আইন না থাকিলে এইরূপ সীমিত স্বাধীনতাও পাওয়া সম্ভব নয়। প্রত্যেকের অবাধ স্বাধীনতার পরিণতি হইতেছে প্রাকৃতিক অবস্থা সৃষ্টি করা যাহা ন্যায়, নীতি ও স্বাধীনতার পরিপন্থী। সেইজন্যই আইনের দ্বারা সমর্থিত নয় এমন স্বাধীনতা কার্যক্ষেত্রে ভোগ করা সম্ভব নয়। রীচি (Ritchie) বলিয়াছেন: স্বাধীনতা মানুষের আত্মোন্নতির সুযোগ আনিয়া দেয় এবং ইহা আইনের দ্বারা সৃষ্ট এবং রাষ্ট্র স্বীকৃতি নিরপেক্ষ।[16]

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, রাষ্ট্র কর্তৃত্ব এবং স্বাধীনতা পরস্পরবিরোধী নয় (Sovereignty and liberty are not contradictory terms), বরং ইহারা পরস্পরের পরিপূরক। কোন ব্যক্তিবিশেষের স্বাধীনতা যাহাতে অন্যের দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত না হয় তাহা দেখিবার ভার রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের হাতে। কিন্তু রাষ্ট্র কর্তৃত্ব নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী ইহাকে রক্ষা করিতে পারে না। সমাজের প্রত্যেকের স্বাধীনতা রক্ষা ও প্রতিপালনের জন্য রাষ্ট্রকে বিধিনিষেধ বা আইন সৃষ্টি করিতে হয়। সুতরাং আইনই স্বাধীনতা রক্ষা করে (Law is the condition of liberty) এবং ইহাই স্বাধীনতার রক্ষাকবচ।

১০ ॥ সাম্যের সংজ্ঞা ও স্বরূপ (Definition and nature of Equality.)

প্রায় আড়াই হাজার বৎসর পূর্বে গ্রীক নাট্যকার ইউরিপাইডিস 'সাম্য'কে মানুষের প্রাকৃতিক বিধান হিসাবে অভিহিত করিয়াছিলেন। প্রাচীন

16. Liberty in the sense of positive opportunity for self development is the creation of Law and not something that could exist apart from the action of the state.—Ritchie.

গ্রীসের স্টোইক দার্শনিকগণও মানুষের সমানাধিকারের দাবী প্রচার করিয়াছিলেন। রুশো জনগণের অধিকার ও সাম্যের দাবীকে বলিষ্ঠভাবে উত্থাপন করায় সমসাময়িক সমাজে ইহা বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। আমেরিকার স্বাধীনতার ঘোষণা ও ফরাসী বিপ্লবের ঘোষণা মূলত সাম্য ও স্বাধীনতার দাবী সম্বলিত ঘোষণা। ১৭৭৬ খৃষ্টাব্দে আমেরিকার ঔপনিবেশিকেরা ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, সকল মানুষ সমান—ইহা তাহারা স্বতঃসিদ্ধ সত্য বলিয়া বিবেচনা করেন। ফরাসী বিপ্লবের ঘোষণায় বলা হইতেছে : "মানুষ জন্ম হইতেই স্বাধীন ও সমানাধিকার সম্পন্ন।" সুতরাং গ্রীক দার্শনিকগণ হইতে শুরু করিয়া বর্তমান যুগের রাষ্ট্রবিজ্ঞানীগণ পর্যন্ত সকলেই সাম্যের উপর গুরুত্ব দিয়া বলিয়াছেন যে, সাম্য ছাড়া স্বাধীনতা নিরর্থক।

মনে রাখিতে হইবে যে সামাজিক অসাম্য একটি ঐতিহাসিক ঘটনা। তাই সামাজিক অবস্থার অপূর্ণতার (Imperfection of Social order) জন্যই সমানাধিকার বা সাম্যের ধারণার উৎপত্তি ঘটে। কিন্তু এই সমানাধিকার বা সাম্যের প্রকৃত অর্থ কী ? সাম্য শব্দটির সাধারণ অর্থ হইল সকল মানুষই সমান। অর্থাৎ, প্রত্যেকেই সমান সুযোগ সুবিধা, সমান আচরণ, সমান অধিকার ও সমপরিমাণ স্বাধীনতা পাইবার অধিকারী। বাস্তব জীবনে দেখা যায় যে, শারীরিক ও মানসিক দিক প্রত্যেকে সমান নয়। সুতরাং সাম্য বলিতে সমস্তবিষয়ে সমান বোঝায় না। বঙ্কিমচন্দ্র সাম্য প্রবন্ধে বলিয়াছেন : 'সাম্য-নীতির এইরূপ ব্যাখ্যা করি না যে, সকল মনুষ্য সমানাবস্থাপন্ন বলিয়া স্থির করিতে হইবে। তাহা কখনও হইতে পারে না। যেখানে বুদ্ধি, মানসিক শক্তি, শিক্ষা, বল প্রভৃতির স্বাভাবিক তারতম্য আছে, সেখানে অবশ্য অবস্থার তারতম্য ঘটিবে,—কেহ রক্ষা করিতে পারিবে না। তবে অধিকারের সাম্য আবশ্যক।" শারীরিক ও মানসিক গঠনে এইরূপ পার্থক্য থাকার জন্য সমস্ত বিষয়ে সমান হওয়া সম্ভবপর নয়। তাই সাম্য বলিতে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে সর্ববিষয়ে সমান ক্ষমতা ও অভিন্নতা বোঝায় না। রিচি মনে করেন যে, বৈষম্যের উত্তরাধিকার হিসাবে সাম্যের ধারণা জন্ম লাভ করে। ল্যাস্কির মতে সাম্য বলিতে প্রত্যেকের সমান সুযোগ পাইবার অধিকার বোঝায়। অর্থাৎ কাহারও প্রতি পক্ষপাতিত্ব না করিয়া রাষ্ট্রপ্রতিটি নাগরিককে সমান সুযোগ-সুবিধা এবং সমান অধিকার দিবে যাহাতে জনগণ তাহাদের ব্যক্তিত্ব বিকাশের সমান সুযোগ পায়। অর্থাৎ আইন ও সার্বভৌমের চোখে যখন প্রতিটি নাগরিক সমান হিসাবে

প্রতীয়মান হয় তখনই সাম্য প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে বলা হয়। সুতরাং স্বাধীনতার মত সাম্যও একটি আইনগত ধারণা। ল্যাস্কি মনে করেন যে সাম্য বলিতে প্রধানত তিনটি শর্ত বুঝায়। প্রথমত, বিশেষ সুযোগ সুবিধার অনুপস্থিতি; দ্বিতীয়ত, প্রত্যেকের জন্য পর্যাপ্ত সুযোগ সুবিধা এবং তৃতীয়ত, সাম্য মূলত একটি সমানুপাত নির্ধারণের সমস্যা।

ঊনবিংশ শতাব্দীর উদারনৈতিক মতবাদীরা সাম্য বলিতে যাহা বুঝিতেন, বিংশ শতাব্দীর সমাজতন্ত্রীরা তাহার চেয়ে অনেক ব্যাপক অর্থে এই শব্দ প্রয়োগ করিয়া থাকেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর সাম্য ছিল আইনের চোখে সকলে সমান এবং ভোট দিবার ও নির্বাচিত হইবার সমান অধিকার। অর্থাৎ সামাজিক ও রাজনৈতিক সাম্যের উপর এই সময়ে গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু বিংশ শতাব্দীতে আর্থিক সাম্য অনেক বেশি প্রাধান্য লাভ করিয়াছে বলিয়া সাম্যের পরিধি অনেকটা বিস্তৃত হইয়াছে।

১১ ॥ সাম্যের বিভিন্নরূপ (Different kinds of Equality):

অধিকার ও স্বাধীনতার মত সাম্যও বিভিন্ন প্রকারের। লর্ড ব্রাইস (Lord Bryce) সাম্যকে চার ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন—যথা, ব্যক্তিগত সাম্য, রাজনৈতিক সাম্য, সামাজিক সাম্য ও স্বাভাবিক সাম্য। ব্রাইসের সাম্যের এই শ্রেণীবিভাগ কিছুটা অসম্পূর্ণতা দোষে দুষ্ট, কারণ তিনি অর্থনৈতিক সাম্যকে উপেক্ষা করিয়াছেন। যাহাই হউক আমরা অর্থনৈতিক সাম্যকেও আলোচনার অংশ হিসাবে গ্রহণ করিতেছি।

(১) **ব্যক্তিগত সাম্য** (Civil Equality): একই প্রকারের পৌর-অধিকার ও স্বাধীনতা ভোগ করাকে ব্যক্তিগত সাম্য বলা যাইতে পারে। জাতি-ধর্ম-বর্ণ প্রভৃতি নির্বিশেষে প্রতিটি নাগরিক যখন একই প্রকারের ব্যক্তিগত অধিকার ও স্বাধীনতা ভোগ করিতে পারে, তখন ইহাকে আমরা ব্যক্তিগত সাম্যের প্রতিষ্ঠা বলিয়া অভিহিত করিতে পারি। ব্যক্তিগত সাম্যের ধারণাটিকে একটু প্রসারিত করিলে দেখা যাইবে ইহার অর্থ হইল প্রত্যেকেই আইনের অধীন এবং আইনের চোখে সমান। আইন যদি ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির পার্থক্য রচনা করে বা আইনের চোখে প্রতিটি ব্যক্তি যদি সমান অধিকার ও মর্যাদা লাভ করিতে না পারে তবে ব্যক্তিগত সাম্য প্রতিষ্ঠিত থাকিতে পারে না।

(২) **রাজনৈতিক সাম্য** (Political Equality) : রাজনৈতিক অধিকার ভোগের সমতাকে রাজনৈতিক সাম্য বলা যাইতে পারে। দণ্ডিত অপরাধী, বিকৃত মস্তিষ্ক, অপ্রাপ্তবয়স্ক এবং দেউলিয়া ব্যতীত রাজনৈতিক জীব হিসাবে প্রতিটি মানুষের সমান রাষ্ট্রনৈতিক অধিকার ভোগের মধ্য দিয়া রাজনৈতিক সাম্য মূর্ত হইয়া ওঠে। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে রাজনৈতিক অধিকার বলিতে নির্বাচনের ভোট দান করা, নির্বাচিত হওয়া, সরকারী কার্যে অংশ গ্রহণ করা এবং রাষ্ট্রীয় কার্যে প্রবেশাধিকার বোঝায়। অর্থাৎ সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়াই রাজনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, অর্থনৈতিক সাম্যের অস্তিত্ব না থাকিলে রাজনৈতিক সাম্য অর্থহীন ও প্রহসনে পরিণত হয়।

(৩) **সামাজিক সাম্য** (Social Equality) : প্রতিটি মানুষই সমাজের এক একটি একক, সামাজিক দৃষ্টিতে সমান এবং সামাজিক মর্যাদা ও সুযোগ সুবিধা ভোগের ক্ষেত্রে সমানভাবে অধিকারী—ইহাই সামাজিক সাম্যের মর্মকথা। সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়া প্রতিটি ব্যক্তিকে নিজ নিজ ব্যক্তিত্ব বিকাশে সুযোগ দেওয়া যাইতে পারে। জাতি, ধর্ম, বর্ণ, অর্থ, প্রতিপত্তি নিরপেক্ষভাবে সামাজিক ক্ষমতা দিতে পারিলে সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠা সম্ভব। কিন্তু ইহা খুবই কঠিন ব্যাপার। বর্ণগত ব্যাপারে দক্ষিণ আফ্রিকা ও রোডেশিয়াতে ব্যাপক বৈষম্য থাকিবার ফলে সেখানে সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠা করা একান্তভাবেই অসম্ভব। ভারতবর্ষে হরিজনদের এখনও সমসামাজিক প্রতিষ্ঠা দিতে আমরা প্রস্তুত নই। ব্যক্তির অর্থ এবং প্রতিপত্তিকে উপেক্ষা করিয়া সমাজের অন্য দশজনের মত তাহাকে একই প্রকারের সামাজিক অধিকার ভোগ করিতে দেওয়া আমরা এখনও ভাবিতে পারি না। সুতরাং বিভিন্ন দেশের সংবিধান সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠার জন্য যতই মহৎ সঙ্কল্প ঘোষণা করুক না কেন, বাস্তবে ইহা প্রায় কোথাও নাই।

(৪) **স্বাভাবিক সাম্য** (Natural Equality) : স্বাভাবিক অধিকারের মত স্বাভাবিক সাম্যের ধারণা ও প্রচলিত দেখা যায়। মানুষ জন্ম হইতেই সাম্যের অধিকার লইয়া জন্মগ্রহণ করে—ইহাই স্বাভাবিক সাম্যের মূলকথা। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, রুশোর বক্তব্যে, আমেরিকার স্বাধীনতার ঘোষণায় স্বাভাবিক সাম্য ও স্বাভাবিক অধিকারের ধারণাগুলি বিশেষভাবে ব্যক্ত হইয়াছে। কিন্তু স্বাভাবিক সাম্যের ধারণাটিকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ হইতে

বিরোধিতা করা হইয়াছে। যেখানে যোগ্যতা, প্রতিভা, কর্মশক্তি, কোন ব্যাপারেই মানুষ সমান নহে, সেখানে স্বাভাবিক সাম্যের কল্পনা সমীচীন কিনা সে ব্যাপারে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। বরং, বাস্তব পৃথিবীতে স্বাভাবিক সাম্য অপেক্ষা স্বাভাবিক বৈষম্যই অধিকতর পরিলক্ষিত হয়। তবে একথা স্বীকার করিতে হইবে যে, স্বাভাবিক সাম্যের আদর্শ বিভিন্ন যুগে মানুষকে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করিয়াছিল।

(৫) **অর্থনৈতিক সাম্য** (Economic Equality): সমস্ত প্রকার সাম্যের মধ্যে অর্থনৈতিক সাম্যই সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। অর্থনৈতিক সাম্য না থাকিলে অন্যান্য সাম্য ও ব্যক্তিস্বাধীনতা ব্যর্থতায় পরিণত হয়। অধ্যাপক ল্যাস্কি বলিয়াছেন যে কোন কোন লোকের জন্য বিশেষ সুবিধার সুযোগ থাকিলে যেমন স্বাধীনতা মূল্যহীন হইয়া পড়ে, ঠিক তেমনি বলা যায় যে অর্থনৈতিক সাম্য ব্যতীতও স্বাধীনতা মূল্যহীন।[17] সমাজে অর্থনৈতিক অসাম্য ও বৈষম্য থাকিলে অর্থনৈতিক দিক দিয়া সম্পদ ও সমৃদ্ধশালী একটি শ্রেণী জন্মগ্রহণ করে যাহারা বিশেষ সুযোগ-সুবিধার অধিকার ভোগ করে। বিশেষ অধিকার প্রাপ্ত এই শ্রেণী ক্রমান্বয়ে অপরের অধিকারে হস্তক্ষেপ করিয়া স্বাধীনতাকে ব্যর্থ করিয়া তোলে। সাম্য প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন: "সর্বাপেক্ষা অর্থগত বৈষম্য গুরুতর। তাহার ফলে কোথাও কোথাও দুই একজন লোক টাকার খরচ খুঁজিয়া পান না—কিন্তু লক্ষ লক্ষ লোক অন্নাভাবে উৎকট রোগগ্রস্ত হইতেছে।"

সাম্যবাদীদের মতে অর্থনৈতিক সাম্য বা অধিকার না থাকিলে সামাজিক ও রাজনৈতিক স্বাধীনতা প্রহসনে পরিণত হইতে বাধ্য। কারণ, তাঁহাদের মতে অর্থনৈতিক উপাদানই জীবন নিয়ন্ত্রণে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। সুতরাং এই অর্থ-নৈতিক সাম্যকে অবহেলা করিয়া নিছক মতপ্রকাশের স্বাধীনতা, ভোটদানের অধিকার, সম্পত্তির অধিকার প্রভৃতি স্বীকার করিলে জনগণ স্বাধীনতার প্রকৃত তাৎপর্য ও আস্বাদ লাভ করিতে পারে না। অর্থনৈতিক জীবনে যে নিঃস্ব ও রিক্ত, পেটে যাহার ক্ষুধা, তাহার নিকট উপরোক্ত অধিকারের কি মূল্য? সুতরাং স্বাধীনতার পরিপূর্ণতার জন্য অর্থনৈতিক সাম্য সর্বাগ্রে প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন।

17 "Freedom for the mass of men can never, firstly, exist in the presence of special privilege."
—Laski

অর্থনৈতিক বৈষম্য দূর করিয়া সমানাধিকার ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠা করিয়াই একমাত্র স্বাধীনতার ব্যাপকতম প্রতিষ্ঠা সম্ভব। এইজন্য সমাজতান্ত্রিক দেশে অর্থনৈতিক অধিকারকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয় এবং সোবিয়েত ইউনিয়নে অর্থনৈতিক অধিকারকে সংবিধানগত স্বীকৃতি দেওয়া হইয়াছে।

ব্যক্তিজীবনের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি ও ব্যক্তিত্ববিকাশের জন্য স্বাধীনতার বিশেষ প্রয়োজন রহিয়াছে। বস্তুত স্বাধীনতাই মানুষের আত্মোপলব্ধির সুযোগ আনিয়া দেয়। কিন্তু স্বাধীনতার পরিপূর্ণতার জন্য অর্থনৈতিক সাম্য একান্ত অপরিহার্য। অর্থনৈতিক সাম্যের অভাবে স্বাধীনতা যে অর্থহীন হইয়া দেখা দেয় ইহার নজীর আধুনিক কালের ইতিহাস হইতে সংগ্রহ করা যায়। সুতরাং অর্থনৈতিক সাম্যকে স্বাধীনতার পরিপূরক ও রক্ষাকবচ হিসাবে অভিহিত করা যায়।

একাদশ অধ্যায়

নাগরিকতা

(Citizenship)

নাগরিকদের লইয়াই রাষ্ট্রীয় সংগঠন গঠিত। স্বভাবতই নাগরিক জীবনের কল্যাণ এবং মঙ্গলকে কেন্দ্র করিয়াই রাষ্ট্রীয় ক্রিয়াকর্মের একটি বিরাট অংশ নিয়োজিত হয় বলিয়া রাষ্ট্রবিজ্ঞান আলোচনার একটি প্রধান অংশ নাগরিকতা সম্পর্কে। বর্তমান অধ্যায়ে আমরা নাগরিকতা সম্পর্কে আলোচনা করিতেছি।

১॥ নাগরিকতার সংজ্ঞা (Definition of citizenship)

কোন রাষ্ট্রের সদস্যকে সেই রাষ্ট্রের নাগরিক বলে। প্রাচীন গ্রীসে এক একটি নগরকে কেন্দ্র করিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নগরভিত্তিক রাষ্ট্রপ্রথা প্রচলিত ছিল। এইরূপ রাষ্ট্রকে নগররাষ্ট্র (city state) বলা হইত। গ্রীস দেশের নগর রাষ্ট্রের অধিবাসীদের নাগরিক বা (citizen) বলা হইত এবং ইহা হইতেই 'নাগরিক' শব্দটি ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। নাগরিকের সংজ্ঞা নির্ণয় করিয়া বলা যায়, যে ব্যক্তিসমষ্টি স্থায়িভাবে কোন রাষ্ট্রে বসবাস করে, সেই রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করে এবং উহার প্রতি নিজের দায়িত্ব পালন করে, তাহাদিগকে নাগরিক বলে। কিন্তু স্থায়ীভাবে বসবাসকারী এবং রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্যশীল হইলেই নাগরিকের অধিকার লাভ করা যায় না। প্রসঙ্গত নাবালক, দেউলিয়া, দণ্ডিত আসামী ও বিকৃত মস্তিকের ব্যক্তির কথা বলা যাইতে পারে। কেহ কেহ মনে করেন ২১ বৎসরের কম যাহাদের বয়স, যেহেতু তাহাদের ভোটদান প্রভৃতি রাজনৈতিক অধিকার নাই, সেইজন্য উহারা আইনগত ভাবে নাগরিক নয়, তাই ইহাদের 'ভবিষ্যত নাগরিক' বলিয়া অভিহিত করার কথা বলা হয়। কিন্তু গার্নারের মতে রাজনৈতিক ভোটদানের অধিকার নাগরিকতার জন্য অপরিহার্য নয় এবং ইহাদের ভিতর কোনরূপ সম্পর্ক নাই।[1] আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি মিলারের (Mr. Justice Miller) রায়েও এই সিদ্ধান্ত সমর্থন করা হইয়াছে।

---

1. "The possession of the electoral privilege is not essential to citizenship and there is no necessary connection between them."—Garner.

অর্থনৈতিক বৈষম্য দূর করিয়া সমানাধিকার ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠা করিয়াই একমাত্র স্বাধীনতার ব্যাপকতম প্রতিষ্ঠা সম্ভব। এইজন্য সমাজতান্ত্রিক দেশে অর্থনৈতিক অধিকারকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয় এবং সোবিয়েত ইউনিয়নে অর্থনৈতিক অধিকারকে সংবিধানগত স্বীকৃতি দেওয়া হইয়াছে।

ব্যক্তিজীবনের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি ও ব্যক্তিত্ববিকাশের জন্য স্বাধীনতার বিশেষ প্রয়োজন রহিয়াছে। বস্তুত স্বাধীনতাই মানুষের আত্মপোলব্ধির সুযোগ আনিয়া দেয়। কিন্তু স্বাধীনতার পরিপূর্ণতার জন্য অর্থনৈতিক সাম্য একান্ত অপরিহার্য। অর্থনৈতিক সাম্যের অভাবে স্বাধীনতা যে অর্থহীন হইয়া দেখা দেয় ইহার নজীর আধুনিক কালের ইতিহাস হইতে সংগ্রহ করা যায়। সুতরাং অর্থনৈতিক সাম্যকে স্বাধীনতার পরিপূরক ও রক্ষাকবচ হিসাবে অভিহিত করা যায়।

প্রশ্নমালা

1. Define Rights. Distinguish between Civil, Political and Economic Rights. (C. U. '45)

[আলোচনার প্রথম ও তৃতীয় অংশ দ্রষ্টব্য]

2. Write a note on Natural Rights.

[দ্বিতীয় অংশ দ্রষ্টব্য]

3. What are the Fundamental Rights that are guaranteed to a citizen in a modern State? (C. U. '51)

[চতুর্থ অংশ দ্রষ্টব্য]

4. Define Rights and discuss the impact of the United Nations on Human Rights.

[প্রথম ও পঞ্চম অংশ দ্রষ্টব্য]

5. Explain the concept of Liberty. What are the methods for safeguarding individual liberty? (C. U. '61, '63, N. B. U. '63)

[ষষ্ঠ ও সপ্তম অংশ দ্রষ্টব্য]

6. "Law is the condition of liberty."—Explain the proposition.

[নবম অংশ দ্রষ্টব্য]

7. "Sovereignty and Liberty are not contradictatory terms." Discuss. (C. U. '57)

[নবম অংশ দ্রষ্টব্য]

8. Explain the concept of Equality. To what extent does the realisation of liberty depend upon economic equality?

[দশম অংশ এবং একাদশ অংশের অর্থনৈতিক সাম্যের আলোচনা দ্রষ্টব্য]

একাদশ অধ্যায়

নাগরিকতা
(Citizenship)

নাগরিকদের লইয়াই রাষ্ট্রীয় সংগঠন গঠিত। স্বভাবতই নাগরিক জীবনের কল্যাণ এবং মঙ্গলকে কেন্দ্র করিয়াই রাষ্ট্রীয় ক্রিয়াকর্মের একটি বিরাট অংশ নিয়োজিত হয় বলিয়া রাষ্ট্রবিজ্ঞান আলোচনার একটি প্রধান অংশ নাগরিকতা সম্পর্কে। বর্তমান অধ্যায়ে আমরা নাগরিকতা সম্পর্কে আলোচনা করিতেছি।

১॥ নাগরিকতার সংজ্ঞা (Definition of citizenship)

কোন রাষ্ট্রের সদস্যকে সেই রাষ্ট্রের নাগরিক বলে। প্রাচীন গ্রীসে এক একটি নগরকে কেন্দ্র করিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নগরভিত্তিক রাষ্ট্রপ্রথা প্রচলিত ছিল। এইরূপ রাষ্ট্রকে নগররাষ্ট্র (city state) বলা হইত। গ্রীস দেশের নগর রাষ্ট্রের অধিবাসীদের নাগরিক বা (citizen) বলা হইত এবং ইহা হইতেই 'নাগরিক' শব্দটি ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। নাগরিকের সংজ্ঞা নির্ণয় করিয়া বলা যায়, যে ব্যক্তিসমষ্টি স্থায়িভাবে কোন রাষ্ট্রে বসবাস করে, সেই রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করে এবং উহার প্রতি নিজের দায়িত্ব পালন করে, তাহাদিগকে নাগরিক বলে। কিন্তু স্থায়ীভাবে বসবাসকারী এবং রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্যশীল হইলেই নাগরিকের অধিকার লাভ করা যায় না। প্রসঙ্গত নাবালক, দেউলিয়া, দণ্ডিত আসামী ও বিকৃত মস্তিষ্কের ব্যক্তির কথা বলা যাইতে পারে। কেহ কেহ মনে করেন ২১ বৎসরের কম যাহাদের বয়স, যেহেতু তাহাদের ভোটদান প্রভৃতি রাজনৈতিক অধিকার নাই, সেইজন্য উহারা আইনগত ভাবে নাগরিক নয়, তাই ইহাদের 'ভবিষ্যত নাগরিক' বলিয়া অভিহিত করার কথা বলা হয়। কিন্তু গার্নারের মতে রাজনৈতিক ভোট-দানের অধিকার নাগরিকতার জন্য অপরিহার্য নয় এবং ইহাদের ভিতর কোনরূপ সম্পর্ক নাই।[1] আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি মিলারের (Mr. Justice Miller) রায়েও এই সিদ্ধান্ত সমর্থন করা হইয়াছে।

---

1. "The possession of the electoral privilege is not essential to citizenship and there is no necessary connection between them."—Garner.

আরিস্টটল নাগরিকদের সংজ্ঞা নির্দেশ করিতে যাইয়া বলিয়াছেন যে, যাহারা সরকারী কার্য পরিচালনায় অংশ গ্রহণ করে এবং রাষ্ট্রের প্রদত্ত সম্মানের অধিকারী তাহারাই নাগরিক। আরিস্টটল নগর রাষ্ট্রের আদর্শ সামনে রাখিয়া নাগরিকের সংজ্ঞা নির্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু বর্তমান যুগে জনবহুল রাষ্ট্রে কোটি কোটি লোকের সরকারী কার্যে যোগদান করা সম্ভবপর নয়। সেইজন্য আরিস্টটলের নাগরিকের সংজ্ঞা বর্তমান যুগের পরিপ্রেক্ষিতে গ্রহণযোগ্য নয়।

ল্যাস্কি বলেন সার্বজনীন কল্যাণের জন্য ব্যক্তির সুশিক্ষিত বিচারবুদ্ধির প্রয়োগই হইতেছে নাগরিকতা।[2] ল্যাস্কির সংজ্ঞা হইতে মনে হয় যাহারা বুদ্ধিবিবেচনাপূর্বক জনকল্যাণে অংশ গ্রহণ করে না, তাহারা নাগরিক নয়। কিন্তু এইরূপ ঘটনা নৈতিক দিক দিয়া কাম্য হইলেও বাস্তবে ইহার অভাবে নাগরিকতা হইতে বঞ্চিত করা হয় না। সুতরাং ল্যাস্কির সংজ্ঞা সম্পূর্ণভাবে গ্রহণযোগ্য নয়। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রিম কোর্ট নাগরিকতার যে সংজ্ঞা নির্দেশ করিয়াছেন তাহাতে বলা হইয়াছে যে, রাজনৈতিক সমাজের অন্তর্ভুক্ত এবং উহার সদস্য জনসমষ্টিকে নাগরিক বলা হয় (The citizens are members of the political community to which they belong)। এই সদস্যদের দ্বারাই রাষ্ট্র সংগঠিত এবং ইহারা সকলে মিলিয়া তাহাদের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত অধিকার রক্ষার জন্য সরকারের প্রতিষ্ঠা করে এবং সরকারের নিকট বশ্যতা স্বীকার করে। নাগরিকতার লক্ষণ মোটামুটিভাবে এই সংজ্ঞাটিতে ব্যক্ত হইয়াছে।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি দেশে দ্বৈত পর্যায়ের নাগরিকতা দেখিতে পাওয়া যায়। অর্থাৎ আমেরিকার প্রতিটি নাগরিকই যুক্তরাষ্ট্র এবং যে অঙ্গরাজ্যে যে বাস করে উভয়েরই নাগরিক বলিয়া বিবেচিত হয়। ভারতবর্ষ যুক্তরাষ্ট্র হওয়া সত্ত্বেও এইরূপ দ্বৈত পর্যায়ের নাগরিকতা নাই।

পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আমরা আলোচনা করিয়াছি যে, ব্যক্তিমানসের সর্বাঙ্গীন বিকাশের জন্য কতকগুলি অধিকার প্রয়োজন। সুতরাং প্রতি বিভিন্ন রাষ্ট্রে নাগরিক জীবনের পূর্ণতার জন্য কতকগুলি পৌর, সামাজিক, রাজনৈতিক ও

---

2. "Citizenship" is the condition of one's instructed judgement to public good."—Laski.

অর্থনৈতিক অধিকার দেওয়া হইয়া থাকে। পূর্ববর্তী অধ্যায়ে এই সমস্ত অধিকার লইয়া আমরা বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছি, তাই এখানে আর উল্লেখ করা হইল না। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা প্রয়োজন যে অধিকার ও কর্তব্য পারস্পরিক সম্পর্কের দ্বারা জড়িত। সুতরাং কর্তব্য ব্যতীত শুধুমাত্র অধিকারের অস্তিত্ব থাকিতে পারে না। তাই নাগরিকের অধিকারের পাশাপাশিই আসিয়া পড়ে রাষ্ট্র ও সমাজের প্রতি নাগরিকের কর্তব্য। রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য, রাষ্ট্রীয় আইন মান্য করিয়া চলা, কর প্রদান করা প্রভৃতিকে নাগরিকের কর্তব্য বলা যাইতে পারে। নাগরিকের প্রতিটি কর্তব্যের আইনগত বাধ্যবাধকতা নাই—ইহাদের কোন কোনটার পিছনে নৈতিক, সামাজিক ও জনমতের প্রভাব আছে বলিয়াই এই সমস্ত কর্তব্যগুলি নাগরিক পালন করে।

এইবার আমরা **'নাগরিক'** ও **'বিদেশী'**-এর (Alien) মধ্যকার পার্থক্য দেখাইবার চেষ্টা করিব। রাষ্ট্রে বসবাসকারী প্রতিটি প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিকেই নাগরিক বলা যায় না। রাষ্ট্রে বসবাসকারীদের দুইটি ভাগে বিভক্ত করা যায়: নাগরিক ও বিদেশী। বিদেশীদের ভিতর একদল থাকে যাহারা ভ্রমণ বা অধ্যয়নের জন্য সাময়িকভাবে বিদেশে আসে। আবার কোন কোন বিদেশী ব্যবসা বাণিজ্য বা অন্যান্য কার্য উপলক্ষে দীর্ঘদিন ধরিয়া বিদেশে বসবাস করে। নাগরিক ও বিদেশীদের মধ্যে আমরা নিম্নলিখিত পার্থক্যগুলি দেখিতে পাই।

১। নাগরিকেরা রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করে। কিন্তু বিদেশীরা যে রাষ্ট্রে বসবাস করে সেখানে নয়—নিজেদের রাষ্ট্রের প্রতি অনুগত থাকে।

২। নাগরিকগণ রাষ্ট্র কর্তৃক অনুমোদিত সমস্ত প্রকার অধিকার ভোগ করিতে পারে। কিন্তু বিদেশীরা নিজ রাষ্ট্র ছাড়া অন্য রাষ্ট্রে রাজনৈতিক অধিকার ভোগ করিতে পারে না।

৩। একজন বিদেশীকে রাষ্ট্রীয় বিধি-নিষেধ ভঙ্গের অপরাধে সেই রাষ্ট্র হইতে বহিষ্কৃত করা যাইতে পারে। কিন্তু নাগরিককে সাধারণত রাষ্ট্র হইতে বহিষ্কার করা যায় না।

৪। রাষ্ট্রের নিরাপত্তা ও কল্যাণের জন্য নাগরিকগণকে বাধ্যতামূলকভাবে সামরিক শিক্ষা দেওয়া ও অন্যান্য কার্যে যোগদান করানো যায়, কিন্তু বিদেশীদের ক্ষেত্রে ইহার প্রয়োগ চলে না।

৫। নাগরিক ও বিদেশীদের ভিতর এই সমস্ত পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও মনে

রাখিতে হইবে রাষ্ট্রীয় আইন উভয়েরই উপরই সমভাবে প্রযোজ্য। বিদেশীদের ভিতর যাহারা দূতাবাসের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকেন তাঁহারা নিজের নিজের রাষ্ট্রের আইনের অধীন থাকেন, কিন্তু অন্য সকল বিদেশী যে রাষ্ট্রে বাস করে সেখানকার আইন মানিয়া চলিতে বাধ্য, তাঁহারা সেই রাষ্ট্রের আদালতে এক্তিয়ারের মধ্যে পড়েন এবং তাহাদের বিরুদ্ধে নালিশ করা যাইতে পারে। তাহারাও অন্যের বিরুদ্ধে নালিশ করিতে পারেন। বিদেশীদিগকে নাগরিকদের মত খাজনা, ট্যাক্স ইত্যাদি সবকিছু দিতে হয়।

একজন বিদেশী যখন কোন একটি রাষ্ট্রের নাগরিকতা লাভ করে তখন সে অন্যান্য নাগরিকের মতই সমস্ত প্রকার অধিকার ভোগ করিতে পারে। যদিও কোন কোন ক্ষেত্রে ইহার কিছু কিছু ব্যতিক্রম ঘটিয়া থাকে। উদাহরণ হিসাবে বলা যাইতে পারে যে, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি এবং উপরাষ্ট্রপতি পদে জন্মসূত্রে নাগরিকতা প্রাপ্ত ব্যক্তি ছাড়া অন্য কেহ আসীন হইতে পারেন না।

২॥ নাগরিকত্ব অর্জন ও বিলোপ (Acquisition and loss of citizenship)

সাধারণভাবে দুইটি উপায়ে নাগরিকতা লাভ করা যায়। প্রথমত স্বাভাবিক উপায়ে অথবা জন্মদ্বারা এবং দ্বিতীয়ত, কৃত্রিম উপায়ে বা অনুমোদন দ্বারা। জন্মসূত্রে নাগরিকতা লাভ করিলে ইহাকে জন্মসূত্রে বা স্বাভাবিক (natural) নাগরিক বলা হয়। কৃত্রিম উপায়ে বা অনুমোদনের দ্বারা নাগরিকতা লাভ করিলে ইহাকে অনুমোদনসিদ্ধ (naturalised) নাগরিক বলে। নাগরিকতা অর্জনের পদ্ধতিগুলিকে নিম্নে ছকের সাহায্যে দেখান হইল :
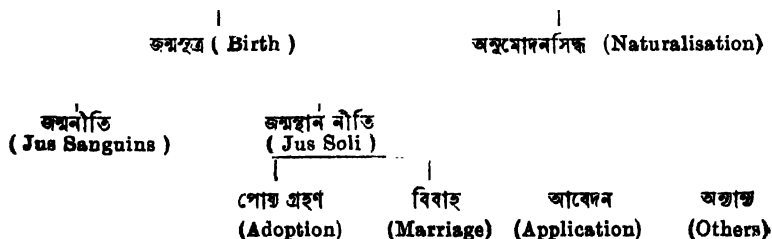
জন্মসূত্রে নাগরিকতা অর্জনের দুইটি নীতি আছে : জন্মনীতি (Jus Sanguins) ও জন্মস্থান নীতি (Jus Soil)। জন্মনীতি অনুযায়ী শিশুর জন্ম

যেখানেই হউক না কেন সে তাহার পিতার নাগরিকতার অধিকারী হইবে। অর্থাৎ এই নীতি অনুসারে শিশুর জন্মস্থানের সঙ্গে নাগরিকতার কোন সম্পর্ক নাই—জন্ম অন্য কোন রাষ্ট্রে হইলেও সন্তান স্বাভাবিকভাবেই পিতার নাগরিকতার অধিকারী হইবে। উদাহরণ হিসাবে বলা যায় যে, ফ্রান্সের কোন নাগরিকের সন্তান যদি ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করে, তবে জন্মনীতি অনুসারে সেই নবজাত শিশু ফরাসী দেশেরই নাগরিকতা লাভ করিবে, ভারতবর্ষের নয়।

জন্মস্থাননীতি সম্পূর্ণভাবে ইহার বিরোধী। এই নীতি অনুযায়ী শিশু যে রাষ্ট্রে জন্মগ্রহণ করিবে সেখানকার নাগরিকতা পাইবার অধিকারী। নবজাত শিশুর পিতা যে কোন রাষ্ট্রের নাগরিক হইতে পারে কিন্তু নবজাতের নাগরিকতা তাহার জন্মস্থান অনুসারে নির্ধারিত হইবে। উদাহরণ হিসাবে বলা যায় যে, আমেরিকার কোন নাগরিকের সন্তান যদি ইংলণ্ডের ভূমিতে জন্মগ্রহণ করে, তবে নবজাত শিশু ইংলণ্ডের নাগরিক হইবে। সে তাহার পিতার নাগরিকতা অনুসারে আমেরিকার নাগরিকতা পাইবে না।

সুতরাং দেখা যাইতেছে, জন্মনীতিতে পিতার নাগরিকতার উপর প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে, আর জন্মস্থান নীতিতে ভূমিগত ঘটনাকে প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে। পৃথিবীতে জন্মনীতি অর্থাৎ পিতার নাগরিকতা অনুযায়ী সন্তানের নাগরিকতা নির্ধারণের নীতিই ব্যাপকভাবে গৃহীত হইয়াছে। তবে জন্মস্থান নীতিও কোন কোন স্থানে গ্রহণ করা হইয়াছে। বিভিন্ন রাষ্ট্র একই নীতি গ্রহণ না করিয়া বিভিন্ন নীতি অনুসরণ করায় দ্বিনাগরিকতা (Double citizenship) এবং নাগরিকহীনতা (statelessness) এর সমস্যা জটিল হইয়া দেখা দেয়। জন্মনীতি অনুযায়ী নাগরিকতা নির্ধারণ করা মোটামুটি গ্রহণযোগ্য। কিন্তু জন্মস্থাননীতি একান্তভাবেই অবৈজ্ঞানিক ও অযৌক্তিক।

অনুমোদনসিদ্ধ নাগরিকতা বলিতে আইন কর্তৃক নাগরিকতার স্বীকৃতি বোঝায়। অর্থাৎ একটি রাষ্ট্রের নাগরিক যখন আইনের মাধ্যমে অন্য একটি রাষ্ট্রের নাগরিকতা লাভ করে তাহাকে অনুমোদনসিদ্ধ নাগরিকতা বলে। অন্য রাষ্ট্রের নাগরিককে পোষ্য গ্রহণ, বিবাহ করা এবং এক রাষ্ট্রের নাগরিক অন্য রাষ্ট্রের নাগরিকতার জন্য আবেদনের মধ্য দিয়া অনুমোদনসিদ্ধ নাগরিকতা লাভ করিতে পারে। বিবাহের দ্বারা নাগরিকতা লাভের নিয়ম বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন প্রকারের।

অন্য রাষ্ট্রের সেনাবাহিনীতে যোগদান বা অন্য রাষ্ট্রে স্থায়ী সম্পত্তি ক্রয় বা অন্য রাষ্ট্রে স্থায়ীভাবে বসবাসের ইচ্ছা প্রকাশ প্রভৃতি উপায় দ্বারাও অন্য রাষ্ট্রের নাগরিক হওয়া যায়। অনুমোদনের দ্বারা আংশিক ও পূর্ণ উভয় প্রকারেরই নাগরিক হওয়া যায়। পূর্ণ নাগরিক রাজনৈতিক অধিকার সহ সমস্ত প্রকার অধিকার ভোগ করিতে পারে। কিন্তু আংশিক নাগরিকতা অর্জন করিলে কয়েকটি রাষ্ট্রনৈতিক অধিকার হইতে বঞ্চিত থাকিতে হয়।

স্বাভাবিক এবং আইনসিদ্ধ প্রথা ছাড়াও আর এক উপায়ে নাগরিকতা অর্জন করা যায়। যেমন ভারতবর্ষ, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি রাষ্ট্রের নিয়ম অনুসারে অন্য কোন অঞ্চল এই রাষ্ট্রগুলির অন্তর্ভুক্ত হইলে সেই অঞ্চলের জনগণ স্বাভাবিকভাবেই এখানকার নাগরিকতা লাভ করিবে। এইরূপভাবে নাগরিকতা অর্জনকে সমষ্টিগত অনুমোদন করণ বলা হয়।

নাগরিকত্ব বিলোপ : সাধারণত নাগরিকত্ব বিলোপ বলিতে একটি রাষ্ট্র হইতে অপর রাষ্ট্রে নাগরিকতার পরিবর্তন বোঝায়; অর্থাৎ একটি রাষ্ট্রে নাগরিকতার লোপ ঘটে এবং অন্য রাষ্ট্রে নাগরিকতা লাভ করা হয়। নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে নাগরিকত্ব বিলোপ হইতে পারে। (১) যদি কোন ব্যক্তি একই সময়ে নিজ রাষ্ট্রের নাগরিকতার সঙ্গে অন্য রাষ্ট্রের নাগরিকতা গ্রহণ করে, তবে তাহাকে স্বরাষ্ট্রের নাগরিকতা ত্যাগ করিতে হইবে। কারণ, একই সময়ে দুইটি রাষ্ট্রের নাগরিক হওয়া চলে না। (২) কোন কোন রাষ্ট্রের আইন অনুযায়ী বিদেশীর সঙ্গে বিবাহিত স্ত্রীলোক তাহার নিজের রাষ্ট্রের নাগরিকতা হইতে বঞ্চিত হয়। (৩) অন্য রাষ্ট্রের নাগরিকতা অর্জন না করিয়াও সৈন্যদল হইতে পলায়ন, বিদেশী রাষ্ট্রপ্রদত্ত উপাধি গ্রহণ, স্বরাষ্ট্র হইতে দীর্ঘকাল অনুপস্থিত থাকা প্রভৃতি কারণে নাগরিকতার বিলোপ ঘটিতে পারে। পূর্বে মনে করা হইত, যেহেতু রাষ্ট্রের প্রতি নাগরিকদের আনুগত্য অপরিবর্তনীয়, সুতরাং নাগরিকতার পরিবর্তন সম্ভব নয়। কিন্তু বর্তমানে রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য পরিবর্তনীয় বলিয়া ধারণা প্রচলিত থাকায় নাগরিকতা অনুমোদনসিদ্ধভাবে অর্জন ও বর্জনের নীতি ব্যাপকভাবে গৃহীত হইয়াছে।

৩ ॥ সুনাগরিকতা ও ইহার প্রতিবন্ধক (Good citizenship and its hindrances) :

সুনাগরিকতার প্রতিবন্ধকতা কোন্ কোন্ উপাদান সৃষ্টি করে তাহা জানিবার পূর্বে 'সুনাগরিক' বলিতে প্রকৃতপক্ষে কী বোঝায় তাহা বোঝা

প্রয়োজন। রাষ্ট্র ও সমাজকে নিয়ন্ত্রণ করিবার দায়িত্ব মূলত নাগরিকদের। স্বাভাবিক কারণেই সেইজন্য নাগরিকদের গুণাগুণের উপর রাষ্ট্রের সামগ্রিক উন্নতি ও সমৃদ্ধি নির্ভর করে। সুতরাং রাষ্ট্রের কল্যাণের জন্য নাগরিকদের কয়েকটি গুণের অধিকারী হওয়া অর্থাৎ সুনাগরিক হওয়া একান্ত প্রয়োজনীয়। লর্ড ব্রাইসের (Lord Bryce) মতে বিচারশক্তি, সংযম ও বিবেকবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিরাই সুনাগরিক হইতে পারে। বিচারশক্তি, সংযম ও বিবেকবুদ্ধি সম্পন্ন না হইলে নাগরিক তাহার যথাযথ দায়িত্ব পালন করিতে পারে না। অশিক্ষা ও সংস্কারমুক্তিও সুনাগরিকতার বিশেষ গুণ। বার্নস (Burns) মনে করেন যে, উপরোক্ত গুণাবলীর সঙ্গে সমাজপ্রেম ও স্বাধীনচেতা মনোবৃত্তি যুক্ত হইলে প্রকৃত সুনাগরিক হওয়া সম্ভবপর।

যে-সমস্ত উপাদান সুনাগরিকতার পথে বাধা সৃষ্টি করে প্রধানত তাহা হইতেছে নির্লিপ্ততা, ব্যক্তিগত স্বার্থপরতা, দলীয় মনোবৃত্তি এবং অজ্ঞতা।

(১) **নির্লিপ্ততা (Indolence):** ঔদাসীন্য, আলস্য ও হতাশার সমন্বয়কে নির্লিপ্ততা বলা যাইতে পারে। নির্লিপ্ততা জাগার কারণ হইতেছে, নাগরিক মনে করে যে, রাষ্ট্রের লক্ষ লক্ষ লোকের মধ্যে তাহার ভূমিকা সামান্য সুতরাং সে কিছু করিলে বা না করিলে রাষ্ট্রের কোন ক্ষয়-বৃদ্ধি ঘটিবে না। দ্বিতীয়ত, সে মনে করে যে, তাহার একক প্রচেষ্টায় রাষ্ট্রযন্ত্রের কোন কল্যাণকর পরিবর্তন সম্ভব নয়। এই ধরণের হতাশাও নাগরিকদের নির্লিপ্ত করিয়া তোলে। অজ্ঞতাও নির্লিপ্ততার একটি কারণ। সর্বসাধারণের কাজ বিশেষভাবে কাহারও কাজ নয় এই বোধ দ্বারা যদি নাগরিকেরা পরিচালিত হয়, সেইক্ষেত্রে রাষ্ট্রের উন্নতির কোনো সম্ভাবনা থাকে না। নির্লিপ্ততার জন্য অনেক নাগরিক এমন কি ভোট দিতে পর্যন্ত উপস্থিত হয় না।

নাগরিকগণের মধ্যে নির্লিপ্ততা প্রসারের অনেকগুলি কারণ আছে। বৃহায়তন রাষ্ট্র, খেলা-ধুলা, আমোদ-প্রমোদ ও শিল্প সাহিত্যের আকর্ষণ সৃষ্টি, জীবন সংগ্রামের তীব্রতা এবং হতাশা নাগরিকগণের মধ্যে নির্লিপ্ততা সৃষ্টি করে।

(২) **ব্যক্তিগত স্বার্থপরতা (Private Interest):** ব্যক্তিগত স্বার্থপরতা সুনাগরিকতার পথে বাধা সৃষ্টি করে এবং নাগরিক ইহার ফলে নিজের কর্তব্য হইতে বিচ্যুত হয়। দুর্নীতি বেশি থাকিলে সেই রাষ্ট্রের

নাগরিকদের স্বার্থপরতাও বৃদ্ধি পায়। ব্যক্তিগত স্বার্থবোধ নাগরিককে সমাজ-বিরোধী ও স্বার্থপর করিয়া তোলে। ব্যক্তিগত স্বার্থের বশবর্তী হইয়া নাগরিক উৎকোচ গ্রহণ ও প্রদান করে, ভোট বিক্রয় করে, অসৎ উপায়ে চাকুরী, কনট্রাক্ট, লাইসেন্স লাভের চেষ্টা করে এবং অন্যান্য দুর্নীতির আশ্রয় গ্রহণ করে। এইরূপভাবে ব্যক্তিগত স্বার্থপরতা সমাজবন্ধনকে ছিন্ন করিয়া রাষ্ট্রের অকল্যাণ করে।

ব্যক্তিগত স্বার্থপরতা নির্লিপ্ততা হইতেও অধিকতর বিপদজনক। নির্লিপ্ততা নেতিবাচক (negative) ক্ষতি করে, কিন্তু নাগরিকগণের ব্যক্তিগত স্বার্থপরতা ইতিবাচক (positive) ক্ষতির ভূমিকা পালন করে বলিয়া ইহা জাতীয় স্বার্থকে ক্ষুণ্ণ করে, সমাজবন্ধনকে ছিন্ন করে এবং রাষ্ট্রের সামগ্রিক ক্ষতি করে।

(৩) **দলীয় মনোবৃত্তি (Party spirit) :** যদিও দলীয় প্রথার শাসন-ব্যবস্থাকে গণতন্ত্রের ভিত্তি বলা হইয়া থাকে, কিন্তু উৎকট দলীয় মনোবৃত্তি সুনাগরিকতার প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। দলীয় প্রথা নাগরিকদের উগ্র দলীয় মনোবৃত্তিকে জাগাইয়া তোলে বলিয়া নাগরিকেরা দেশের কল্যাণ অপেক্ষা দলীয় স্বার্থের উপর বেশি গুরুত্ব দেয়। এইরূপ হইবার জন্য নাগরিক রাষ্ট্রের প্রতি তাহার কর্তব্য পালনে ব্যর্থ হয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে দলীয় প্রথা এবং সুনাগরিকতার মধ্যে একটি মৌলিক বিরোধ রহিয়াছে। এই বিরোধের উৎপত্তি ঘটার কারণ হইল বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই রাজনৈতিক দলগুলি দেশ, জাতি ও সমাজের কল্যাণকে উপেক্ষা করিয়া স্বীয় দলীয় স্বার্থকে প্রাধান্য দেয় এবং ফলে দলীয় ব্যক্তিরা দলীয় মনোবৃত্তি দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া নাগরিক দায়িত্বকে অবহেলা ও অস্বীকার করে।

(৪) **অজ্ঞতা (Ignorance) :** সুনাগরিক হিসাবে রাষ্ট্রের প্রতি যথাযথ দায়িত্ব পালন করিতে হইলে নাগরিকের কিছু পরিমাণে শিক্ষাগত যোগ্যতা থাকা প্রয়োজন। শিক্ষার অভাবের জন্য বিভিন্ন প্রকার কুসংস্কার দেখা দেয় যাহা সুনাগরিক হইবার পথে বাধা সৃষ্টি করে। নাগরিকেরা অজ্ঞ হইলে অতি সহজেই তাহাদের বিপথে চালনা করা যায়। এইজন্য স্টুয়ার্ট মিল অজ্ঞ নাগরিকদের ভোটাধিকার দিবার বিরোধী ছিলেন। কারণ, তাঁহার মতে অজ্ঞ নাগরিকগণ ভোটের গুরুত্ব বুঝিতে না পারার জন্য ইহার মর্যাদা রাখিতে পারে না।

এই সমস্ত ত্রুটি ছাড়াও অনেক সময় রাষ্ট্রের নির্বাচন পদ্ধতি, সংবাদপত্রের প্রতি অন্ধবিশ্বাস প্রভৃতি সুনাগরিকতার পথে বাধা সৃষ্টি করে।

প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণের পন্থা : সুনাগরিকতার অন্তরায় দূর করিবার জন্য কেহ কেহ শাসনতান্ত্রিক প্রতিবিধানের কথা বলিয়া থাকেন। অনেক সময় নাগরিক নির্বাচনের মত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে উদাসীন ও নির্লিপ্ত থাকে। কিন্তু নাগরিকগণকে গণতান্ত্রিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ করিতে না পারিলে গণতন্ত্র সাফল্য লাভ করিতে পারে না। সেইজন্য অনেকের মতে ভোটদান প্রথা বাধ্যতামূলক করিয়া নাগরিকদের কর্তব্যবোধ জাগ্রত করা সম্ভবপর। দ্বিতীয়ত, অনেকের মতে নিছক নির্বাচনের ব্যাপারে উৎসাহিত না করিয়া যদি নাগরিকদের গণভোট (Refernedum), গণউদ্যোগ (Initiative) এবং পদচ্যুতি (Recall) প্রভৃতি প্রত্যক্ষ পদ্ধতিগুলির দ্বারা রাষ্ট্রীয় কার্যে ব্যাপকভাবে অংশ গ্রহণ করানো যায়, তবে তাহা সুনাগরিক সৃষ্টি করিতে সাহায্য করিবে। তৃতীয়ত, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে রাষ্ট্রীয় কাজকর্মে উৎসাহিত করিবার জন্য অনেকে সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব প্রচলনের প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন।

উপরোক্ত শাসনতান্ত্রিক প্রতিবিধান ব্যতীত নৈতিক প্রতিবিধানের কথাও ভাবা উচিত। আইন প্রয়োগ করিয়া সতস্ফূর্তভাবে গুণের বিকাশ ঘটানো সম্ভব নহে। শাসনতান্ত্রিক প্রক্রিয়া প্রচলনের দ্বারা সুনাগরিকতার কিছু কিছু প্রতিবন্ধকতা দূরীভূত হইবে সন্দেহ নাই। কিন্তু নাগরিকদের সামাজিক দায়িত্ববোধ জাগ্রত করিয়া তাহাদের প্রকৃত সুনাগরিক করিয়া তুলিতে হইলে নৈতিক উৎকর্ষ সাধনের চেষ্টা করিবার প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে। জনগণের নৈতিকবোধ ও শুভবুদ্ধি জাগ্রত করিতে হইলে অর্থনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠা করিয়া জীবনযাত্রার মান উন্নত করার চেষ্টা করা উচিত। তাহা না হইলে অর্থনৈতিক বৈষম্য দুর্নীতি সৃষ্টি করিবে যাহার ফলে কোনপ্রকার প্রতিবিধানই কার্যকরী হইবে না।

দ্বাদশ অধ্যায়

রাষ্ট্রের সংবিধান

(Constitution)

১ ॥ সংবিধানের অর্থ (Meaning of the Constitution)

প্রতিটি সংস্থার সংগঠনগতরূপ যাহা হইতে জানা যায় তাহাকে সেই সংস্থার সংবিধান বা শাসনতন্ত্র বলে। কোন রাষ্ট্রের শাসনপদ্ধতি ও তাহার স্বরূপ যাহা হইতে জানা যায় তাহাকে রাষ্ট্রের সংবিধান বলা হয়। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই রাষ্ট্রের শাসন পদ্ধতি একটি দলিলে লিপিবদ্ধ করা হয় এবং এই দলিলকে সংবিধান বা (constitution) আখ্যা দেওয়া হইয়া থাকে। কোন কোন ক্ষেত্রে অবশ্য শাসনপদ্ধতি লিখিতভাবে লিপিবদ্ধ করা হয় না। উদাহরণ হিসাবে ইংলণ্ডের কথা বলা যাইতে পারে। যেহেতু ইংলণ্ডের সংবিধান লিখিত নহে, তাই টকভিলের (Tocqueville) মতে ইংলণ্ডে সংবিধানের অস্তিত্ব নাই। কিন্তু ইংলণ্ডের সংবিধান নাই,—এই কথা ভাবিবার কারণ নাই। কোন একটি রাষ্ট্রের সংবিধান অধ্যয়ন করিয়া সেই রাষ্ট্রের সমুদয় শাসনতান্ত্রিক পদ্ধতি জানা যাইবে মনে করিলে ভুল করা হইবে। কারণ সংবিধান রাষ্ট্রের শাসনপদ্ধতির বিস্তারিত ইতিহাস নহে। মানুষের সমাজ-ব্যবস্থার ন্যায় শাসনপদ্ধতিও পরিবর্তনশীল। তাই যুগের চিন্তা, ধারণা, আচার, ব্যবহার এবং আর্থিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতি রাখিয়া সংবিধান সৃষ্টি হয়। সুতরাং ইহাদের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সংবিধান পরিবর্তন করিবার প্রয়োজন দেখা যায়। সেইজন্য বলা হয় সংবিধান তৈয়ারী করার জিনিস নয়, মূলত বিবর্তনের মধ্য দিয়া ইহার জন্ম (constitutions grow and are not made)। সেইজন্যই প্রেসিডেণ্ট উইলসন বলিয়াছেন যে সংবিধানকে জীবন্ত হইতে হইলে কাঠামো ও প্রয়োগের ক্ষেত্রে ইহাকে ডারউনিয়ন (Darwinian) হইতে হইবে।[1]

ডাইসির (Dicey) মতে, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে যে নিয়মকানুন রাষ্ট্রের ক্ষমতা ব্যবহারের ও বণ্টনের রীতিকে প্রভাবান্বিত করে তাহাই সংবিধান।

1. "Living political constitutions must be Darwinian in structure and practice." —Wilson

এই বক্তব্যকে সংক্ষিপ্ত করিয়া ডাঃ ফাইনার (Finer) বলিয়াছেন যে, রাষ্ট্রীয় মৌলিক প্রতিষ্ঠানসমূহের নিয়ম-বিধিকেই সংবিধান বলা হয়।[2] হুইয়ার (Wheare) বলিয়াছেন, যে উদ্দেশে এবং যে সমস্ত বিভাগ দ্বারা শাসনক্ষমতা পরিচালিত হয় তাহাদের নিয়ন্ত্রণ করিবার নিয়মাবলীকে সংবিধান বলা হয়।[3] লর্ড ব্রাইসের মতে, যে আইন ও প্রথার ছত্রছায়ায় রাষ্ট্রের জীবন বহিয়া চলে তাহাকে সংবিধান বলে।[4]

এই সমস্ত সংজ্ঞার পরিপ্রেক্ষিতে সংবিধানের বৈশিষ্ট্য হিসাবে মনে রাখিতে হইবে যে সংবিধান একটি আইনগত ধারণা এবং ইহার আইনগত একটি বিশেষ তাৎপর্য রহিয়াছে। দ্বিতীয়ত, যেহেতু রাষ্ট্রীয় জীবন বিকাশের জন্য সংবিধান অপরিহার্য সেইজন্য স্বাভাবিকভাবেই বিভিন্ন দেশে সংবিধানকে পবিত্র বলিয়া গণ্য করা হইয়া থাকে। তৃতীয়ত, কিন্তু তাহার অর্থ এই নয় যে, সংবিধান স্থায়ী ও চিরন্তন এবং ইহা লয় ও ক্ষয়ের ঊর্ধ্বে। বস্তুতপক্ষে কোন রাষ্ট্রে আজ যে সংবিধান গৃহীত ও স্বীকৃত হইয়াছে, পরবর্তীকালে কোন বৈপ্লবিক পরিবর্তনের ফলে নতুন সরকার উহাকে বাতিল করিয়া অন্য প্রকার সংবিধান তৈয়ারী করিতে পারে। পৃথিবীতে এইরূপ ঘটনা বিরল নয়। সুতরাং সংবিধান লয় ও ক্ষয়ের ঊর্ধ্বে নয়। চতুর্থত, সংবিধানের মূল উদ্দেশ্য হইতেছে রাষ্ট্রের মূল ক্ষমতা কোথায় তাহা নির্ধারণ করা, সরকারের বিভিন্ন বিভাগের পারস্পরিক ক্ষমতা স্থির করিয়া শাসনব্যবস্থার সামগ্রিক কাঠামোটিকে উপস্থিত করা। তাই ডাঃ ফাইনার সংবিধানকে রাষ্ট্রাভ্যন্তরস্থ পারস্পরিক ক্ষমতা আত্মজীবনী বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন (A constitution is the autobiography of a power relationship)।

২ ॥ শাসনতন্ত্রের শ্রেণীবিভাগ (Classifications of Constitutions) :

শাসনতন্ত্রকে বিভিন্ন শ্রেণীবিভক্ত করা যাইতে পারে। ইহার মধ্যে—(১) লিখিত ও অলিখিত সংবিধান এবং (২) সহজ পরিবর্তনশীল ও দুষ্পরিবর্তন-

2. "The system of the fundamental institutions is the constitution."
—Finer

3. " (The constitution is) the body of rules which regulate the ends for which and the organs through which Governmental power is exerised."
—Wheare

4. (The constitution) is the aggregate of laws and customs under which the life of the state goes on." —Lord Bryce

শীল সংবিধানই প্রধান। নিম্নে আমরা সংবিধানের এই দুইটি শ্রেণী লইয়া বিস্তারিত আলোচনা করিতেছি।

(ক) লিখিত ও অলিখিত সংবিধান (Written and Unwritten Constitutions)

সংবিধানকে 'লিখিত' ও 'অলিখিত' এই দুইভাগে বিভক্ত করার পদ্ধতি বহুদিন হইতে চলিয়া আসিতেছে। যখন শাসনব্যবস্থা সম্পর্কিত মৌলিক নীতিগুলি এক বা একাধিক দলিলে লিখিতভাবে লিপিবদ্ধ করা হয়, সেই শাসনব্যবস্থাকে 'লিখিত' সংবিধান বলা হয়। তাই গেটেল (Gettell) বলিয়াছেন যে যেখানে লিখিত দলিলের মাধ্যমে সরকার গঠনের প্রায় সমস্ত মৌলিক সূত্রগুলিকে লিপিবদ্ধ করা হয় তাহাকে লিখিত সংবিধান বলে।[5] ভারতবর্ষ, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রভৃতি রাষ্ট্রের সংবিধান লিখিত।

ডাঃ ফাইনারের মতে যেখানে সামগ্রিকভাবে শাসনতন্ত্র হিসাবে আইন-প্রণেতাগণ সংবিধানকে ঘোষণা করে নাই এবং ইহার ফলে কোনপ্রকার বাহ্যিক উপায়ে শাসনতান্ত্রিক আইনকে অন্য প্রকার আইন হইতে পৃথক করা যায় না, সেইরূপ অবস্থায় সংবিধানকে 'অলিখিত' সংবিধান বলা হয়। ইংলণ্ডের সংবিধান আধুনিক কালের শাসনতন্ত্রগুলির মধ্যে অলিখিত শাসনতন্ত্রের একমাত্র উদাহরণ। সুতরাং ডাঃ ফাইনারের মত অনুযায়ী অলিখিত সংবিধানে কয়েকটি প্রয়োজনীয় বিষয় যাহা অন্যান্য সংবিধানে লিপিবদ্ধ করা হইয়া থাকে, তাহার উল্লেখ থাকে না। যেমন ইংলণ্ডের কোনও আইনে এমন কথা লেখা নাই যে প্রধানমন্ত্রী অন্যান্য মন্ত্রীকে নিযুক্ত করিবেন। দ্বিতীয়ত, অলিখিত সংবিধানে সাধারণ আইন ও সাংবিধানিক আইনের মধ্যে কোনপ্রকার পার্থক্য করা হয় না। অর্থাৎ একই পদ্ধতিতে উভয় প্রকার আইন পার্লামেন্টের দ্বারা পাশ করানো হয়।

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে ফরাসী লেখক টক্‌ভিল বলিয়াছেন যে, প্রকৃতপক্ষে ইংলণ্ডে সংবিধানের কোন অস্তিত্ব নাই। কিন্তু সংবিধান অলিখিত হইলেই ইহার অস্তিত্ব নাই মনে করা ঠিক নয়। ইংলণ্ডে শাসনতান্ত্রিক নিয়মাবলী

5. A written constitution is one in which most of the fundamental principles of Govermental organisation are contained in a formal written instrument or instruments deliberately created. —Gettell

যদিও একস্থানে লিপিবদ্ধ করা হয়নি, কিন্তু বিভিন্ন দলিল ও রীতিনীতির মধ্যে ইহা ছড়াইয়া আছে। উপরন্তু বেজহট (Bagehot) ডাইসি (Dicey), মে (May), জেনিংস (Jennings) প্রভৃতি পণ্ডিতগণ ইংলণ্ডের শাসনতান্ত্রিক প্রথাগুলি তালিকাভুক্ত করিয়া সেগুলির বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা দান করিয়াছেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, ইংলণ্ডের সংবিধান অলিখিত হইলেও ইহার বিষয়বস্তু বিভিন্ন সনদ, দলিল ও ব্যাখ্যা সংক্রান্ত পুস্তকে ছড়াইয়া আছে।

উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে লিখিত ও অলিখিত সংবিধানের পার্থক্য নির্দেশ করিয়া প্রথমত বলা যাইতে পারে যে, লিখিত সংবিধানে প্রায় সমস্ত বিষয়ই লিখিত থাকে, কিন্তু অলিখিত সংবিধান তাহা নয়। কিন্তু এই পার্থক্য খুব বেশি কার্যকরী হয় না। যেমন, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান লিখিত বটে, কিন্তু ইহাতে সেখানকার রাজনৈতিক দলের কথা, রাষ্ট্রপতির নির্বাচন এবং তাঁহার প্রভাবের সকল নিদর্শনের উল্লেখ করা হয় নাই। দ্বিতীয়ত, লিখিত শাসনতন্ত্রকে আইনপ্রণেতামণ্ডলী শাসনতান্ত্রিক আইন বলিয়া ঘোষণা করিয়া ইহাকে প্রয়োগ করিয়া থাকেন। কিন্তু অলিখিত সংবিধানের ক্ষেত্রে এইরূপ ঘটে না। তৃতীয়ত, লিখিত সংবিধানকে স্থায়ী ও নির্দিষ্ট এবং অলিখিত সংবিধানকে সহজ পরিবর্তনশীল বলিয়া পার্থক্য করা হয়। কিন্তু এই বক্তব্য সম্পূর্ণভাবে ঠিক নয়। কারণ ইংলণ্ডের সংবিধান অলিখিত হইলেও ইহা অনির্দিষ্ট বা ক্ষণভঙ্গুর নয়, এবং এই সংবিধানের প্রতি জনগণের আস্থা ও শ্রদ্ধা কোন অংশে কম নহে। মূল কথা হইল সংবিধানের মানদণ্ড নির্ভর করে ইহার স্থায়িত্ব, নির্দিষ্টতাও পরিবর্তন ক্ষমতার উপর। ইংলণ্ডের সংবিধানের স্থায়িত্ব, নির্দিষ্টতা ও পরিবর্তনশীলতা পৃথিবীর কোন রাষ্ট্রের লিখিত সংবিধান অপেক্ষা কম নয়।

যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় সংবিধান লিখিত হওয়া বিশেষ প্রয়োজনীয় বলিয়া অনেকে মনে করেন। কিন্তু সংবিধান লিখিত হইলেই সর্ববিষয়ে ইহা শ্রেষ্ঠ হইবে বা উন্নত পর্যায়ের শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করিতে পারিবে এইরূপ মনে করার কোন সঙ্গত কারণ নাই। বস্তুতঃপক্ষে পৃথিবীর কোন সংবিধানই সম্পূর্ণভাবে লিখিত ও অলিখিত হইতে পারে না। তাই 'লিখিত' ও 'অলিখিত' শব্দের পরিবর্তে 'বহুলাংশে লিখিত' ও 'বহুস্থানে বিক্ষিপ্ত' এইরূপ বলিলেই বাস্তবের সঙ্গে অধিকতর সামঞ্জস্য রক্ষা করা হইবে।

(খ) সহজ পরিবর্তনীয় ও দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধান (Flexible & Rigid Constitution).

সংবিধানকে 'লিখিত' ও 'অলিখিত' এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করিবার নীতি বর্জন করিয়া লর্ড ব্রাইস সংবিধান সহজ পরিবর্তনশীল কি না ইহার ভিত্তিতে সংবিধানকে সুপরিবর্তনীয় বা নমনীয় (Flexible) ও দুষ্পরিবর্তনীয় (Rigid) এই দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। সুপরিবর্তনীয় ও দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধান বলিতে কী বোঝায় ইহা জানিতে হইলে ইহাদের ভিতরকার পার্থক্যও সহজেই বোঝা যাইবে।

যে সংবিধান পরিবর্তন করিতে কোনরূপ জটিল ও কষ্টকর পদ্ধতির আশ্রয় লইতে হয় না, যাহা সহজভাবে, বিনা আয়াসে, সাধারণ আইন তৈয়ারীর পদ্ধতিতে আইনসভার দ্বারা পরিবর্তিত করা যায়, তাহাকে 'সুপরিবর্তনীয়' সংবিধান (Flexible) বলে। লর্ড ব্রাইসের মতে সুপরিবর্তনীয় সংবিধান সহজভাবে পরিবর্তনশীল বলিয়া সংকটকালে প্রয়োজনের সঙ্গে সঙ্গতি রাখিয়া অথচ সংবিধানের মূল কাঠামোকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়া ইহাকে সংশোধন করা যায়।[6] উদাহরণ দিয়া বলা যাইতে পারে যে, যদি কোন রাষ্ট্রে দেখা যায় যে অন্যান্য সাধারণ আইনের মত আইনসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের নিছক অনুমোদনের দ্বারা সংবিধানকে সংশোধন করা সম্ভবপর, তবে তাহাকে আমরা সুপরিবর্তনীয় সংবিধান বলিব। সুপরিবর্তনীয় সংবিধানের উদাহরণ ইংলণ্ড।

কিন্তু আর এক প্রকারের সংবিধান আছে যাহাদের পরিবর্তন বা সংশোধন করা এইরূপ সহজসাধ্য নয়। এই প্রকারের সংবিধান সংশোধন করিতে হইলে জটিল ও বিশেষ পদ্ধতির আশ্রয় লইতে হয় এবং এই সমস্ত পদ্ধতির কথা সংবিধানে সুস্পষ্টভাবে নির্দেশিত থাকে। অর্থাৎ যে সমস্ত সংবিধান সহজে পরিবর্তন করা যায় না, একমাত্র সংবিধান নির্দেশিত বিশেষ পদ্ধতির সাহায্যে সংশোধন করা যায় তাহাকে দুষ্পরিবর্তনীয় (Rigid) সংবিধান বলে। উদাহরণের সাহায্যে বলা যায় যদি দেখা যায় যে কোন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান সংশোধন করিবার জন্য আইনসভার উভয় কক্ষের দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের অনুমোদন প্রয়োজন এবং তাহার পরে ঐ সংশোধনকে আবার তিন-চতুর্থাংশ অঙ্গরাজ্য দ্বারা দৃঢ়ীকৃত (Ratified) করিতে হয়, সেই ক্ষেত্রে এই সংবিধানকে

6, They can be stretched or bent, so as to meet emergeucies without breaking their framewo1k."—Bryce

দুষ্পরিবর্তনীয় আখ্যা দেওয়া হইয়া থাকে। দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধান হিসাবে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানের উল্লেখ করা যায়। সুপরিবর্তনীয় সংবিধান সহজ পরিবর্তনশীল বলিয়া ইহাকে গতিশীল ও অনির্দিষ্ট বলা হয়। কিন্তু দুষ্পরি-বর্তনীয় সংবিধান সংশোধন করা সহজসাধ্য নয় তাই ইহাকে স্থিতিশীল ও নির্দিষ্ট বলিয়া অনেকে মনে করেন। সুপরিবর্তনীয় ও দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধানের মূল পার্থক্য নির্ণয় করিয়া স্ট্রং (Strong) বলিয়াছেন যে সাধারণ আইন তৈয়ারীর পদ্ধতিতে সংবিধানও সংশোধিত হয় কিনা তাহাই এই দুই প্রকার সংবিধানের মূল পার্থক্য।[7] অর্থাৎ ইংলণ্ডে দেখা যাইবে, সাধারণ আইন যেমন পার্লামেণ্টের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের অনুমোদন লাভ করিলেই তৈয়ারী করা যায়, ঠিক তেমনি ভাবেই সংবিধানের সংশোধন করাও সম্ভব। সংবিধান সংশোধনের এইরূপ পদ্ধতি আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে নাই। তাই ইংলণ্ড ও আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানকে যথাক্রমে সহজ পরিবর্তনীয় এবং দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধান বলা হইয়া থাকে।

সুপরিবর্তনীয় ও দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধানের দোষ ত্রুটি তুলনামূলক আলোচনা না করিয়াও বলা যায় যে নাগরিকদের অধিকার রক্ষা যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনতন্ত্রে অঙ্গরাজ্যগুলি ও সংখ্যালঘুদের স্বার্থরক্ষার জন্য অনেকে দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধানের প্রয়োজনীয়তাকে অপরিহার্য বলিয়া মনে করেন। তবে, অধ্যাপক ল্যাস্কির মতে ইংলণ্ডের মত সহজ পরিবর্তনশীল সংবিধানও যেমন কাম্য নয়, তেমনি আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের মত দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধানও অবাঞ্ছনীয়।

এই পার্থক্য পরিমাণগত : লওয়েল (Lowell) মনে করেন যে সুপরিবর্তনীয় ও দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধানের এই পার্থক্য মূলগত বা গুণগত নয়, ইহা একান্তভাবেই পরিমাণগত। অর্থাৎ কোন মূলগত পার্থক্যের উপর ভিত্তি করিয়া ইহারা দুইটি ভাগে বিভক্ত হয় নাই। ইহাদের পার্থক্য যে পরিমাণগত তাহা সুপরিবর্তনীয় ও দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধান বিশ্লেষণের ভিতর দিয়াই প্রমাণ করা যাইতে পারে। যেমন, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানকে দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধান বলিয়া অভিহিত করা হইয়া থাকে এবং আপাতদৃষ্টিতে দেখা যায় যে এখানে সংবিধান পরিবর্তন করিতে হইলে কষ্টকর এবং জটিল পদ্ধতির সাহায্য

7. "The whole ground of differnce here is whether the process of constitutional law making is or is not identical with the process of ordinary law making."—Strong.

লইতে হয়। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে এই সমস্ত নিয়মতান্ত্রিক জটিল পদ্ধতি ছাড়াও সেখানে সংবিধানের সময়োপযোগী বহু গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে মাত্র ২৩টি সংশোধন হইয়াছে। কিন্তু অবশিষ্ট অনেক সংশোধন সম্ভব হইয়াছে প্রথা ও বিচারালয়ের মাধ্যমে। সেখানে প্রথাগত বিধির দ্বারাই ক্যাবিনেটের উৎপত্তি হইয়াছে এবং বিচারালয়ের সিদ্ধান্তের দ্বারা কেন্দ্রের ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইয়াছে। প্রথা ও বিচারালয়ের মাধ্যমে সংবিধান পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের এইরূপ অসংখ্য উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। সুতরাং দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধান থাকিবার জন্য যেখানে নিয়মতান্ত্রিকভাবে সংবিধানের পরিবর্তন সম্ভব নয়, সেখানে প্রথা, বিচারালয়ের সিদ্ধান্ত প্রভৃতি অন্য উপায়ের দ্বারা সংশোধন সহজসাধ্য করা হইয়াছে। তাই ম্যাকবেন ও মুনরো দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন যে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান ইংলণ্ডের সংবিধান অপেক্ষা কম নমনীয় ও কম পরিবর্তনশীল নহে।

তেমনি বিপরীত দিক হইতে দেখা যাইবে যে, ব্রিটেনের সংবিধান সুপরিবর্তনীয় হওয়া সত্ত্বেও ইহা অত্যন্ত দৃঢ় ভিত্তিক, সর্বক্ষেত্রে সহজভাবে ইহার পরিবর্তন সম্ভব নয়। ব্রিটেনের সংবিধান পরিবর্তনের জন্য দীর্ঘকালব্যাপী আলাপ আলোচনা ও মতের সংঘাত এবং রক্ষণশীল ইংরাজ জাতির মতামত জানিবার চেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। সংবিধান সহজ পরিবর্তনশীল হওয়া সত্ত্বেও সেখানে জনমত ও জনচেতনাকে উপেক্ষা করিবার ক্ষমতা পার্লামেণ্টের নাই।

উপরোক্ত আলোচনা হইতে দেখা যাইতেছে যে দুষ্পপরিবর্তনীয় সংবিধান কোন ক্রমেই স্থাণুর মত থাকিতে পারে না, পরিবর্তনের সহজ পথ নিজেই সৃষ্টি করিয়া লয়। তেমনি সুপরিবর্তনীয় সংবিধানও বিভিন্ন বিধিনিষেধের দ্বারা ইহার পরিবর্তনশীল চরিত্রকে হারাইয়া ফেলে। অর্থাৎ দুষ্পপরিবর্তনীয় সংবিধান যেমন নমনীয় হইয়া উঠে, ঠিক তেমনি কালক্রমে নমনীয় সংবিধানের ভিতর দুষ্পপরিবর্তনশীল প্রভাব সৃষ্ট হয়। ইহার কারণ, দুষ্পপরির্তনশীল ও সুপরিবর্তনশীল সংবিধানের ভিতর কোন মূলগত প্রভেদ নাই। বস্তুত ইহাদের সমস্ত পার্থক্যই আপেক্ষিক ও পরিমাণগত।

৩॥ সহজ পরিবর্তনীয় ও দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধানের দোষগুণ (Merits and Demerits of Rigid and Flexible Constitutions)

নিম্নে আমরা এই দুই প্রকার শাসনতন্ত্রের দোষগুণ পর্যালোচনা করিতেছি।

(ক) সহজ পরিবর্তনীয় সংবিধানের গুণাগুণ: সহজ পরিবর্তনীয় সংবিধানের সংশোধনের পদ্ধতি সহজ ও সরল বলিয়া এই ধরণের সংবিধান সমাজ, যুগ ও রাষ্ট্রের অবস্থার সঙ্গে সঙ্গতি রাখিয়া সহজেই পরিবর্তিত হইতে পারে। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান সংশোধন প্রণালী দুষ্পরিবর্তনীয় বলিয়া প্রেসিডেন্ট রুশভেল্ট অর্থনীতি মন্দাকে মোকাবিলা করিবার জন্য সংবিধানের প্রয়োজনীয় সংশোধন পাশ করাইতে ব্যর্থ হইয়াছিলেন। সংবিধান সুপরিবর্তনীয় হইলে প্রয়োজনের সঙ্গে তাল রাখিয়া সংবিধান সংশোধন করা খুব কষ্টকর হয় না। দ্বিতীয়ত, জরুরী ও সংকটকালীন অবস্থায় সুপরিবর্তনীয় সংবিধান অনেক বেশী উপযোগী, কারণ প্রয়োজনীয় সংশোধন খুব দ্রুত করা সম্ভবপর। তৃতীয়ত, সুপরিবর্তনীয় সংবিধানের পরিবর্তন সহজেই করা যায় বলিয়া সংবিধানের জটিলতা ও কঠিনতাকে কেন্দ্র করিয়া কোন উত্তেজনা প্রকাশ পায় না এবং জনগণের আন্দোলন প্রশমিত করা সম্ভব। চতুর্থত, সামাজিক পরিবর্তন যে অপ্রতিরোধ্য নহে এই চরম সত্যটিকে সুপরিবর্তনীয় সংবিধান প্রমাণ করে, ফলে এই ধরণের সংবিধানের অস্তিত্ব অনেক অকাম্য ও অপ্রয়োজনীয় ঘটনা হইতে মুক্ত থাকিতে সাহায্য করে।

কিন্তু সুপরিবর্তনীয় সংবিধানের এইসব গুণ থাকা সত্ত্বেও এই সংবিধানকে মূলত অস্থায়ী, ও ক্ষণভঙ্গুর মনে করা হয়। তাই স্বাভাবিকভাবেই এই ধরণের সংবিধান লইয়া রাষ্ট্রের কর্ণধারগণ ও রাজনৈতিক নেতারা যথেচ্ছাচার করিতে পারেন এইরূপ আশঙ্কা করা হয়। সুতরাং স্থিতিশীলতার অভাব সুপরিবর্তনীয় সংবিধানের বিরাট ত্রুটি। দ্বিতীয়ত, সুপরিবর্তনীয় সংবিধানের সমালোচনা করিয়া বলা হয় যে, এই ধরণের সংবিধান জনগণের মৌলিক অধিকার এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের স্বার্থ রক্ষা করিতে অপারগ। এই প্রসঙ্গে তাহারা বলিয়াছেন যে সুপরিবর্তনীয় সংবিধান নিছক সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটে পরিবর্তিত হইতে পারে বলিয়া ইহা সংখ্যালঘুর স্বার্থ রক্ষা করিতে পারে না এবং সেই কারণেই ইহা রাষ্ট্রের প্রতি সংখ্যালঘুর আনুগত্য নষ্ট করিবার প্রবণতা সৃষ্টি

করে।[8] তৃতীয়ত, উপরোক্ত কারণেই এই শাসনতন্ত্র ব্যাপক জনসাধারণের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে পারে না।

(খ) দুষ্পপরিবর্তনীয় সংবিধানের গুণাগুণ :

বস্তুতপক্ষে সুপরিবর্তনীয় সংবিধানের ত্রুটিগুলিই দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধানের গুণ এবং উহার গুণগুলিই দুষ্পপরিবর্তনীয় সংবিধানের ত্রুটি। উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, সুপরিবর্তনীয় সংবিধান অস্থায়ী ও ক্ষণভঙ্গুর বলিয়া ইহার সমালোচনা করা হইয়াছে। এই দৃষ্টিকোণ হইতে বিচার করিলে দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধানকে ত্রুটিযুক্ত বলা যাইতে পারে, কারণ ইহা স্থায়ী ও স্থিতিশীল। সুতরাং স্থায়িত্ব ও স্থিতিশীলতা দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধানের প্রধান গুণ। দ্বিতীয়ত, দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধান অনেক বেশী পরিমাণে নির্দিষ্ট ও অস্পষ্টতামুক্ত। তৃতীয়ত, দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধান দেশের অন্যান্য আইন অপেক্ষা অনেক বেশী পরিমাণে মৌলিক ও মর্যাদাসম্পন্ন বলিয়া ইহা জনসাধারণের অধিকতর শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে। চতুর্থত, কোন ব্যক্তিবিশেষ বা সম্প্রদায়ের ইচ্ছানুযায়ী দুষ্পপরিবর্তনীয় সংবিধান সহজেই সংশোধিত হয় না বলিয়া ইহা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের স্বার্থ এবং জনগণের মৌলিক অধিকার রক্ষার ব্যাপারে অনেক বেশী কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করিতে পারে। পঞ্চমত, যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় কেন্দ্র ও অঙ্গরাজ্যের স্ব স্ব অধিকার রক্ষা করার জন্য সংবিধান দুষ্পরিবর্তনীয় হওয়া বাঞ্ছনীয় এবং সেইদিক হইতে দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধান যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে অপরিহার্য।

ল্যাস্কি বলিয়াছেন, সংবিধানের মধ্য দিয়া যুগের ধ্যান ধারণা প্রতিফলিত হওয়া উচিত।[9] কিন্তু দুষ্পপরিবর্তনীয় সংবিধান সহজে পরিবর্তনীয় নয় বলিয়া ইহা যুগের সঙ্গে সঙ্গতি রাখিয়া পরিবর্তিত হইতে পারে না। ফলে, ইহা প্রয়োজনীয় সংস্কার সাধনের পরিপন্থী। দ্বিতীয়ত, এই কারণেই দুষ্পপরিবর্তনীয় সংবিধানের এই অনড়তা জনগণকে আন্দোলন, গৃহযুদ্ধ ও বিপ্লবের দিকে ঠেলিয়া

৪. "...a constitution which is easily alterable by a numerical popular majority may so theeten or destroy the right of a minority that it provokes the minority to justifiable disobedience...." —Wheare

৯. 'A constitution will always reflect the spirit of the time at which it was made.' —Laski

দেয়।[10] তৃতীয়ত, দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধান বিচার বিভাগের প্রাধান্য সৃষ্টি করে বলিয়া শেষ পর্যন্ত সংবিধান বিচারকদের ব্যাখ্যা ও সিদ্ধান্তের উপর নির্ভরশীল হইয়া পড়ে।[11] প্রসঙ্গত আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রীমকোর্টের ভূমিকা উল্লেখ করা যাইতে পারে।

৪ ॥ **বিভিন্ন রাষ্ট্রের সংবিধানের পরিবর্তনশীলতা**: আমেরিকা, যুক্তরাষ্ট্র, ইংলণ্ড, সোভিয়েত রাশিয়া এবং ভারতবর্ষের সংবিধান কতটা সুপরিবর্তনীয় অথবা দুষ্পরিবর্তনীয় তাহা নিম্নে বিচার করা হইল।

(ক) আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র—আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানকে পৃথিবীর অন্যতম দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধান বলিয়া মনে করা হয়। ইহার কারণ নিয়মতান্ত্রিকভাবে সংবিধান সংশোধন করিবার নিয়মাবলী এখানে খুবই জটিল ও কষ্টকর। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে সংবিধান সংশোধন করিতে হইলে প্রথমে কংগ্রেসের প্রতিটি কক্ষের দুই তৃতীয়াংশ সদস্যের দ্বারা অথবা অন্তর্ভুক্ত অঙ্গ রাজ্যগুলির বিধানমণ্ডলীর এক জাতীয় সভার (national convention) দুই তৃতীয়াংশ সভ্য দ্বারা এই প্রস্তাব পাশ করাইতে হইবে। এই দুইটি পদ্ধতির কোন একটি দ্বারা যদি প্রস্তাব গৃহীত হয় তাহা হইলে উহা রাজ্যগুলির তিন চতুর্থাংশ আইনসভার দ্বারা অথবা রাজ্য সমূহের বিশেষ সভার তিন চতুর্থাংশ ভোটের দ্বারা উহা গৃহীত হইতে হইবে। দুই প্রকারের প্রস্তাব ও দুই প্রকারের দৃঢ়ীকরণের ব্যবস্থার ফলে সংশোধনের চার রকমের পদ্ধতি নিয়মবদ্ধ করা হইয়াছে। সুতরাং নিয়মতান্ত্রিক দিক হইতে সংবিধান সংশোধন করা খুবই দুরূহ। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, এই জটিল পদ্ধতি থাকা সত্ত্বেও সেখানে প্রথাগত বিধি ও বিচারালয়ের সিদ্ধান্তের দ্বারা সংবিধানের অনেক সংশোধন করা হয়। তাই আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানকে যতটা দুষ্পরিবর্তনীয় বলিয়া মনে হয়, বাস্তবক্ষেত্রে ইহা ততটা দুষ্পরিবর্তনীয় নয়।

(খ) ইংলণ্ড—তত্ত্বগত দিক হইতে ব্রিটেনের সংবিধান খুবই সুপরিবর্তনশীল। কারণ, বৃটেনে সংবিধানের কোন অংশ সংশোধন করিতে হইলে সাধারণ আইন যে ভাবে একটি কক্ষে পাশ করাইবার পর অন্য কক্ষে প্রেরণ করা হয় এবং সেখানে গৃহীত হইলে রাজকীয় স্বাক্ষর লাভ করিয়া বলবৎ

---

10. "The great cause of revolutions is that while nations move ownward, constitutions stand still." —Macaulay

11. "We are under a constitution, but the constitution is what the judges say it is." —Chief justice Hughes

হয়, সেইরূপ সহজ পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়। আপাতদৃষ্টিতে তাই ব্রিটেনের সংবিধান নমনীয়। কিন্তু সেই সঙ্গে ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে বাস্তবক্ষেত্রে একান্ত ভাবেই ইহা অতটা নমনীয় নহে। কারণ সেখানে সংবিধান সংশোধনের ক্ষেত্রে জনমত, আইনসভার আলাপ আলোচনা ও বিভিন্ন মতের সংঘাত যেভাবে প্রভাব বিস্তার করে ও জটিলতা সৃষ্টি করে তাহাতে ইহাকে সম্পূর্ণভাবে নমনীয় বা সুপরিবর্তনীয় বলা ঠিক নয়।

(গ) সোভিয়েত ইউনিয়ন—সোভিয়েত ইউনিয়নে সংবিধান দুষ্পরিবর্তনীয় হইলেও আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের মত এতটা নয়। সোভিয়েত ইউনিয়নের সংবিধানকে কেন্দ্রীয় সোভিয়েত বা কেন্দ্রীয় আইনসভার উভয় কক্ষের দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাধিক্যে সংশোধন করা যায়। অধ্যাপক ল্যাস্কির মতে সংবিধান বেশি পরিমাণ সুপরিবর্তনশীল বা দুষ্পরিবর্তনশীল কোনটাই হওয়া উচিত নয়। তাঁহার মতে আইনসভার দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের অনুমোদন সাপেক্ষে সংবিধান সংশোধিত করিবার নিয়ম থাকা উচিত। সুতরাং সোভিয়েত ইউনিয়নের সংবিধানকে সুপরিবর্তনশীল ও দুষ্পরিবর্তনশীলের মাঝামাঝি বলিলেই বোধহয় সঙ্গত হইবে।

(ঘ) ভারতবর্ষ—তত্ত্বগত দিক হইতে ভারতবর্ষের সংবিধানকে দুষ্পরিবর্তনশীল বলা হয়। কিন্তু ইহা পুরাপুরি ঠিক নয়। ভারত ইউনিয়নের সংবিধান সংশোধন পদ্ধতিকে তিনভাগে ভাগ করা যায়। (১) কেন্দ্রীয় আইনসভা বা পার্লামেণ্টের সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিকে কিছু কিছু বিষয় সংশোধন করা যায়। (২) কতকগুলি বিষয় সংশোধন করিতে হইলে কেন্দ্রীয় আইনসভার উপস্থিত ও ভোটদানকারী সদস্যদের দুই-তৃতীয়াংশের স্বীকৃতি প্রয়োজন হয়। (৩) আবার কতকগুলি বিষয় আছে যাহাদের সংশোধন করিবার জন্য দ্বিতীয় পদ্ধতির সহিত কমপক্ষে অর্ধেক অঙ্গরাজ্যের আইনসভার সম্মতি গ্রহণ করিতে হয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে তত্ত্বগত দিক হইতে যাহাই হউক না কেন ভারতীয় ইউনিয়নের সংবিধান বাস্তবপক্ষে সম্পূর্ণভাবে দুষ্পরিবর্তনীয় নহে। ইহার স্থানও সুপরিবর্তনীয়তা ও দুষ্পরিবর্তনীয়তার মধ্যখানে। ইহার প্রমাণ এই ষোল বৎসরের মধ্যে ইতিমধ্যেই ভারতবর্ষের সংবিধান বিশবার সংশোধন করা হইয়াছে।

৫ ॥ শাসনতন্ত্রের বিষয়বস্তু ও গুণ (Contents and Qualities of Constitution)

একটি ভাল বা আদর্শ সংবিধানের বিষয়বস্তু এবং উপাদান কি হইবে এবং ইহার কি কি গুণ থাকিবে সংবিধানের ছাত্র হিসাবে তাহা আমাদের জানা প্রয়োজন। এই বিষয়ে সংবিধান বিশেষজ্ঞগণও একমত হইয়া কোন নির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন নাই। নিম্নে আমরা সংবিধানের বিষয়বস্তু ও গুণ সম্পর্কে আলোচনা করিতেছি।

বিষয় বস্তু : সংবিধানের বিষয়বস্তু কী হইবে তাহা বহুলাংশে নির্ভর করে উহার উদ্দেশ্যের উপর। শাসনতন্ত্র কি কেবলমাত্র সরকারের ক্ষমতার উৎস বলিয়া বিবেচিত হইবে, না ইহা মূলত ব্যক্তিস্বাধীনতার রক্ষা কবচ হিসাবে গৃহীত হইবে—এই বিষয়ে সংবিধান পারদর্শীগণ কোন ঐক্যমত হইতে পারেন নাই। সেইজন্যই বিভিন্ন দেশে সংবিধানের বিষয়বস্তুর পার্থক্য লক্ষ্য করা যায় এবং আদর্শ সংবিধানের বিষয়বস্তু হিসাবে কিছু এখনও বিশেষজ্ঞ দ্বারা স্থিরীকৃত হয় নাই। কেহ কেহ মনে করেন যে, রাষ্ট্রের ক্ষমতা ও ব্যক্তি-স্বাধীনতার মধ্যে সমন্বয় সাধন করিয়া ব্যক্তিত্বের পূর্ণ অভিব্যক্তির পথ সুগম করাই সংবিধানের মূল উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্যের পরিপ্রেক্ষিতে আমরা সংবিধানের বিষয়বস্তুর আলোচনা করিতেছি।

প্রথমত, সংবিধানের প্রারম্ভেই একটি প্রস্তাবনা (Preamble) থাকা উচিত, যাহার ভিতর দিয়া সংবিধানের মূল উদ্দেশ্য (spirit) সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত হইবে। এইরূপ প্রস্তাবনা থাকিলে সংবিধানের যে সমস্ত ধারা যথেষ্ট পরিমাণে সুস্পষ্ট নয়, উহাদের প্রস্তাবনার উদ্দেশ্যের পরিপ্রেক্ষিতে ব্যাখ্যা করা সম্ভব হয়।

দ্বিতীয়ত, শাসনকার্য পরিচালনা করিবার জন্য যে শাসকমণ্ডলী থাকিবে উহাদের নির্বাচন পদ্ধতি ও ক্ষমতা বিস্তারিতভাবে সংবিধানে লিপিবদ্ধ থাকা উচিত, যাহাতে ক্ষমতার অপপ্রয়োগ ঘটিতে না পাবে। সংবিধান যেমন একদিকে সরকারের ক্ষমতা স্থির করিবে, তেমনি অপরপক্ষে সরকার কি কি করিবার অধিকারী নয় তাহাও নির্দেশ করিয়া সরকারের কার্যের সীমারেখা নির্ধারণ করা সংবিধানের কর্তব্য।

তৃতীয়ত, ঠিক তেমনি ভাল সংবিধানে আইনবিভাগ ও বিচার বিভাগীয় সদস্যদের নির্বাচন বা মনোনয়ন পদ্ধতি এবং উহাদের ক্ষমতা ও এক্তিয়ার সুনির্দিষ্টভাবে বিধিবদ্ধ থাকা উচিত।

চতুর্থত, সরকারের কার্য সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করিবার জন্য সরকারের বিভিন্ন বিভাগের পারস্পরিক সম্পর্ক ও নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি উত্তম সংবিধানের স্থির করা একান্ত কাম্য। এইরূপ হইলে বিভিন্ন ক্ষমতা পরস্পরের বিরোধী হইয়া বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির পরিবর্তে নিয়ন্ত্রিত থাকিয়া সুষ্ঠু শাসন পরিচালনায় সাহায্য করে।

পঞ্চমত, যেহেতু সংবিধানকে ব্যক্তিস্বাধীনতার উৎস ও রক্ষাকবচ মনে করা হয় সেইজন্য সমাজ জীবনে নাগরিকগণ পারস্পরিক ক্ষেত্রে এবং সরকারের সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে কি পরিমাণ অধিকার ভোগ করিতে পারে তাহা সংবিধানে লিপিবদ্ধ করা ও বিচারালয় কর্তৃক সুরক্ষিত হওয়া প্রয়োজন। হুইয়ার প্রভৃতি লেখকগণ অবশ্য জনগণের অধিকারকে সংবিধানে লিপিবদ্ধ করিবার বিরোধী। তাঁহারা বলেন যে আদর্শ আইন যদিও অধিকারের সংজ্ঞা নির্দেশ করিবে এবং ইহা সংরক্ষণের দায়িত্ব গ্রহণ করিবে কিন্তু আদর্শ সংবিধান অধিকারকে লিপিবদ্ধ করিবে না।[12]

ষষ্ঠত, সরকারী কার্য, সরকারী হিসাব পরীক্ষা, নির্বাচন পরিচালনা প্রভৃতি কার্যের জন্য লোক নিয়োগ এবং এই সংক্রান্ত বিধি নিষেধ আদর্শ সংবিধানে নির্দেশ করিবার প্রয়োজনীয়তা আছে।

সপ্তমত, নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে সংবিধান পরিবর্তন করিবার অধিকারী কে এবং কি উপায়ে ইহার পরিবর্তন হইবে তাহা সুস্পষ্টভাবে নির্দেশ করা হইয়া থাকে।

উত্তম সংবিধানের গুণ: একটি আদর্শ বা উত্তম সংবিধানের যে সমস্ত গুণাবলী থাকা প্রয়োজনীয় তাহা নিম্নে আলোচনা করা হইল।

১। লিখিত বা অলিখিতই হউক সংবিধানের সর্বপ্রধান গুণ হইতেছে ইহার সুস্পষ্টতা। সুস্পষ্টতা বলিতে বক্তব্যের নির্দিষ্টতা, ভাষার স্পষ্টতা ও ব্যাখ্যার প্রাঞ্জলতা বোঝান হয়। সংবিধান এইরূপ হইলে ইহার বিষয়বস্তুর অর্থ লইয়া মতান্তর ঘটিবার সুযোগ কম থাকে। সংবিধানে এমন কোন কথা বলা ঠিক নয় যাহার দুই বা ততোধিক অর্থ করা সম্ভব। উদাহরণ হিসাবে বলা যাইতে পারে যে যদিও আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানকে অনেকে আদর্শস্থানীয় বলিয়া মনে করেন, কিন্তু সেখানেও দেখা যাইবে যে সুস্পষ্টতার অভাবে একই

12. "The ideal constitution...would contain a few or no declaration of rights, though the ideal system of law would define and guarantee many rights," —Wheare

শব্দের এক এক প্রকার ব্যাখ্যা সেখানকার সুপ্রিম কোর্ট বিভিন্ন সময়ে করিয়াছে। সুতরাং যথাসম্ভব সুপষ্ট করিয়া সংবিধান রচনা করা প্রয়োজন।

২। সংবিধানকে অতিরিক্ত ব্যাপক করা উচিত নয়। অপ্রয়োজনীয় খুঁটি-নাটি বিষয়বস্তুগুলি যদি সংবিধানে লিপিবদ্ধ করা হয় তবে ইহা বৃহদায়তন হইতে বাধ্য। সেইজন্য সংবিধানের মধ্যে মাত্র মৌলিক বিষয়গুলির সংক্ষিপ্ত নির্দেশ থাকা উচিত—কোন বিষয়ের ব্যাপক ও পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা দিবার প্রয়োজন নাই। এই দিক হইতে বিচার করিলে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান আদর্শ। ভারতবর্ষের সংবিধান অতিরিক্ত ব্যাপক। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানে মাত্র ৭টি ধারা আছে; আর ভারতবর্ষের সংবিধানে ৩৯৫টি ধারা ও আটটি পরিশিষ্ট আছে। সংবিধান ব্যাপক হইলে ইহা অনাবশ্যকভাবে জটিল হইয়া পড়ে। তাই হুইয়ার বলিয়াছেন যে সংক্ষিপ্ততা আদর্শ সংবিধানের অপরিহার্য গুণ।[13] অবশ্য যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান স্বাভাবিক কারণেই একটু বৃহৎ হইতে বাধ্য।

৩। অতিরিক্ত সুপরিবর্তনীয় বা দুষ্পরিবর্তনীয় না হইয়া সংবিধানের মধ্যপন্থা অবলম্বন করা উচিৎ বলিয়া ল্যাস্কি প্রমুখ অনেকে মনে করেন। কারণ, সংবিধান একান্তভাবে নমনীয় হইলে উহার স্থায়িত্ব ও অস্তিত্ব সম্পর্কে সন্দেহ জাগে। আবার বেশি দুষ্পরিবর্তনীয় হইলে পরিবর্তিত অবস্থার সাথে ইহা সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে পারে না। তাই ব্রাইস বলিয়াছেন যে সংকটকালে প্রয়োজনের সাথে সঙ্গতি রাখিয়া অথচ মুল কাঠামোকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়া যেন সংবিধানকে পরিবর্তন করা যায়। সংবিধান যদি নমনীয়তা এবং অনমনীয়তার মধ্যপন্থা অবলম্বন করে তবেই ইহা সম্ভব।

৪। অনেকের মতে উত্তম সংবিধান লিখিত হওয়া প্রয়োজন। কারণ, অলিখিত সংবিধান অনেক বেশি অস্পষ্ট বলিয়া অনেকে মনে করেন। শতাব্দীর পর শতাব্দী যে সংবিধান বিবর্তন ও পরিবর্তনের ভিতর দিয়া অগ্রসর হইয়াছে এবং বিভিন্ন প্রথা ও রীতিনীতির জন্ম দিয়াছে তাহা অলিখিত হইলেও চলিতে পারে বটে; কিন্তু নতুন অবস্থায় সংবিধান লিখিত হওয়া প্রয়োজন।

৫। জনসাধারণের মৌলিক অধিকারগুলিকে সংবিধানে লিপিবদ্ধ করার উপর অনেকে গুরুত্ব দিয়া থাকেন। যেহেতু সংবিধান ব্যক্তি স্বাধীনতার

13. "The essential characteristic of the ideally best from of constitution is that it should be as short as possible." —Wheare

রক্ষাকবচ, সেইজন্য ইহা সংবিধানের অন্তর্ভূ‍ক্ত হওয়া প্রয়োজন। তাহা ছাড়া শাসনতান্ত্রিক আইনে মৌলিক অধিকারগুলি লিপিবদ্ধ থাকিলে, সেইগুলি লংঘন করা কষ্টকর হয় এবং উহাদের বজায় রাখিবার সংগ্রামে আইনসম্মত পন্থাও জনগণের সম্মুখে উন্মুক্ত থাকে। তবে মৌলিক অধিকার সংবিধানে লিপিবদ্ধ করা ঠিক কি না সেই বিষয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ আছে। ল্যাস্কি মনে করেন মৌলিক অধিকার লিপিবদ্ধ থাকা উচিৎ, কিন্তু হুইয়ার ইহাকে অন্তর্ভূ‍ক্ত করার পক্ষপাতী নন।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

সরকারের বিভিন্ন বিভাগ

(Organs of Government)

রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ও কার্যাবলী সুস্পষ্টভাবে তিন ভাগে বিভক্ত। ইহারা হইল আইন বিভাগ, শাসন বিভাগ ও বিচার বিভাগ। প্রথমত, আইন রচনা ও ঘোষণা করিবার দায়িত্ব হইল আইন বিভাগের। দ্বিতীয়ত, রাষ্ট্রের শাসন ও শৃঙ্খলা রক্ষা করিবার জন্য সেই আইন যথাযথভাবে পালিত হইতেছে কিনা তাহা দেখিবার দায়িত্ব শাসন বিভাগের। তৃতীয়ত, আইন বিভাগ কর্তৃক ঘোষিত আইনানুসারে পক্ষপাতশূন্য বিচার করিয়া অপরাধীকে দণ্ড দেওয়ার দায়িত্ব হইল বিচার বিভাগের। এই তিনটি প্রাথমিক ও মৌলিক কর্তব্য যথাযথভাবে সম্পন্ন না হইলে রাষ্ট্রের কার্য্য সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হইতে পারে না।

১॥ আইন বিভাগ ও ইহার কার্যাবলী (The Legislature and its functions)

পূর্বেই বলিয়াছি আইনসভা আইন রচনা করে, ইহা রাষ্ট্রের ইচ্ছাকে আইনের মধ্য দিয়া প্রকাশ করে। আইন বিভাগ মূলত আইন রচনা করে বটে, কিন্তু নিছক আইন প্রণয়ণের মধ্য দিয়া আইন বিভাগের কার্য্য শেষ হইয়া যায় না। বর্তমানে গণতান্ত্রিক চেতনার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে আইন বিভাগের কার্য্য ও দায়িত্বের ব্যাপক সম্প্রসারণ ঘটিয়াছে এবং বস্তুত বাস্তবে বেশির ভাগ রাষ্ট্রেই আইন বিভাগ সমগ্র শাসন ব্যাপারের নিয়ামক হইয়া উঠিয়াছে। গণতান্ত্রিক চেতনার যত দিন প্রসার ঘটে নাই তত দিন আইন সভার জনপ্রতিনিধিত্বমূলক চরিত্রটি ছিল অস্পষ্ট এবং গৌণ, ফলে সেই যুগে আইনসভা বিশেষ কোন ভূমিকা বা মর্যাদার অধিকারী ছিল না। উদাহরণ হিসাবে জারের আমলে রাশিয়ার আইন সভার উল্লেখ করা যাইতে পারে। আবার একনায়কতন্ত্রেও আইনসভা নিয়ামকের ভূমিকা পালন করিতে পারে না, কারণ একনায়কেরা আইনসভাকে উপেক্ষা করিয়া নিজেদের ক্ষমতা ও মর্য্যাদা প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন। এ ব্যাপারে হিটলার ও মুসোলিনীর নাম উল্লেখ করা যায়। তাঁহারা জনগণের ইচ্ছা ও পছন্দ অনুযায়ী আইন সভার অস্তিত্ব রাখিয়াছিলেন বটে,

কিন্তু ইহাকে ক্রিড়ানক হিসাবে ব্যবহার করিয়াছিলেন।[1] কিন্তু সাধারণ ভাবে বলা যাইতে পারে, প্রতিটি রাষ্ট্রের শাসনতান্ত্রিক ব্যাপারে আইনসভা শুধু মাত্র শাসন ও বিচার বিভাগ হইতে ক্ষমতা, মর্য্যাদা ও প্রতিপত্তিতেই বড় নয়, বস্তুত আইনসভা শাসনতান্ত্রিক ব্যাপারের মধ্যমণিতে পরিণত হইয়াছে।

সরকারের তিনটি বিভাগকে স্ব স্ব ক্ষমতার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখিবার যে কথা ক্ষমতা পৃথকীকরণনীতিতে বলা হইয়াছে, তাহা পৃথিবীর কোন রাষ্ট্রের সংবিধানেই স্থান পায় নাই। ফলে আইন বিভাগের ক্ষমতাকে প্রসারিত করা এবং কোন কোন ক্ষেত্রে আইন বিভাগ কর্তৃক শাসন ও বিচার বিভাগের ক্ষমতা আত্মসাৎ করা বিশেষ কোন বাধার সম্মুখীন হয় নাই। বরং, আইনসভা জন প্রতিনিধিত্ব-মূলক প্রতিষ্ঠান, সুতরাং শাসনতান্ত্রিক ব্যাপারে ইহারই মুখ্য ভূমিকা থাকিবে—এই যুক্তি গণতান্ত্রিক ধারণার সঙ্গে সামঞ্জস্য পুর্ণ বলিয়া ব্যাপকভাবে স্বীকৃত হইয়াছে।

রাষ্ট্রপতি পরিচালিত সরকারে (Presidential form of Government) আইনসভার ক্রিয়াকর্মকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া ইহার ক্ষমতাকে সীমিত রাখার কিছু কিছু সম্ভাবনা আছে। কিন্তু আইনসভা বা মন্ত্রিসভা পরিচালিত সরকারে (Cabinet from of Government) আইনসভার ক্ষমতাকে নিয়ন্ত্রিত করা প্রায় অসম্ভব। কারণ, এইরূপ শাসনব্যবস্থায় আইনসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের দ্বারা শাসন বিভাগ গঠিত হয়, শাসন বিভাগ তাহার সমস্ত কাজের জন্য আইনসভার নিকট দায়িত্বশীল থাকে এবং আইনসভার আস্থা লাভ করিয়া শাসন বিভাগকে চলিতে হয়। ফলে শেষ পর্যন্ত আইন বিভাগ ও শাসন বিভাগের মধ্যকার পার্থক্য বিলুপ্ত হয়। এইরূপ শাসন ব্যবস্থায় আইন বিভাগ শুধুমাত্র শাসন বিভাগকেই নিয়ন্ত্রণ করে না, বিচার বিভাগ এবং বিচারকদের পর্যন্ত আইন বিভাগের মুখাপেক্ষী থাকিতে হয়।

উপরোক্ত আলোচনার মধ্য দিয়া আমরা শাসনতান্ত্রিক ক্ষেত্রে আইন বিভাগের গুরুত্ব উপস্থিত করার চেষ্টা করিয়াছি। এইবার আইন সভার কার্য্যাবলী আলোচনা করিলে আইন সভার ক্ষমতার ব্যাপকতা আরও পরিষ্কার হইবে।

১। **আইন প্রণয়ন**—আইন প্রণয়নই আইন সভার প্রধান কাজ। সংবিধানগত সীমারেখা মানিয়া জনগণের ইচ্ছা ও রাষ্ট্রের প্রয়োজনের সঙ্গে

1. "Parliament is a play thing, but a play thing that people like to have,'. —Mussolini

সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া আইন প্রণয়ন করে আইনসভা। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, আইনসভা আইন প্রণয়ন করে বটে কিন্তু শাসনতান্ত্রিক প্রধানের সম্মতি না পাওয়া পর্যন্ত ইহা আইনের মর্যাদা লাভ করিতে পারে না।

২। **অর্থ সংক্রান্ত কার্য**—আইনসভা সরকারের আয়, ব্যয় ও টাকা পয়সার রক্ষক ও নিয়ন্ত্রক। জনপ্রতিনিধির সম্মতি ব্যতীত কর ধার্য নহে (No taxation without representation)—গণতন্ত্রের এই স্বীকৃত নীতি আইন সভাকে অর্থ নৈতিক ক্ষমতার নিয়ামক করিয়াছে। আইনসভা কর ধার্য, সরকারী ব্যয় বরাদ্দ, অর্থ নৈতিক যোজনার রূপদান, সরকারী ঋণ গ্রহণের সিদ্ধান্ত, বাজেট পাশ প্রভৃতি যাবতীয় অর্থ নৈতিক কার্য সম্পন্ন করে। যুদ্ধের সঙ্গে প্রচুর অর্থ ব্যয় জড়িত বলিয়া আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে যুদ্ধ ঘোষণার পূর্বে আইনসভার সম্মতি লওয়া বাধ্যতামূলক।

৩। **শাসন সংক্রান্ত কার্য**—শাসন সংক্রান্ত কার্যের জন্য শাসন বিভাগ দায়িত্ববদ্ধ হইলেও এই ব্যাপারে আইন বিভাগের বিভিন্ন কার্য সম্পাদন করিতে হয়। রাষ্ট্রপতি পরিচালিত শাসন ব্যবস্থায় রাষ্ট্রপতির সুপারিশ অনুযায়ী আইনসভা উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারীদের, বৈদেশিক দূতদের এবং মন্ত্রীসভার সদস্যদের নিয়োগ করে। প্রেসিডেণ্ট কর্তৃক সম্পাদিত চুক্তিকে আইনসভা অনুমোদন করে। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের আইন সভার দ্বিতীয় কক্ষ সিনেট উপরোক্ত শাসন বিভাগের ক্ষমতাগুলি ভোগ করে।

আইনসভা বা মন্ত্রীসভা পরিচালিত সরকারের অধীনে যদিও আইনসভা প্রত্যক্ষভাবে কোন শাসন সংক্রান্ত কার্যে অংশ গ্রহণ করে না, কিন্তু শাসন বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ করে আইনসভা। বস্তুত আইন সভার নিকট শাসন বিভাগ দায়িত্বশীল থাকে। যেখানেই গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা প্রচলিত সেখানেই আইনসভা বিভিন্ন ক্ষমতার অধিকারী হইয়া উঠিয়াছে।

৪। **বিচার সংক্রান্ত কার্য**—কোন কোন দেশে আইনসভা বিচার বিভাগীয় কার্য সম্পাদন করিয়া থাকে। ইংলণ্ডের আইন সভার দ্বিতীয় কক্ষ লর্ড সভা সর্বোচ্চ অপীল আদালত হিসাবে অভিহিত হইয়া থাকে। আমেরিকার আইন সভার দ্বিতীয় কক্ষ সিনেট রাষ্ট্রপতি ও উপরাষ্ট্রপতি প্রভৃতি বিচার করিয়া থাকে। ভারতবর্ষের আইনসভাও রাষ্ট্রপতির বিচার করিতে পারে এবং এই সময় আইনসভা বিচারালয় হিসাব কাজ করে।

৫। **অন্যান্য ক্ষমতা**—বিভিন্ন দেশের আইনসভা সংবিধান সংশোধনের একক অধিকারী। কোন কোন দেশের আইনসভা মুখ্য শাসক ও সর্বোচ্চ বিচরালয়ের বিচারকদের নিযুক্ত করে। ভারতবর্ষতেই আইন বিভাগের সদস্যগণ রাষ্ট্রপতিকে নির্বাচন করে। সুইজারল্যাণ্ডে যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভা যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালতের বিচারকদের নির্বাচন করে।

২॥ দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা (Bi-cameralism)

আধুনিক কালে বিভিন্ন রাষ্ট্রের আইনসভা বিশেষ করিয়া যুক্তরাষ্ট্রীয় আইন-সভাগুলি দুইটি কক্ষে (chamber) বিভক্ত। ইহার মধ্যে একটি কক্ষের সদস্যরা সাধারণত জনগণের দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত হইয়া থাকে এবং ইহাকে প্রথম কক্ষ বা নিম্ন কক্ষ নামে অভিহিত করা হয়। দ্বিতীয় বা উচ্চকক্ষের গঠন বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন নীতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে। তবে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই দ্বিতীয় কক্ষ অপ্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত ও মনোনীত সদস্যদ্বারা গঠিত হইয়া থাকে। এক কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভাকে একপরিষদীয় বিধানমণ্ডলী (Unicameral Legislature) এবং দুই কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভাকে দ্বিপরিষদীয় বিধানমণ্ডলী (Bi-cameral Legislature) নামে অভিহিত করা হয়। নিউজিল্যাণ্ড, যুগোশ্লাভাকিয়া প্রভৃতি রাষ্ট্রে একপরিষদীয় আইনসভা এবং ভারতবর্ষ আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েত রাশিয়া, ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে দ্বিপরিষদীয় আইনসভা রহিয়াছে।

দ্বিপরিষদীয় বিধানমণ্ডীর যৌক্তিকতা ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে রাষ্ট্র-বিজ্ঞানিগণ দ্বিধাবিভক্ত। অর্থাৎ আইনসভার দ্বিতীয় কক্ষ থাকা উচিত কিনা সেই বিষয়ে কোন ঐক্যমত সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠিত না হইবার জন্য ইহা একটি বিতর্কিত বিষয় হিসাবে দেখা দিয়াছে। দ্বিপরিষদীয় আইনসভার পক্ষে যে সমস্ত যুক্তি উপস্থিত করা হইয়াছে তাহা নিম্নে আলোচনা করা হইল।

স্বপক্ষে বক্তব্য : আইনসভার একটিমাত্র কক্ষ থাকিলে ইহা সর্বদা সুচিন্তিত ও যুক্তিসঙ্গত আইন প্রণয়ন করিতে পারে না, বরং মাঝে মাঝে অসাবধানতা ও উত্তেজনার বশবর্তী হইয়া অসঙ্গত, অবিচেনাপ্রসূত ও হটকারী আইন রচনা করে। এক পরিষদীয় ব্যবস্থায় ঐরূপ অবিবেচনাপ্রসূত আইনকে বাধা দেওয়া বা নিয়ন্ত্রণ ও সংশোধন করিবার মত কোন পরিষদ

থাকে না। কিন্তু দ্বিপরিষদীয় আইনসভা থাকিলে এইরূপ অসঙ্গত কর্মপ্রচেষ্টাকে সংযত করা যাইতে পারে।

এক পরিষদীয় শাসন ব্যবস্থায় একটিমাত্র কক্ষের অত্যাচার ও স্বেচ্ছাচারিতা হইতে জনসাধারণের অধিকার ও ব্যক্তিস্বাধীনতা রক্ষার জন্য দ্বিতীয় কক্ষের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রহিয়াছে। লর্ড ব্রাইস (Lord Bryce) বলিয়াছেন: এক কক্ষের ঘৃণ্য, অত্যাচারী ও দুর্নীতিপরায়ণ হইয়া উঠিবার যে সম্ভাবনা রহিয়াছে তাহা রোধের প্রয়োজনীয়তা হইতেই দ্বিতীয় কক্ষের উদ্ভব ঘটিয়াছে, যাহাতে সমক্ষমতাসম্পন্ন অপর একটি কক্ষের সহ-অবস্থানের মাধ্যমে ইহার গতি রোধ করা যায়।[2] সুতরাং দ্বি-পরিষদীয় ব্যবস্থায় দুইটি আইনসভা পারস্পরিক ভারসাম্য রক্ষা করিয়া এক অপরের স্বেচ্ছাচারিতা রোধ করিতে পারে।

রুশো জনগণের প্রকৃত ইচ্ছাকে আইনসভায় প্রতিফলিত করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু আইনসভা এক কক্ষবিশিষ্ট হইলে জনগণের বিভিন্ন ইচ্ছা ও স্বার্থ প্রতিফলিত হইবার বিশেষ কোন সুযোগ সুবিধা থাকে না। দ্বিতীয় কক্ষ থাকিলে বিশেষ ধরণের স্বার্থ ও বিভিন্ন শ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব আইনসভায় প্রতিফলিত হইতে পারে। সুতরাং জনগণের বিভিন্ন চিন্তা, স্বার্থ ও ইচ্ছাকে প্রতিফলিত করিতে হইলে দ্বিতীয় কক্ষের অবস্থিতি অপরিহার্য।

দ্বিপরিষদীয় আইনসভা থাকিলে স্বাভাবিকভাবেই আইন পাশ করিতে কিছুটা বিলম্ব ঘটে। এই বিলম্ব ও কালহরণের ফলে সদস্যদের সাময়িক উত্তেজনা ও সংকীর্ণতা কমিয়া যায়, সুস্থ পরিবেশে বিস্তৃত আলোচনার ফলে ইহার ত্রুটি-বিচ্যুতি ধরা পড়ে এবং সুষ্ঠু, উন্নত ও যুক্তিপূর্ণ আইন প্রণয়ন করা সহজতর হয়।

জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্রে আইনসভার কার্যকলাপ ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পাওয়ায় একটি কক্ষের পক্ষে উহা সুচারুরূপে পালনকরা সম্ভব নয়। তাই দ্বিতীয় কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা থাকিলে প্রথম কক্ষের অহেতুক কার্যভার বহুল পরিমাণে লাঘব করিয়া আইনসভার কার্যকলাপ সুষ্ঠ ও সুন্দরভাবে পরিচালনা করা যায়।

2. "The necessity of two chambers is based on the belief that the innate tendency of an assembly to become hateful, tyrannical and corrupt, needs to be checked by the co-existence of another house of equal authority."

—Lord Bryce

আইনসভা এক কক্ষ বিশিষ্ট হইলে উহার সদস্যরা জনসাধারণের দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত হইয়া থাকেন। অনেক সময় লক্ষ্য করা যায় যে প্রতিভাশালী, জ্ঞানী, গুণী, শিল্পী সাহিত্যিক এবং রাষ্ট্রীয় কাজ-কর্মে অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক থাকেন না অথবা জয়লাভ করিতে পারেন না। ইহার ফলে আইনসভা বিভিন্ন ব্যাপারে অভিজ্ঞতা ও বিচক্ষণতার সঙ্গে কাজ করিতে পারে না। কিন্তু আইনসভা দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট হইলে দেশের জ্ঞানী. গুণী. শিল্পী. সাহিত্যিক, বিদ্যানুরাগী; প্রতিভাশালী প্রভৃতি ব্যক্তিগণ দ্বিতীয় কক্ষের সভ্য মনোনীত হইয়া থাকেন বলিয়া আইন-সভার দক্ষতা অনেক পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সিনেট ইহার একটি চাক্ষুষ প্রমাণ।

এই সমস্ত যুক্তি ছাড়াও যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় অন্যান্য কারণে দ্বিপরিষদীয় বিধানমণ্ডলীর বিশেষ প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। যুক্তরাষ্ট্র যে সমস্ত অঙ্গ রাষ্ট্র লইয়া গঠিত হয়, দ্বিতীয় কক্ষ সেই সমস্ত অঙ্গরাষ্ট্রের সমপরিমাণ প্রতিনিধিত্বের সুযোগ দিয়া তাহাদের প্রত্যেকের স্বার্থ সংরক্ষণের ব্যবস্থা করিয়া থাকে। সুতরাং জাতীয় স্বার্থ এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় স্বার্থের যুগপৎ রক্ষা ও প্রতিপালনের জন্য দ্বিপরিষদীয় আইনসভার বিশেষ ভূমিকা রহিয়াছে।

বিপক্ষে বক্তব্য : এক কক্ষবিশিষ্ট আইনসভার প্রতিনিধিবর্গ জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটের দ্বারা নির্ধারিত হন বলিয়া এইরূপ ব্যবস্থায় জনমত প্রতিফলিত ও প্রাধান্য বিস্তার করিতে পারে। কিন্তু দ্বিপরিষদীয় আইনসভার দ্বিতীয় কক্ষ যেভাবে গঠিত হয় তাহাতে উহাকে জনমতের প্রতিফলন বা গণ-তান্ত্রিক পদ্ধতির প্রয়োগ বলা যায় না।

দ্বিতীয় কক্ষের সদস্যগণ নির্বাচিত নয় বলিয়া বেশিরভাগ ক্ষেত্রে (যেমন ইংলণ্ডে) প্রাচীনপন্থী, রক্ষণশীল, সম্পদশালী এবং প্রতিক্রিয়াপন্থীগণ দ্বিতীয় কক্ষের সদস্যপদ লাভ করেন। পরিবর্তনশীল জীবন ও যুগের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখিতে না পারার জন্য প্রগতিশীল ও যুগোপযোগী আইন কানুন প্রণয়ন ও ইহার প্রয়োগের ক্ষেত্রে তাঁহারা বাধা সৃষ্টি করেন। তাই ল্যাস্কির মতে এক পরিষদীয় আইন সভাকে নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য দ্বিপরিষদীয় ব্যবস্থা

গ্রহণ না করিয়া বরং ইহা নিয়ন্ত্রণের ভার নির্বাচকমণ্ডলী ও শাসকমণ্ডলীর উপর দেওয়া বাঞ্ছনীয়।[8]

এক কক্ষবিশিষ্ট আইনসভার অসঙ্গতি, অবিবেচনা এবং হটকারিতা বন্ধ করিয়া কালহরণের ভিতর দিয়া যুক্তিপূর্ণ এবং সুচিন্তিত আইন প্রণয়নের জন্য দ্বিপরিষদীয় আইনসভার যে প্রয়োজনের কথা বলা হইয়া থাকে, তাহা যথেষ্ট শক্তিশালী নয়। কারণ, আধুনিক যুগে কোন আইনই সহসা এবং আকস্মিকভাবে রচনা করা হয় না। একটি আইন গৃহীত হইবার পূর্বে সংবাদ পত্র, সভাসমিতি এবং রাজনৈতিক দলগুলির পক্ষ হইতে ইহাকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ হইতে আলোচনা করিয়া ইহার ত্রুটি বিচ্যুতি দেখান হয়। সুতরাং আধুনিক যুগে কোন আইনের প্রকৃত তাৎপর্য বুঝিবার জন্য দ্বিতীয় কক্ষের অহেতুক কাল-হরণের প্রয়োজন নাই। দ্বিতীয় কক্ষ কোন আইনের উপর নতুন আলোকপাত করিতে সমর্থ হয় না। সুতরাং দ্বিতীয়কক্ষ এ ব্যাপারে কোন উপকার না করিয়া বরং আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে অনাবশ্যক বিলম্ব ঘটায়।

ইহা ছাড়াও, বর্তমান যুগে বেশির ভাগ রাষ্ট্রেই দলীয় শাসন পদ্ধতি প্রবর্তনের ফলে আইনসভার দুইটি কক্ষের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যগণই একই দলীয় নীতির দ্বারা পরিচালিত হয়। সুতরাং প্রথম কক্ষ কর্তৃক প্রণীত কোন আইনকে দ্বিতীয় কক্ষের সেই দলীয় সদস্যগণ বিরোধিতা করিবে এইরূপ আশা করা বৃথা। কারণ, দ্বিতীয় কক্ষের সদস্যগণও দলীয় নির্দেশ অনুযায়ী ভোট দিয়া থাকেন। অর্থাৎ, এককক্ষের স্বেচ্ছাচারিতা ও অন্যায়কে বন্ধ করিবার জন্য যে দ্বিপরিষদীয় আইনসভার কথা বলা হইয়াছে, উহা দলীয় শাসনব্যবস্থায় কার্যকরী হইতে পারে না।

বলা হইয়া থাকে যে, দেশের জ্ঞানী, গুণী ও বিশেষজ্ঞগণের জন্য দ্বিতীয় কক্ষের প্রচলন থাকা উচিত। কিন্তু এই সমস্ত গুণবানব্যক্তিদের দ্বিতীয় কক্ষে স্থান করিবার মত কোন নিশ্চিত পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয় নাই। বরং অভিজ্ঞতায় দেখা যায় যে শাসকমণ্ডলীর আস্থাবান অভিজাত, বিত্তবান ও সমাজে উচ্চপদস্থ ব্যক্তিগণের জন্যই বিভিন্ন দেশে দ্বিতীয় কক্ষের সৃষ্টি।

দ্বিপরিষদীয় বিধানমণ্ডলী বিশেষভাবে ব্যয়বহুল বলিয়া অনেকে ইহার বিরোধিতা করেন।

8. It is better, therefore, to have directly single—chamber goverment, and to throw the burden of control upon the electorate which chooses the chamber, and the executive which directs its activities. —Laski

আইনসভার দুইটি কক্ষ থাকিলে দায়িত্ব বিভাগ ও কর্মবণ্টন বিষয়ে মতভেদ দেখা দিবার সম্ভাবনা আছে। এইরূপ হইলে ইহারা পরস্পর পরস্পরের উপর দোষ চাপাইয়া নিজেরা দায়িত্বমুক্ত করিবার চেষ্টা করিবে। দুই কক্ষের দ্বন্দ্ব তীব্র আকার ধারণ করিলে সামগ্রিকভাবে আইনবিভাগ তাহার কার্যকারিতা হারাইবে।

আইনসভার দুইটি কক্ষ থাকিলে এক নয় কক্ষ দুইটি একমত হইবে অথবা ইহারা পরস্পরের বিরোধিতা করিবে। আবিসিয়ে (Abbe´s Sie´ye´s) বলিয়াছেন যে, দ্বিতীয় কক্ষ যদি প্রথম কক্ষের বিরোধিতা করে তবে উহা অনিষ্টকর এবং যদি উহার সহিত একমত হয় তাহা হইলে নিরর্থক।[4] এই বক্তব্যকে প্রায় একই ভাষায় ল্যাস্কিও সমর্থন করিয়াছেন।[5] বেন্থাম (Bentham) হিতবাদের দৃষ্টিকোণ হইতে বলিয়াছেন যে প্রত্যেকটি প্রাপ্ত-বয়স্কের ভোট লইয়া গঠিত আইনসভার একটি কক্ষই যথেষ্ট। প্রথম কক্ষ জনসাধারণের সাধারণ স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করে, সুতরাং দ্বিতীয় কক্ষ যদি তাহাই করিতে যায় তবে উহা নিরর্থক ও আর যদি বিশেষ কোন স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করে তবে উহা অন্যায়। সুতরাং তাঁহার মতে দ্বিতীয় কক্ষ অপ্রয়োজনীয়, নিরর্থক বা উহা হইতেও নিকৃষ্ট (needless, useless and worse than useless)।

অনেকে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনেও দ্বিপরিষদীয় আইনসভার অপরিহার্যতা স্বীকার করে না। তাহাদের মতে রাজনৈতিক দলীয় ব্যবস্থা প্রবর্তনের ফলে যুক্তরাষ্ট্রীয় অঙ্গরাজ্যগুলির বিশেষ প্রতিনিধিত্বের যৌক্তিকতা ও প্রয়োজনীয়তা বহুলাংশে লোপ পাইয়াছে। বর্তমান যুগে উচ্চ কক্ষের সদস্যগণ নিজ নিজ অঙ্গরাজ্যের নির্দেশ অনুযায়ী ভোট দেয় না—তাহারা নিজেদের দলীয় সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ভোট দেয়। ইহা ছাড়াও লক্ষ্য করা গিয়াছে যে, অঙ্গরাজ্যগুলির অধিকার উচ্চকক্ষ রক্ষা করে না। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই শাসনতান্ত্রিক বিধি-নিষেধ ও জনমত এই বিশেষ অধিকারগুলি রক্ষা করিয়া থাকে।

উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা সিদ্ধান্ত করিতে পারি যে দ্বিপরিষদীয় আইনসভার প্রয়োজনীয়তা যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় সামান্য

4. "If a second chamber dissents from the first, it is mischievous ; if it agrees with it, it is superfluous." —Abbe´s Sie´ye´s

5. "Broadly speaking, any second chamber which agrees with the first is superfluous, and if it disagrees, it is bound to be obnoxious." —Laski

পরিমাণ থাকিলেও থাকিতে পারে, কিন্তু অন্যান্যস্থানে ইহা একেবারেই অর্থহীন। বিশেষ করিয়া গণতন্ত্রের দৃষ্টিকোন হইতে বিচার করিলে ইহাকে একেবারেই অনাবশ্যক বলিয়া মনে হয়। মিল (Mill) এ সম্পর্কে চমৎকার উক্তি করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, শাসনতান্ত্রিক অন্যান্য প্রশ্নের যদি সহজ মীমাংসা ঘটে, তবে আইনসভা এক না দুই কক্ষ লইয়া গঠিত হইবে তাহা খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার নয়।[6] যাহাই হউক প্রচলিত রীতি এবং প্রাচীন শাসনব্যবস্থার স্মৃতি হিসাবে দ্বিপরিষদীয় আইনসভা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে আজও টিঁকিয়া আছে।

৩॥ সার্বভৌম ও অসার্বভৌম আইনসভা (Sovereign and non-Sovereign law-making body)

আইনসভার কার্যকারিতা ও ক্ষমতার দিক বিশ্লেষণ করিয়া সংবিধান বিশেষজ্ঞ ডাইসি (Dicey) আইনসভাকে সার্বভৌম আইনসভা (Soverign law-making body) এবং অসার্বভৌম আইনসভা (Non sovereign law-making body) এই দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। যে আইনসভার ক্ষমতা চরম এবং চূড়ান্ত, যাহার নির্দেশকে সবাই মান্য করিতে বাধ্য, যাহার ক্ষমতা কোনরূপ বাধা-নিষেধের দ্বারা সীমাবদ্ধ নয়, এইরূপ আইনসভাকে সার্বভৌম আইনসভা বলে। কিন্তু এইরূপ সার্বভৌম আইনসভা ছাড়াও আর এক প্রকারের আইনসভার অস্তিত্ব দেখা যাইবে যাহাদের ক্ষমতা চরম ও চূড়ান্ত নয়, যাহাদের ক্ষমতার উপর বাধা নিষেধ প্রয়োগ করা যায়, সীমারেখা টানিয়া দেওয়া যায়, আইনগত বাধার জন্য যাহারা সর্বপ্রকার আইন প্রণয়ন করিতে পারে না। এইরূপ আইনসভাকে ডাইসি অসার্বভৌম আইনসভা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

ডাইসি অসার্বভৌম আইনসভার নিম্নলিখিত তিনটি বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করিয়া উহার পরিপ্রেক্ষিত সার্বভৌম আইনসভার সহিত ইহার পার্থক্য দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। প্রথমত, যেখানে আইনসভার গঠনতন্ত্র সম্পর্কীয় আইনের অস্তিত্ব থাকে যাহা আইনসভা পরিবর্তন করিতে পারে না এবং যাহা সে মানিতে বাধ্য,[7] সেইস্থানে আইনসভাকে অসার্বভৌম বলা যাইতে পারে।

---

6. "If all other constitutional questions are rightly decided, it is but of secondary importance whether the parliament consits of two chambers or only of one." J. S. Mill

7. "The existence of laws of effecting its constitution which such body must obey and cannot change." —Dicey

অর্থাৎ আরও পরিষ্কার করিয়া বলা যায় যে, এই স্থানে আইনসভা সার্বভৌম নহে, কারণ সেখানে একটি উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন আইনের অস্তিত্ব রহিয়াছে যাহাকে মানিতে আইনসভা বাধ্য। দ্বিতীয়ত, এইরূপক্ষেত্রে সাধারণ আইনের (যাহা আইনসভা সৃষ্টি করে) সঙ্গে মৌলিক আইনের (যাহা সার্বভৌম শক্তি মানিতে বাধ্য) ভিতর সুস্পষ্ট পার্থক্য রহিয়াছে (···hence, secondly, the formation of a marked distinction between ordinary laws and fundamental laws)। তৃতীয়ত, বিচারবিভাগীয় অথবা অন্য এমন কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিসমষ্টির যদি অস্তিত্ব থাকে, যাহারা আইনসভার আইনের বৈধতা অথবা শাসনতান্ত্রিক গুণাগুণ সম্পর্কে রায় দিবার অধিকারী।[৪]

ইংলণ্ডের শাসনতন্ত্রের পরিপ্রেক্ষিতে ডাইসি দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন যে ইংলণ্ডের আইনসভা সার্বভৌম ক্ষমতা সম্পন্ন। কারণ সেখানকার আইনসভা বা পার্লামেণ্ট সাধারণ আইন প্রণয়নের পদ্ধতিতেই আইন প্রবর্তন ও সংশোধন করিতে পারে এবং সেখানে সাধারণ আইন ও মৌলিক আইনের ভিতর কোন-রূপ পার্থক্য নাই। তাহা ছাড়া, ইংলণ্ডের পার্লামেণ্ট প্রণীত আইন বাতিল করিবার কাহারও ক্ষমতা নাই। সুতরাং ডাইসি ইংলণ্ডের পার্লামেণ্টকে সার্বভৌম আইনসভা (Sovereign law-making body) বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।

অসার্বভৌম আইনসভা বলিতে ডাইসি একদিকে আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠান, বিভিন্ন কোম্পানী এবং ঔপনিবেশিক আইনসভার কথা বলিয়াছেন, যাহারা নিজেদের এক্তিয়ারভুক্ত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের জন্য বাধ্যতামূলক নিয়মাবলী সৃষ্টি করিতে পারেন, কিন্তু ইহারা সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী নয়। সার্বভৌম আইনসভা ইহাদের সৃষ্ট বিধি-নিষেধকে বাতিল করিতে পারেন। অপরপক্ষে ডাইসি অসার্বভৌম আইনসভা বলিতে সেই সমস্ত স্বাধীন রাষ্ট্রের আইনসভার কথা বলিয়াছেন যাহাদের সংবিধান সংশোধন করিবার অধিকার নাই। অর্থাৎ সেখানে আইনসভার স্থান শাসনতন্ত্রের নীচে। এইরূপ আইনসভার অস্তিত্ব বিশেষ করিয়া যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় লক্ষ্য করা যায়। প্রসঙ্গক্রমে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। ডাইসির মতানুসারে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের আইনসভা বা কংগ্রেস অসার্বভৌম আইনসভা (Non-

---

৪. The existence of some persons. or persons judicial or otherwise, having authority to pronounce upon the validity or constitutionality of laws, passed by such law-making body. —Dicey

sovereign law-making body) কারণ, সেখানকার আইনসভা একচ্ছত্র সার্ব-ভৌমিকতা দাবী করিতে পারে না। সার্বভৌম আইনসভা তাহাকেই বলে যাহা আইন প্রণয়ন ও সংশোধনের সর্ববিধ ক্ষেত্রে চূড়ান্ত। সার্বভৌম আইনসভার সমস্ত আইনকেই আদালত মানিতে বাধ্য। কিন্তু আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে শাসন-তন্ত্রের স্থান সর্বোচ্চে। সেখানকার আইনসভা কর্তৃক প্রণীত কোন আইন সংবিধান বিরোধী হইলে বিচারালয় তাহা বাতিল করিতে পারে। সুতরাং ডাইসির দৃষ্টিকোণ হইতে বিচার করিলে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেসকে অসার্বভৌম আইনসভা বলিতে হয়।

কিন্তু জেনিংস (Jennings) এইরূপ সার্বভৌম ও অসার্বভৌম আইনসভার শ্রেণীবিভাগ স্বীকার করেন না। তাঁহার মতে ইংলণ্ডের পার্লামেণ্ট যেরূপ যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারে না, তেমনি আমেরিকার কংগ্রেসও একেবারেই ক্ষমতাহীন নয়। অর্থাৎ ইংলণ্ডের পার্লামেণ্টকে চূড়ান্ত সার্বভৌম ও আমেরিকার কংগ্রেসকে একান্তভাবেই সার্বভৌম ক্ষমতাহীন বলিতে জেনিংস প্রস্তুত নন। তাঁহার মতে আমেরিকার কংগ্রেসের ক্ষমতা যেমন সীমিত, তেমনি ইংলণ্ডের পার্লামেণ্টের অধিকার রাজনৈতিক পরিবেশ ও শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতির দ্বারা সীমিত ও নিয়ন্ত্রিত।

উপসংহারে বলা যাইতে পারে যে, আইনসভাকে এইরূপ সার্বভৌম ও অসার্বভৌম হিসাবে অভিহিত করিয়া ডাইসি যে বক্তব্য উপস্থিত করিয়াছেন তাহা সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য না হইতে পারে, কিন্তু আইনসভার ক্ষমতার ব্যাপ্তির দিক হইতে তিনি যেভাবে ইহাদের ভিতর পার্থক্য নির্দেশ করিয়াছেন তাহার গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

৪॥ শাসনবিভাগ ও ইহার কার্যাবলী (The Executive and its functions)

পূর্বেই বলা হইয়াছে, আইনবিভাগ কর্তৃক রচিত আইনের মাধ্যমে রাষ্ট্রের শাসন ও শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব শাসনবিভাগের। আধুনিককালে রাষ্ট্রীয় কর্ম-পরিধির প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে শাসন বিভাগের কার্যও বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি লাভ করিয়াছে। শাসনবিভাগকে আজিকার দিনে শুধুমাত্র আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করিলেই চলে না, মানুষের বহুমুখী রাষ্ট্রীয় জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করাও শাসনবিভাগের দায়িত্ব। ইহা ব্যতীতও মনে রাখিতে হইবে যে বর্তমান যুগে

আইনসভার হাতে যে ব্যাপক ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হইয়াছে তাহার একটা বিরাট অংশ হস্তান্তরের মধ্য দিয়া শাসনবিভাগের মন্ত্রিমণ্ডলীর হস্তে ন্যস্ত হইয়াছে। এইজন্যই ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশের মন্ত্রিমণ্ডলী ব্যাপক ক্ষমতা লাভের অধিকারী হইয়াছে এবং এই সমস্ত দেশের শাসনব্যবস্থাকে মন্ত্রিসভার একনায়কতন্ত্র (cabinet dictatorship) নামে অভিহিত করা হয়।

শাসনবিভাগ বলিতে মুখ্য শাসক, মন্ত্রিমণ্ডলী এবং উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী বা আমলাদের বোঝায়। মুখ্য শাসক কোথাও কোথাও নিয়মতান্ত্রিক (formal) থাকে, যেমন ইংলণ্ডের রাণী। তাই ইংলণ্ডে শাসন-বিভাগীয় সমস্ত ক্ষমতাই প্রায় মন্ত্রিমণ্ডলীর হস্তে ন্যস্ত। অপরপক্ষে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের মুখ্য শাসক রাষ্ট্রপ্রতি ক্ষমতা প্রয়োগ করার অধিকারী. এইখানে মন্ত্রিমণ্ডলীর ভূমিকা খুবই গৌণ। অধ্যাপক গার্নার (Garner) শাসন বিভাগের কার্যকে পাঁচ ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন: ১। কূটনৈতিক বা রাজনৈতিক ক্ষমতা (Diplomatic or Political Power), ২। প্রশাসনিক ক্ষমতা (Administrative Power), ৩। সামরিক ক্ষমতা (Military Power), ৪। আইন সম্পর্কীয় ক্ষমতা (Legislative Power) এবং ৫। বিচার বিভাগীয় ক্ষমতা (Judicial Power)। নিম্নে ইহাদের সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হইল।

১। কূটনৈতিক বা রাজনৈতিক ক্ষমতা: সমস্ত রাষ্ট্রকেই বৈদেশিক রাষ্ট্রের সঙ্গে পারস্পরিক সম্পর্ক রক্ষা করিতে হয়। এই সম্পর্ক স্থাপন ও তাহা নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে শাসন বিভাগের বিরাট দায়িত্ব রহিয়াছে। শাসন বিভাগের পরামর্শ অনুযায়ী রাষ্ট্রপ্রধান অন্যরাষ্ট্রে কূটনৈতিক প্রতিনিধি প্রেরণ করেন, অপর রাষ্ট্রের কূটনৈতিক প্রতিনিধিকে গ্রহণ করেন. বিভিন্ন রাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন ও উহা নিয়ন্ত্রণ করেন, অন্য রাষ্ট্রের সহিত সন্ধি, চুক্তি ইত্যাদি সম্পাদন করেন। যদিও এই সমস্ত ব্যাপারই শাসন বিভাগের কাজ, কিন্তু কোন কোন রাষ্ট্রে ইহা আইনসভার সম্মতি বা অনুমোদন লইয়া কার্যকরী করা হয়।

২। প্রশাসনিক ক্ষমতা: আইন অনুযায়ী রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ শাসন পরিচালনা করা শাসন বিভাগের সর্বপ্রধান কর্তব্য। আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য শাসন বিভাগকে পুলিস নিয়োগ ও অন্যান্য ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হয় এবং আইনভঙ্গকারীদের বিচারালয় নির্ধারিত শাস্তির ব্যবস্থা করিতে হয়। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে আধুনিক যুগে রাষ্ট্রের কার্যের পরিধি ব্যাপকতর হওয়ায় শাসন

বিভাগকে শুধুমাত্র আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষা করিলে চলে না, জনকল্যাণের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া শিক্ষা, স্বাস্থ্য, শিল্প সংস্কৃতি, ব্যবসা-বাণিজ্য প্রভৃতি বহুমুখী কার্য পরিচালনার দায়িত্বও গ্রহণ করিতে হয়। ইহার ফলে জনজীবনে শাসনবিভাগের প্রভাব বাড়িতেছে এবং জনগণের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপিত হইতেছে।

৩। **সামরিক ক্ষমতা:** শুধুমাত্র আভ্যন্তরীণ আইন এবং শৃঙ্খলা রক্ষা করাই নয়, বহিরাক্রমণ হইতে রাষ্ট্রের নিরাপত্তা রক্ষার দায়িত্বও শাসন-বিভাগের। মুখ্য শাসনকর্তা হিসাবে রাষ্ট্রপ্রধান রাষ্ট্রের স্থলবাহিনী, নৌবাহিনী এবং বিমান বাহিনীর অর্থাৎ সমগ্র সামরিক বাহিনীর প্রধান অধিকর্তা। যুদ্ধ ঘোষণা, সন্ধিস্থাপন ইত্যাদির সমুদয় দায়িত্ব কোথাও প্রত্যক্ষভাবে তাঁহার হাতে আবার কোন কোন রাষ্ট্রে ইহা আইনসভার অনুমোদন সাপেক্ষ তাঁহার হাতে ন্যস্ত থাকে। সৈন্যবাহিনী নিয়োগ, সৈন্যাধ্যক্ষ মনোনয়ন, যুদ্ধ পরিচালনা প্রভৃতি দায়িত্ব শাসনবিভাগের। স্বাভাবিক সময় অপেক্ষা যুদ্ধের সময় শাসন-বিভাগের ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধি লাভ করে।

৪। **আইন সম্পর্কীয় ক্ষমতা:** মন্ত্রীপরিষদ পরিচালিত (cabinet form of government) শাসনব্যবস্থায় মন্ত্রীসভার সদস্যগণ আইন সভারও সদস্য এবং সেই দল আইনসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ। তাই শাসনবিভাগ বা মন্ত্রীসভা আইন প্রণয়ন কার্যে সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করিয়া থাকে। ইহারা আইন প্রণয়ন করে, বিতর্কে যোগদান করে এবং দলীয় প্রভাব বিস্তার করিয়া আইন পাশ করিয়া থাকে। বস্তুত বর্তমানকালে আইনসভায় কোন আইন উত্থাপনের পূর্বে মন্ত্রিসভা ইহা আলোচনা করিয়া থাকে। জরুরী অবস্থায় অনেক দেশের শাসন বিভাগ জরুরী আইন প্রণয়ন করিতে পারে। প্রয়োজনে শাসনবিভাগ সমস্ত দেশে সামরিক আইন ঘোষণা করিতে পারে। আইনসভা আহ্বান করা, ইহার অধিবেশন স্থগিত রাখা, ইহা ভাঙ্গিয়া দেওয়া প্রভৃতির অধিকার বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই শাসন বিভাগ ভোগ করে। ইহা ছাড়াও, ভারতবর্ষ, আমেরিকা প্রভৃতি দেশে রাষ্ট্রপ্রধান আইনসভা কর্তৃক গৃহীত আইন নাকচ করিবার অধিকারী। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতির বাণী পাঠাইয়া, অনুগ্রহ বিতরণ করিয়া পরোক্ষভাবে আইন প্রণয়নের ব্যাপারে প্রভাব বিস্তার করিতে পারেন।

৫। **বিচার বিভাগীয় ক্ষমতা:** শাসন বিভাগীয় প্রভাব হইতে বিচার বিভাগকে দূরে রাখা অপরিহার্য। কিন্তু প্রায় প্রত্যেক রাষ্ট্রেই শাসন কর্তৃপক্ষের কিছু কিছু বিচার বিভাগীয় ক্ষমতা থাকে। দণ্ডিত ব্যক্তিকে ক্ষমা করা, শাস্তির

পরিমাণ হ্রাস করা প্রভৃতি মামুলী ক্ষমতা অনেক রাষ্ট্রেই শাসন বিভাগের থাকে। কিন্তু উচ্চ আদালত সমূহের বিচারপতি নিয়োগ, শাসনবিভাগীয় কর্মচারীর উপর কিছু কিছু বিচারের দায়িত্ব অর্পণ প্রভৃতি বিচার বিভাগীয় মৌলিক কার্যাবলী অনেক রাষ্ট্রে শাসন বিভাগের উপর ন্যস্ত করা যায়।

৫॥ বিচারবিভাগ ও ইহার গঠন (Judiciary and its organisation)

প্রতিটি আধুনিক রাষ্ট্রে রাষ্ট্রীয় আইনের পরিপ্রেক্ষিতে শৃঙ্খলা রক্ষা ও জনগণের অধিকারকে বলবৎ করিবার জন্য বিচার বিভাগ রহিয়াছে। ব্রাইস বলিয়াছেন: কোন শাসন ব্যবস্থার উৎকর্ষ নির্ধারণের ক্ষেত্রে বিচার বিভাগীয় যোগ্যতা অপেক্ষা অন্য কোন শ্রেষ্ঠ মানদণ্ড নাই।[9] ব্রাইস আরও বলিয়াছেন যে কোন জাতি রাজনৈতিক সভ্যতার কোন স্তরে আছে, তাহা নির্ণয় করিবার শ্রেষ্ঠ উপায় হইতেছে পরীক্ষা করিয়া দেখা যে নাগরিকদের পরস্পরের মধ্যে এবং সরকারী কর্মচারী ও নাগরিকগণের মধ্যে বিচার ব্যবস্থা কতটা আইনানুমোদিত ও ন্যায়সঙ্গত। সিজউইকও (Sidgwick) প্রায় একই ভাষায় এই বক্তব্য রাখিয়াছেন। বস্তুতপক্ষে গণতন্ত্রের সাফল্য বহুল পরিমাণে বিচার ব্যবস্থায় যোগ্যতা ও উৎকর্ষতার উপর নির্ভর করে। মনে রাখা প্রয়োজন 'বিচারের বাতি নিভিয়া গেলে, সে অন্ধকার খুবই ভয়ঙ্কর।[10] বিচার ব্যবস্থাকে যদি দ্রুত, নিরপেক্ষ ও নিশ্চিত করা যায় তবেই বিচার বিভাগ তাহার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনে সমর্থ হইয়া থাকে। বিচার ব্যবস্থা দ্রুত করিতে না পারিলে অনেক ক্ষেত্রেই বিচারের প্রকৃত উদ্দেশ্য নষ্ট হইয়া যায়। বিচার ব্যবস্থার নিরপেক্ষতা দ্বারা বিচারকের নিরপেক্ষতার কথা বলা হয়। বিচারকেরা যদি বিশেষ কোন শ্রেণীস্বার্থের প্রতিভূ হন তবে তাহাদের নিকট হইতে নিরপেক্ষ বিচার আশা করা যায় না। ইহা ছাড়াও বিচারালয় হইতে ন্যায়বিচার পাওয়া সম্পর্কে কোন সন্দেহ জনগণের মধ্যে থাকিলে সেই বিচার ব্যবস্থা জনগণের শ্রদ্ধা লাভ করিতে পারে না। সর্বোপরি মনে রাখা প্রয়োজন যে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্যের উপর বিচার বিভাগের নিরপেক্ষতা ও সাফল্য ও নির্ভর করে।

---

9. "There is no better test of the excellence of a government than the efficiency of its judicial system." —Bryce

10. "If the lamp of justice goes out in darkness, how great is that darkness." —Bryce

বিচার বিভাগের সংগঠন : পৃথিবীর সমস্ত রাষ্ট্রের বিচারবিভাগীয় সংগঠন একই নীতির দ্বারা নির্ধারিত ও নিয়ন্ত্রিত হয় না। তাই বিভিন্ন রাষ্ট্রে বিভিন্ন প্রকারের বিচারবিভাগীয় সংগঠন লক্ষ্য করা যায়। তাহা সত্বেও বিচারবিভাগীয় সংগঠনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন রাষ্ট্রে যে মৌলিক নীতি মোটামুটি-ভাবে অনুসৃত হয় তাহা আলোচনা করা হইল। বিচার বিভাগকে 'দেওয়ানী' ও 'ফৌজদারী' এই দুই ভাগে বিভক্ত করিবার রীতি প্রায় সমস্ত রাষ্ট্রই প্রচলিত। ব্যক্তিগত দাবী দাওয়া ও অধিকার রক্ষার উদ্দেশ্যে যে মামলা করা হয় তাহাকে দেওয়ানী মামলা (civil case) বলা হয় এবং যেখানে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অপরাধ অনুষ্ঠিত হয় এবং রাষ্ট্র মামলার একটি পক্ষে থাকেন তাহাকে ফৌজদারী মামলা (criminal case) বলা হয়। উভয় শ্রেণীর আদালতই নিম্নতম হইতে উচ্চতম একের পর এক ধাপে ধাপে সংগঠিত হইয়া একটি পিরামিডের আকার ধারণ করিয়া থাকে। দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালত ছাড়াও বিশেষ ধরণের বিচারের জন্য বিশেষ আদালত দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের মধ্যে শাসন বিভাগীয় আদালত, সামরিক আদালত প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এই সমস্ত বিভিন্ন প্রকারের সংগঠিত আদালতের ক্ষমতা ও এক্তিয়ার স্বতন্ত্রভাবে নির্দিষ্ট থাকে।

বিচারালয়কে 'আপীল আদালত' (Court of Appellate Jurisdiction) ও সাধারণ আদালত বা মামলার আদি পত্তন আদালত (Court of Original Jurisdiction) এই দুই ভাগে বিভক্ত করিবার নীতি পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্রে ব্যাপকভাবে লক্ষ্য করা যায়। যে বিচারালয়ে নিম্ন আদালতের বিচারের বিরুদ্ধে আবেদন করা যায় তাহাকে আপীল আদালত বলে। যে আদালতে মামলার আদি পত্তন বা প্রথম বিচার অনুষ্ঠিত হয় তাহাকে সাধারণ আদালত বলে।

যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচার ব্যবস্থায় সাধারণতঃ দুই শ্রেণীর আদালত লক্ষ্য করা যায়। এক শ্রেণীর আদালত অঙ্গরাজ্যগুলির জন্য এবং অপর এক শ্রেণীর আদালত যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচার ব্যবস্থার ক্ষেত্রে কার্যকরী। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এই নীতি সম্পূর্ণভাবে কার্যকরী হইয়াছে। সেখানে যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনের বিচার যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালতে এবং অঙ্গরাজ্যগুলির আইন সংক্রান্ত বিচার অঙ্গ আদালতে সম্পন্ন হইয়া থাকে। সকল যুক্তরাষ্ট্রে অনুরূপ ব্যবস্থা নাই।

ভারতবর্ষে কেন্দ্রে ও প্রদেশগুলিতে স্বতন্ত্র আদালত আছে, কিন্তু সামগ্রিকভাবে ইহাকে একটি বিচার বিভাগ মনে করা হয়।

উপরোক্ত আলোচনায় দেখা যাইতেছে যে বিচারবিভাগীয় সংগঠনের ক্ষেত্রে একই প্রকারের কিছু কিছু রীতি প্রায় সর্বক্ষেত্রেই প্রয়োগ করা হইয়া থাকে। এইবার বিভিন্ন রাষ্ট্রে বিচারবিভাগীয় নীতির ক্ষেত্রে যে গভীর পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় তাহা আলোচনা করা হইতেছে। ফ্রান্স ও জার্মানী প্রভৃতি দেশে একাধিক বিচারপতির দ্বারা সমষ্টিগতভাবে বিচার করা হইয়া থাকে। ফ্রান্সে সমষ্টিগত বিচারকের সংখ্যা তিন হইতে পনেরো পর্যন্ত হয়। কিন্তু ইংলণ্ড ও তাহার প্রভাবিত রাষ্ট্রগুলিতে আপীল ছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রে একজন বিচারক দ্বারা বিচার করা হইয়া থাকে। আবার, ইঙ্গ-মার্কিন বিচার পদ্ধতিতে ঘূর্ণ্যমান বিচারালয়ের (circuit courts) ব্যবস্থা রহিয়াছে। সেখানে মামলার নিষ্পত্তির জন্য ইহার সহিত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সুবিধার্থে বিচারকগণ বিভিন্ন স্থানে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বিচার করেন। কিন্তু ইউরোপীয় দেশসমূহে এইরূপ ঘূর্ণ্যমান আদালতের ব্যবস্থা নাই। ইহা ছাড়াও লক্ষ্য করা যাইতে পারে যে, ফ্রান্স, জার্মানী ও ইউরোপের রাষ্ট্রগুলিতে একই বিচারকেরা এবং একই আদালত দেওয়ানী ও ফৌজদারী উভয় মামলার বিচার করিয়া থাকেন। ইঙ্গ-মার্কিন দেশসমূহে অবশ্য এই নীতি কার্যকরী হয় না।

ইংলণ্ড ও আমেরিকা প্রভৃতি দেশে আইনের অনুশাসনের (Rule of Law) প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়। এখানে আইনের চোখে সমস্ত নাগরিকই সমান। একই পদ্ধতিতে একই আদালতে উচ্চ-নীচ সমস্ত নাগরিকগণের বিচার হইয়া থাকে। কিন্তু ফরাসী প্রভৃতি দেশে এইরূপ নীতির পরিবর্তে সাধারণ আদালত (Ordinary Courts) এবং শাসনবিভাগীয় আদালত (Administrative Courts) এই দুই শ্রেণীতে আদালত বিভক্ত হইয়া থাকে এবং বিভিন্ন শ্রেণীর আদালত সরকারী কর্মচারী ও সাধারণ নাগরিকগণের বিচার করে।

কোন কোন রাষ্ট্রে বিচারকদের বিচার ও রায়দান হইতে নতুন নতুন আইনের উপাদান সংগৃহীত হইয়া উহা আইনের মর্যাদা লাভ (Judge-made law) করে। ইঙ্গ-মার্কিন রাষ্ট্রে এইরূপ ঘটনা বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করা যায়। আবার আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র প্রমুখ দেশে সর্বোচ্চ বিচারালয়কে সংবিধানের অভিভাবক মনে করা হয়। যদিও এই নীতি অন্যান্য রাষ্ট্রে কার্যকরী হইতে দেওয়া যায় না।

৬॥ বিচার বিভাগের কার্যাবলী (Functions of the judiciary)

আইনের ভিত্তিতে বিরোধের মীমাংসা করা মূলত বিচার বিভাগের দায়িত্ব হইলেও বিচার বিভাগকে আরও কতকগুলি মৌলিক দায়িত্ব পালন করিতে হয়। সংবিধান রক্ষা ও ইহার সঙ্গে সম্পর্কীত কিছু কিছু দায়িত্ব বিচার বিভাগের অঙ্গীভূত হইবার জন্য বিচার বিভাগের কার্যেরও প্রসার ঘটিয়াছে।

বিচার বিভাগের কার্যাবলী নিম্নে আলোচনা করা হইল :

১। বিচার বিভাগের প্রধান কার্য হইল ন্যায়ের ভিত্তিতে সুবিচার করা। অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় আইনকে ন্যায়ের ভিত্তিতে যথাযথ ভাবে প্রয়োগ করা। ইহার জন্য বিচারককে প্রতিটি ক্ষেত্রে সাক্ষ্য, প্রমাণাদির ভিত্তিতে বিশ্লেষণ করিয়া আইনের প্রকৃত ঘটনা ও ইহার তাৎপর্য নির্ণয় করিতে হইবে এবং যথাযোগ্য প্রয়োগ করিয়া অপরাধীকে শাস্তি দিতে হইবে।

২। বিচারক শুধুমাত্র আইন প্রয়োগই করেন না, তিনি আইনের ব্যাখ্যাও করিয়া থাকেন এবং এইরূপ ব্যাখ্যার ভিতর দিয়া নতুন নতুন 'বিচারক প্রণীত আইন' (Judge made laws) সৃষ্টি হয়। যে সব ক্ষেত্রে আইনের ভাষা দ্ব্যর্থবোধক বা পরস্পরবিরোধী, সেইস্থানে আইনের সঠিক ব্যাখ্যা করা এবং উহাকে বিশেষ ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিয়া বিচারক রায় দিয়া থাকেন। এইভাবে আইনের সঠিক ব্যাখ্যা উপস্থিত করা এবং তাহার ভিতর দিয়া বিচারক প্রণীত আইন সৃষ্টি করা বিচার বিভাগের অন্যতম কার্য।

৩। যে ক্ষেত্রে কোন বিশেষ অপরাধ সম্পর্কে আইন নীরব, সেখানে বিচারক চিরন্তন ন্যায়নীতির আদর্শ বা Equity-এর ভিত্তিকে বিচার করিয়া থাকেন।

৪। আইনভঙ্গের সম্ভাবনা উপলব্ধি করিয়া পূর্ব হইতে বিচরালয়ে আবেদন করিলে, বিচারক উহার সভ্যতা সম্পর্কে নিশ্চিত হইলে "নিষেধাজ্ঞা" (Injunctions or Restraining orders) জারি করিয়া ইহা রোধ করিতে পারেন।

৫। কোন কোন রাষ্ট্রে বিচারবিভাগ সংবিধানের অভিভাবক হিসাবে কার্য করে। সংবিধানের কোন ধারা বা অংশ ভঙ্গ করিয়া আইনসভা যদি কোন আইন তৈয়ারী করে, সেই ক্ষেত্রে বিচারবিভাগ ঐ আইনকে বা উহার অংশ বিশেষকে বাতিল করিতে পারেন। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের বিচারালয়কে শাসনতন্ত্রের মর্যাদা রক্ষার জন্য এই ধরনের শাসনতান্ত্রিক সমীক্ষার (Judicial

Review) ক্ষমতা ও দায়িত্ব দেওয়া হইয়াছে। ইংলণ্ডে অবশ্য বিচারালয়ের এইরূপ কোন ক্ষমতা নাই।

৬। রাষ্ট্রের উচ্চতম বিচারালয়ের নিকট শাসনবিভাগ বা রাষ্ট্রপ্রধান আইন-ঘটিত বা শাসনতান্ত্রিক ব্যাপারে পরামর্শ চাহিতে পারেন। সেই ক্ষেত্রে বিচারকগণ নিজেদের মতামত ব্যক্ত করিতে পারেন। কিন্তু শাসন বিভাগের পক্ষে উহা গ্রহণ করা বাধ্যতামূলক নয়। এই পরামর্শদানের ব্যবস্থা সমস্ত রাষ্ট্রে প্রচলিত নাই।

৭। যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় উচ্চতম বিচারালয়ের দায়িত্ব হইতেছে কেন্দ্রীয় শাসনবিভাগ ও আইনবিভাগের হাত হইতে অঙ্গরাজ্যগুলির সংবিধান নির্দেশিত অধিকারকে সুরক্ষিত করা।

৮। এই সমস্ত ছাড়াও বিচার বিভাগকে কিছু কিছু শাসনবিভাগীয় কার্য করিতে হয়। নাবালকের সম্পত্তির অছি (Guardian) নিয়োগ করা, ট্রাষ্টি (Truestee) নিয়োগ করা, ঋণগ্রস্ত বা দেউলিয়া ব্যক্তির সম্পত্তির তত্ত্বাবধায়ক (Receiver) নিয়োগ করা, মৃতের উইলের (will) অনুমোদন করা প্রভৃতি কার্য বিচার বিভাগকে করিতে হয়।

৭ ॥ বিচারবিভাগের স্বাধীনতা (Independence of the judiciary)

বিচারবিভাগের স্বাধীনতার উপরই গণতন্ত্রের সাফল্য ও বিচারবিভাগের দক্ষতা সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে। কারণ, বিচারকগণ যদি শাসনবিভাগ ও বিচারবিভাগের প্রভাবের ঊর্ধ্বে উঠিতে না পারেন তবে তাঁহারা ন্যায় ও নিরপেক্ষ বিচার করিতে পারেন। বিভিন্ন রাষ্ট্রের শাসকবর্গ (যেমন, ইংলণ্ডের ষ্টুয়ার্ট রাজারা) বিচারালয়ের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বী ও শত্রুদিগকে নির্যাতিত করিয়া থাকিতেন। এইরূপ ক্ষেত্রে বিচার-বিভাগের স্বাধীনতা লুপ্ত হয় এবং সমগ্র বিচারব্যবস্থা প্রহসনে পরিণত হয়। সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত ইংলণ্ডে এবং আজও পৃথিবীর অনেক রাষ্ট্রের রাজা বা রাষ্ট্র প্রধান বিচারকগণকে নিযুক্ত ও পদচ্যুত করিতে পারেন। স্বাভাবিকভাবেই এই সমস্ত ক্ষেত্রে শাসনবিভাগ ও বিচারবিভাগের উপর অন্যায় প্রভাববিস্তার করিয়া ইহার স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা নষ্ট করে। সুতরাং ন্যায় ও নিরপেক্ষ বিচারকে সুনিশ্চিত করা ও গণতন্ত্রের সাফল্যের জন্য বিচারবিভাগীয় স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা ও প্রসারিত করা একান্ত প্রয়োজন। বিচারবিভাগীয় স্বাধীনতা

না থাকিলে রাষ্ট্রের আইন যতই ভাল হউক না কেন এবং বিচারকেরা যত দক্ষই হউক না কেন, সুবিচার প্রাপ্তির আশা করা যায় না। যাহাই হউক নিম্নলিখিত উপাদানগুলির উপর বিচারবিভাগের স্বাধীনতা নির্ভর করে।

১। বিচারবিভাগীয় ক্ষমতা পৃথকীকরণ: বিচার বিভাগকে শাসন ও আইন বিভাগের প্রভাব হইতে মুক্ত করা প্রয়োজন। শাসনকর্তা যদি বিচার বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ করে বা তিনি যদি শাসক ও বিচারকের দ্বৈত ভূমিকায় অবতীর্ণ হন্ তবে বিচারবিভাগীয় স্বাধীনতা লুপ্ত হইতে বাধ্য।

২। বিচারক নিয়োগ পদ্ধতি: বিচারকগণের নিয়োগের পদ্ধতির উপরও বিচারবিভাগের স্বাধীনতা অনেক পরিমাণে নির্ভর করে। বিচারকগণকে তিনটি উপায়ে নির্বাচন করা যায়: (ক) জনসাধারণ কর্তৃক নির্বাচিত, (খ) আইন সভার দ্বারা মনোনীত এবং (গ) শাসনবিভাগের দ্বারা নিয়োজিত।

(ক) আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের অঙ্গরাজ্য ও সুইজারল্যাণ্ডের ক্যাণ্টনগুলিতে জনগণ দ্বারা বিচারক নির্বাচন পদ্ধতি প্রচলিত। জনগণের দ্বারা নির্বাচন করাইলে যাঁহাদের উপর লোকের আস্থা আছে তাঁহারা নির্বাচিত হইতে পারেন বটে, কিন্তু বিচারকের আইনজ্ঞান ও দক্ষতা নির্বাচনে প্রাধান্য লাভ করিতে পারে না। অর্থাৎ বিচারকের যে সমস্ত গুণ থাকার প্রয়োজন, নির্বাচনে বিজয়ী জনপ্রিয় ব্যক্তির তাহা নাও থাকিতে পারে। তাই জনসাধারণ কর্তৃক বিচারক নির্বাচনের পদ্ধতিকে ল্যাস্কি নিকৃষ্ট পদ্ধতি বলিয়াছেন।

(খ) সোভিয়েত রাশিয়ার আইনসভা উচ্চ আদালতের বিচারকদের নির্বাচন করিয়া থাকে। কিন্তু এইরূপ বিচারক নির্বাচনেও দলীয় স্বার্থ, স্থানীয় স্বার্থ এবং অন্যান্য জিনিষ প্রার্থীগণের যোগ্যতা অপেক্ষা বেশি প্রভাব বিস্তার করিতে পারে। তাহা-সত্ত্বেও অনেকে মনে করেন যে জনসাধারণ কর্তৃক নির্বাচন করার চাইতে আইনসভা দ্বারা বিচারক নির্বাচন অপেক্ষাকৃত ভাল।

(গ) অনেক রাষ্ট্রে শাসনবিভাগ কর্তৃক আইনজীবিদের মধ্য হইতে বিচারক নির্বাচনের পদ্ধতি প্রচলিত আছে। পদ্ধতি যদিও ত্রুটিপূর্ণ এবং সমালোচনার অপেক্ষা রাখে, তাহা সত্ত্বেও তুলনামূলক বিচারে এই পদ্ধতিই গ্রহণযোগ্য। ল্যাস্কিও প্রয়োজনীয় সাবধানতা অবলম্বন করিয়া এই পদ্ধতি গ্রহণের কথা বলিয়াছেন।

৩। কার্যকাল নির্ধারণ ও কার্যের স্থায়িত্ব: কোন কোন রাষ্ট্রে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বিচারক নিয়োগ করা হইয়া থাকে। কিন্তু এই পদ্ধতি অনুসরণ

করিলে বিচারবিভাগের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হইবার সম্ভাবনা থাকে। বিচারকগণকে স্থায়ীভাবে নিয়োগ করা এবং অক্ষমতা ও অপরাধের কারণ ব্যতীত তাহাদের অপসারণ বন্ধ করিতে পারিলে বিচারকগণের চাকুরীর নিশ্চয়তা থাকে এবং বিচার বিভাগের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখা যায়।

৪। **অপসারণ পদ্ধতি :** বিচারকগণ যদি সৎ, ন্যায়পরায়ণ, নিরপেক্ষ ও দক্ষ না হয় তবে তাহাদের নিশ্চয়ই অপসারণ করা প্রয়োজন। কিন্তু অপসারণের ক্ষমতার অপব্যবহার করিয়া বিচারবিভাগকে প্রভাবিত করিবার সুযোগ থাকিলে ইহার স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হইতে পারে। তাই বিচারককে অপসারণ বা পদচ্যুতি করিবার পুর্বে তাহার বিরুদ্ধে অভিযোগের উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বিচার (impeachment) করিবার ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন।

৫। **উপযুক্ত বেতন :** উপযুক্ত ব্যক্তিগণ যাহাতে বিচারকার্যে যোগদান করে এবং সর্বপ্রকার দুর্নীতি ও হীনতার উর্ধ্বে উঠিতে পারে তাহার জন্য বিচারকগণকে উপযুক্ত বেতন দেওয়া উচিত। বিচারকগণ উপযুক্ত বেতন না পাইলে বিচারকদের স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা বিঘ্নিত হইবার আশঙ্কা থাকে।

উপরোক্ত ব্যবস্থাগুলি অবলম্বন করিলে বিচারবিভাগের স্বাধীনতা রক্ষা করা সম্ভবপর। কিন্তু ল্যাস্কি মনে করেন যে, বিচারকগণ সাধারণত যে শ্রেণী হইতে আসেন তাহাতে তাহাদের পক্ষে রক্ষণশীলতা ও সঙ্কীর্ণতা ত্যাগ করিয়া উহার উর্ধ্বে উঠা বা শ্রেণী স্বার্থ ত্যাগ করিয়া নিরপেক্ষ বিচার করা সম্ভব নয়। কিন্তু এ বক্তব্য হয়তো সম্পূর্ণ সঠিক নয়। বাস্তবে দেখা গিয়াছে যে আইনের প্রয়োগের ক্ষেত্রে বিচারকগণ যথেষ্ট পরিমাণ নিরপেক্ষ মনোভাব অবলম্বন করিয়া থাকেন।

চতুর্দশ অধ্যায়

ক্ষমতার পৃথকীকরণ নীতি

(Theory of Separation of Powers)

সরকারের কার্যাবলী যে প্রাথমিকভাবে তিনটি বিভাগে বিভক্ত ইহা আমরা পুর্বেই বলিয়াছি। বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ হইতে এই বিভাগ তিনটিকে স্বতন্ত্র করার প্রয়োজনীয়তার কথা ক্ষমতা পৃথকীকরণ নীতিতে বলা হইয়াছে। কিন্তু বাস্তবে এই তত্ত্ব গ্রহণ করা সম্ভব কিনা সেই বিষয়ে বিতর্কের অবকাশ আছে। এই ব্যাপারে এই অধ্যায়ে আলোচনা করা হইল।

১ ॥ ক্ষমতা পৃথকীকরণ নীতি (Theory of separation of Powers)

প্রাথমিকভাবে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ও কার্যাবলী তিনভাগে বিভক্ত। প্রথমত জনগণের অধিকার ও কর্তব্য নির্দেশ করিয়া আইন রচনা ও ঘোষণা করা; দ্বিতীয়ত রাষ্ট্রের শাসন ও শৃঙ্খলা রক্ষা করিবার জন্য সেই আইন যথাযথভাবে পালিত হইতেছে কিনা তাহা দেখা এবং তৃতীয়ত আইনবিভাগ কর্তৃক রচিত আইন অনুসারে পক্ষপাতশূন্য বিচার করিয়া অপরাধীদের দণ্ড দান করা। এই তিন প্রকারের ক্ষমতা পরিচালনার জন্য সরকারের কার্যাবলীকে যথাক্রমে আইনবিভাগ (Legislature), শাসনবিভাগে (Executive) এবং বিচার বিভাগে (Judiciary) বিভক্ত করা হইয়াছে। এই তিনটি প্রাথমিক ও মৌলিক কর্তব্য যথাযথভাবে সম্পন্ন না হইলে রাষ্ট্রের কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হইতে পারে না।

আরিষ্টটলের সময় হইতে সরকারের কার্যের এই ত্রি-বিভাগীয় সূত্র প্রায় সর্বজন স্বীকৃত নীতিতে রূপান্তরিত হইয়াছে। আরিষ্টটল আইন, শাসন এবং বিচার বিভাগকে যথাক্রমে Deliberative, Magisterial এবং Judiciary নামে অভিহিত করিয়াছেন। আরিষ্টটল সরকারের ক্ষমতাকে তিনভাগে বিভক্ত করিয়াছেন বটে কিন্তু ক্ষমতার পৃথকীকরণের কথা প্রচার করেন নাই।

সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দী হইতে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা ক্ষমতা পৃথকীকরণ নীতিকে বিশেষভাবে আলোচনা ও বিশ্লেষণ সুরু করিলেন। তাহাদের মতে রাষ্ট্রের কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার করিবার জন্য উপরোক্ত বিভাগ তিনটিকে

পরস্পর হইতে স্বতন্ত্র এবং পারস্পরিক প্রভাব হইতে মুক্ত রাখা প্রয়োজন। আইন তৈয়ারী করা, শাসন করা এবং বিচার করা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ধরণের তিনপ্রকারের কার্য। তাই কার্যগুলি স্বতন্ত্র ব্যক্তিদ্বারা সম্পন্ন হওয়া উচিত। অর্থাৎ এই বিভাগগুলিকে স্বতন্ত্র, নিজ নিজ এক্তিয়ারভুক্ত কার্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ এবং অন্যান্য বিভাগীয় কার্যে হস্তক্ষেপ ও প্রভাব বিস্তার করা হইতে বিরত রাখা প্রয়োজন। আইনবিভাগ, শাসনবিভাগ, ও বিচার বিভাগীয় ক্ষমতাকে এইরূপ স্বতন্ত্র এবং পারস্পরিক প্রভাব হইতে মুক্ত রাখিবার নীতিকেই ক্ষমতার পৃথকীকরণ তত্ত্ব (Theory of separation of powers) বলা হয়।

ফরাসী দার্শনিক মঁতেস্কুই (Montesquioa) সর্বপ্রথম ক্ষমতা পৃথকীকরণ তত্ত্বকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তির প্রতিষ্ঠা করিয়া এই তত্ত্বের ব্যাপক প্রচার করেন। ১৭৪৮ সালে প্রকাশিত তাঁহার Spirit of wsl নামক বিখ্যাত গ্রন্থে। মঁতেস্কু এই তত্ত্বকে প্রচার করেন। মঁতেস্কুর মতে জনগণের ব্যক্তি স্বাধীনতা অক্ষুন্ন রাখিবার জন্য আইনবিভাগ বিচারবিভাগকে সম্পূর্ণ পৃথক করা অত্যাবশ্যক। তাহা করিতে হইলে বিভিন্ন নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা ব্যক্তি সমষ্টির হস্তে বিভিন্ন বিভাগীয় ক্ষমতা ন্যস্ত করা প্রয়োজন; যাহাতে এক বিভাগ অন্য বিভাগকে প্রভাবিত করিতে না পারে। যদি শাসনবিভাগকে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা দেওয়া যায় তাহা হইলে স্বৈরাচারী আইনের সৃষ্টি হইবে, ফলে ব্যক্তি-স্বাধীনতা বিপন্ন হইবে। যদি শাসনবিভাগকে বিচার বিভাগীয় ক্ষমতা দেওয়া হয় তবে বিচার প্রহশনে পরিণত হইবে এবং সেই ক্ষেত্রেও ব্যক্তি স্বাধীনতা বিপন্ন হইবে। তেমনি বিচার ও আইন করিবার ক্ষমতা একই হাতে থাকিলে লোকের জীবন ও স্বাধীনতা স্বেচ্ছাচারমূলক নিয়ন্ত্রণের কবলে পড়িবার আশঙ্কা আছে, কারণ সেই ক্ষেত্রে বিচারক স্বয়ং আইন রচনা করিবেন।[1] অর্থাৎ মঁতেস্কুর ক্ষমতা পৃথকীকরণ নীতি তিনটি সূত্রের উপর নির্ভরশীল— ১) এক বিভাগ অন্য বিভাগের কার্য পরিচালনা করিবে না; (২) একই ব্যক্তি বা ব্যক্তিসমষ্টি একাধিক বিভাগের কার্য সম্পাদন করিবে না; (৩) এক বিভাগ

1. "If the legislative and executive powers are united in the same person or body of persons, there is no liberty, because of the danger that the same monarch or the same senate may make tyrannical laws and execute them tyrannically. Nor again is there any liberty if the judicial power is not separated from the legislative and the executive. If it were joined to the legislative power, the power of the life and liberty of the citizens would be arbitary; for the judge would be the law maker. If it were joined to the executive power, the judge would have the force of an oppressor."—Montesquieu.

অন্য বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ করিবে না। মঁতেস্কু ব্যক্তিস্বাধীনতা রক্ষার জন্য ক্ষমতার পৃথকীকরণের প্রয়োজনীয়তা বুঝাইতে যাইয়া ইংলণ্ডের উদাহরণ দিয়া বলিয়াছেন যে ইংলণ্ডের জনগণের ব্যক্তি স্বাধীনতা আছে, কারণ ইংলণ্ডে ক্ষমতার পৃথকীকরণ নীতি কার্যকরী হইয়াছে বলিয়া সেখানে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অপব্যবহার ঘটে নাই।

মঁতেস্কুর ক্ষমতা পৃথকীকরণ তত্ত্ব 'নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্যের নীতি'র (Theory of checks and balances) সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত।[2] সরকারের প্রতিটি বিভাগ স্বতন্ত্র ও নিজ নিজ এক্তিয়ারের মধ্যে স্বাধীন থাকিলেই পারস্পরিক নিয়ন্ত্রণের মধ্য দিয়া ভারসাম্য রক্ষা করা সম্ভব। এই প্রসঙ্গে মনে রাখা প্রয়োজন যে, সরকারের প্রতিটি বিভাগ অন্য বিভাগকে তখনই নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে যখন প্রতিটি বিভাগ সমক্ষমতাসম্পন্ন হয়; অর্থাৎ মঁতেস্কু প্রতিটি বিভাগকে সম ক্ষমতা সম্পন্ন বলিয়া মনে করিয়াছিলেন।

ইংরাজ সংবিধান বিশেষজ্ঞ ব্লাকস্টোন (Blackstone) মঁতেস্কুর ক্ষমতার পৃথকী-করণ নীতির সমর্থন করিয়া বলিলেন যে, যেখানে আইন তৈয়ারী এবং উহা প্রয়োগ ও কার্যকরী করিবার ক্ষমতা একই ব্যক্তি বা ব্যক্তিসমষ্টির হাতে ন্যস্ত থাকে সেখানে জনগণের স্বাধীনতা থাকিতে পারে না। রাষ্ট্রনীতিবিদ্ ম্যাডিসনও (Madison) মনে করেন যে একই হস্তে সর্ব ক্ষমতার সমন্বয়ে স্বেচ্ছা চারিতা দেখা যাইতে পারে।[3]

২॥ সংক্ষিপ্ত ইতিহাস (Short history)—

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে ক্ষমতা পৃথকীকরণ নীতি সম্পর্কে ধ্যানধারণা এরিস্টটলের সময় হইতেই লক্ষ্য করা গিয়াছে। আরিস্টটল সরকারী কার্যের ত্রিবিধ সূত্রের কথা বলিয়াছিলেন, যদিও তিনি ইহাদিগকে পৃথক বা স্বতন্ত্র করার কথা বলেন নাই। প্রাচীন রোম সাম্রাজ্যের সংবিধানের শ্রেষ্ঠত্বের কারণ আলোচনা করিতে যাইয়া পলিবিয়াস (Polibius) এবং সিসেরো (Cicero) 'ভারসাম্য নীতি ও নিয়ন্ত্রণ নীতির' কথা বলিয়াছেন। অর্থাৎ প্রকারান্তরে তাঁহারা ক্ষমতা পৃথকীকরণ নীতির অস্তিত্বকে স্বীকার করিয়াছেন।

2. "From the very nature of things power should be a check to power." —Montesquieu.

3. "The accumulation of all powers......in the same hands......may justly be pronounced the very definition of tyranny." —Madison,

মধ্যযুগে ক্ষমতা পৃথকীকরণ নীতি লইয়া বিশেষ কোন আলোচনা লক্ষ্য করা যায় না। একমাত্র চতুর্দশ শতাব্দীতে মারসিগ্লিও (Marsiglio) শাসন ও আইনবিভাগের পার্থক্য নির্ণয় করিতে যাইয়া এই তত্ত্বের কথা বলিয়াছেন। আধুনিক যুগে ম্যাকিয়াভেলির (Machiavelli) রচনার মধ্য দিয়া তাই তত্ত্বের আবির্ভাব ঘটে এবং ষোড়শ শতাব্দীতে বিখ্যাত ফরাসী দার্শনিক বোঁদা (Bodin) ইহাকে যুক্তি ও ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেন। বোদা বিশেষ করিয়া বিচার বিভাগকে রাজার হাত হইতে পৃথক করিবার উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়াছিলেন। সপ্তদশ শতাব্দীতে হ্যারিংটন (Harrington) এবং লক (Locke) এই তত্ত্ব সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছিলেন।

লক সরকারী কার্যকে আইন, শাসন এবং আন্তর্জাতিক সম্বন্ধ এই তিনভাগে বিভক্ত করেন। তিনি মনে করিতেন যে শাসন ও আইনবিভাগের ক্ষমতাকে পৃথক করা আবশ্যক, কারণ একই ব্যক্তির হাতে আইন তৈয়ারী করা এবং আইনকে প্রয়োগ করিবার অর্থাৎ শাসনক্ষমতা থাকিলে বিপজ্জনক অবস্থার সৃষ্টি হইতে পারে। সুতরাং কোন অবস্থাতেই তিনি আইনসভাকে শাসনক্ষমতা ব্যবহার করিতে দিতে সম্মত ছিলেন না।[4] বলা যাইতে পারে যে লক ব্যক্তি-স্বাধীনতা রক্ষার জন্যই স্বতন্ত্রীকরণ নীতির প্রবর্তনের কথা বলিয়াছিলেন।

লকের এই বক্তব্যই মঁতেস্কুর ক্ষমতা পৃথকীকরণ নীতির মর্মকথা। ব্যক্তি-স্বাধীনতার রক্ষাকবচ হিসাবেই মঁতেস্কু ক্ষমতা পৃথকীকরণ নীতির কথা বলিয়াছেন। বস্তুত ফরাসী সম্রাট চতুর্দশ ও পঞ্চদশ লুই-এর রাজত্বকালে তাহাদের স্বেচ্ছাচারিতায় ফরাসী দেশের জনগণের ব্যক্তিস্বাধীনতার বিলুপ্তি ঘটায় মঁতেস্কু কি উপায়ে ব্যক্তিস্বাধীনতা রক্ষা করা যায় সেই ব্যাপারে খুবই চিন্তিত হইয়া পড়েন এবং সেই সময়ে তিনি ইংলণ্ড ভ্রমণে আসিয়া সেখানকার জনগণের ব্যক্তিস্বাধীনতার ব্যাপকতা দেখিয়া অভিভূত হন। মঁতেস্কু সিদ্ধান্ত করেন যে ইংলণ্ডে ক্ষমতা পৃথকীকরণ নীতি আছে বলিয়াই জনগণের ব্যক্তি-স্বাধীনতার অস্তিত্ব রহিয়াছে। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে ইংলণ্ডে ক্ষমতা পৃথকীকরণ নীতির অস্তিত্ব সম্পর্কে মঁতেস্কুর সিদ্ধান্ত ভ্রান্ত। যাহাই হউক

---

4. "And because it may be too great a temptation to human frailty, apt to grasp at power, for the persons who have the power of making laws to have also in their hands the power to execute them, whereby they exempt themselves from obedience to the laws they make, and suit the law, both in its making and execution, to their own private advantage......",—Locke

মঁতেস্কুর ক্ষমতা পৃথকীকরণ তত্ত্ব মানুষের ক্ষমতা লোভের মনোবিজ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত। মঁতেস্কু মনে করিতেন যে আমাদের অভিজ্ঞতা এই কথাই প্রমাণ করে যে মানুষকে ক্ষমতা দিলে যে উহা অপব্যবহার করিতে পরিকর, যদি না তাহার ক্ষমতা ও কর্তৃত্বকে সীমাবদ্ধ রাখা হয়।[5] সুতরাং ক্ষমতা পৃথকী-করণের মধ্য দিয়াই শাসকের ক্ষমতা ও কর্তৃত্বকে সীমাবদ্ধ রাখা যায় এবং ফলে ব্যক্তিস্বাধীনতাও প্রসারিত করা যায় বলিয়া মঁতেস্কু বিশ্বাস করিতেন।

ইংরাজ ব্যবহারশাস্ত্রাবিদ ব্লাকষ্টোন মঁতেস্কুকে অনুসরণ করিয়া ক্ষমতা পৃথকীকরণ নীতি ব্যাখ্যা করিলেন। বলা যাইতে পারে ব্লাকষ্টোন স্বকীয় ব্যাখ্যার দ্বারা এই তত্ত্বের ভিত্তিভূমিকে আরও দৃঢ় করিয়াছেন। পরবর্তীকালে হ্যামিলটন (Hamilton) স্বাধীনতা রক্ষার কবচ হিসাবে ক্ষমতা পৃথকীকরণ তত্ত্বের ভূমিকাকে আরও বিশদভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই যে মঁতেস্কু ও তাঁহার সমর্থনকারীদের দ্বারা প্রচারিত এই তত্ত্ব ফরাসীবিপ্লব হইতে সুরু করিয়া পরবর্তীকালে বিভিন্ন সময়ে রাষ্ট্রনীতিতে গভীর ও তাৎপর্যপূর্ণ প্রভাব বিস্তারে সক্ষম হইয়াছে।

৩॥ ক্ষমতা পৃথকীকরণ নীতির সমালোচনা (criticism of the theory of sepration of powers)

ক্ষমতার পৃথিকীকরণ নীতি আবির্ভাবের পর হইতেই ইহা তীব্র সমালোচ-নার সম্মুখীন হইয়াছে। অধ্যাপক রবসন বিদ্রূপ করিয়া বলিয়াছেন যে, এই নীতির ভাঙ্গা রথে চড়াইয়া রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ও সাংবিধানিকগণ কতকগুলি ভ্রান্ত মত প্রচার করিয়াছেন। এই তত্ত্বকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীগণ যে সমস্ত দিক হইতে সমালোচনা করিয়াছেন তাহা আলোচনা করা হইল।

গুডনো (Godnow), জেক্‌নস্ (Jenks) প্রভৃতি লেখকগণ সমালোচনা করিয়া বলিয়াছেন যে মঁতেস্কু ক্ষমতা যে তিনটি ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন উহা ঠিক নয়। কারণ ক্ষমতা মূলত দুইটি—শাসনবিভাগীয় ও আইনবিভাগীয়। তাঁহাদের মতে বিচার বিভাগ শাসনবিভাগের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু ইহাদের এই বক্তব্য গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ বিচারবিভাগ শাসনবিভাগ হইতে স্বতন্ত্র না হইলে নিরপেক্ষ, ন্যায় ও পক্ষপাতশূন্য বিচার আশা করা যায় না। অপর দিকে

5. "......Constant experience shows us that every man invested with power is apt to abouse it and to carry his authority until he is confronted with limits."—Montesquieu.

শাসনপদ্ধতি-বিশেষজ্ঞ উইলোবির (Wilorghby) মতে মঁতেস্কু উল্লেখিত তিনটি বিভাগ ব্যতীত আরও দুইটি বিভাগ রহিয়াছে (Electorate ও Administration), যাহা মঁতেস্কু স্বীকার করে নাই। উইলোবির বক্তব্য অবশ্য যথেষ্ট শক্তিশালী নয়। মঁতেস্কু বলিয়াছেন ক্ষমতার পৃথকীকরণ না করিলে ব্যক্তিস্বাধীনতা রক্ষিত হইতে পারে না। সমালোচকদের মতে মঁতেস্কুর এই মতবাদ ভ্রান্ত। ব্যক্তিস্বাধীনতা রক্ষার জন্য ক্ষমতা পৃথকীকরণ নীতির আবশ্যকতা নাই। মঁতেস্কু ইংলণ্ডের সংবিধান অনুশীলন করিয়া মনে করিয়াছিলেন যে, ইংলণ্ডে জনগণের ব্যক্তি-স্বাধীনতা থাকিবার কারণ সেখানকার সংবিধানে ক্ষমতা পৃথকীকরণ নীতি প্রয়োগ করা হইয়াছে। কিন্তু ইংলণ্ডের শাসনপদ্ধতি বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে, ইংলণ্ডে ক্ষমতা পৃথকীকরণ নীতি প্রয়োগ করা হয় নাই। সুতরাং ইংলণ্ডের শাসনপদ্ধতির চরিত্র সম্পর্কে মঁতেস্কুর মূল্যায়ণ ছিল ভ্রান্ত। ইহা হইতে প্রমাণিত হয় যে, ব্যক্তিগত স্বাধীনতা রক্ষা করিবার জন্য ক্ষমতা পৃথকীকরণ নীতি অপরিহার্য নয়। বর্তমানে ইহা স্বীকৃত যে কোন দেশের জাগ্রত জনমত ও জনগণের সতর্ক দৃষ্টি ব্যক্তিস্বাধীনতার রক্ষাকবচ—ক্ষমতা স্বতন্ত্রী-করণ নীতি নহে। অর্থাৎ মঁতেস্কুর মতের ঐতিহাসিক ভিত্তি খুবই দুর্বল।

অনেকের মতে সরকার একটি অখণ্ড ও অবিচ্ছেদ্য সত্বা, মঁতেস্কু নির্দেশিত উপায়ে ইহাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া পৃথক করা যায় না। সরকারের সমস্ত কার্যই কম-বেশি অন্যান্য বিভাগের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। আইন তৈয়ারীর ব্যাপারে শাসন-বিভাগও ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। আবার শাসনবিভাগকেও সম্পূর্ণভাবে বিচার-বিভাগীয় কার্য হইতে পৃথক করা যায় না। অর্থাৎ এই বিভাগ তিনটি পরস্পরের সঙ্গে যে-ভাবে যুক্ত হইয়া আছে তাহাতে উহাদের কৃত্রিম-ভাবে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। সুতরাং এই নীতি কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করা সম্ভব নয়।

কেহ কেহ রাষ্ট্রের সঙ্গে জীবদেহের তুলনা করিয়া দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন যে, জীবদেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যেমন পরস্পরের সঙ্গে রক্তমাংসের সম্পর্কে আবদ্ধ, সরকারের আইন, শাসন ও বিচারবিভাগও তেমনি ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত, ইহাদের পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন করিলে সরকারের অপমৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। ব্লুনৎস্লী (Bluntschli) বলিয়াছেন যে, দেহ হইতে মস্তককে পৃথক করিয়া তাহার সহিত সমান করিতে গেলে মানুষের যেমন প্রাণহানি না ঘটিয়া পারে না, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাত্রয়কে পৃথক করিতে গেলে রাষ্ট্র এইরূপ ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হইবে

এবং ইহার অপমৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। সুতরাং এইরূপ অবস্থায় ক্ষমতা পৃথিকীকরণ অসম্ভব ও অকাম্য।

জন স্টুয়ার্ট (J. S. Mill) মিলের মতে সরকারের প্রতিটি বিভাগ নিজ নিজ ক্ষেত্রে যদি সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র হয় তাহা হইলে এক অচলাবস্থার সৃষ্টি হইবে। কারণ, প্রতিটি বিভাগই অপর বিভাগকে কোনরূপ সাহায্য না করিয়া কেবলমাত্র নিজ নিজ ক্ষমতা সংরক্ষণ করিবে। ইহার ফলে সরকারের কর্মদক্ষতা হ্রাস পাইবে। ল্যাস্কিও মনে করেন যে শাসন, আইন বিচারবিভাগের কার্যকে যদি সম্পূর্ণভাবে পৃথক করা হয় তাহা হইলে প্রতিটি বিভাগই নিজ নিজ দায়িত্ব এড়াইয়া ইহা অন্যের উপর চাপাইবার চেষ্টা করিবে। এইরূপ ভাবে বিভাগীয় স্বাতন্ত্র্য পরস্পরের মধ্যে সংঘাত ও বিভ্রান্তি সৃষ্টি করিবে।

কোন কোন সমালোচকের মতে আধুনিক কল্যাণধর্মী রাষ্ট্রে পরিকল্পনা ও জনকল্যাণ নীতির সার্থক রূপায়ণ করিতে হইলে ক্ষমতা পৃথকীকরণ নীতি গ্রহণ করা সম্ভব নয়। ক্ষমতা পৃথকীকরণ নীতির জটিলতা কল্যাণধর্মী রাষ্ট্রের আদর্শ ও উদ্দেশ্য ব্যর্থ করিয়া দেয়। আধুনিক রাষ্ট্রে আইনবিভাগের স্থান সকলের উপরে। আইনবিভাগ শুধুমাত্র আইনই রচনা করে না, ইহা শাসনবিভাগীয় কার্যও করিয়া থাকে। কোন কোন রাষ্ট্রে আইনসভাকে সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী মনে করা হয়। মঁতেস্কু তিনটি বিভাগকে সমক্ষমতার অধিকারী বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। কিন্তু ঘটনা তাহা নয়। সুতরাং বাস্তবক্ষেত্রে আইনবিভাগের প্রাধান্য দেখা যায়। সুতরাং মঁতেস্কুর এই দৃষ্টিভঙ্গীর জন্যই তাঁহার নীতি ত্রুটিপূর্ণ হইয়াছে। বার্কার (Barker) অবশ্য মনে করেন যে, এই তিনটি বিভাগের মধ্যে শাসনবিভাগের প্রাধান্যই বর্তমান যুগে বিশেষ করিয়া পরিলক্ষিত হয়। শাসনবিভাগ পরোক্ষভাবে আইন প্রণয়নের বহু ক্ষমতা ব্যবহার করিয়া থাকে। সুতরাং এই দিক হইতে বিচার করিলেও দেখা যায় যে, মঁতেস্কু রাষ্ট্রব্যবস্থায় যে তিনটি বিভাগের সমতা করিয়াছেন তাহা ভ্রান্ত। এমতাবস্থায় ক্ষমতা পৃথকীকরণ নীতি রাষ্ট্রীয় কার্যের দ্রুত রূপায়ণে বাধা সৃষ্টি করিয়া অচলাবস্থা সৃষ্টি করিবে।

ফাইনার (Finer) ক্ষমতার পৃথকীকরণ নীতির সমালোচনা করিয়া বলিয়াছেন যে, ক্ষমতাত্রয়কে সম্পূর্ণভাবে পৃথক করিলে সরকার কখনও বা মূর্ছিত হইবে, কখনও বা ধনুষ্টংকারের রোগীর মত হাত-পা ছুঁড়িতে থাকিবে।

উপরোক্ত আলোচনার ভিত্তিতে দেখা যাইতেছে যে, সমালোচকগণ ক্ষমতা

পৃককীকরণ নীতির প্রয়োজনীয়তা ও সম্ভাব্যতা সম্পর্কে গভীর সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। বস্তুত পক্ষে এই নীতি বাস্তবে প্রয়োগ করা যায় না। ইহার প্রমাণ হিসাবে বলা যাইতে পারে, পৃথিবীর কোন রাষ্ট্রেই ক্ষমতার পৃথকীকরণ নীতি সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করা হয় নাই। একমাত্র আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে কার্যত এই নীতির সামান্য কিছু প্রয়োগ ঘটিয়াছে। এই তত্ত্বের প্রয়োগ যদি সম্ভব এবং কাম্য হইত তবে নিশ্চয়ই ব্যক্তিস্বাধীনতা রক্ষার জন্য বিভিন্ন রাষ্ট্রে ইহা কার্যকরী করা হইত। যদিও ক্ষমতা পৃথকীকরণ নীতি একটি ঐতিহাসিক প্রয়োজন সিদ্ধ করিয়াছে এবং ব্যক্তিস্বাধীনতা রক্ষার ক্ষেত্রে ইহার একটি বিশেষ আবেদন রহিয়াছে, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও উপরোক্ত কারণসমূহের জন্য এই নীতিকে সম্পূর্ণভাবে কার্যকরী করা সম্ভব নয়।

এই তত্ত্বের মূল্যায়ন: ক্ষমতার পৃথকীকরণ নীতির উপরোক্ত ত্রুটি সত্ত্বেও এই তত্ত্বের ঐতিহাসিক মূল্য ও গুরুত্বকে অস্বীকার করা যায় না। ব্যক্তি স্বাধীনতা রক্ষা ও প্রসারের জন্য বিশেষ করিয়া বিচারবিভাগীয় ক্ষমতাকে পৃথক ও প্রভাবমুক্ত করিবার প্রয়োজনীয়তা বর্তমানে অধিক পরিমাণে অনুভূত হইতেছে। এইজন্য বিভিন্ন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র আজকাল বিচারবিভাগীয় স্বাতন্ত্র্য ও নিরপেক্ষতা রক্ষা করিবার জন্য সতর্কতা অবলম্বন করিতেছে। দ্বিতীয়ত, বিভিন্ন রাষ্ট্রে আইনবিভাগীয় কার্যাবলীর ন্যায্যতা বিচারের ক্ষমতা, সংবিধান অক্ষুণ্ণ রাখার দায়িত্ব প্রভৃতি বিচারবিভাগের উপর অর্পণ করিয়া আইন ও শাসন বিভাগের ক্ষমতা সীমিত করার চেষ্টা চলিতেছে। এই সমস্ত ঘটনাকে সংশোধিতভাবে ক্ষমতা পৃথকীকরণ নীতির প্রয়োগ বলা যাইতে পারে। তৃতীয়ত, ক্ষমতার পৃথকীকরণ তত্ত্ব বিভিন্ন রাষ্ট্রে ইহার নীতিকে পুরাপুরি কার্যকরী করিতে না পারিলেও কেন্দ্রীভূত ক্ষমতার অপব্যবহার যে কী মারাত্মক সেই বিষয়ে অঙ্গুলী নির্দেশ করিয়া এই তত্ত্ব তাহা রোধ করিতে সাহায্য করিয়াছে। চতুর্থত, ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে দেখা যাইবে ক্ষমতার পৃথকীকরণ নীতিকে ফরাসী ও আমেরিকার বিপ্লবীরা ব্যক্তিস্বাধীনতার মূলমন্ত্র হিসাবে গ্রহণ করিয়াছিল। এই নীতি একসময়ে ফ্রান্স ও আমেরিকার সংবিধান রচনার ক্ষেত্রে প্রভূত পরিমাণ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। আজও রাজনৈতিক আলোচনার ক্ষেত্রে এই নীতির দোহাই দেওয়া হইয়া থাকে। সুতরাং এই সমস্ত বিচার করিয়া বলা যায় যে, ক্ষমতা পৃথকীকরণ নীতি একটি

ঐতিহাসিক প্রয়োজনসিদ্ধ করিয়াছে যদিও বর্তমানের কর্মমুখর জনকল্যাণ রাষ্ট্রে ইহার প্রয়োগ অবাঞ্ছিত।

৪ ॥ বিভিন্ন শাসনতন্ত্রে এই তত্ত্বের প্রয়োগ (Application of the theory in different constitutions)

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, গ্রেট ব্রিটেন, ভারতবর্ষ ও সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে ক্ষমতার পৃথকীকরণ নীতি কতটা কার্যকরী হইয়াছে তাহা নিয়ে আলোচনা করা হইল।

(ক) আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র : আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে ক্ষমতার পৃথকীকরণ নীতি কিছু পরিমাণে কার্যকরী করা হইয়াছে যদিও আমেরিকার সংবিধানে এই নীতির প্রয়োগ সম্পর্কে স্পষ্ট করিয়া কিছু উল্লেখ করা হয় নাই। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রীম কোর্ট ক্ষমতার পৃথকীকরণ নীতিকে শাসনপদ্ধতির এক মৌলিক তত্ত্ব হিসাবে স্বীকার করিয়াছেন। ডাঃ ফাইনারও বলিয়াছেন যে, ক্ষমতার পৃথকীকরণ নীতির প্রভাবেই হউক বা ব্যক্তিস্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখিবার তাগিদেই হউক, সংবিধান প্রণেতাগণ এই নীতিকে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানে কার্যকরী করিয়াছেন।

আমেরিকার রাষ্ট্রপতি, যিনি শাসনবিভাগীয় সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী ক্ষমতা পৃথকীকরণ নীতি অনুযায়ী তিনি বিধানমণ্ডলী দ্বারা নির্বাচিত না হইয়া পরোক্ষভাবে জনগণকর্তৃক নির্বাচিত হন। তিনি আইনসভার সভ্য নন এবং আইন সভার অধিবেশনে যোগদান করেন না। অবশ্য শাসন পরিচালনার সুবিধার জন্য তিনি আইনসভার নিকট বাণী পাঠাইতে পারেন এবং প্রয়োজনবোধে সেখানে বক্তৃতা করিতে পারেন। ইহা ছাড়াও রাষ্ট্রপতি আইনসভা প্রণীত আইনকে বাতিল করিতে বা ভিটো দিতে পারেন। এইভাবে আমেরিকার রাষ্ট্রপতি আইনবিভাগের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী কিছু কিছু কার্য আইনসভাকে দিয়া করাইয়া লইতে পারেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, আইন ও শাসনবিভাগের পৃথকীকরণ আমেরিকায় সম্পূর্ণভাবে রক্ষিত হয় নাই।

শাসন ও বিচারবিভাগীয় সম্পর্কের ক্ষেত্রে দেখা যাইবে যে, আমেরিকার রাষ্ট্রপতি শাসনবিভাগীয় ব্যক্তি হইয়াও বিচারকদের নিযুক্ত করিয়া থাকেন এবং

তিনি বিচারপতি কর্তৃক প্রদত্ত অপরাধীর দণ্ড মুকুব বা হ্রাস করিতে পারেন। আবার বিচারপতিরাও রাষ্ট্রপতির নির্দেশ বাতিল করিতে পারেন। সুতরাং এই ক্ষেত্রেও পৃথকীকরণ নীতি পুরোপুরিভাবে কার্যকরী করা হয় নাই। অন্যদিকে আমেরিকার সর্বোচ্চ আদালত বা সুপ্রীম কোর্ট আইনসভা কর্তৃক পাস-করা আইনের বৈধতা বিচার ও প্রয়োজনবোধে উহাকে বাতিল করিতে পারে। সংবিধানের এই সূত্রগুলি ক্ষমতা পৃথকীকরণ নীতিকে লঙ্ঘন করিয়াছে বলা যায়। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে, এই নীতি সম্পূর্ণভাবে প্রয়োগ করা সম্ভব নয়, করিলে সংবিধান অচল হইয়া যাইবে। তাই আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে সীমাবদ্ধ ক্ষমতা পৃথকীকরণ নীতির প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়।

(খ) **গ্রেট ব্রিটেন:** ইংলণ্ডের সংবিধান দেখিয়া আপাতদৃষ্টিতে মনে হইবে যে, সেখানে ক্ষমতা পৃথকীকরণ নীতি কার্যকরী হইয়াছে। রানী মন্ত্রিসভার সাহায্যে শাসন পরিচালনা করেন, পালামেণ্ট আইন রচনা করেন এবং বিচারবিভাগ স্বাধীনভাবে কার্য করেন, কারণ ইহারা শাসনবিভাগ কর্তৃক বরখাস্ত হইতে পারেন না। কিন্তু প্রকৃত ঘটনা এইরূপ নয়। একটু বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে, এই বিভাগগুলি পরস্পরের প্রতি দায়িত্বশীল এবং বাস্তবক্ষেত্রে ইংলণ্ডে ক্ষমতার পৃথকীকরণ নীতি কার্যত পরিত্যক্ত হইয়াছে।

ইংলণ্ডের ক্যাবিনেট বা মন্ত্রিসভা যদিও শাসনবিভাগীয়, কিন্তু ইহারাই প্রকৃতপক্ষে আইনসভাকে পরিচালিত করে। আইনসভায় যে সমস্ত বিল পাস করা হয় তা মূলত ক্যাবিনেট কর্তৃক পূর্বাহ্ণেই গৃহীত ও স্থিরীকৃত হয়। রাজা বা রানী শাসনবিভাগীয় সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী হইয়াও আইনসভা কর্তৃক গৃহীত বিল অনুমোদন করিয়া আইনে পরিণত করিবার অধিকারী। আবার তিনি বিচারবিভাগ কর্তৃক অপরাধীর প্রদত্ত দণ্ড মুকুব ও হ্রাস করিতে পারেন। ইংলণ্ডের লর্ড চ্যান্সেলার ক্যাবিনেট বা শাসনবিভাগের সদস্য হইয়াও লর্ড সভায় সভাপতিত্ব করেন এবং বিচারবিভাগের প্রধান বলিয়া পরিগণিত হন। এই সমস্ত ঘটনা প্রমাণ করে যে, ইংলণ্ডে ক্ষমতার পৃথকীকরণ নীতি প্রয়োগ করা হয় নাই।

(গ) **ভারতবর্ষ:** ভারতবর্ষের সংবিধানে শাসনবিভাগ, আইনবিভাগ ও বিচারবিভাগকে পৃথক করিয়া দেখানো হইলেও এখানে ক্ষমতার পৃথকীকরণ-নীতি কার্যকরী হয় নাই। ভারতবর্ষের রাষ্ট্রপতি শাসনবিভাগীয় সর্বোচ্চ ক্ষমতার

অধিকারী, কিন্তু তিনি আইনসভা কর্তৃক গৃহীত বিলকে আইনে পরিণত করেন, জরুরী অবস্থায় জরুরী আইন প্রণয়ন করিতে পারেন, বিচারপতিদের নিয়োগ করেন, অপরাধীদের দণ্ড মুকুব বা হ্রাস করিয়া থাকেন, প্রয়োজনবোধে তিনি পার্লামেণ্ট, বিভিন্ন রাজ্যের আইনসভা এবং মন্ত্রিসভা ভাঙ্গিয়া দিয়া রাষ্ট্রপতির শাসন প্রবর্তন করিতে পারেন। সুতরাং তাঁহার শুধুমাত্র শাসনবিভাগীয়ই নয়; আইন ও বিচারবিভাগীয় ক্ষমতাও আছে। ভারতবর্ষে মন্ত্রিমণ্ডলী শুধুমাত্র শাসনক্ষমতাই ভোগ করেন না, তাঁহারা আইনসভারও সদস্য। বস্তুতপক্ষে মন্ত্রিসভাই আইনসভা পরিচালনা করেন। বিশেষ করিয়া প্রধানমন্ত্রী শুধুমাত্র শাসনবিভাগ পরিচালনা করেন না, তাঁহার নির্দেশে আইনসভাও পরিচালিত হয়। ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী আইনসভার নেতা। ভারতবর্ষে জেলা-শাসক বা মহকুমা-শাসকেরা শুধুমাত্র জেলা বা মহকুমার সর্বময় শাসনকর্তা নন, তাঁহারা ফৌজদারী মামলার বিচারপতির দায়িত্বও পালন করিয়া থাকেন। এই সমস্ত ঘটনা প্রমাণ করে যে, ভারতবর্ষে শাসনবিভাগ, আইনবিভাগ ও বিচার-বিভাগ স্বতন্ত্র ও পারস্পরিক প্রভাবমুক্ত নয়, বরং ইহারা পরস্পরের উপর নির্ভরশীল।

(ঘ) **সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র:** মার্কসীয় রাষ্ট্রদর্শনের সঙ্গে সঙ্গতি রাখিয়া ক্ষমতার পৃথকীকরণ নীতিকে বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে, মার্কসবাদী দৃষ্টিতে ক্ষমতার পৃথকীকরণ নীতিকে অবশ্য গ্রহণীয় কোন আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করা হয় না। তাই সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে ক্ষমতা পৃথকীকরণ নীতি কার্যকরী করিবার কোন প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায় না। উদাহরণ হিসাবে, প্রিসিডিয়ামের উল্লেখ করা যায়। প্রিসিডিয়াম আইনসভা কর্তৃক নির্বাচিত, কিন্তু ইহার ক্ষমতা আইনবিভাগ ও শাসনবিভাগ উভয় ক্ষেত্রেই প্রসারিত।

৫ ॥ বিকেন্দ্রীকরণ নীতি (Theory of Decentralisation)

শিল্পায়ন ও সমাজ ব্যবস্থার দ্রুত পরিবর্তনের ফলে বর্তমান যুগে রাষ্ট্রের ক্রিয়াকর্ম ও কার্যাবলীর ব্যাপক প্রসার ঘটিয়াছে। উনবিংশ শতাব্দীর মত বর্তমান যুগে রাষ্ট্রের কর্ম পরিধি শুধুমাত্র আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার মধ্যে সীমাবদ্ধ নহে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে শিল্প বিপ্লবের পর হইতে একচেটিয়া কারবার ও ব্যবসায় সংগঠনের উদ্ভব, ভোটাধিকারের প্রসার, দুইটি বিশ্বযুদ্ধ, সমাজতান্ত্রিক

মতবাদের ব্যাপক প্রসার প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ কারণগুলি রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার পরিধিকে প্রসারিত করিতে সাহায্য করিয়াছে। ব্যক্তিগত কর্মোদ্যোগকে সীমিত রাখিয়া রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাও কাজকর্মকে প্রসারিত করিয়া জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্র গঠনের প্রবণতা ক্রমশ ব্যাপ্তি লাভ করিতেছে।

কিন্তু রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাকে শুধুমাত্র প্রসারিত হইলেই চলিবে না ইহাকে সুষ্ঠু ও যথাযোগ্যভাবে প্রয়োগ করিতে হইবে। কারণ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ও দায়িত্বের সুষ্ঠু ও যথাযোগ্য প্রয়োগের দ্বারাই ব্যক্তি স্বাধীনতা রক্ষা, ব্যক্তি মানবের কল্যাণ এবং রাষ্ট্রীয় ভিত্তিকে শক্তিশালী করা যাইতে পারে।

এই অবস্থার পট ভূমিকায় রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা বিকেন্দ্রীকরণ নীতির কথা বলিয়াছেন। সর্বময় ক্ষমতা একই স্থানে কেন্দ্রীভূত না রাখিয়া বিভিন্ন স্থান ও প্রতিষ্ঠানের মধ্য বিভক্ত করিয়া দেওয়াকেই বিকেন্দ্রীকরণ নীতি বলে। বর্তমানে রাষ্ট্রের পরিধি বিশাল হইয়া দেখা দেওয়ায় এই তত্ত্বের প্রয়োজন আরও বেশি অনুভূত হইতেছে। ভারতবর্ষ, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র বা সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের মত বিশাল রাষ্ট্রের সমস্ত ক্ষমতা একই কেন্দ্র হইতে পরিচালিত করা সম্ভব নহে। ইহার জন্য প্রয়োজন ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ। বর্তমান যুগে রাষ্ট্রের হস্তে যে বিপুল এবং অসংখ্য ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হইয়াছে তাহা একই স্থান হইতে প্রয়োগ করিবার চেষ্টা করিলে জটিলতা ও বিশৃঙ্খলা দেখা দিবে। ধরা যাউক ভারতবর্ষে প্রাদেশিক সরকার স্বায়ত্বশাসনমূলক প্রতিষ্ঠান, প্রভৃতির অবলোপ করিয়া যদি সমুদয় ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকার দ্বারা প্রয়োগ করা হয়, তবে স্বাভাবিক কারণেই জটিল, বিশৃঙ্খল এবং বিপজ্জনক পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটিবে। এইরূপ পরিস্থিতিতে জনগণ বা রাষ্ট্র কাহারও কল্যাণ হইতে পারে না। সুতরাং উক্ত পরিস্থিতি সৃষ্টি না করিয়া রাষ্ট্র যাহাতে তাহার ব্যাপক দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করিতে পারে তাহার জন্যই বিকেন্দ্রীকরণ নীতির কথা চিন্তা করা হয়।

বিকেন্দ্রীকরণ তিনটি উপায়ের দ্বারা কার্যকরী যাইতে পারে। প্রথমত, আঞ্চলিক বিকেন্দ্রীকরণ (Territorial Decentralisation)। আঞ্চলিক বিকেন্দ্রীকরণের উদাহরণ হইল বিভিন্ন দেশের যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনপদ্ধতি। রাষ্ট্রকে কয়েকটি অঙ্গরাজ্যে বিভক্ত করিয়া রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা কেন্দ্রীয় ও অঙ্গ রাজ্যগুলির মধ্যে ভাগ করিয়া আঞ্চলিক বিকেন্দ্রীকরণ নীতির প্রবর্তন করা যাইতে পারে।

কেন্দ্রীয় এবং অঙ্গ রাজ্যের সরকারগুলির স্ব স্ব আইন, শাসন এবং বিচার বিভাগ থাকিতে এবং উহারা প্রত্যেকে স্বাধীনভাবে নিজ নিজ এক্তিয়ারভুক্ত ক্ষমতা পরিচালনা করিতে পারিবে। ক্ষমতাকে কেন্দ্রীভূত না রাখিয়া এইরূপভাবে আঞ্চলিক বিকেন্দ্রীকরণের দ্বারা রাষ্ট্র তাহার বিপুল ও ব্যাপক ক্ষমতাকে সুষ্ঠুভাবে প্রয়োগ করিতে পারে। ভারতবর্ষ, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি রাষ্ট্রে এইরূপ আঞ্চলিক বিকেন্দ্রীকরণের নীতি প্রচলিত।

দ্বিতীয়ত, কার্যগত বিকেন্দ্রীকরণের (Functional Decentralisation) দ্বারাও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ করা সম্ভব। রাষ্ট্র সমস্ত কার্য নিজের হস্তে না রাখিয়া যখন নির্দিষ্ট এক একটি কার্য এক একটি প্রতিষ্ঠানের উপর সমর্পন করে তখন তাহাকে কার্যগত বিকেন্দ্রীকরণ বলে। যেমন শিক্ষা এবং পরীক্ষা গ্রহণের বিভিন্ন দায়-দায়িত্ব কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সহ অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় এবং মধ্যশিক্ষা পর্ষদের হস্তে ন্যস্ত করা হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গে বিদ্যুৎ সরবারহ এবং বৈদ্যুতিক করণের দায়িত্ব রাষ্ট্রীয় বিদ্যুৎ পর্ষদের উপর ন্যস্ত করা হইয়াছে। অর্থাৎ রাষ্ট্র সমস্ত ক্ষমতা পালনের দায়িত্ব নিজে না রাখিয়া এইরূপ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ভাগ করিয়া দিলে তাহাকে কার্যগত বিকেন্দ্রীকরণ বলা হয়। বিভিন্ন আধা-সরকারী বা বে-সরকারী প্রতিষ্ঠানের উপরেও কিছু কিছু দায়িত্ব আধুনিক রাষ্ট্রে দেওয়া হইয়া থাকে। কার্যগত বিকেন্দ্রীকরণের ফলে প্রতিটি প্রতিষ্ঠানই নিজের নিজের দায়িত্ব দক্ষতার সঙ্গে এবং সুষ্ঠুভাবে পালন করিতে পারে।

বিকেন্দ্রীকরণের তৃতীয় পন্থা হইল স্থানীয় স্বায়ত্বশাসনমূলক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বিকেন্দ্রীকরণ (Decentralisation through Local Self Government)। স্থানীয় স্বায়ত্ব শাসনমূলক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের নীতি বহুদিন হইতেই বিভিন্ন দেশে প্রচলিত আছে। পৌরজীবনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত কার্যবলীকে সহর এলাকায় পৌরসভা বা পৌর প্রতিষ্ঠানের (Municipality and Corporation) হস্তে এবং গ্রাম অঞ্চলে গ্রাম পঞ্চায়েত, অঞ্চল পঞ্চায়েত, জিলা পরিষদ প্রভৃতি পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠানের হস্তে ন্যস্ত করিয়া স্বায়ত্বশাসনমূলক বিকেন্দ্রীকরণ করা হয়। রাস্তাঘাট নির্মাণ, আবর্জনা পরিষ্কার, জল সরবারহ, রাস্তাঘাটে আলোর বন্দোবস্ত, ফেরীঘাট ও শ্মশানের পরিচালনা প্রভৃতি পৌর দায়িত্ব রাষ্ট্র এই সমস্ত পৌর প্রতিষ্ঠানকে হস্তান্তরিত করিয়া নিজে ইহা পালন করা হইতে মুক্ত থাকিতে পারে।

ব্যক্তিস্বাধীনতা রক্ষার প্রয়োজন হইতে ক্ষমতা পৃথকীকরণ নীতির কথা বলা হইয়াছে। রাষ্ট্রীয় কার্যকে সুষ্ঠু ও দক্ষতার সঙ্গে পালনের জন্য বিকেন্দ্রীকরণ নীতির প্রশ্ন দেখা গিয়াছে। বস্তুত ক্ষমতা পৃথকীকরণ নীতি নহে, ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ নীতির দ্বারাই জনকল্যাণ, জনগণের স্বায়ত্বশাসনের অধিকার দান এবং রাষ্ট্রীয় ভিত্তিকে শক্তিশালী করা সম্ভবপর।

পঞ্চদশ অধ্যায়

সরকারের বিভিন্ন রূপ

(Froms of Government)

বিভিন্ন রাষ্ট্রের প্রকৃতিগত পার্থক্য লক্ষ্য করিয়া আরিষ্টটল হইতে সুরু করিয়া বর্তমান যুগ পর্যন্ত রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা রাষ্ট্রে ও সরকারের বিভিন্ন শ্রেণী-বিভাগের চেষ্টা করিয়াছেন। এই শ্রেণীবিভাগ সর্বত্র বিজ্ঞানসম্মত হইয়াছে—এই কথা বলা যায় না। কিন্তু তাহা সত্বেও সরকারের বিভিন্নরূপের উপলব্ধির ক্ষেত্রে এই শ্রেণীবিভাগের মূল্য আছে।

১ ॥ রাষ্ট্রের শ্রেণীবিভাগ (Classification of States) :

দেশ-কাল ভেদে সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক অবস্থার পরিবর্তনের জন্য বিভিন্ন স্থানে রাষ্ট্র ও সরকার বিভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে, ফলে বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে প্রকৃতিগত পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু অনেকে বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যকার এই ধরণের মৌলিক প্রকৃতিগত পার্থক্য স্বীকার করেন না। তাঁহারা মনে করেন যে প্রতিটি রাষ্ট্র জনসমষ্টি, ভূ-খণ্ড, সার্বভৌমিকতা প্রভৃতি একই উপাদানে গঠিত এবং প্রতিটি রাষ্ট্র একই প্রকারের দায়িত্ব ও কার্য সম্পন্ন করিয়া থাকে বলিয়া বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে প্রকৃতিগত কোন মৌলিক পার্থক্য থাকে না। সুতরাং এই দৃষ্টিকোণ হইতে বিচার করিলে বিভিন্নরাষ্ট্রের মধ্যে কোন মৌলিক প্রকারভেদ নাই, সকল রাষ্ট্রই একই পর্যায়ভুক্ত।

কিন্তু একটু বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে, বিভিন্ন রাষ্ট্র একই উপাদানে গঠিত হইলেও এবং প্রকারের কর্তব্য পালন করিলেও বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে গভীর ও মৌলিক পার্থক্য রহিয়াছে। সরকারের গঠনপদ্ধতি বিচার করিলে উহাদের মধ্যেকার সুদূরপ্রসারী পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। উদাহরণ হিসাবে বলা যায় যে রাষ্ট্র হিসাবে স্পেন ও ইংলণ্ড একই উপাদানে গঠিত এবং একই প্রকারের কর্তব্য পালন করা সত্বেও স্পেনে স্বেচ্ছাচারী এবং ইংলণ্ডে গণতান্ত্রিক সরকার স্থাপিত হইয়াছে। আবার ইংলণ্ডে সীমাবদ্ধ রাজতন্ত্র এবং আমেরিকায় রাষ্ট্রপতি পরিচালিত সরকার লক্ষ্য করা যায়। ইংলণ্ডে এককেন্দ্রীক এবং ভারতবর্ষ, আমেরিকা প্রভৃতি দেশে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায়।

সুতরাং, বাহ্যিক উপাদান বা কার্যের ভিত্তিতে বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে পার্থক্য বিচার না করিয়া ইহাদের গঠন ও প্রকৃতিগত মাপকাঠিতে বিচার করিলে রাষ্ট্র ও সরকারের শ্রেণীবিভাগ একটা নির্দিষ্ট ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে রাষ্ট্র ও সরকার এক নহে—ইহাদের মধ্যকার মৌলিক পার্থক্য মনে রাখিয়া ইহাদের স্বতন্ত্রভাবে শ্রেণীবিভক্ত করা প্রয়োজন।

২॥ আরিষ্টটলের শ্রেণীবিভাগ (Aristotle's classifications)

রাষ্ট্রের শ্রেণীবিভাগের ক্ষেত্রে আরিষ্টটলই পথপ্রদর্শক। অর্থাৎ তিনিই এ ব্যাপারে ভিত্তি রচনা করেন। আরিষ্টটল একটি মৌলিক নীতির উপর নির্ভর করিয়া তৎকালীন গ্রীক্ রাষ্ট্রগুলির শ্রেণীবিভাগ করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রথম নীতি ছিল সার্বভৌম ক্ষমতা প্রয়োগকারীর সংখ্যাভিত্তিক—অর্থাৎ সার্বভৌম ক্ষমতা একজন অথবা কয়েকজন অথবা বহুজনে প্রয়োগ করিতেছে। তাঁহার দ্বিতীয় নীতি ছিল আদর্শ ভিত্তিক—অর্থাৎ রাষ্ট্রক্ষমতা শাসকের স্বার্থে অথবা জনসাধারণের স্বার্থে ব্যবহৃত হইতেছে। এই দুইটি নীতি প্রয়োগ করিয়া আরিষ্টটল নিম্নলিখিত ছয় ভাগে রাষ্ট্রের শ্রেণী বিভাগ করিয়াছেন।

সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারীর সংখ্যা (Number of Sovereigns)	স্বাভাবিক রূপ (Natural form)	বিকৃত রূপ (Perverted from)
একজনের শাসন (Government of one)	রাজতন্ত্র (Monarchy)	স্বৈরাচারতন্ত্র (Tyranny or Despotism)
কয়েকজনের শাসন (Government of few)	অভিজাততন্ত্র (Aristocracy)	স্বার্থগত অভিজাততন্ত্র (Oligarchy)
বহুজনের শাসন (Government of Many)	গণতন্ত্র (Polity)	জনতাতন্ত্র (Democracy)

সুতরাং উপরোক্ত শ্রেণীবিভাগ হইতে দেখা যাইতেছে যে, আরিষ্টটল রাষ্ট্রের স্বাভাবিক এবং কাম্য তিনটি রূপের কথা বলিয়াছেন—রাজতন্ত্র, অভিজাততন্ত্র এবং গণতন্ত্র। এই তিনটি শ্রেণীর শাসকেরাই বিভিন্ন সদ্‌গুণের অধিকারী এবং ইহারা নিজেদের স্বার্থে শাসন ক্ষমতা ব্যবহার না করিয়া জনগণের স্বার্থ ও

কল্যাণে শাসনক্ষমতা ব্যবহার করিয়া থাকে। এই তিন শ্রেণীর রাষ্ট্র-ব্যবস্থার মধ্যে পার্থক্য সার্বভৌম ক্ষমতা প্রয়োগকারীর সংখ্যার উপর নির্ভর করে। রাজতন্ত্রে সার্বভৌম একজন, অভিজাততন্ত্রে কয়েকজন এবং গণতন্ত্রে বহু।

উপরোক্ত তিনটি স্বাভাবিক রূপ ব্যতীতও আরিষ্টটল আরও তিনটি বিকৃত এবং অকাম্য রাষ্ট্র-ব্যবস্থার কথা বলিয়াছেন—স্বৈরাচারতন্ত্র, স্বার্থগত অভিজাততন্ত্র এবং জনতাতন্ত্র। এই তিনটি শ্রেণীর শাসকেরা জনগণের কল্যাণে উপেক্ষা করিয়া নিজেদের স্বার্থে শাসন ক্ষমতা প্রয়োগ করে। আরিষ্টটলের মতে এইরূপ বিকৃত অবস্থায় শাসনক্ষমতা একজনে প্রয়োগ করিলে স্বৈরাচারীতন্ত্র, কয়েকজনে প্রয়োগ করিলে স্বার্থগত অভিজাততন্ত্র এবং বহুজনে প্রয়োগ করিলে জনতাতন্ত্র বলে।

সমালোচনা: পরবর্তীকালে আরিষ্টটলের রাষ্ট্রের শ্রেণীবিভাগকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা সমালোচনা করিয়াছেন। তাঁহারা মনে করেন যে আরিষ্টটলের শ্রেণীবিভাগ প্রাচীন গ্রীকের নগররাষ্ট্র সম্পর্কে প্রযোজ্য হইলেও বর্তমানে যুগে এ ধারণা অচল। রাষ্ট্র কাঠামো ও শাসনব্যবস্থার ক্ষেত্রে বর্তমান যুগে অনেক নতুন নতুন ধ্যান ধারণা দেখা দেওয়াতে আরিষ্টটলের উপরোক্ত শ্রেণীবিভাগ যথেষ্ট নহে, এমন কি অনেকস্থানে অর্থহীন হইয়া পড়িয়াছে। তবে জেলিনেক (Jellinek), ব্লুনৎস্লি (Bluntschli), বার্জেস (Burgess) প্রভৃতিরা আরিষ্টটলের শ্রেণীবিভাগকে সমর্থণ করিয়াছেন এবং তাঁহাদের মতে এই শ্রেণীবিভাগ বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর রচিত।

দ্বিতীয়ত, সমালোচকদের মতে আরিষ্টটল রাষ্ট্র ও সরকারের মধ্যে পার্থক্য করেন নাই—একই অর্থে এই দুইটি সংস্থাকে তিনি ব্যবহার করিয়াছেন। ফলে, তাঁহার শ্রেণীবিভাগ সুস্পষ্ট হইয়া উঠে নাই। আরিষ্টটলের বিরুদ্ধে এই সমালোচনার মধ্যে যথেষ্ট সত্য আছে। বস্তুত রাষ্ট্রের একটি উপাদান হইল সরকার, তাই রাষ্ট্র ও সরকারের মধ্যে পার্থক্য সুস্পষ্ট। রাষ্ট্র ও সরকারের মধ্যকার এই পার্থক্যকে আরিষ্টটল তাঁহার শ্রেণীবিভাগের মধ্যে প্রতিফলিত করেন নাই।

তৃতীয়ত, সমালোচকেরা মনে করেন যে আরিষ্টটল সার্বভৌমের সংখ্যার উপর অত্যাধিক গুরুত্ব দেওয়ার জন্য প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য উপেক্ষিত হইয়াছে। তাই তাঁহার শ্রেণীবিভাগ বিজ্ঞানসম্মত হইয়া উঠিতে পারে নাই। সরকারের

গঠনগত বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্য পার্থক্য নির্দেশ করিলে একমাত্র উহা বিজ্ঞানভিত্তিক হইতে পারে।

এইবার আমরা রাজতন্ত্র ও অভিজাততন্ত্র সম্পর্কে স্বতন্ত্রভাবে কিছু আলোচনা করিতে চাই।

রাজতন্ত্র (Monarchy) : সার্বভৌম ক্ষমতা যখন উত্তরাধিকার সূত্রে কোন ব্যক্তি বিশেষের হস্তে ন্যস্ত থাকে, তখন এই প্রকারের শাসন-ব্যবস্থাকে রাজতন্ত্র নামে অভিহিত করা যায়। মধ্যযুগে এক প্রকারের রাজতন্ত্রের সন্ধান পাওয়া যায় যেখানে রাজা জনগণের দ্বারা নির্বাচিত হইতেন। উত্তরাধিকার সূত্রে ক্ষমতা লাভ না করিয়া নির্বাচনের মধ্য দিয়া ক্ষমতায় আসীন হইলে ইহাকে রাজতন্ত্র বলা যায় না।

রাজতন্ত্রকে চরম (Absolute Monarchy) এবং সীমাবদ্ধ (limited or constitutional Monarchy) এই দুইভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। আদিতে বেশিরভাগ রাষ্ট্রেই চরম রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত ছিল। চরম রাজতন্ত্রে রাজার ক্ষমতা সমস্ত প্রকার নিয়ন্ত্রণের উর্ধ্বে। বর্তমানে চরম রাজতন্ত্রের কথা ভাবিতেও পারা যায় না। এখনও যে সমস্ত দেশে রাজতন্ত্র আছে তাহা সীমাবদ্ধ রাজতন্ত্র। বস্তুত বর্তমান যুগে বিভিন্ন দেশে রাজতন্ত্রের বিলোপ ঘটাইয়া প্রতিনিধিত্বমূলক শাসন-ব্যবস্থা গৃহীত হইতেছে।

রাজতন্ত্রের ভবিষ্যত যদিও সম্ভাবনাময় নয়, কিন্তু ইহা স্বীকার করিতেই হইবে যে রাজতন্ত্র একটি ঐতিহাসিক প্রয়োজনকে সিদ্ধ করিয়াছে—সঙ্ঘবদ্ধ, সুস্থ ও স্বাভাবিক সমাজ-জীবন গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করিয়াছে। জন স্টুয়ার্ট মিল (J. S. Mill) যথার্থই বলিয়াছেন যে বর্বরদের নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য রাজতন্ত্রই উপযুক্ত শাসনব্যবস্থা। দ্বিতীয়ত, রাজতন্ত্রের সারল্য ও সহজবোধ্য রূপরেখাটি ইহার আর একটি প্রধান গুণ। তৃতীয়ত, রাজতন্ত্র শাসকের প্রতি একটি শ্রদ্ধা-ভয় মিশ্রিত মনোভাব সৃষ্টি করে যাহা আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয়। চতুর্থত, রাজতন্ত্রে ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত থাকে বলিয়া ইহা জাতিকে একতাবদ্ধ করে এবং শাসনকে দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করে। সর্বশেষে বলা যায় যে, জাতীয় রাষ্ট্র ও জাতীয়তাবাদের অভ্যুদয়ের ক্ষেত্রে রাজতন্ত্র একটি বিশেষ ভূমিকা পালন করিয়া থাকে।

কিন্তু পূর্বেই বলা হইয়াছে যে বর্তমান যুগে রাজতন্ত্র অচল ও অকাম্য।

কারণ হিসাবে বলা যায় যে উত্তরাধিকারসূত্রে কাহাকেও রাষ্ট্রের চরম ক্ষমতা-দানের নীতি একান্তভাবে অবৈজ্ঞানিক ও অযৌক্তিক কারণ অযোগ্য ও স্বার্থপর রাজার হস্তে ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হইলে বিপদজনক পরিস্থিতির সৃষ্টি হইতে পারে এবং জনগণকে সীমাহীন দুঃখ কষ্টের সম্মুখীন হইতে হয়। ইংলণ্ডের রাজা অষ্টম হেনরী ; ফ্রান্সের চতুর্দশ লুই ; রাশিয়ার জার সম্রাটগণ ইহার উদাহরণ। দ্বিতীয়ত, আদর্শ হিসাবে রাজতন্ত্রের বিশেষ কোন মূল্য নাই। কোন মহৎ আদর্শ বা ধ্যান-ধারণা রাজতন্ত্রের মধ্য দিয়া বাস্তবে রূপায়িত হইতে দেখা যায় না।

অভিজাততন্ত্র (Aristocracy) পূর্বেই বলা হইয়াছে যে অভিজাতশ্রেণী যখন শাসন ক্ষমতায় আসীন থাকে এবং সর্বসাধারণের কল্যাণে যখন তাহারা শাসন ক্ষমতাকে প্রয়োগ করে তখন তাহাকে অভিজাততন্ত্র বলে। সর্বসাধারণের কল্যাণের পরিবর্তে তাহারা নিজেদের স্বার্থে শাসনক্ষমতা প্রয়োগ করিলে ইহাকে মুখ্যতন্ত্র (oligarchy) বলে।

গ্রীক ধারণায় বিশেষ কয়েকটি সৎগুণের অধিকারীকে অভিজাতশ্রেণী বলা হইত। সামন্ত যুগে ইংলণ্ডে এইরূপ অভিজাততন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। বর্তমানে অবশ্য জন্মগত, ভূমিগত এবং সম্পদগত দিক হইতে বিশেষাধিকার লাভ করিয়া যে শ্রেণী জন্মলাভ করে তাহাকে অভিজাত শ্রেণী বলে। সুতরাং বর্তমানে অভিজাত শ্রেণী বলিতে যাহা বুঝায় গ্রীক ধ্যান-ধারণায় তাহাকে অভিজাত বলা হইত না। অর্থাৎ গ্রীক চিন্তায় সৎগুণের অধিকারী ব্যক্তি সমষ্টির শাসনকে অভিজাততন্ত্র বলা হইত। বর্তমানে সামাজিক দিক হইতে বিশেষাধিকার লাভ করিয়া যে শ্রেণী শাসন ক্ষমতা পরিচালনা করে তাহাকেই অভিজাততন্ত্র বলে।

মিলের মতে গ্রীক ধারণা অনুযায়ী অভিজাততন্ত্র মানেই সৎ, দক্ষ ও উদ্যমশীলের শাসন। সুতরাং আদর্শদিক হইতে এই ধরণের শাসনব্যবস্থা কাম্য। কিন্তু বাস্তবে দেখা যাইবে যে দক্ষতার নামে এই শাসনব্যবস্থা রাষ্ট্রকে যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত করিয়া জনজীবনের প্রভূত ক্ষতি সাধন করিয়াছে। দ্বিতীয়ত, সাম্য, স্বাধীনতা প্রভৃতি মহৎ গণতান্ত্রিক আদর্শগুলি শ্রেণীস্বার্থবাহী অভিজাততন্ত্রে বিশেষ কোন স্থান পায় না। তৃতীয়ত, অভিজাততন্ত্র জনগণের সম্মতির উপর প্রতিষ্ঠিত নয় বলিয়া ইহা অযৌক্তিক ও অকাম্য। চতুর্থত,

অভিজাততন্ত্র রক্ষণশীল এবং স্বভাবতই ইহা প্রগতি বিরোধী। নতুন চিন্তা ধ্যান-ধারণায় কোন স্থান অভিজাততন্ত্রে থাকিতে পারে না।

সর্বোপরি গণতন্ত্রের সঙ্গে অভিজাততন্ত্রের তুলনা করিয়া বলা যাইতে পারে যে অভিজাততন্ত্র অপেক্ষা গণতন্ত্র অনেক মহৎ এবং উচ্চতর আদর্শের প্রতীক এবং জনকল্যাণের পটভূমিকায় গণতন্ত্র অনেক বেশি কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করিতে পারে।

৩॥ আধুনিক শ্রেণীবিভাগ (Modern classifications):

রাষ্ট্রের বাহ্যিক প্রকৃতিগত সাদৃশ এবং বৈষাদৃশ্যকে পরিহার করিয়া সরকারের বিভিন্নরূপের মধ্যেকার সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্যের ভিত্তিতে শ্রেণীবিভাগ করাকেই অধিকতর সন্তোষজনক বলিয়া আধুনিক যুগের রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা মনে করেন।[1] আধুনিককালে রাষ্ট্রচিন্তা জগতে রাষ্ট্র ও সরকারের কাঠামো সম্পর্কে নানা ধরণের নতুন নতুন ধ্যাণ-ধারণার প্রকাশ ঘটিতেছে। বিভিন্ন ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হইয়া বিভিন্ন দেশে শাসন ব্যবস্থার নতুন ধরণের কাঠামো লইয়া পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলিতেছে। ম্যারিয়ট (Merriott) তিনটি ভাগে বিভক্ত করিয়া এক প্রকারের আধুনিক শ্রেণীবিভাগ করিয়াছেন। তাঁহার মতে (১) এককেন্দ্রীক ও যুক্তরাষ্ট্রীয় (২) দুষ্পরিবর্তনশীল ও সুপরিবর্তনশীল (৩) রাজতন্ত্র, রাষ্ট্রপতি পরিচালিত এবং আইনসভা পরিচালিত—এই তিনটি ব্যাপক শ্রেণীবিভক্ত করা যাইতে পারে। লীকক্ (Leacock) গণতন্ত্র ও স্বেচ্ছাচারীতার মধ্যকার পার্থক্যের ভিত্তিতে শ্রেণীবিভাগ করিয়াছেন। উইলোবি (willoughby) সরকারের কাঠামোগত বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করিয়া শ্রেণী-বিভাগ করিয়াছেন।

আধুনিক শ্রেণীবিভাগের কয়েকটি ব্যাপকভাবে স্বীকৃত নীতির সন্ধান পাওয়া যায় গেটেলের বক্তব্যের মধ্য দিয়া। সার্বভৌম ক্ষমতা প্রয়োগকারী সংখ্যা, ক্ষমতা পৃথকীকরণের ভিত্তিতে শাসন ও আইন বিভাগের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক এবং শাসন ক্ষমতার বণ্টন রীতি—এই তিনটি মূল সূত্রের উপর নির্ভর করিয়া গেটেল আধুনিক শ্রেণীবিভাগের কথা বলিয়াছেন। প্রথম নীতির উপর ভিত্তি করিয়া সরকারকে মূলত রাজতন্ত্র বা একনায়কতন্ত্র এবং গণতন্ত্রে বিভক্ত করা যায়। দ্বিতীয় নীতির ভিত্তিতে রাষ্ট্রপতি পরিচালিত এবং

1. "...........hence the most satisfactory classification is based on the similarities and differences of Governmental form." —Gettell.

আইনসভা বা মন্ত্রিসভা পরিচালিত সরকারের অস্তিত্ব দেখা যায়। তৃতীয় নীতি অনুসারে এককেন্দ্রীক ও যুক্তরাষ্ট্রে এই দুই প্রকারের সরকার দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু মনে রাখা প্রয়োজন যে কার্যগত বা ক্ষমতার পৃথকীকরণ-নীতির ভিত্তিতে রাষ্ট্রপতি পরিচালিত এবং আইনসভা পরিচালিত এবং আঞ্চলিক ক্ষমতা বণ্টনের ভিত্তিতে এককেন্দ্রীয় এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় এই দুই প্রকারের শ্রেণীবিভাগ বেশ কিছু পরিমাণে সংমিশ্রিত শ্রেণীবিভাগ। কারণ, এককেন্দ্রীক রাষ্ট্র রাষ্ট্রপতির পরিচালিত এবং আইনসভা পরিচালিত দুই প্রকারেরই হইতে পারে। আবার যুক্তরাষ্ট্র ও রাষ্ট্রপতি পরিচালিত ও আইনসভা পরিচালিত দুই প্রকারেরই হইতে পারে। গেটেল তাই এই প্রকারের শ্রেণীবিভাগকে মিশ্রিত শ্রেণীবিভাগ বলিয়াছেন।[2]

মূলত উপরোক্ত নীতিগুলিকে গ্রহণ করিয়া আরও ব্যাপকভাবে রাষ্ট্রের যে শ্রেণীবিভাগ করা হয় তাহার কাঠামো উপস্থিত করা হইল (পরের পৃষ্ঠায় ছক দ্রষ্টব্য)। এই শ্রেণীবিভাগ অনুযায়ী রাষ্ট্র এবং সরকারকে স্বেচ্ছাতন্ত্র, একনায়কতন্ত্র ও গণতন্ত্র তিনভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। স্বেচ্ছাতন্ত্রের ক্ষমতা রাজা, সামরিক নায়ক বা অভিজাত শ্রেণীর হস্তে কেন্দ্রীভূত থাকিতে পারে। একনায়কতন্ত্র তিন প্রকারের হইতে পারে—ব্যক্তিগত, দলগত এবং শ্রেণীগত। গণতন্ত্র মূলত প্রজাতন্ত্র এবং সীমাবদ্ধ রাজতন্ত্রে বিভক্ত। ইহাদের প্রতিটি শ্রেণীকে আবার এককেন্দ্রীক ও যুক্তরাষ্ট্রীয় এবং রাষ্ট্রপতি পরিচালিত ও আইনসভা পরিচালিত সরকারে বিভক্ত করা যায়।

বর্তমানে অবশ্য বিভিন্ন দেশের শাসন পদ্ধতি বিচারের ক্ষেত্রে গেটেল আলোচিত নিম্নলিখিত তিনটি চরিত্রের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়:

১। গণতন্ত্র এবং একনায়কতন্ত্র (Democracy and Dictatorship)

২। রাষ্ট্রপতি শাসিত এবং আইসভা শাসিত সরকার (Presidential and Parliamentary)

৩। এককেন্দ্রীক এবং যুক্তরাষ্ট্র (Huitary and Federal)

আমরা এই সরকারের এই ছয়টি রূপ লইয়া পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করিতেছি।

2. "The classification of governments on the basis of functional separation into presidential and cabinet types, and on the basis of territorial division into unitary and federal types, is a cross classification." —Gettell

রাষ্ট্রের শ্রেণী বিভাগ
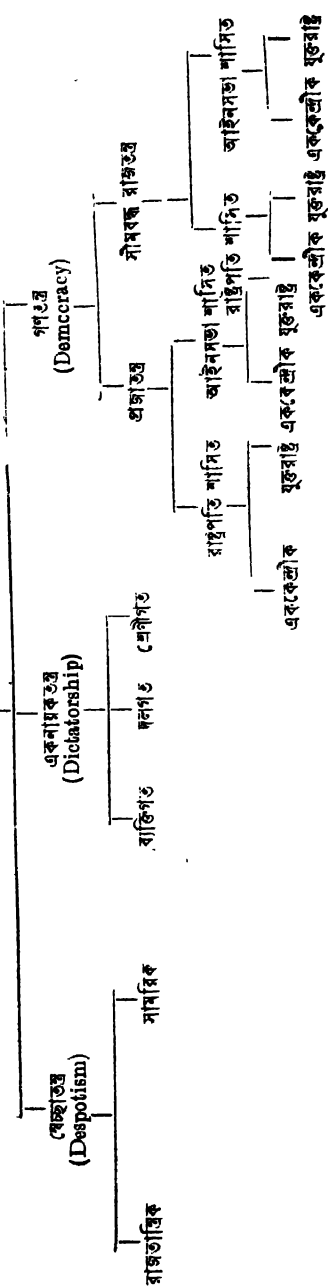
ষোড়শ অধ্যায়

গণতন্ত্র ও একনায়কতন্ত্র

(Democracy and Dictatorship)

লর্ড ব্রাইসকে অনুসরণ করিয়া বলা যায় যে যেখানে একশত বৎসর পূর্বে সুইজারল্যাণ্ডের কয়েকটি ক্যাণ্টনে টিম টিম করিয়া গণতন্ত্রের দীপ প্রজ্বলিত ছিল, সেখানে গণতন্ত্র বর্তমানে একটি সর্বজনস্বীকৃত শাসনব্যবস্থা হিসাবে ব্যাপকভাবে স্বীকৃত ও গৃহীত হইয়াছে। বস্তুত বর্তমান যুগ গণতন্ত্রের যুগ। রাষ্ট্রনৈতিক আদর্শ হিসাবে গণতন্ত্রের শ্রেষ্ঠত্ব ও অনিবার্যতা আজ দ্ব্যর্থহীনভাবে স্বীকৃত। আমাদের যুগের সমাজ-ব্যবস্থা, রাষ্ট্রব্যবস্থা এবং শাসনব্যবস্থার ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক আদর্শের অবদান ও ভূমিকা অপরিসীম গুরুত্বের দাবী রাখে। এই অধ্যায়ে আমরা বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ হইতে গণতন্ত্রের আলোচনা উপস্থিত করিলাম।

১॥ গণতন্ত্রের অর্থ ও আদর্শ (Meaning and ideals of Democracy)

বর্তমান যুগে 'গণতন্ত্র' শব্দটির সঙ্গে আমরা বিশেষভাবে পরিচিত। সত্তর-আশি বৎসর পূর্বেও 'গণতন্ত্র' শব্দটি যথেষ্ট বিতৃষ্ণা এবং ভীতি সৃষ্টি করিত, কিন্তু বর্তমানে ইহা জনগণের একটা শ্রদ্ধামিশ্রিত ভালবাসা আদায় করিতে সমর্থ হইয়াছে। কিন্তু প্রথমেই প্রশ্ন থাকিয়া যাইতেছে, গণতন্ত্র বলিতে আমরা কি বুঝি ? প্লেটো এবং আরিষ্টটল মনে করিতেন যে, সেখানে শাসন-ক্ষমতা ব্যাপক জনসাধারণের হস্তে ন্যস্ত থাকে এবং উহারা জনগণের কল্যাণ উপেক্ষা করিয়া নিজেদের স্বার্থে শাসনক্ষমতা প্রয়োগ করে, তাহাকে গণতন্ত্র বলে। তাঁহাদের মতে গণতন্ত্র সরকারের স্বাভাবিকরূপ নহে,—বিকৃতরূপ।

কিন্তু আরিষ্টটল প্রদত্ত গণতন্ত্রের অর্থের এই ব্যাখ্যা বর্তমানযুগে কেহ স্বীকার করেন না। মোটামুটিভাবে ব্যাপক অর্থে মনে করা হয়, যে শাসন-ব্যবস্থায় জনগণই শাসন ক্ষমতার প্রকৃত অধিকারী, তাহাকে গণতন্ত্র বলে। বস্তুত গণতন্ত্রের শব্দগত অর্থও ইহাই। 'গণতন্ত্র' শব্দটি *Demos* এর *Krat*[illegible] নামক দুইটি গ্রীক শব্দের সমন্বয়ে গঠিত, যাহার অর্থ 'জনগণের ক্ষমতা'।

আব্রাহাম লিঙ্কন গণতন্ত্রের যে সংজ্ঞা দিয়াছেন তাহা খুবই জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছে'। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে লিঙ্কন গণতন্ত্রের যে সংজ্ঞা দিয়াছেন তাহা একান্তভাবেই গণতান্ত্রিক সরকার বা **গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থার** সংজ্ঞা। তিনি বলিয়াছেন: Democracy is a Government of the people, by the people and for the people—গণতন্ত্র জনগণের সরকার, জনগণের দ্বারা পরিচালিত সরকার এবং জনকল্যাণে নিয়োজিত সরকার। সুতরাং তত্ত্বগত দিক হইতে লিঙ্কনের সংজ্ঞা অনুযায়ী গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় জনগণের ইচ্ছা, জন-প্রতিনিধিত্ব এবং জনকল্যাণ মূর্ত হইয়া উঠে।

লিঙ্কন প্রদত্ত গণতন্ত্রের সংজ্ঞা লইয়া অবশ্য বিতর্কের অবকাশ আছে। প্রথমত, 'জনগণের সরকার' দ্বারা গণতন্ত্রে জনগণই সরকারের উৎস ইহা ব্যক্ত হইয়াছে। দ্বিতীয়ত, 'জনগণেব দ্বারা পরিচালিত সরকার' বলিতে জনগণের প্রতিটি অংশ সরকাব পরিচালনায় অংশ গ্রহণ করে ইহাই প্রতিয়মান হয়। প্রসঙ্গত সীলি গণতন্ত্রের যে সংজ্ঞা দিয়াছেন তাহার উল্লেখ করা যাইতে পারে। সীলি বলিয়াছেন, যেখানে শাসন-ব্যবস্থায় সকলেই অংশ গ্রহণ করে তাহা গণতন্ত্র।[1] কিন্তু সর্বসাধারণ সরকার পরিচালনায় অংশ গ্রহণ করে না এবং করিতে পারেও না। ডাইসী মনে করেন, যেখানে তুলনামূলকভাবে জনগণের একটি বিরাট অংশ শাসনকার্য পরিচালনায় অংশ গ্রহণ করে তাহাকেই 'জনগণের দ্বারা পরিচালিত সরকার' বলা যাইতে পারে। লর্ড ব্রাইসও গণতন্ত্র বলিতে যোগ্যতাসম্পন্ন নাগরিকদের অধিকাংশের (অর্থাৎ দুই-তৃতীয়াংশ অংশের) শাসন প্রবর্তনের কথা বলিয়াছেন।[2] তৃতীয়ত, 'জনগণের সরকার' বলিতে জনসাধারণের কল্যাণ সাধনই মূল লক্ষ্য হিসাবে বোঝান হইয়াছে।

ম্যাকআইভার মনে করেন যে গণতন্ত্র বলিতে সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ অথবা অন্য কোন অংশ শাসন পরিচালনা করিবে ইহা বুঝায় না, ইহার দ্বারা কে এবং কোন উদ্দেশ্যে শাসন করিবে তাহা স্থির করাকে বুঝায়।[3] সুতরাং এই অর্থে মনোনয়নের স্বাধীনতাই (freedom of choice) গণতন্ত্রের মূলভিত্তি।

1. "A Government in which every one has a share." —Seeley

2. "A government in which the will of the majority of qualified citizens rules, taking the qualified citizens to constitute the great bulk of the inhabitants, say, roughly, at least three-fourths, so that the physical force of the citizens coincides (broadly speaking) with their voting power." —Lord Bryce

3. "Democracy is not a way of governing, whether by majority or otherwise, primarily a way of determining, who shall govern, and broadly, to what ends". —Mac Iver

জন স্টুয়ার্ট মিল গণতন্ত্র বলিতে রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতায় সকলের প্রবেশাধিকার বুঝাইয়াছেন।[4] এইরূপ ব্যবস্থা কার্যকরী হইলে শাসক ও শাসিতের আদিম ও চিরন্তন প্রভেদ লুপ্ত হইয়া সকল মানুষের সমান অধিকারের ভিত্তিতে সরকার গঠিত হয়। গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় শাসন ক্ষমতা সামগ্রিকভাবে জনগণের হস্তে ন্যস্ত থাকে। গণসার্বভৌমত্ব ও জন-কল্যাণই গণতন্ত্রের মূলভিত্তি। কিন্তু ইহার জন্য প্রয়োজন ব্যক্তিগত অধিকার ও সাম্য প্রতিষ্ঠা, কারণ ব্যক্তিগত অধিকার ও সাম্য ব্যতীত গণসার্বভৌমত্ব ও জনকল্যাণ কার্যকরী হইতে পারে না। বস্তুত সাম্যই গণতন্ত্রের ভিত্তি।

উপরোক্ত আলোচনার ভিত্তিতে আমরা গণতন্ত্রের কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করিতে পারি। প্রথমত, গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা জনমতের উপর ভিত্তি করিয়া প্রতিষ্ঠিত হয় (Resting on public opinion) এবং জনমতই গণতন্ত্রের প্রাণ। দ্বিতীয়ত, গণতান্ত্রিক শাসন পরিচালনার ক্ষেত্রে যোগ্যতাসম্পন্ন নাগরিকদের একটি বিরাট অংশকে সক্রিয়ভাবে সরকারী কার্যে অংশ গ্রহণ করিতে হইবে। নাগরিকদের সকলের সরকারের কার্যে অংশ গ্রহণ করিবার যোগ্যতা থাকে না, সুতরাং গণতন্ত্র যোগ্যতাসম্পন্ন নাগরিকদের সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন। তৃতীয়ত, তত্ত্বগত দিক হইতে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা জনগণের হস্তে ন্যস্ত থাকে। চতুর্থত, জনকল্যাণই গণতন্ত্রের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং সাম্যনীতিই ইহার মূলভিত্তি। অর্থাৎ গণতন্ত্র সামাজিক, অর্থ নৈতিক ও রাজনৈতিক সমান অধিকার সম্পন্ন মানুষের সমাজ।

গণতন্ত্রের আদর্শ : গণতন্ত্র সরকারের একটি বিশেষ রূপের বা একটি বিশেষ শাসনব্যবস্থার কথা ব্যক্ত করিলেও ব্যাপক অর্থে গণতন্ত্রকে আমরা একটি মহান আদর্শ হিসাবে দেখি। ইহার এইরূপ একটি আদর্শগত তাৎপর্য থাকিবার জন্য গণতন্ত্রকে বিভিন্নভাবে ও বিভিন্ন অর্থে প্রয়োগ করা হইয়া থাকে। গণতন্ত্র একাধারে বিশেষ ধরণের শাসনব্যবস্থা, সমাজব্যবস্থা, রাষ্ট্রব্যবস্থা, জীবন ধারণ পদ্ধতি, দৃষ্টিভঙ্গী বা আদর্শ প্রভৃতি নির্দেশ করে। কোন কোন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী মনে করেন যে বিভিন্ন ও ব্যাপক অর্থে গণতন্ত্রকে প্রয়োগ করার জন্য গণতন্ত্রের ধান-ধারণা এখনও অস্পষ্ট এবং অনির্দিষ্ট রহিয়াছে।[5] সে যাহাই হউক আমরা

4. "Admission of all to a share in Sovereign power of the state."
—J. S. Mill

5. "(Democracy is) the most elusive and ambiguous of all political terms.
—Mabbott

এখানে আদর্শ হিসাবে বিভিন্ন অর্থে গণতন্ত্রের প্রয়োগ লইয়া আলোচনা করিতেছি।

সমাজব্যবস্থার ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক আদর্শ আলোচনা করিতে যাইয়া বলা যায় যে গণতান্ত্রিক সমাজ (Democratic Society) এক প্রকারের সামাজিক সংগঠন যেখানে সমাজের সমষ্টিগত কার্যকলাপে ব্যক্তির অংশ গ্রহণ অবধারিত এবং যেখানে কর্মনীতি শেষ পর্যন্ত সমস্ত জনসাধারণের ইচ্ছার দ্বারাই স্থিরীকৃত হয়। বার্ণস (Burns) বলিয়াছেন যে গণতান্ত্রিক সমাজে প্রত্যেকেই সমান এই অর্থে যে প্রত্যেকেই সমাজের এক একটি অচ্ছেদ্য এবং অপরিহার্য অংশ।[6] জন্ম বা সম্পত্তিগতভাবে বিশেষাধিকারকে অস্বীকার করিয়া সম অধিকার ও সম সুযোগ সুবিধার একটি সামাজিক আবহাওয়া সৃষ্টির মধ্য দিয়াই সামাজিক গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা ঘটিতে পারে।

গণতন্ত্র রাষ্ট্রগত একটি রূপও বটে। রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রে সাম্য প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়া গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র (Democratic state) রূপ লাভ করিতে পারে। যে রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থা জনসম্মতির উপর প্রতিষ্ঠিত এবং জনগণের সমষ্টিগত ইচ্ছার দ্বারা যে রাষ্ট্র পরিচালিত হয় তাহাকে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র বলে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থা যে কোন রূপের হইতে পারে।[7] রাষ্ট্র গণতান্ত্রিক হইলে শাসনব্যবস্থাও গণতান্ত্রিক হইবে এমন কোন কথা নাই। কোন রাজতন্ত্র যদি সাম্যনীতি গ্রহণ করে, জনসম্মতির উপর নির্ভরশীল হয় এবং জনগণের সমষ্টিগত ইচ্ছার উপর ভিত্তি করিয়া শাসন পরিচালনা করে, তবে আমরা ইহাকে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র বলিতে পারি। অর্থাৎ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রেও রাজতন্ত্র বা অন্য প্রকারের শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে।

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র, সমাজ এবং শাসনব্যবস্থা ব্যতীত অনেকে শ্রমশিল্পেও গণতন্ত্রের (Industrial Democracy) কথা বলেন। যাহাদের বুদ্ধি, শ্রম ও শক্তিতে ধনোৎপাদন সম্ভব হইয়াছে, তাহারাই শিল্পের উৎপাদন, বিনিময়, বণ্টন প্রভৃতি পরিচালনার মালিক—ইহাই গণতান্ত্রিক শ্রমশিল্পের মূল বক্তব্য।

জীবন ধারণ পদ্ধতি, দৃষ্টিভঙ্গী প্রভৃতির ক্ষেত্রেও গণতন্ত্রের আদর্শের কথা

---

6. "Democracy as an ideal is a society of equals in the sense that each is an integral and irresplaceable part of the whole." —Burns

7. "......Democracy as a form of state is consistent with any type of Government." —Hearnshaw

বলা হয়। একটি বিশেষ তত্ত্বের মধ্য আবদ্ধ না থাকিয়া গণতন্ত্র একটি মহৎ আদর্শে রূপায়িত হইয়াছে। ব্যক্তিমানুষের শুভ বুদ্ধি, চিন্তা এবং চেতনার উপর আস্থা রাখিয়া প্রত্যেকের স্বাধীন ব্যবহারের পর্যাপ্ত সুযোগ সৃষ্টির দ্বারা সর্ব মানবের ব্যাপকতর কল্যাণ সাধন করাই গণতান্ত্রিক আদর্শের মূল কথা। ভীতি ও সন্ত্রাসের রাজত্বকে চিরতরে নিশ্চিহ্ন করিয়া জনগণের ইচ্ছা ও সম্মতির উপর শাসনব্যবস্থা কায়েম করিবার যে আদর্শ গণতন্ত্র প্রচার করিয়াছে তাহার মূল্য অপরিসীম।

২ ॥ গণতান্ত্রিক সরকারের শ্রেণীবিভাগ (Classification of Democratic Government)

পূর্ববর্তী আলোচনায় দেখা গিয়াছে যে 'গণতন্ত্র' শব্দটি ব্যাপক এবং বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। তবে গণতন্ত্র দ্বারা প্রধানত গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থাকেই বোঝায়। বর্তমানে আমাদের আলোচনা গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা লইয়া। জনগণের সম্মতির উপর ভিত্তি করিয়া যে শাসন ব্যবস্থা গঠিত হয় তাহাকে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা বলিয়া অভিহিত করিলে দেখা যাইবে যে জনগণের সম্মতি প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ এই দুই ভাবে লাভ করা যায়। সুতরাং গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থাকে আমরা দুই ভাগে বিভক্ত করিতে পারি—প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র এবং পরোক্ষ গণতন্ত্র।

(ক) **প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র** (Direct Democracy)—যে শাসনব্যবস্থায় নাগরিকগণ প্রত্যক্ষভাবে শাসন পরিচালনায় অংশ গ্রহণ করে তাহাকে প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র বলে। প্রাচীন গ্রীসের নগর-রাষ্ট্রে (city state) এইরূপ শাসন ব্যবস্থার প্রচলন ছিল। প্রাচীন গ্রীসের নগর-রাষ্ট্রের নাগরিকগণ সকলে কোন নির্দিষ্ট দিনে এবং স্থানে সমবেত হইয়া আইন প্রণয়ন হইতে সুরু করিয়া সমস্ত শাসনতান্ত্রিক ও বিচার বিষয়ক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিত এবং জনগণের এই সমস্ত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী শাসন পরিচালিত হইত। জনগণের প্রত্যক্ষ অংশ গ্রহণের মধ্য দিয়া এইরূপ শাসন পরিচালিত হইত বলিয়া ইহাকে প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র বলা হয়।

কিন্তু বর্তমান যুগে গ্রীসের নগর রাষ্ট্রের মত প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। সেই যুগের রাষ্ট্র ছিল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এক একটি নগর ভিত্তিক। জনসংখ্যাও ছিল খুবই কম এবং রাষ্ট্রনৈতিক জীবনে কোন জটিলতা ছিল না। কিন্তু বর্তমানে

রাষ্ট্রগুলির আয়তন বিরাট, লোকসংখ্যা বিশাল এবং রাষ্ট্রনৈতিক সমস্যা জটিল হইয়া দেখা দেওয়ায় প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক পদ্ধতি গ্রহণের কোন প্রশ্নই উঠে না। বর্তমানে এখনও সুইজারল্যাণ্ডের কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্যান্টনে এই ব্যবস্থা রহিয়াছে।

(খ) **পরোক্ষ গণতন্ত্র** (Indirect Democracy)—বর্তমান যুগের রাষ্ট্রের আয়তন, লোকসংখ্যা, সমস্যা, কার্যাবলীর সঙ্গে সঙ্গতি রাখিয়া যে গণতান্ত্রিক শাসনপদ্ধতির প্রবর্তন করা হইয়াছে তাহাকে অপ্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ গণতন্ত্র বা জনপ্রতিনিধিমূলক গণতন্ত্র (Representative Democracy) বলা হয়। পরোক্ষ গণতন্ত্রে জনগণ শাসকমণ্ডলীকে নির্বাচিত করে এবং তাহারা জন প্রতিনিধি হিসাবে শাসন প্ররিচালনা করে। জনপ্রতিনিধিরা তাহাদের কাজের জন্য নাগরিকদের নিকট দায়িত্বশীল থাকে, নাগরিকদের আস্থা অর্জন করিয়া শাসন পরিচালনায় বহাল থাকে। অর্থাৎ জনগণের নির্বাচিত আস্থা ভাজন প্রতি-নিধিদের দ্বারা শাসনকার্য পরিচালনা করাকে পরোক্ষ গণতন্ত্র বলে।

জন স্টুয়ার্ট মিল পরোক্ষ গণতন্ত্রের সংজ্ঞা দিয়া বলিয়াছেন যে এই প্রকারের শাসন ব্যবস্থায় জনসংখ্যার সমগ্র বা অধিকাংশ তাহাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে শাসন পরিচালনার ক্ষমতা প্রয়োগ বা ব্যবহার করেন।[৪] জনগণ তাহাদের প্রতিনিধিদের একটা নির্দিষ্ট সময় অন্তর নির্বাচন করে এবং এই প্রতিনিধিরা নির্বাচিত হইবার পর জনগনের ইচ্ছা ও মতানুযায়ী আইন রচনা ও শাসন পরিচালনা করেন। পরবর্তী নির্বাচনে নাগরিকগণ এই সমস্ত প্রতিনিধিদের কার্যাবলী পর্যালোচনা করিয়া উহাদের পুনর্নির্বাচিত অথবা নতুন প্রতিনিধি নির্বাচন করে।

প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক শাসনে জনপ্রতিনিধিগণ মিলিত হইয়া আইনসভা গঠন করে এবং আইন সভার সদস্যগণের মধ্য হইতে সাধারণত শাসকমণ্ডলী নির্বাচিত হন। কোন কোন দেশে অবশ্য আইনসভার সদস্য না হইয়াও শাসনবিভাগের সদস্য হওয়া যায় এবং কোন কোন দেশে প্রধান শাসক আইন সভার দ্বারা নির্বাচিত না হইয়া জনগনের দ্বারা অপ্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত হন।

তত্ত্বগত ভাবে জনপ্রতিনিধিরা জনমতের দ্বারা পরিচালিত হইবেন এবং জনগণের ইচ্ছা অনুযায়ী কার্য করিবেন। কিন্তু বাস্তবে ইহার নিশ্চয়তা নাই। সুতরাং জনপ্রতিনিধিগণ জনমত ও জনস্বার্থ বিরোধী কার্য

৪. It is a form of Government where "...the whole people or some numerous portion of them, exercise the governing power through deputies periodically elected by themselves." J. S. Mill.

করিলে ইহার প্রতিবিধান করা যাহাতে সম্ভবপর হয় ইহার জন্য পরোক্ষ গণতন্ত্রে প্রতিবিধান বা প্রতিনিধিগণের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপের কিছু কিছু বিধি-ব্যবস্থা প্রবর্তনের কথা বলা হইয়া থাকে। ইহাদিগকে **প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ** (Direct Democratic Checks) বলা হয়। প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা প্রধানত তিনটি—গণভোট (Referendum), গণউদ্যোগ (Initiative), ও প্রত্যাহার আজ্ঞা (Recall)।

আইনসভা কর্তৃক প্রণীত কোন আইন যখন জনগণের নিকট অনুমোদন বা প্রত্যাখানের জন্য উপস্থিত করা হয়, তাহাকে গণভোট বলে। এই পদ্ধতি দ্বারা জনসাধারণ আইনসভার কার্যের বিচার বিবেচনা ও নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে। সুইজারল্যাণ্ডের সংবিধানে গণভোটের অধিকার স্বীকৃত। গণভোট দুই প্রকারের বাধ্যতামূলক এবং ইচ্ছাধীন। বিল জনসাধারণের নিকট উপস্থিত করিয়া তাহাদের দ্বারা অনুমোদন লাভ করিয়া আইনে পরিণত হইবে—সংবিধানে এইরূপ নির্দেশ থাকিলে ইহাকে বাধ্যতামূলক গণভোট বলে। অপরপক্ষে সংবিধানে যদি এইরূপ নির্দেশ থাকে যে একটা নির্দিষ্ট সংখ্যক জনগণ দাবী করিলে বিলটি জনগণের নিকট উপস্থিত করিয়া তাহাদের মতামত গ্রহণ করিতে হইবে, তবে তাহাকে ইচ্ছাধীন গণভোট বলে। যাহাই হউক পরোক্ষ বা প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রে গণভোট প্রয়োগ করিয়া নাগরিকগণ আইনসভার স্বেচ্ছাচারিতা প্রতিরোধ করিতে পারে।

শুধুমাত্র আইনসভার স্বেচ্ছাচারিতা বন্ধ করা নহে, আইন প্রণয়নের সর্বময় ক্ষমতা আইনসভার হস্তে কেন্দ্রীভূত না রাখিয়া জনগণের হস্তে প্রসারিত করার উদ্দেশে গণউদ্যোগের কথা বলা হয়। গণউদ্যোগের দ্বারা জনগণ আইন প্রণয়ণে উদ্যোগ গ্রহণ করিতে পারে। গণউদ্যোগের অধিকার সংবিধানে স্বীকৃত হইলে একটা নির্দিষ্ট সংখ্যক নাগরিক কোন বিশেষ আইন প্রণয়নের জন্য আইনসভাকে নির্দেশ দান করিতে পারে। সুইজারল্যাণ্ডের সংবিধানে গণউদ্যোগের অধিকারও লিপিবদ্ধ আছে।

কোন জনপ্রতিনিধির কার্য যদি নাগরিকগণের নিকট সন্তোষজনক না হয়, তবে সেই জনপ্রতিনিধির কার্যকাল শেষ হইবার পুর্বেই জনপ্রতিনিধিত্ব হইতে তাহাকে প্রত্যাহার করাকে প্রত্যাহার আজ্ঞা বলে। এই পদ্ধতি অনুযায়ী নির্দিষ্ট সংখ্যক নাগরিক তাহাদের প্রতিনিধির প্রত্যাহার দাবী করিলে উহা নির্বাচকদের মতামতের জন্য উপস্থিত করা হয়।

প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রকে নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য মোটামুটিভাবে উপরোক্ত তিনটি পদ্ধতির কথা বলা হয়। এই গণতান্ত্রিক পদ্ধতিগুলির প্রশংসা করিয়া লর্ড ব্রাইস বলিয়াছেন যে সাধারণ নির্বাচনের সময় ব্যতীত অন্যান্য সময়েও জনগণের সঙ্গে আইনসভার সদস্যগণের যোগাযোগ রক্ষার ক্ষেত্রে এই পদ্ধতিগুলি বিশেষ সাহায্য করে।[9] দলীয় স্বার্থের জটাজালে আইনসভা যখন আবদ্ধ হইয়া পড়ে বা দুইটি কক্ষের দ্বন্দ্বে আইনসভা যখন তাহার কার্যকারিতা হারাইয়া ফেলে বা জনপ্রতিনিধিরা যখন গণস্বার্থ উপেক্ষা করিয়া আইন প্রণয়নে অগ্রসর হয় তখনই প্রয়োজন হয় নাগরিকদের সক্রিয় প্রতিরোধ। এই গণতান্ত্রিক পদ্ধতিগুলি প্রয়োগের মধ্য দিয়া নাগরিক প্রয়োজনীয় হস্তক্ষেপ এবং প্রতিরোধ করিতে পারে।

কিন্তু প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপ পদ্ধতির বিরুদ্ধে ডঃ ফাইনার (Dr. Finer) প্রভৃতি তীব্র সমালোচনা করিয়াছেন। তাঁহারা মনে করেন যে বর্তমান যুগে দলীয় প্রথা প্রবর্তনের ফলে গণভোট মূলত রাজনৈতিক দলগুলির প্রভাব ও নিয়ন্ত্রণের মধ্যেই থাকিয়া যাইবে এবং সেই ক্ষেত্রে কোন দলীয় জনপ্রতিনিধি বা কোন দলের সংখ্যাগরিষ্ঠ আইনসভার বিরুদ্ধে গণভোট বা প্রত্যাহার আজ্ঞা পদ্ধতিগুলিকে বাস্তবে কার্যকরী করার সম্ভাবনা খুবই কম। ইহা ছাড়াও প্রত্যাহার আজ্ঞা জনগণের উত্তেজনা, অসন্তোষ এবং অন্ধসংস্কারের ক্রীড়নকে পরিণত হইতে পারে। গণভোট, গণউদ্যোগ প্রভৃতি পদ্ধতিকে রূপায়িত করিতে হইলে আইন প্রয়োগ এবং আইনের বিচারের জন্য জনগণের যে পরিমান জ্ঞান ও দক্ষতা প্রয়োজন, তাহা বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই নাই। এই সমস্ত কারণে ডঃ ফাইনার প্রভৃতি মনে করেন যে জনগণের সার্বভৌমিকতাকে প্রমাণ করিবার জন্য এই পদ্ধতিগুলি বজায় রাখা যাইতে পারে, কিন্তু প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রকে ত্রুটি ও দুর্বলতা হইতে মুক্ত করার ব্যাপারে এই পদ্ধতিগুলি বিশেষ কার্যকরী ভূমিকা পালন করিতে পারে না।

৩॥ গণতন্ত্রের সাফল্যের শর্ত (Conditions of Success of Democracy)

গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা কায়েম করাই বর্তমান যুগের লক্ষ্য। কিন্তু তত্ত্বগত গণতন্ত্রকে বাস্তবে রূপায়িত করা সহজ নয়। জনগণের ইচ্ছার দ্বারা

9. "It helps the Legislature to keep in touch with the people at other times than at general elections." —Bryce.

পরিচালিত এবং জনকল্যাণে ব্রতী গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থাকে সার্থকভাবে প্রবর্তন করিতে হইলে কতগুলি শর্ত পালিত হওয়া প্রয়োজন। এই সমস্ত শর্ত পালিত না হইলে গণতন্ত্র সফল হইতে পারে না।

বার্কার গণতন্ত্রের সাফল্যের জন্য দুইটি শর্তের কথা বলিয়াছেন—সন্তোষজনক বস্তুগত বা বাহ্য অবস্থা এবং আভ্যন্তরীণ অবস্থা। তাঁহার মতে জাতীয় এবং সামাজিক ঐক্যের মধ্য দিয়া গণতন্ত্রের সাফল্যের বস্তুগত অবস্থা সৃষ্টি হইতে পারে। অপরদিকে গণতন্ত্রের জন্য প্রয়োজন মানসিক প্রস্তুতি ও ঐক্য। ইহাই গণতন্ত্রের সাফল্যের আভ্যন্তরীণ শর্ত। জন স্টুয়ার্ট মিল আরও পরিষ্কার ভাবে গণতন্ত্রকে সাফল্যমণ্ডিত করিবার জন্য তিনটি শর্ত পালিত হওয়ার কথা বলিয়াছিলেন। প্রথমত, গণতন্ত্রকে গ্রহণ করিবার ইচ্ছা ও ক্ষমতা জনগণের থাকা প্রয়োজন। দ্বিতীয়ত, গণতন্ত্রকে রক্ষা করিবার জন্য জনগণের সংগ্রামী হইবার প্রয়োজন এবং তৃতীয়ত, গণতন্ত্রকে রক্ষা করিবার জন্য কর্তব্যপালন ও অধিকার রক্ষার জন্য জনগণের সংগ্রাম করিবার ক্ষমতা থাকা প্রয়োজন।

এই ত্রিবিধ গুণসম্পন্ন নাগরিকেরাই একমাত্র গণতন্ত্রের যোগ্য এবং গণতন্ত্র রক্ষা করিতে সমর্থ। তাই যে সমস্ত নাগরিক এই গুণ গুলির অধিকারী, তাহাদিগকে গণতান্ত্রিক মানুষ (Democratic People) বলে, ইহারা গণতন্ত্রকে রক্ষা ও সফল করিতে পারে। সুতরাং গণতান্ত্রিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ হইয়া সক্রিয়ভাবে রাষ্ট্রীয় কাজকর্মে অংশ গ্রহণ করা গণতন্ত্রের সাফল্যের জন্য একান্ত অপরিহার্য।

দ্বিতীয়ত, শিক্ষার ব্যাপকতাও গণতন্ত্রের কৃতকার্যতার জন্য আবশ্যক। গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় জনগণকে সক্রিয়ভাবে সরকারী কাজকর্মে অংশ গ্রহণ করিতে হয়। কিন্তু নাগরিক যদি অশিক্ষিত হয় তবে তাহার পক্ষে শাসন-সংক্রান্ত জটিল সমস্যাগুলির অনুধাবন করা ও সমাধানের পথ নির্দেশ করা সম্ভব নয়। তাই ব্রাইস বলিয়াছেন যে, শিক্ষাই জনগণকে ভোটাধিকার প্রয়োগের যোগ্য করিয়া তোলে। তাই গণতন্ত্রের সাফল্যের জন্য ব্যাপক শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তন করিয়া জনগণকে শিক্ষিত করিয়া তোলা দরকার যাহাতে এমন এক পরিবেশ সৃষ্টি হয় যেখানে ব্যক্তি তাহার পূর্ণ সত্ত্বা ও ব্যক্তিত্বকে উপলব্ধি করিতে পারে।

তৃতীয়ত, সফল গণতন্ত্রের রূপকার হইতে হইলে মানুষকে গুণগত দিক হইতেও উন্নত হইতে হইবে। ব্যক্তিগত বা দলগত স্বার্থকে প্রাধান্য না দিয়া

সংকীর্ণ মনোভাব বর্জন করিয়া উদার ও সংস্কামুক্ত দৃষ্টিতে সবকিছুকে বিচার ও বিশ্লেষণ করিতে হইবে। ইহার জন্য প্রয়োজন যুক্তিগ্রাহ্য মন, পরমতসহিষ্ণুতা, উদারতা ও বিচার শক্তি।

চতুর্থত, নিছক রাজনৈতিক অধিকার গণতন্ত্রকে সফল করিতে পারে না। গণতন্ত্রের সাফল্যের জন্য অর্থনৈতিক ও সামাজিক সাম্য অপরিহার্য। সামাজিক দিক হইতে অল্পকিছু লোক সমাজের উচ্চস্থানে বিচরণ করিলে এবং বাকী সবাই অবহেলিত হইলে যেমন গণতন্ত্র সফল হয় না, ঠিক তেমনি অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও ধনী ও দরিদ্রের ভিতর ব্যবধান থাকিলে গণতন্ত্র ইহার লক্ষ্যে উপনীত হইতে পারে না। কারণ এইরূপ অবস্থায় অল্পসংখ্যক ধনী ও সমাজের উচ্চতলার লোক নানা উপায়ে সরকারকে প্রভাবিত করিয়া গণতন্ত্রের মূল নীতিকে পদদলিত করিবে। মানুষকে মনুষ্যত্বের মর্যাদা না দিয়া শুধুমাত্র গণতন্ত্রের বুলি আওড়াইয়া গণতন্ত্রের অস্তিত্ব রক্ষা করা যায় না।

পঞ্চমত, শুধু নিজের অধিকার নয়, অপরের অধিকার, বিশেষ করিয়া সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অধিকার ও তাহার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য যাহাতে অক্ষুণ্ণ থাকে গণতন্ত্রকে সফল করিতে হইলে সেই ব্যাপারেও অগ্রণী হইতে হইবে।

সুতরাং, শুধুমাত্র গণতন্ত্র পছন্দ বা কামনা করিলেই হইবে না, ইহাকে রক্ষা ও সফল করিবার জন্য জনসাধারণকে ব্যাপকভাবে গণতান্ত্রিক নীতি গ্রহণ করিতে হইবে এবং এই নীতিকে কার্যে পরিণত করিতে হইলে যে কর্তব্য ও দায়িত্ব পালন করা প্রয়োজন, তাহা পালন করিবার মত জনগণের ইচ্ছা ও যোগ্যতা থাকিতে হইবে।

৪ ॥ গণতন্ত্রের গুণাগুণ (Merits and Demerits of Democracy)

গণতন্ত্র যুগোপোযোগী শাসনব্যবস্থা হিসাবে ব্যাপক স্বীকৃতি লাভ করা সত্ত্বেও মনে রাখিতে হইবে যে ইহা সমস্তপ্রকার দোষ ত্রুটির উর্ধ্বে নহে। একদল গণতন্ত্রের জয়গানে যেমন মুখরিত, তেমনি অন্যান্য অনেকে গণতন্ত্রকে তীব্রভাবে সমালোচনা করিয়াছে। আমরা এইবার গণতন্ত্রের গুণাগুণ আলোচনা করিতেছি।

গণতন্ত্রের গুণ : যে সমস্ত গুণের জন্য গণতন্ত্র এতটা জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছে প্রথমে তাহা আলোচনা করা হইল। গণতন্ত্র মানুষের ভিতর কোনরূপ পার্থক্য ও বিভেদ সৃষ্টি না করিয়া "স্বাভাবিক অধিকারের তত্ত্ব" (Doctrine of

10 The gift of Knowledge creates the capacity to use the suffrage aright" —Bryce

Natural Rights) অনুযায়ী সকল মানুষের সামনে সমান অধিকার ও সুযোগের সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দেয়। মানুষ স্বাধীন হইয়া এবং সমান অধিকার লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে—এই মূলনীতি গণতন্ত্র স্বীকার করিয়া সকলকে রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে সমান সুযোগ ও সুবিধা প্রদান করিয়া থাকে। এই জন্যই গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় শাসন পরিচালনার ক্ষেত্রে সাম্যের ভিত্তিতে প্রত্যেকের সমান অধিকার ও দাবী রহিয়াছে। দ্বিতীয়ত, গণতন্ত্রে শাসক ও শাসিতের ভিতর অনতিক্রমনীয় ব্যবধান বা পার্থক্য নাই। বেন্থামের মতে সুশাসনের সমস্যা হইল শাসক ও শাসিতের স্বার্থকে এক ও অভিন্ন করিয়া তুলিয়া ব্যাপকতর জনগণের ব্যাপকতর কল্যাণ সাধনের সমস্যা। গণতন্ত্র শাসক ও শাসিতের পার্থক্য দূর করিয়া ব্যাপক জনসমাজের ব্যাপক (greatest good for the greatest number) কল্যাণে ব্রতী হইতে পারে। তৃতীয়ত, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে শাসকমণ্ডলী জনগণের দ্বারা নির্বাচিত, জনগনের নিকট দায়িত্বশীল এবং জনগণের দ্বারা পরিবর্তনীয়। সুতরাং এইরূপ শাসনব্যবস্থায় রাষ্ট্রের চূড়ান্ত ক্ষমতা জনসাধারণের হস্তে ন্যস্ত থাকে। অর্থাৎ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রেই জনগণের সার্বভৌমিকতা প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে। চতুর্থত, গণতন্ত্র মানুষের যতটা মর্যাদা দেয় এইরূপ আর কোনপ্রকারের শাসনব্যবস্থা দেয় না। গণতন্ত্রে ছোট-বড়, ধনী-গরীব, স্ত্রী-পুরুষ সকলেই সমান এবং প্রত্যেকের ব্যক্তিত্বের বিকাশের জন্য গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা সমান যত্নশীল। তাই টক্‌ভিল বলিয়াছিলেন যে, সকল শ্রেণীর কল্যাণ সাধনের জন্য গণতন্ত্রের ন্যায় আর কোনও শাসনব্যবস্থা এখনও আবিষ্কৃত হয় নাই।[11] পঞ্চমত, সর্ব মানুষের সহযোগিতা ও ঐক্য গণতন্ত্রের ভিত্তি। সুতরাং গণতন্ত্রে ভ্রাতৃত্বমূলক বন্ধন ও পারস্পরিক সহযোগিতার মধ্যে দিয়া রাষ্ট্র পরিচালিত হয় বলিয়া এখানে সদিচ্ছা, সহযোগিতা ও পরমতসহিষ্ণুতা প্রাধান্য লাভ করিয়া থাকে।

গণতন্ত্র সংখ্যাগরিষ্ঠের মত অনুযায়ী শাসিত হয় বটে, কিন্তু সংখ্যালঘুদের মতকেও এখানে যথোচিত গুরুত্ব দেওয়া হইয়া থাকে। সভা-সমিতি, আলাপ-আলোচনা, সংবাদপত্র প্রভৃতির দ্বারা সংখ্যালঘুরা নিজস্ব মতামত প্রকাশ করিতে পারে এবং গণতান্ত্রিক সরকার অনেক ক্ষেত্রে সেই মতামত অনুসারে নিজেদের নীতি নির্ধারণ করে।

11. "No political form has hitherto been discovered which is equally favourable to the prosperity and development of all the classes,"
—Tocqueville

সপ্তমত, গণতন্ত্র মানুষকে সুস্থ দেশপ্রেম দ্বারা উদ্বুদ্ধ করে বলিয়া এইরূপ শাসনে মানুষ দেশ ও দেশের জনগণকে ভালবাসিতে শেখে এবং ইহার ফলে এক মহত্তর সামাজিক জীবন প্রতিষ্ঠা লাভ করে। মানবসভ্যতার উন্নতি ও বিকাশের ক্ষেত্রে গণতন্ত্রের ভূমিকা ও অবদান অনস্বীকার্য।

গণতন্ত্রের সমালোচনা: গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার সমর্থনে যেমন একদল রাষ্ট্রবিজ্ঞানী উচ্ছ্বসিত ভাষায় ইহার ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন, ঠিক তেমনি কিছু কিছু সমালোচক বিভিন্ন দিক হইতে ইহার ত্রুটিবিচ্যুতি দেখাইয়া তাঁহাদের সমালোচনা উপস্থিত করিয়াছেন। প্লেটো গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে দুইটি সমালোচনা করিয়াছেন। তাঁহার মতে প্রথমত, গণতন্ত্র মূর্খের শাসন। কোনপ্রকার ক্ষমতা, দক্ষতা, যোগ্যতা, শিক্ষা প্রভৃতি বিচার না করিয়া গণতন্ত্র সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন প্রবর্তন করিতে যাইয়া প্রকারান্তরে মূর্খের শাসন কায়েম করে। দ্বিতীয়ত, প্লেটোর মতে, গণতান্ত্রিক শাসনে উচ্ছৃঙ্খলতা এত বৃদ্ধি লাভ করে যে অবশেষে স্বেচ্ছাচারী নায়কের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তরিত হয়। প্লেটোর মতে স্বাধীনতার ক্রমবর্ধমান মদ্যপানে উন্মত্ত হইয়া গণতন্ত্র কালক্রমে অরাজকতা ও উচ্ছৃঙ্খলতার আবাসে পরিণত হয়। তৃতীয়ত, প্লেটোর বক্তব্যের প্রতিধ্বনি করিয়া হেনরী মেইন গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থাকে অপদার্থ, অক্ষম, ক্ষণভঙ্গুর এবং সর্বপ্রকার সামাজিক অগ্রগতির বিরোধী বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। তাঁহার মতে মূর্খ জনতাকে ভুলাইয়া প্রাত্যহিক দুর্নীতিপূর্ণ দলীয় সরকার গণতন্ত্রে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এমিল ফাগুয়েও গণতন্ত্রকে অক্ষমের শাসন (the cult of Incompetence) বলিয়া আখ্যা দিয়াছেন। চতুর্থত, লেকী (Leeky) উপরোক্ত বক্তব্য সমর্থন করিয়া বলিয়াছেন যে, গণতন্ত্র জনগণের শাসন বটে, কিন্তু এই জনগণের অধিকাংশই দরিদ্র, মূর্খ এবং অক্ষম। তাঁহার মতে এইরূপ শাসনে স্বাভাবিক ভাবেই স্বাধীনতার অধিকার খর্ব হইতে বাধ্য। পঞ্চমত, সমালোচকদের মতে জনসাধারণ সামগ্রিকভাবে জনমত গঠন করিয়া শাসনকার্যে অংশ গ্রহণ করিতে পারে না। সুতরাং গণতন্ত্রের নামে চতুর নেতৃত্ব নিজেদের ক্ষমতা শাসনকার্যে কায়েম করে। ষষ্ঠত, বাস্তব অভিজ্ঞতা হইতে দেখা যায় যে, গণতান্ত্রিক শাসনপদ্ধতি নামে জনগণের শাসন হইলেও, মূলত ইহাতে উচ্চ পদস্থ সরকারী কর্মচারীরাই সর্বাধিক ক্ষমতা অধিকার করিয়া নিজেদের ইচ্ছা অনুযায়ী ইহাকে প্রয়োগ করিয়া থাকে। সুতরাং গণতন্ত্রে আমলারা প্রভূত ক্ষমতার অধিকারী হইয়া উঠে।

জনগণ নয়। তাই অনেকের মতে গণতন্ত্রে যে ব্যক্তিস্বাধীনতার কল্পনা করা হয় তাহা একান্তভাবেই অলীক, বাস্তবে ইহার কোন অস্তিত্ব নাই।

সপ্তমত, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ হইতে গণতন্ত্রের সমালোচনা করিয়া ইহাকে অবৈজ্ঞানিক বলা হইয়াছে। গ্রাহাম ওয়ালস্ (Graham Wallas) প্রভৃতিরা মনস্তাত্ত্বিক (Psychological) কারণে গণতন্ত্রের সমালোচনা করিয়া বলিয়াছেন যে মনস্তাত্ত্বিক ভিড়ের মধ্যে (Psychology crowd) মানুষের মনের উচ্ছৃঙ্খলতা, দায়িত্বহীনতা ও উত্তেজনার প্রবণতা দেখা দেয় বলিয়া গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা দক্ষতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করিতে পারে না। ইহা ছাড়াও জীববিদ্যার (Biological) নজীর উপস্থিত করিয়া অনেকে মানুষের গুণগত পার্থক্যের কথা বলিয়া দেখাইবার চেষ্টা করেন যে, যাহারা সমাজের উচ্চতলার লোক একমাত্র তাহাদের বংশেই অধিকতর গুণসম্পন্ন সন্তান-সন্ততি জন্মগ্রহণ করে।[12] সুতরাং এইরূপ অবস্থায় সর্বসাধারণ দ্বারা শাসনকার্য পরিচালনা করিলে ইহাতে যোগ্যতা ও দক্ষতার অভাব থাকিবে।

উপসংহারে বলা যাইতে পারে যে, গণতন্ত্রের কিছু কিছু ত্রুটি রহিয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু তুলনামূলক বিচারে অন্যান্য শাসনব্যবস্থা হইতে ইহা শ্রেষ্ঠ এবং সেই কারণেই কাম্য। আদর্শগতভাবে গণতন্ত্রের প্রকাশ্য বিরোধিতা খুব বেশি সমালোচক করেন না, কেবলমাত্র কিছু কিছু ত্রুটিবিচ্যুতির প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া থাকেন। এই সমস্ত ত্রুটি অনেকাংশে সত্য সন্দেহ নাই, কিন্তু তাই বলিয়া ইহা গণতন্ত্রের শ্রেষ্ঠত্বকে উড়াইয়া দিতে পারে না। গণতন্ত্রের দোষ ও গুণের তুলনামূলক আলোচনা করিলে দেখা যাইবে, ইহার ত্রুটি অপেক্ষা গুণাবলী অনেক বেশি। লর্ড ব্রাইসকে অনুসরণ করিয়া বলা যাইতে যে গণতন্ত্র আমাদের প্রত্যাশিত আশীর্বাদ দান করিতে না পারিলেও ইহা অতীতের অনেক অভিশাপকে নিশ্চিহ্ন করিয়াছে।[13]

৫ ॥ গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের সম্পর্ক (Relation between Democracy and socialism)

এইবার আমরা গণতন্ত্রের সঙ্গে সমাজতন্ত্রের সম্পর্ক পর্যালোচনা করিতে

12. "Capacity for intellectual growth is inborn, that is hereditary, and also that it is closely correlated with social status." —Mc Dougall

13. "The Democracy has not brought all the blessings that were expected. it has materially diminished and destroyed many of the cruelties and terrors, injustices and oppressions of former times." —Lord Bryce

পারি। সমাজতন্ত্র ও গণতন্ত্র পরস্পরবিরোধী নয়, বরং সমাজতান্ত্রিক আদর্শকে গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় রূপায়িত করিতে না পারিলে গণতন্ত্র সফল হইতে পারে না—এইরূপ ধারণা বর্তমানে পৃথিবীতে ব্যাপকভাবে স্বীকৃতি লাভ করিতেছে। তাই পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে সমাজতান্ত্রিক আদর্শের ভিত্তিতে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিবার ব্যাপক প্রয়াস চলিতেছে। ইহার কারণ হইতেছে এই যে, অষ্টাদশ শতাব্দীতে মূলত যে রাজনৈতিক সমানাধিকারের দাবীতে গণ-তন্ত্রের প্রতিষ্ঠা ঘটিয়াছিল, বিংশ শতাব্দীতে তাহা ব্যাপক সামাজিক ও অর্থ-নৈতিক সমানাধিকারের আদর্শে রূপান্তরিত হয়। ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় জনগণের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সমানাধিকারের আদর্শ বাস্তবে রূপলাভ করিতে পারে না। কারণ, ধনতন্ত্র অর্থনৈতিক অসাম্যের উপরই প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং জনগণের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সমানাধিকারের মহান আদর্শকে যদি সত্যই বাস্তবে রূপায়িত করিতে হয়, তবে সমাজতন্ত্র একান্ত ভাবেই অপরিহার্য।

ধনতন্ত্রে ধনোৎপাদনের উপাদানগুলি ব্যক্তিগত মালিকানার অন্তর্ভুক্ত থাকে। এইরূপ ব্যবস্থায় ধনোৎপাদনের উপাদানগুলির মালিকগণ শ্রমিক শ্রেণীকে বঞ্চিত করিয়া নিজেদের মুনাফা ও সম্পদ বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা করে। তাই ধনতন্ত্রে পরস্পরবিরোধী স্বার্থসম্পন্ন শ্রেণী থাকে এবং স্বভাবতই এইরূপ সমাজব্যবস্থায় সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমানাধিকারের গণতান্ত্রিক আদর্শ কার্যকরী হইতে পারে না। অপরপক্ষে সমাজতন্ত্র ধনোৎপাদনের উৎস এবং উপাদানগুলিকে সমাজ ও রাষ্ট্রের মালিকানায় আনিয়া পরস্পরবিরোধী শ্রেণীস্বার্থের বিনাশের ভিতর দিয়া শ্রেণীহীন সমাজবাদী ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করিতে প্রয়াসী হয়। এইরূপ সমাজব্যবস্থায় রাষ্ট্রের সমুদয় শিল্প, কারখানা, সম্পত্তি, রেল, পোস্টঅফিস, রেডিও, ট্রাম-বাস, ব্যাঙ্ক, ব্যবসা-বাণিজ্য প্রভৃতির মালিকানা রাষ্ট্র বা সমাজের হস্তে ন্যস্ত করা যায়। রাষ্ট্রের প্রতিটি সক্ষম ব্যক্তি রাষ্ট্র কর্তৃক নিযুক্ত কর্মী হিসাবে নিজ নিজ যোগ্যতা অনুযায়ী উৎপাদন ও সম্পদ সৃষ্টির ক্ষেত্রে সাহায্য করে এবং প্রতিদানে নিজের প্রয়োজন অনুযায়ী ভোগ্যদ্রব্য পাইয়া থাকে। সমাজতন্ত্রে রাষ্ট্র জনগণের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা ও কর্মসংস্থানের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া থাকে। অর্থাৎ এককথায় রাষ্ট্রের অর্থনীতি সমাজব্যবস্থা, শিক্ষা-সংস্কৃতি, নিরাপত্তা প্রভৃতি সমস্ত ক্ষেত্রেই রাষ্ট্র ইহাদের

নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকে এবং একক ব্যক্তিগত কর্মপ্রচেষ্টা বা মালিকানা এইরূপ সমাজব্যবস্থায় কোন প্রকার প্রাধান্য বিস্তার করিতে পারে না।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমানাধিকারের গণতান্ত্রিক আদর্শ একমাত্র সমাজতন্ত্রেই পুরাপুরিভাবে রূপায়িত হইতে পারে। তাই সমাজতান্ত্রিক মতবাদীরা মনে করেন যে, ধনোৎপাদন ও বণ্টনের উপায় ও উৎপাদনকে ব্যক্তিগত সম্পত্তি হইতে সামাজিক সম্পত্তিতে পরিণত করিতে না পারিলে গণতন্ত্রের বিকাশ সম্ভব নয়। ইহা আজ ব্যাপকভাবে স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে যে, নিছক রাজনৈতিক অধিকারের দাবী গণতন্ত্রের লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য নয়, অর্থনৈতিক বৈষম্যকে দূর করিয়া সর্বক্ষেত্রে সমানাধিকারের প্রতিষ্ঠা করাই গণতন্ত্রেব আদর্শ। সুতরাং গণতন্ত্রকে সফল ও সার্থক করিয়া তুলিতে হইলে বেকারী হইতে জনগণকে মুক্তিদান; সভ্য ও সুস্থ জীবন যাপনের উপযোগী বেতন দান, রোগ, বার্ধক্য ও বিপর্যয় হইতে নিরাপত্তা দান; শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের সুযোগ দান; সর্বপ্রকার বৈষম্যের অবসান প্রভৃতি শর্তগুলি পালিত হওয়া একান্ত প্রয়োজন। অনেকের মতে এই সমস্ত শর্ত একমাত্র সমাজতান্ত্রিক অবস্থার ভিতরই পালিত হইতে পারে। ধর্ম, বর্ণ, কুল, শ্রেণী ও ধনগত বৈষম্যের পর্বত-প্রমাণ প্রাচীর প্রতি পদে গণতান্ত্রিক আদর্শের ভিত্তিতে আঘাত করিয়া গণতন্ত্রকে দুর্বল করিয়া তুলিয়াছে। সমাজতন্ত্র সর্বসাধারণের সমানাধিকারের অধিকার প্রতিষ্ঠার ভিতর দিয়া এই সমস্ত বৈষম্য দূর করিয়া গণতন্ত্রের ভিত্তিকে শক্তিশালী করিতে পারে। এই সমস্ত কারণেই বলা হয়: গণতন্ত্রকে বিরোধীতা নহে—সমাজতন্ত্র গণতান্ত্রিক আদর্শকে পরিপূর্ণ করিয়া তোলে।[14]

৬॥ একদলীয়ব্যবস্থা ও গণতন্ত্র (One Party state and Democracy)

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মতে গণতন্ত্রকে যথার্থভাবে কার্যকরী ও সফল করিতে হইলে একাধিক রাজনৈতিকদলের অস্তিত্ব একান্ত অপরিহার্য। কারণ তাঁহাদের মতে একাধিক রাজনৈতিক দল না থাকিলে সাধারণ নির্বাচনে জনগণের পক্ষে বিকল্প কোন দলকে ভোট দেওয়া সম্ভবপর হয় না, ইহার ফলে একদলীয় স্বেচ্ছাচারিতা সৃষ্টি হয় এবং গণতন্ত্রের মূল আদর্শ ব্যর্থ হয়। একাধিক রাজনৈতিক দল থাকিলে সরকারবিরোধী দল বা দলসমূহ বিকল্প কর্মপন্থা

14. "Socialism proposes to complete rather than to oppose the liberal democratic creed."

উপস্থিত করিয়া জনসমর্থন সংগ্রহ করিলে পারিলে সরকারগঠনকারী দলকে নির্বাচনে পরাজিত করিতে পারে অথবা পরাজয়ের ভয় দেখাইয়া সংযত, দায়িত্বশীল ও জনকল্যাণমুখী করিতে পারে। কিন্তু একটি দল থাকিলে জনগণের অধিকার, স্বাধীনতা এবং বিভিন্ন মতামত প্রকাশ লাভ করিতে পারে না এবং ইহার ফলে গণতন্ত্রের মৌল আদর্শ ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়া দলীয় একনায়কতন্ত্র সৃষ্টি হয়। সুতরাং একদলীয় শাসনব্যবস্থায় প্রকৃত গণতন্ত্র থাকিতে পারে না। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, সোভিয়েত ইউনিয়নে একটি মাত্র রাজনৈতিক দল কমিউনিস্ট পার্টির একমাত্র অস্তিত্ব রহিয়াছে। সুতরাং এই মতবাদ অনুযায়ী সোভিয়েত ইউনিয়নে কোনরূপ গণতন্ত্র থাকিতে পারে না।

কিন্তু পক্ষান্তরে মার্কসবাদী পণ্ডিতগণ গণতন্ত্রের যে সংজ্ঞা দিয়াছেন তাহার ভিত্তিতে বলিতে পারা যায় যে, সোভিয়েত ইউনিয়নে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে এবং মার্কসবাদী যুক্তির আলোতে প্রমাণ করা যাইতে পারে যে, বহুদলীয় পশ্চিমী গণতন্ত্র অপেক্ষা সোভিয়েত ইউনিয়নের একদলীয় গণতন্ত্র উন্নত পর্যায়ের।

মার্কসবাদীদের মতে একটি দেশে কয়টি রাজনৈতিক দল থাকিবে তাহা একান্তভাবেই নির্ভর করে সেই দেশের শ্রেণীগত অবস্থার উপর। মূল প্রশ্ন হইতেছে রাজনৈতিক দল কাহাকে বলে? এক একটি রাজনৈতিক দল মূলত এক একটি অর্থনৈতিক শ্রেণীস্বার্থের প্রতিভূ। অর্থাৎ এক একটি রাজনৈতিক দল এক একটি শ্রেণীস্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করে (বিস্তারিত আলোচনার জন্য 'রাজনৈতিক দল' অধ্যায় দ্রষ্টব্য)। উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, কোনও দেশে যদি পরস্পরবিরোধী অর্থনৈতিক স্বার্থসম্পন্ন দুইটি শ্রেণী থাকে, তবে সেখানে দুইটি শ্রেণীস্বার্থের প্রতিভূ হিসাবে দুইটি রাজনৈতিক দলের সৃষ্টি হইবে। কারণ, এই দুইটি শ্রেণীর স্বার্থ এক হইতে পারে না, তাই একটি রাজনৈতিক দল তাহাদের প্রতিনিধিত্ব করিতে পারে না। যে দেশে জমিদার, কৃষক, মালিক, শ্রমিক, প্রভৃতি বিভিন্ন শ্রেণী থাকে, সেই দেশে বিভিন্ন শ্রেণীস্বার্থ থাকিবার জন্য একাধিক রাজনৈতিক দল থাকিতে বাধ্য। ধনতান্ত্রিক দেশে বিভিন্ন শ্রেণী ও শ্রেণীস্বার্থ থাকিবার জন্য বিভিন্ন দলের উত্থান ঘটে। সোভিয়েত ইউনিয়নে যেহেতু একটি মাত্র শ্রেণী আছে, সেইজন্য মার্কসবাদীদের মতে সেইস্থানে একটির বেশি রাজনৈতিক দল থাকিতে পারে না। কিন্তু প্রশ্ন হইতেছে, সোভিয়েত ইউনিয়নেও তো শ্রমিক

ও কৃষক এই দুইটি শ্রেণী রহিয়াছে। সুতরাং উপরোক্ত নীতি অনুযায়ী সেইখানে দুইটি দল থাকা প্রয়োজন। ইহার উত্তরে মার্কসবাদীরা বলেন যে পরস্পর-বিরোধী স্বার্থসম্পন্ন দুইটি শ্রেণী শ্রমিক ও কৃষকের স্বার্থ একই রাজনৈতিক দলের ভিতর দিয়া রূপায়িত হইতেছে এবং ইহার ফলে এই দুইটি সমঅর্থ-নৈতিক স্বার্থসম্পন্ন শ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব একটি দলই করিতেছে। এইরূপে মার্কসবাদীরা সোভিয়েত ইউনিয়নে একদল থাকিবার যৌক্তিকতা প্রমাণ করিয়াছেন।

মার্কসবাদীদের মতে আমেরিকা ও পশ্চিম ইউরোপীয় দেশগুলির গণতন্ত্র হইতেছে রাজনৈতিক ক্ষমতার সঙ্গে জড়িত সংখ্যালঘিষ্ঠের গণতন্ত্র। সুতরাং এই সমস্ত দেশে সংখ্যালঘিষ্ঠ শোষক সম্প্রদায় (যাহারা রাষ্ট্রের জনসংখ্যার পাঁচ শতাংশও নয়) গণতন্ত্রের ফল ভোগ করিয়া সংখ্যাগরিষ্ঠ শোষিত সম্প্রদায়ের উপর গণতন্ত্রের নামে শাসক শ্রেণীর একনায়কত্ব চাপাইয়া দেয়। তাই লেনিন (Lenin) ইহাকে নিয়ন্ত্রিত, ভ্রান্ত ও কাল্পনিক গণতন্ত্র আখ্যা দিয়াছেন। সুতরাং এই সমস্ত পশ্চিমী গণতান্ত্রিক দেশে যে-সমস্ত স্বাধীনতা ও সমানাধিকারের কথা বলা হয় তাহার কোন বাস্তবমূল্য নাই।

অপরপক্ষে মার্কসবাদীদের মতে সোভিয়েত ইউনিয়নে দেশের জনসংখ্যার শতকরা নব্বই জনের জন্য গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে এবং বাকী শতকরা দশজন যাহারা সমাজতান্ত্রিক আদর্শকে গ্রহণ করিতে না পারার জন্য ষড়যন্ত্র ও দেশদ্রোহিতামূলক কার্যে লিপ্ত তাহাদের উপর একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সোভিয়েত ইউনিয়নে যে সর্বহারা শ্রেণীর একনায়কতন্ত্রের কথা বলা হয়, তাহা গণতন্ত্রেরই আর এক রূপ। কারণ এই সর্বহারা শ্রেণীর একনায়কতন্ত্র মানে শতকরা নব্বই জনের একনায়কতন্ত্র। যে ক্ষেত্রে শাসন দেশের শতকরা নব্বই জন পরিচালনা করে তাহার চাইতে উৎকৃষ্ট গণতন্ত্র কী থাকিতে পারে ?

ইহা ছাড়া মার্কসবাদী দৃষ্টিতে গণতন্ত্রের প্রবক্তাগণ বলিয়া থাকেন যে, পশ্চিমী দেশগুলিতে জনগণের অর্থনৈতিক অধিকারকে অস্বীকার করিয়া শুধুমাত্র নিছক রাজনৈতিক অধিকারের ভিত্তিতে গণতন্ত্রকে প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে। মার্কসবাদীরা মনে করেন, অর্থনৈতিক অধিকার না থাকিলে রাজনৈতিক অধিকার অর্থহীন। তাঁহাদের মতে গণতন্ত্র মানেই অর্থনৈতিক সমানাধিকার। সুতরাং অর্থনৈতিক অধিকার অস্বীকার করিয়া এবং

অর্থনৈতিক অসাম্য বজায় রাখিয়া গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা যায় না। অপরপক্ষে সোভিয়েত ইউনিয়নে অর্থনৈতিক অধিকারের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়া অর্থনৈতিক সমানাধিকার প্রতিষ্ঠা করিয়া গণতন্ত্রের মৌলিক আদর্শকে কার্যকরী করা হইয়াছে।

সুতরাং উপরোক্ত আলোচনার ভিত্তিতে বলা যাইতে পারে যে, কোন রাষ্ট্রে একদলীয় প্রথা প্রবর্তিত হইয়াছে বলিয়া এখানে গণতন্ত্র নাই একথা বলা ঠিক নয়।

৭ ॥ গণতন্ত্রের ভবিষ্যত (Future of Democracy)

অষ্টাদশ শতাব্দীতে স্বাধীনতা সাম্য ও সমানাধিকারের দাবীতে গণতান্ত্রিক আদর্শের যে জয়যাত্রা সুরু হইয়াছিল বর্তমান শতাব্দীতে তাহা ব্যাপক অর্থনৈতিক অধিকার ও কল্যাণমূলক রাষ্ট্রের দাবীতে রূপান্তরিত হইয়াছে। গণতান্ত্রিক চিন্তা, চেতনা ও আদর্শের প্লাবনে রাজতন্ত্র, একনায়কতন্ত্র, ব্যক্তি-স্বাতন্ত্রবাদী তত্ত্ব ইতিহাসের আবর্জনা হিসাবে কোথায় ভাসিয়া গিয়াছে। বর্তমান যুগ গণতন্ত্রের যুগ—তাই চিন্তা, শিক্ষা, কর্ম প্রতিটি ক্ষেত্রেই আমরা গণতান্ত্রিকবোধ এবং গণতান্ত্রিক আদর্শ দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া জীবনের ক্ষেত্রে এই আদর্শকে রূপায়িত করিবার চেষ্টা করিতেছি। গণতন্ত্রের প্রসার এবং ব্যাপ্তি দেখিয়া এই বিষয় কোন সন্দেহই থাকে না যে গণতন্ত্রের ভবিষ্যত উজ্জল এবং সম্ভাবনাপূর্ণ।

কিন্তু অনেকে মনে করেন যে গণতন্ত্রের সম্মুখে গভীর সংকট ও সমস্যা দেখা দিয়াছে, তাই ইহার ভবিষ্যত অন্ধকারাচ্ছন্ন। কারণ গণতন্ত্র মানুষের সমস্ত প্রত্যাশা পূরণ করিতে পারে নাই, ইহা ধন বৈষম্যকে দূরীভূত করিয়া অর্থনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠা করিতে পারে নাই। তাই দেখা যাইবে পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থায়ও রাজনৈতিক বা শাসনতান্ত্রিক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। ইহা ছাড়াও গণতন্ত্রকে সফল করিতে হইলে নাগরিকগণের যে চেতনা ও প্রচেষ্টা থাকা প্রয়োজন তাহার অভাব বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হইতেছে, ফলে গণতন্ত্রের ভবিষ্যত সম্পর্কে সংশয় দেখা দিয়াছে। তাই লয়েড (Lloyd) মনে করেন যে নাগরিকগণের নির্লিপ্ততা ও আলস্যের জন্য গণতন্ত্র বিপদের সম্মুখীন হইয়াছে।[14]

---

14. "Democracy is in danger of growing stale through the laziness of its members." —Lloyd

এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই যে গণতন্ত্রের বিভিন্ন ত্রুটি আছে—ইহা ত্রুটি মুক্ত নহে। গণতন্ত্রের সাফল্যের জন্য যে সমস্ত শর্ত পালিত হওয়া প্রয়োজন তাহাও যথাযোগ্য ভাবে পালিত হইতেছে না। কিন্তু প্রশ্ন হইতেছে তাই বলিয়া গণতন্ত্রের কি কোন ভবিষ্যত নাই? তত্ত্ব ও তথ্যের সাহায্যে বিভিন্ন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের কার্যাবলীর বিশ্লেষণের মধ্য দিয়া ব্রাইস তাঁহার Modern Democracies পুস্তকে এই বিষয়ের অবতারণা করিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে আধুনিক যুগের পরীক্ষা-নিরীক্ষায় দ্ব্যর্থহীনভাবে গণতন্ত্রের প্রয়োজনীয়তা ও উপযোগিতা প্রমাণিত হইয়াছে।[15] তিনি আরও মনে করেন যে সরকারের কোনরূপই মানুষের চরিত্রকে ত্রুটিমুক্ত করিতে পারে না এবং সরকারের প্রতিটি রূপেরই কিছু পরিমাণ চরিত্রগত ত্রুটি থাকিবে। কিন্তু দুঃখ, দারিদ্র, ভীতি ও অন্যায়ের উৎসকে সমূলে উৎপাটিত করিয়া ব্যক্তিসত্তার সাংস্কৃতিক জীবনের সম্মুখে নতুন সম্ভাবনার পথ উন্মুক্ত করার ব্যাপারে সরকারের অন্যান্য রূপ হইতে গণতন্ত্র অনেক বেশি কার্যকরী ভূমিকা পালন করিয়াছে।

বস্তুত গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে তীব্রতম সমালোচনা থাকা সত্ত্বেও গণতন্ত্রের সমালোচকেরা কিন্তু ইহার পরিবর্তে উন্নততরের অন্য কোন শাসনব্যবস্থার নির্দেশ দিতে পারেন নাই।[16] ইহার দ্বারা কি এই কথাই প্রমাণিত হয় না যে ত্রুটি বিচ্যুতি সত্ত্বেও গণতন্ত্র গ্রহণযোগ্য একমাত্র শাসনব্যবস্থা এবং ইহা সর্বজনীনভাবে গৃহীত হইতে (destined to be universal) বাধ্য? গণতন্ত্রকে বিসর্জন দিতে হইলে আমাদের রাজতন্ত্র, অভিজাততন্ত্র বা একনায়কতন্ত্র গ্রহণ করিতে হইবে। কিন্তু তাহা কখনই সম্ভব নহে, কারণ আদর্শ ও গুণের দিক হইতে ইহারা গণতন্ত্র অপেক্ষা অনেক নিকৃষ্ট শাসনব্যবস্থা। সুতরাং যতদিন গণতন্ত্রের স্থান গ্রহণ করিবার জন্য গণতন্ত্র হইতেও উন্নততরের শাসনব্যবস্থার আবির্ভাব না ঘটিতেছে, ততদিন গণতন্ত্রের ভবিষ্যত লইয়া চিন্তার বিশেষ কোন কারণ নাই। লর্ড ব্রাইসকে অনুসরণ করিয়া বলা যায় আশার অস্তিত্ব যতদিন থাকিবে, ততদিন গণতন্ত্রের ধ্বংস নাই (It may be said Democracy will never perish till after hope has expired)।

15. "Bryce......came to the conclusion that the modern experiment in Democracy has justified itself." —Cocker

16. "However grave indicment that may be brought against Democracy, its friends can answer, what alternative do you offer?" —Bryce

৮ ॥ একনায়কতন্ত্র (Dictatorship)

গণতন্ত্রের বিকল্প এবং সম্পূর্ণ বিরোধী শাসনব্যবস্থা হইল একনায়কতন্ত্র। যখন কোন রাষ্ট্রে কোন ব্যক্তি অবাধ শক্তির অধিকারী হইয়া রাষ্ট্রীয় শাসন-ক্ষমতা দখল করে এবং সার্বভৌম শক্তির একমাত্র অধিকারী হিসাবে নিজের ব্যক্তিগত ইচ্ছা অনুযায়ী শাসন পরিচালনা করে, তখন এইরূপ শাসনব্যবস্থাকে একনায়কতন্ত্র বা Dictatorship বলা হয়।

প্রাচীন রোমে প্রজাতন্ত্রের যুগে রাষ্ট্রের সঙ্কটময় অবস্থার সুষ্ঠু সমাধানের উদ্দেশ্যে সাময়িকভাবে কোন এক ব্যক্তিবিশেষের হাতে রাষ্ট্রীয় অবাধ ক্ষমতা ন্যস্ত করিবার রীতি প্রচলন ছিল[17] এবং এইরূপ শাসনব্যবস্থাকে একনায়ক-তন্ত্র নামে অভিহিত করা হইত। বর্তমান যুগে যখন কোন ব্যক্তিবিশেষ বা সামরিক নেতা অথবা কোন দল বা শ্রেণী প্রভূত ক্ষমতার অধিকারী হইয়া শাসনতান্ত্রিক পদ্ধতি বা সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করেন এবং সর্বমানুষের কল্যাণের নীতিকে পদদলিত করিয়া নিজেদের ইচ্ছা ও লিপ্সা অনুযায়ী রাষ্ট্রকে পরিচালিত করেন, তখন এইরূপ শাসনপদ্ধতিকে একনায়কতন্ত্র বলা হয়।[18]

সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির মধ্যে যাহাদের সাম্রাজ্যের আয়তন কম তাহাদের সাম্রাজ্য বৃদ্ধির স্পৃহা এবং পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থার অর্থনৈতিক সংকটই মূলত একনায়কতন্ত্রের আত্মপ্রকাশের জন্য দায়ী। যুদ্ধের মধ্য দিয়া উপরোক্ত সংকট এড়াইবার প্রয়াস হইতে গণতন্ত্রকে বিসর্জন দিয়া একনায়কতন্ত্র গ্রহণ করা হইয়াছিল।

পৃথিবীতে বিগত দুইটি মহাযুদ্ধকে কেন্দ্র করিয়া বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন প্রকারের নগ্ন ও বীভৎস একনায়কতন্ত্রের আবির্ভাব ঘটিয়াছে। ইতালী ও জার্মানীতে মুসোলিনী ও হিটলার ফ্যাসিস্ট ও নাৎসী দলের একনায়কতন্ত্র (Party Dictatorship) প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু কালক্রমে এই দুই দেশেই দলগত একনায়কতন্ত্র ব্যক্তিগত একনায়কতন্ত্রে (Personal Dictatorship) পরিণত হয়। গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে মারাত্মক আঘাত হানিয়াছে এই ফ্যাসিস্ট ও নাৎসী

17. "The Roman dictatorship was constitutional device under which the constitution was suspended during a grave crisis of the state." —MacIver

18. "By dictatorship we understand the rule of a person or group of persons who arrogate to themselves and monopolise power in the state, exercising it without restraint." —Neumann

একনায়কতন্ত্র। একনায়কতন্ত্রে ব্যক্তিস্বাধীনতা থাকেনা এবং ইহা যুক্তি ও তর্ক উপেক্ষা করিয়া নেতাকে তাহার ন্যায়-অন্যায় কার্যে অন্ধভাবে অনুসরণ করিতে শেখায়। এই ধরণের একনায়কেরা নিজের রাষ্ট্র, জাতির অহমিকা প্রচার করিয়া অন্য জাতির কৃষ্টি, ঐতিহ্য, সাহিত্য প্রভৃতিকে ঘৃণা করিতে শিক্ষা দেয়, যুদ্ধের উপাসনা এবং সাম্রাজ্য বিস্তারে মনোনিবেশ করে। ইদানীং কালে পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্রে সামরিক আভ্যুত্থানের দ্বারা সামরিক একনায়কতন্ত্র (Military Dictatorship) প্রতিষ্ঠার প্রবল ঝোঁক লক্ষ্য করা যাইতেছে। গণতান্ত্রিক চেতনার অভাব ও দেশের অর্থনৈতিক দুরবস্থার সুযোগেই একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া থাকে। সমালোচনা, বিরোধীতা এবং বিরোধীদলের কোন অস্তিত্ব একনায়কতন্ত্রে থাকিতে পারে না।

শ্রেণীগত একনায়কতন্ত্রের (Class Dictatorship) রূপ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে সর্বহারা শ্রেণীর একনায়কতন্ত্র (Proletariat Dictatorship) স্থাপিত হইয়াছে। এখানে রাষ্ট্রের শতকরা নব্বই জন লোকের একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। সুতরাং তত্ত্বগতভাবে ইহা গণতন্ত্রেরই আর এক প্রকাশ।

একনায়কতন্ত্রের চরিত্র বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে, এইরূপ শাসনে জনগণের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবনকে সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রিত করা হয়। তাই একনায়কতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় শিক্ষা, সাহিত্য, শিল্প, সংবাদপত্র, বেতার, চলচ্চিত্র, অর্থনীতি প্রভৃতিকে রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত করিয়া একটা যান্ত্রিক জীবন সৃষ্টি করে। হিটলার ও মুসোলিনী প্রভৃতি একনায়কেরা নিজেদের মহামানব বা ত্রাণকর্তার পর্যায়ে উন্নীত করিয়া নিজেদের ইচ্ছাকে রাষ্ট্রীয় ইচ্ছার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত করিয়াছেন। একনায়কেরা রাষ্ট্রকে ব্যক্তিজীবনের চরম পরিণতি বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া রাষ্ট্রীয় বেদীমূলে ব্যক্তি-জীবনকে বলি দিয়া থাকেন।

গণতন্ত্র ও একনায়কতন্ত্রের তুলনা করিয়া বলা যায় যে ইহারা মূলত দুইটি পৃথক ও পরস্পরবিরোধী তত্ত্ব ও আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত। গণতন্ত্রে সার্বভৌমিকতার অধিকারী জনসাধারন, এবং একনায়কতন্ত্রে একনায়ক ব্যক্তিগতভাবে সার্বভৌম শক্তির অধিকারী। গণতন্ত্র মানবতাবাদের মহান আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত, কিন্তু একনায়কতন্ত্র মানবতার পরিপন্থী। ব্যাপক জনকল্যাণ গণতন্ত্রের লক্ষ্য, কিন্তু একনায়কতন্ত্রে জনকল্যাণ রাষ্ট্র-পরিচালনার

ক্ষেত্রে প্রাধান্য লাভ করে না। গণতন্ত্রে জনগণের সমষ্টিগত ইচ্ছা রাষ্ট্রের ভিতর দিয়া মূর্ত হইয়া উঠে, কিন্তু একনায়ক নিজের ইচ্ছা ও রাষ্ট্রের ইচ্ছা অভিন্ন করিয়া দেখে। তাই ফরাসী সম্রাট চতুর্দশ লুই বলিয়াছিলেন: "I am the state" (আমিই রাষ্ট্র)। গণতন্ত্রে ব্যক্তিই সমাজ-জীবনের চরম পরিণতি, কিন্তু একনায়কতন্ত্রে রাষ্ট্রের বেদীমূলে ব্যক্তি-জীবনকে বলি দেওয়া হয়। ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ও সাম্য গণতন্ত্রের মূলনীতি. একনায়কতন্ত্রে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ও সাম্যের কোন মূল্য নাই। অর্থাৎ গণতন্ত্র ও একনায়কতন্ত্র মৌলিকভাবেই দুইটি পরস্পরবিরোধী আদর্শের ভিত্তিতে গঠিত।

৯। একনায়কতন্ত্রের গুণাগুণ (Merits and Demerits of Dictatorship)

গণতন্ত্রের সঙ্গে একনায়কতন্ত্রের তুলনামূলক আলোচনার ভিত্তিতে একনায়কতন্ত্রের সমর্থকেরা ইহার কয়েকটি বিশেষ গুণের কথা উল্লেখ করিয়া থাকেন। নিম্নে উহা আলোচনা করা হইল।

একনায়কতন্ত্রের গুণ: গণতন্ত্রের মত একনায়কতন্ত্রে বিভিন্ন নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতি গ্রহণ করিয়া অগ্রসর হইতে হয় না বলিয়া একনায়কতন্ত্র দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া দক্ষ শাসন পরিচালনা করিতে পারে। দ্বিতীয়ত, জরুরী অবস্থায় জাতীয় স্বার্থ সংরক্ষণের ক্ষেত্রে এই শাসনব্যবস্থা অধিকতর উপযোগী। তৃতীয়ত, একনায়কতন্ত্র সংকীর্ণ দলাদলি হইতে জাতিকে মুক্ত করিয়া জনগণের দেশপ্রেম ও জাতীয় ঐক্য জাগ্রত করে। চতুর্থত, অনেকের মতে দ্রুত জাতীয় অগ্রগতির জন্য অন্যান্য শাসনব্যবস্থা হইতে একনায়কতন্ত্র অনেক বেশি কার্যকরী ভূমিকা পালন করিতে পারে।

প্রসঙ্গত বলা প্রয়োজন যে একনায়কতন্ত্রের পক্ষে যে-সমস্ত যুক্তি উপস্থিত করা হইয়াছে, তাহার অধিকাংশ অতিরঞ্জিত। বস্তুতপক্ষে পৃথিবীতে বীভৎসরূপে যেভাবে একনায়কতন্ত্রের আত্মপ্রকাশ ঘটিয়াছে তাহাতে ইহার প্রতি মোহ থাকিবার আর কোন সঙ্গত কারণ নাই।

দোষ: রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা একনায়কতন্ত্রকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ হইতে তীব্র সমালোচনা করিয়াছেন। এই সমস্ত সমালোচনাকে উপস্থিত করা হইল। একনায়কতন্ত্রে জনসাধারণের রাষ্ট্রীয় কার্য পরিচালনায় অংশ গ্রহণের কোন সুযোগ থাকে না। জনসাধারণের ইচ্ছা, কল্যাণ ও অধিকারকে

পদদলিত করিয়া একনায়কের ইচ্ছা ও অভিরুচি অনুসারে শাসন পরিচালিত হয়। সুতরাং এইরূপ অবস্থায় জনগণের কল্যাণ ও মুক্তি আসিতে পারে না। দ্বিতীয়ত, একনায়কতন্ত্রে ব্যক্তিস্বাধীনতার কোন মূল্য নাই। এখানে রাষ্ট্রের ইচ্ছাই চরম ও চূড়ান্ত, তাই রাষ্ট্রীয় ইচ্ছার নিকট ব্যক্তির ইচ্ছা ও স্বাধীনতাকে বিসর্জন দেওয়া হয়। তৃতীয়ত, একনায়কতন্ত্র বিচার, বুদ্ধি ও যুক্তিকে বিসর্জন দিয়া নেতাকে অন্ধভাবে অনুসরণ করিবার শিক্ষা দেয়। এই শাসনব্যবস্থায় যুক্তি, তর্ক বা বুদ্ধি প্রয়োগ করিয়া যৌথ নেতৃত্বের মাধ্যমে কোন সিদ্ধান্ত করা হয় না। সর্ববিষয়ে অন্ধভাবে নেতাকে সমর্থন করাই একনায়কতন্ত্রের লক্ষ্য। চতুর্থত, একনায়কতন্ত্র কুল, জাতি ও রাষ্ট্রগত অহমিকা ও প্রাধান্য প্রচারের ভিতর দিয়া একদিকে অন্য জাতির প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করে এবং অপরদিকে উগ্র ও অসুস্থ জাতীয়তাবাদ সৃষ্টি করিয়া থাকে। পঞ্চমত, ইহারই ফল হিসাবে একনায়কতন্ত্র ব্যক্তিপূজা ও যুদ্ধের উপাসনার মাধ্যমে পৃথিবীর বুকে যুদ্ধ ও বিপর্যয় সৃষ্টি করে। যুদ্ধই যে উগ্র জাতীয়তাবাদের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি ইহার জলন্ত প্রমাণ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ। ষষ্ঠত, উগ্র জাতীয়তাবাদ ও যুদ্ধের উপাসনার অবিচ্ছেদ্য সঙ্গী হিসাবে সাম্রাজ্যবাদী মনোভাব একনায়কতন্ত্রে প্রকট হইয়া দেখা দেয় এবং ইহার ফলে একনায়ক শুধুমাত্র নিজের দেশের ভূমি লইয়াই সন্তুষ্ট থাকিতে পারে না, অন্যান্য স্থানেও নিজ সাম্রাজ্যের সীমাকে প্রসারিত করিবার জন্য বিপজ্জনক অবস্থা সৃষ্টি করিয়া থাকে। সপ্তমত, একনায়কতন্ত্র মানবসভ্যতা বিরোধী। কারণ, এই শাসনব্যবস্থায় সাহিত্য, শিল্প, কৃষ্টি, সামাজিক জীবন এবং সভ্যতার বিনাশ ঘটে। সর্বোপরি একনায়কতন্ত্র নিজের আদর্শ ছাড়া অন্য কোন আদর্শ, নীতি, মত বা বিরোধীতা সহ্য করে না। তাই স্বাভাবিক কারণেই এই শাসনব্যবস্থা মানুষের সূক্ষ্ম জীবনবোধ নষ্ট করিয়া তাহাকে যন্ত্রে পরিণত করে।

সপ্তদশ অধ্যায়

আইনসভা পরিচালিত ও রাষ্ট্রপতি পরিচালিত সরকার

(Parliamentary a Presidential form of Government)

আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সরকারী কার্যপরিচালনার ক্ষেত্রে দুইটি পদ্ধতি প্রয়োগ করা হইয়া থাকে। একটি হইতেছে আইনসভা বা মন্ত্রিসভা-শাসিত শাসনব্যবস্থা এবং অপরটি রাষ্ট্রপতি-শাসিত শাসনব্যবস্থা। আইন-বিভাগ এবং শাসনবিভাগের পারস্পরিক সম্পর্কের ভিত্তিতে ইহাদের এইরূপ শ্রেণীবিভক্ত করা হয়।

১॥ আইনসভা পরিচালিত সরকার (Parliamentary Government) :

যে শাসন ব্যবস্থায় মন্ত্রিসভাই প্রকৃত শাসনক্ষমতার অধিকারী এবং মন্ত্রিসভা ইহার কার্যের জন্য জনগণের প্রতিনিধিত্বমূলক সার্বভৌম ক্ষমতাসম্পন্ন আইনসভার নিকট দায়িত্ববদ্ধ থাকে, সেইরূপ শাসনব্যবস্থাকে আইনসভা বা মন্ত্রিসভা শাসিত শাসনব্যবস্থা (Parliamentary or Cabinet form of Government) বলে। আইনসভা পরিচালিত শাসনব্যবস্থায় রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ ক্ষমতায় নামসর্বস্ব বা উপাধিসূচক (titular) রাজা বা রাষ্ট্রপ্রধান অধিষ্ঠিত থাকেন, কিন্তু সরকারের কেন্দ্রবিন্দুতে থাকিয়া মন্ত্রিসভাই প্রকৃতপক্ষে সর্বময় ক্ষমতা প্রয়োগ করিয়া থাকেন। এই মন্ত্রিসভা ইহার যাবতীয় কার্যের জন্য প্রতিনিধিত্বমূলক সার্বভৌম ক্ষমতাসম্পন্ন আইনসভার নিকট দায়িত্বশীল থাকে। মন্ত্রিসভার সদস্যগণ আইনসভারও সদস্য থাকেন এবং এইরূপ শাসন-ব্যবস্থায় আইনসভাকে পরিচালনা করিবার ও নেতৃত্ব দিবার সম্পূর্ণ ক্ষমতা মন্ত্রিসভার হস্তে ন্যস্ত থাকে। আইনসভা পরিচালিত শাসনব্যবস্থায় আইনসভার সঙ্গে মন্ত্রিসভা বা শাসনবিভাগের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ থাকিবার ফলে ক্ষমতার পৃথকীকরণ নীতি কার্যকরী হইতে পারে না। মন্ত্রিসভা যতক্ষণ পর্যন্ত

আইনসভার আস্থা অর্জন করিতে পারিবেন, ততক্ষণ তাঁহারা প্রবল ক্ষমতার অধিকারী থাকিয়া শাসন চালাইতে পারিবেন। কিন্তু তাঁহাদের প্রতি আইনসভার অনাস্থা প্রকাশ পাইলে তাঁহাদের পদত্যাগ করিতে হইবে।

আইনসভা পরিচালিত শাসনব্যবস্থার শ্রেষ্ঠ উদাহরণ হইল ইংলণ্ড। সেখানে রাজা বা রাণী হইতেছেন রাষ্ট্রের নামসর্বস্ব অধিকর্তা। কিন্তু সেখানকার মন্ত্রিসভাই (cabinet) প্রকৃত ক্ষমতার অধিকারী। ইংলণ্ডের মন্ত্রিসভার বর্ণনা দিতে যাইয়া বেজহট বলিয়াছেন যে ইহা শাসনবিভাগ ও আইনবিভাগকে যুক্ত ও ঐক্যবদ্ধ করিবার যন্ত্রবিশেষ।[1] ইংলণ্ডের উদাহরণের অনুকরণে ভারতবর্ষ প্রভৃতি পৃথিবীর বিভিন্ন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে আইনসভা পরিচালিত শাসনব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছে।

আইনসভা পরিচালিত শাসনব্যবস্থায় নামসর্বস্ব শাসকের ক্ষমতার প্রকৃতি আলোচনা করিয়া গ্লাডষ্টোন বলিয়াছেন যে নামসর্বস্ব শাসক রাজস্ব আদায় ও রক্ষণাবেক্ষণ করেন, মন্ত্রিদের নিয়োগ ও বরখাস্ত করেন, আইনসভার অধিবেশন আহ্বান করেন এবং উহা ভাঙ্গিয়া দেন, বিদেশের সঙ্গে চুক্তি করেন, যুদ্ধ ঘোষণা করেন, শান্তি স্থাপন করেন এবং অপরাধীর শাস্তি মুকুব করেন। উপরোক্ত ক্ষমতাসমূহ নিয়মতান্ত্রিক শাসকের নামে প্রয়োগকরা হয় বটে, কিন্তু উহা তাহার ব্যক্তিগত ক্ষমতা নহে, এই সমস্ত ক্ষমতা প্রকৃত পক্ষে তাহার নামে মন্ত্রিসভাই ভোগ করে।

আইনসভা পরিচালিত শাসনব্যবস্থায় শাসনবিভাগ ও আইনবিভাগের ক্ষমতার মধ্যে সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে বিশেষ কোন পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় না। বাস্তব দৃষ্টিতে বিচার করিলে দেখা যাবে যে শাসনবিভাগের প্রতিভূ ক্যাবিনেট আইনসভার একটি সংস্থা বিশেষ। কারণ,আইনসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতাদের লইয়াই ক্যাবিনেট গঠিত হয়। এই ক্যাবিনেট আইনসভার নিকট নিজের কার্য ও ও নীতির জন্য দায়ী থাকে এবং আইনসভার অনাস্থা প্রকাশ পাইলে ক্যাবিনেটকে পদত্যাগ করিতে হয়। ইংলণ্ডে ১৬৮৮ সালের গৌরবময় বিপ্লবের দ্বারা রাজার প্রায় সমস্ত ক্ষমতা হস্তান্তরিত হইয়া পার্লামেণ্টের হস্তে কেন্দ্রীভূত হইবার ফলে ক্যাবিনেটকে পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত করিবার ক্ষেত্রে পার্লামেন্ট সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু

---

1. "a hyphen that joins, a buckle that fastens. the exentive and legislative departments together." Bagehot.

বিংশ শতাব্দীতে সংবিধানের ক্রমবিকাশের ফলে আইনসভার উপর ক্যাবিনেটের অবিসংবাদিত প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। ফলে বর্তমানে আইনসভা ক্যাবিনেটর কার্যকলাপের সম্মতিদান করিবার একটি যন্ত্রবিশেষে পরিণত হইয়াছে।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, যে সমস্ত মূলসূত্রের উপর ভিত্তি করিয়া আইনসভা পরিচালিত শাসনব্যবস্থা গড়িয়া উঠিয়াছে উহার প্রবর্তন আকস্মিকভাবে হয় নাই। বৃটেনেই সর্বপ্রথম বিবর্তন ও ক্রমপরিবর্তনের মধ্য দিয়া ধীরে ধীরে ক্যাবিনেট প্রথা এবং ইহার মূলসূত্রগুলি আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। এই ব্যাপারে ওয়ালপোলের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কারণ তাঁহার মন্ত্রিত্বকালেই ইংলণ্ডে ক্যাবিনেট প্রথার মূলসূত্রগুলির উদ্ভব ঘটিয়াছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীতে এই সমস্ত মূলনীতিগুলি স্পষ্টরূপ ধারণ করিতে না পারিলেও উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকেই ক্যাবিনেট প্রথার মূলনীতিগুলি দৃঢ়ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়া সুস্পষ্ট আকার ধারণ করে।

সর্বশেষে একটি কথা বলা প্রয়োজন যে, আইনসভা পরিচালিত শাসনব্যবস্থার সাফল্য নির্ভর করে সফল দলব্যবস্থার উপর। অর্থাৎ শৃঙ্খলাবদ্ধ দলীয় ব্যবস্থার অস্তিত্বই আইনসভা পরিচালিত সরকারের মূলভিত্তি।

বৈশিষ্ট্য: আইনসভা বা মন্ত্রিসভা পরিচালিত শাসনব্যবস্থার কতকগুলি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখকরা প্রয়োজন। প্রথমত, এইরূপ শাসনব্যবস্থায় একজন নিয়মতান্ত্রিক বা নামসর্বস্ব প্রধান শাসক থাকেন। যদিও আইনত মন্ত্রিসভা নিয়মতান্ত্রিক শাসকের উপদেষ্টা, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে প্রকৃত ক্ষমতা মন্ত্রিসভার হস্তে ন্যস্ত থাকে এবং মন্ত্রিসভাই সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী থাকে। অর্থাৎ মন্ত্রিসভা পরিচালিত সরকারে নিয়মতান্ত্রিক শাসক এবং প্রকৃত শাসকের মধ্য পার্থক্য এবং উহাদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়।

দ্বিতীয়ত, এইরূপ শাসনব্যবস্থায় শাসনবিভাগের সঙ্গে আইনবিভাগের খুব ঘনিষ্ট সম্পর্ক থাকে। মন্ত্রিসভার সদস্যগণকে আইনভার যে কোন একটি কক্ষের সদস্য হতে হয়। মন্ত্রিসভা শুধুমাত্র শাসনই পরিচালনা করে না, আইনপ্রনয়নের ব্যাপারেও নেতৃত্ব দিয়া থাকে। এই প্রকারের শাসনব্যবস্থায় আইনবিভাগের সঙ্গে শাসনভাগের ঘনিষ্ট সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয় বলিয়া দক্ষতাসম্পন্ন ও কার্যকরী সরকার জন্মলাভ করে।

তৃতীয়ত, মন্ত্রিসভা পরিচালিত সরকারের আর একটি বৈশিষ্ট্য হইল

সংখ্যাগরিষ্ঠতার নীতি, অর্থাৎ আইনসভার নির্বাচনে যে দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করিবে সেই দল মন্ত্রিসভা গঠন করিবে। ইহার ফলে মন্ত্রিসভার প্রতি আইনসভার সমর্থন ও আস্থা অটুট থাকে। মন্ত্রি নির্বাচনের ব্যাপারে নিয়মতান্ত্রিক প্রধানের বিশেষ কোন ভূমিকা থাকেনা। আইনসভার সংখ্যাগরিষ্ঠদলের নেতা প্রধানমন্ত্রি নিযুক্ত হন এবং প্রধানমন্ত্রির সুপারিশ অনুযায়ী নিয়মতান্ত্রিক প্রধান অন্যান্য মন্ত্রিদের নিযুক্ত করেন। আইনসভা পরিচালিত সরকারে আইনসভার সংখ্যাগরিষ্ঠদলের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত থাকিবার ফলে কাজকর্মের ব্যাপারে মন্ত্রিসভা আইনসভার নিকট হইতে কোন বাধার সম্মুখীন হয় না। আইনসভাতে কোন দল যদি একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা (Absolute Majority) অর্জন করিতে সমর্থ না হয়, তবে সংখ্যাগরিষ্ঠতার নীতি অনুযায়ী একাধিক দল মিলিত হইয়া আইনসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করিতে পারিলে তাহারা সম্মিলিত (Coalition) মন্ত্রিসভা গঠন করিয়া শাসন পরিচালনা করিয়া থাকে।

তৃতীয়ত, আইনসভা পরিচালিত শাসনব্যবস্থার সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হইল দায়িত্বশীল শাসনব্যবস্থার প্রবর্তন। দায়িত্বশীল শাসনব্যবস্থা বলিতে শাসনপরিচালনার ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রিদের জনপ্রতিনিধিত্বমূলক আইনসভার নিকট রাষ্ট্রনৈতিক দায়িত্বশীলতা বোঝায়। এই দায়িত্ব আবার দুই প্রকারের। প্রথমত, সরকারী কার্য পরিচালনার ক্ষেত্রে মন্ত্রিদের স্বকীয় কার্যের জন্য ব্যক্তিগত (individual responsibility) দায়িত্ব বহন করিতে হয়। যৌথ দায়িত্বের (collective responsibility) নীতি অনুসারে সমস্ত প্রকার সরকারী নীতি এবং উহার সাফল্য ও ব্যর্থতা সম্পর্কে সামগ্রিকভাবে মন্ত্রিসভা বা ক্যাবিনেটকে দায়িত্ব বহন করিতে হয়। সেইজন্য ক্যাবিনেটের কোন সিদ্ধান্ত সম্পর্কে কোন মন্ত্রি তাহার দায়িত্ব এড়াইতে পারেন না। এই নীতির জন্যই সাধারণভাবে যে কোন দপ্তরের যে কোন গুরুত্বপূর্ণ কার্যের জন্য মন্ত্রিসভা দায়ী থাকেন। যৌথ দায়িত্বের নীতির ফলে মন্ত্রিসভার উত্থান ও পতনের সঙ্গে প্রতিটি মন্ত্রির উত্থান-পতন অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত।

চতুর্থত, ক্যাবিনেট প্রথার আর একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হইল প্রধানমন্ত্রির অবিসংবাদিত নেতৃত্ব ও প্রাধান্য। যদিও প্রধান মন্ত্রিকে সমপর্যায়ভুক্তদের মধ্যে প্রধান (Primus inter pares) বলিয়া বর্ণনা করা হয়, কিন্তু

কার্যক্ষেত্রে প্রধান মন্ত্রীর নেতৃত্বের উপর ভিত্তি করিয়াই আইনসভা পরিচালিত-সরকার ঐক্যবদ্ধ ও নিয়ন্ত্রিত হয়।[২]

সর্বোপরি উল্লেখকরা প্রয়োজন যে, আইনসভায় সরকার বিরোধী দলের অস্তিত্ব আইনসভা পরিচালিত শাসনব্যবস্থায় একান্তভাবেই অপরিহার্য। মন্ত্রিসভাকে স্বেচ্ছাচারিতার পথ হইতে জনকল্যাণমুখী করিবার ব্যাপারে বিরোধী দলের ভূমিকা অপরিসীম গুরুত্বের দাবী রাখে।

সাফল্যের শর্ত : আইনসভা পরিচালিত সরকারকে সাফল্য অর্জন করিতে হইলে কতকগুলি শর্ত প্রতিপালিত হইয়া প্রয়োজন।[৩] পূর্বেই বলা হইয়াছে যে আইনসভা পরিচালিত শাসনব্যবস্থার সাফল্যের জন্য দলীয় ব্যবস্থার প্রচলন থাকা উচিত, যাহাতে মন্ত্রিসভার কার্য ও নীতি আইনসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের দ্বারা অনুমোদিত হইতে পারে। আইনসভায় কোন একটি রাজনৈতিকদল একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করিতে না পারিলে মন্ত্রিসভা পরিচালিত সরকার সাফল্য লাভ করিতে পারে না। দ্বিতীয়ত, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলির সুস্থ চিন্তা ও সহনশীলতা আইনসভা পরিচালিত সরকারের সাফল্যের জন্য একান্ত অপরিহার্য। কারণ আদর্শগত সংঘাত অপেক্ষা বিভিন্ন মনের মিলনের উপরই গণতন্ত্র নির্ভরশীল।[৪] সুতরাং ক্ষমতা লাভ বা ক্ষমতা রক্ষার জন্য রাজনৈতিক দলগুলির কার্যাবলী সর্বপ্রকার ন্যায়নীতি বহির্ভূত হইলে এই শাসনব্যবস্থা সফল হইতে পারে না। তৃতীয়ত; যদি দেখা যায়, শাসনবিভাগ ও আইন-বিভাগের ভিতর এইরূপ অচলাবস্থা সৃষ্টি হইয়াছে যে মন্ত্রিসভার পক্ষে উহার অবসান ঘটাইয়া শাসনকার্য পরিচালনা সম্ভব নয়, তবে সেই ক্ষেত্রে আইনসভা পরিচালিত শাসনব্যবস্থার সফলতার জন্য আইনসভা ভাঙ্গিয়া দিয়া নতুন নির্বাচন অনুষ্ঠিত করিবার ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। চতুর্থত, শক্তিশালী ও দায়িত্বসম্পন্ন বিরোধীপক্ষের অস্তিত্বের উপর আইনসভা পরিচালিত শাসনব্যবস্থার

---

2. "If it is the party system which gives the cabinet its homogeneity, it is the position of the Prime Minister which gives it solidarity."
—C. F. Strong

3. "There are certain pre-requisites without which cabinet government easily turns into something quite different." —Neumann.

4. "After all, democracy is based as much on the battle of ideas as on the marriage of minds." —Barker.

সাফল্য সবচাইতে বেশি নির্ভর করে। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, শক্তিশালী ও দায়িত্বসম্পন্ন বিরোধীদল থাকিলে ক্ষমতাসীন দলের স্বেচ্ছাচারিতা এবং মন্ত্রিসভার একনায়কত্ব বহুল পরিমাণে বন্ধ করা যাইতে পারে।

২॥ আইনসভা কর্তৃক মন্ত্রিসভা নিয়ন্ত্রণ (Parliamentary control over Cabinet)

পূর্বেই আলোচনা করা হইয়াছে যে আইনসভা পরিচালিত শাসনব্যবস্থায় আইনসভার সঙ্গে মন্ত্রিসভার সম্পর্ক খুবই ঘনিষ্ঠ। বস্তুতপক্ষে মন্ত্রিসভাই আইনসভাকে নেতৃত্ব দান ও পরিচালনা করে। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও মনে রাখিতে যে, মন্ত্রিসভাকে নিয়ন্ত্রণ করিবার ক্ষমতা আইনসভার রহিয়াছে। নিম্নলিখিত পদ্ধতির দ্বারা আইনসভা মন্ত্রিসভাকে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে।

আইনসভার সদস্যগণ বিভিন্ন অভাব-অভিযোগ উত্থাপন করিয়া উহার প্রতিকারের জন্য বক্তৃতা করিতে পারেন। আইনসভার সদস্যগণের এই সমস্ত বক্তৃতা ও সমালোচনাকে মন্ত্রিসভা বা ক্যাবিনেট উপেক্ষা করিতে সাহসী হন না। কারণ, এই সমস্ত আলোচনার মাধ্যমে যে জনমত গঠিত হয় তাহা এতই গুরুত্বপূর্ণ যে মন্ত্রিসভা আগামী নির্বাচনের কথা স্মরণ রাখিয়া উহা উপেক্ষা করিতে পারে না। সুতরাং আইনসভা অভাব-অভিযোগ সহ বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা ও বক্তৃতা দ্বারা মন্ত্রিসভাকে বহুল পরিমাণে নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে।

দ্বিতীয়ত, আইনসভার সদস্যগণ বিভিন্ন প্রকারের প্রশ্ন উত্থাপন করিয়া মন্ত্রিসভার নিকট হইতে উত্তর আদায় করিতে পারেন। উত্তর সন্তোষজনক না হইলে অতিরিক্ত প্রশ্নও (supplementary questions) সদস্যগণ দাবী করিতে পারেন। প্রশ্নের মাধ্যমে এইরূপ সংবাদ সংগৃহীত করিবার পদ্ধতি প্রচলিত থাকিবার জন্য মন্ত্রিসভাকে সর্বদা সতর্ক ও তৎপর থাকিতে হয়, যাহাতে কোন প্রশ্ন উত্থাপন করিয়া ইহাকে অসুবিধায় ফেলা না যায়। প্রশ্ন জিজ্ঞাসার এই পদ্ধতি নিশ্চিতভাবে আইনসভার নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা বৃদ্ধিতে সাহায্য করিয়াছে। কারণ পরবর্তীকালে প্রশ্ন করিয়া আলোড়ন সৃষ্টি করিতে পারে এমন কাজ করা হইতে মন্ত্রিসভা বিরত থাকে।

তৃতীয়ত, কোন গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাকে উপলক্ষ্য করিয়া আইনসভার সদস্যগণের মূলতুবী প্রস্তাব (Adjournment Motion) এবং নিন্দাসূচক

প্রস্তাব উত্থাপনের অধিকার মন্ত্রিসভার থাকিবার জন্য এমন কোন কার্য করিতে ইচ্ছুক বা সাহসী হয় না যাহার ফলে তাহার বিরুদ্ধে নিন্দাসূচক প্রস্তাব উত্থাপিত হইতে পারে।

সর্বশেষে বলা যাইতে পারে যে, মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে ব্যাপক অসন্তোষ থাকিলে আইনসভা অনাস্থা প্রস্তাব (No-confidence Motion) উত্থাপণ করিতে পারে। আইনসভা অনাস্থা প্রস্তাব উত্থাপন করিয়া বা উত্থাপনের ভয় দেখাইয়া মন্ত্রিসভার উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে। আইনসভা কর্তৃক উত্থাপিত এইরূপ অনাস্থা প্রস্তাব গৃহীত হইলে মন্ত্রিসভার পতন ঘটিবে সন্দেহ নাই, কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গে আইনসভারও অবসান ঘটিয়া নূতন নির্বাচন অনুষ্ঠান হইবার সম্ভাবনা প্রচুর। তাই ল্যাস্কি ইংলণ্ডের মন্ত্রিসভা পরিচালিত শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে বলিয়াছেন যে, আইনসভা মন্ত্রিসভাকে জীবন দান করে সত্য, কিন্তু মন্ত্রিসভাকে জীবন দানের দ্বারা ইহা নিজেরই জীবনের অস্তিত্ব রক্ষা করে। নিজের বিনাশের মূল্যেই আইনসভা একমাত্র মন্ত্রিসভাকে বিনাশ করিতে পারে।[5]

আইনসভা বাজেট আলোচনায় অংশ গ্রহণ (Budgetary Discussion), ছাঁটাই প্রস্তাব (Cut-Motion) প্রভৃতি উত্থাপনের দ্বারাও মন্ত্রিসভাকে নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে।

তত্ত্বগত দিক হইতে আইনসভা মন্ত্রিসভাকে নিয়ন্ত্রণ করিবার ব্যাপক ক্ষমতার অধিকারী। কিন্তু বাস্তবে ঘটনা ইহা নয়। দলীয় ব্যবস্থা প্রচলিত থাকিবার জন্য সংখ্যাগরিষ্ঠদল শাসনক্ষমতা লাভ করে বলিয়া দলীয় শৃঙ্খলার শক্তিতে মন্ত্রিসভার স্থায়িত্ব মোটামুটি নিরাপদ। কারণ, সংখ্যাগরিষ্ঠদলের সদস্যগণ মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে ভোট না দেওয়ায় উপরোক্ত পদ্ধতিগুলি কার্যকরী হইতে পারে না। ইহা ছাড়াও গিলোটিন, আংশিকভাবে বন্ধ করণ প্রস্তাব, ক্যাংগারু-বন্ধ করণ প্রভৃতি নীতি প্রয়োগের দ্বারা আইনসভার বক্তৃতা, সমালোচনা প্রভৃতির ক্ষমতা বন্ধ করা যাইতে পারে।

বর্তমানে অবস্থা যাহা দাঁড়াইয়াছে তাহাতে দেখা যাইবে যে ক্যাবিনেটই

5. The Heuse of commons gives 'the cabinet life ; but normally it can itseelf live so long as it is prepared to go on giving life to the cabinet. It destroys the cabinet at the cost of self-destruction." —Laski

সর্বময় নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতার অধিকারী হইয়া উঠিয়াছে। ব্যবহারিক ক্ষেত্রে সরকারের নীতি ঘোষণার কেন্দ্র হিসাবে পার্লামেণ্ট আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। পার্লামেণ্টের অন্যান্য অধিকার, ক্ষমতা ও কার্যাবলী প্রায় আনুষ্ঠানিক হইয়া দেখা দিয়াছে। তাই জেনিংস (Jennings) যথার্থই বলিয়াছেন যে, যদিও তত্ত্বগত দিক হইতে পার্লামেণ্ট ক্যাবিনেটকে নিয়ন্ত্রণ করে, কিন্তু বাস্তবে দেখা যাইবে যে ক্যাবিনেটই পার্লামেণ্টকে নিয়ন্ত্রিত করে।[6] অধ্যাপক ল্যাস্কিও বলিয়াছেন যে আইনসভা পরিচালিত শাসনব্যবস্থায় প্রকৃত পক্ষে মন্ত্রিসভাই আইনসভাকে নিয়ন্ত্রণ করে।[7]

যাই হউক জেনিংস তাই মনে করেন যে, আইনসভা মন্ত্রিসভাকে নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে না, শুধুমাত্র বিভিন্ন প্রকার মতামতকে প্রতিফলিত করিতে পারে।[8] জেনিংসের এই বক্তব্য সম্পূর্ণভাবে গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ যদিও মন্ত্রিসভা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই বিরোধীদলের সমালোচনায় তাঁহাদের মত বা নীতি পরিবর্তন করেন না, কিন্তু তাহারা বিরোধী দলেব সমালোচনায় একেবারে উদাসীন বা নির্লিপ্তও থাকিতে পারেন না। কারণ আগামী নির্বাচনের ভয় তাঁহাদের ইচ্ছামত শাসন চালাইতে বাধা সৃষ্টি করে। এই সমস্ত কারণেই শুধুমাত্র তত্ত্বগত নয়, বাস্তবদিক হইতেও মন্ত্রিসভাকে নিয়ন্ত্রণ করিবার কিছু ক্ষমতা আইনসভার রহিয়াছে।

৩॥ আইনসভা পরিচালিত সরকারের গুণাগুণ (Merits and Demerits of Parliamentary Government)

মন্ত্রিসভা বা আইনসভা পরিচালিত সরকার গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার সঙ্গে অধিকতর সামঞ্জস্যপূর্ণ বলিয়া পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে সংসদীয় গণতন্ত্র (Parliamentary Democracy) প্রতিষ্ঠার প্রবনতা লক্ষ্য করা যাইতেছে।

6. Though in one sense it is true that the House controls the Government, in another and more practical sense the Government controls the House of Commons. —Jennings

7. "The secret of the success of Parliamentry Gevernment lies in the control of the House of commons by the cabinet." —Laski

8. "The function of the House of Commons is...not to control the government, but to act as a forum of outside opinion." —Jennings

কিন্তু আইনসভা পরিচালিত সরকার শুধুমাত্র অবিমিশ্র আশীর্বাদ নহে, ইহার কিছু কিছু দোষ ত্রুটিও রহিয়াছে। নিম্নে আমরা আইনসভা পরিচালিত শাসনব্যবস্থার গুণাগুণ পর্যালোচনা করিলাম।

গুণ: আইনসভা পরিচালিত শাসনব্যবস্থায় আইনবিভাগ ও শাসনবিভাগের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকে বলিয়া ইহা অনেক বেশি দক্ষতা এবং শৃঙ্খলার সঙ্গে কার্য সম্পাদন করিতে পারে। ক্ষমতার পৃথকীকরণ নীতির সমালোচনায় দেখাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে যে শাসন ও আইনবিভাগ পরস্পর হইতে স্বতন্ত্র এবং বিচ্ছিন্ন থাকিলে এক অস্বস্তিকর অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়। কিন্তু আইনসভা পরিচালিত সরকারে এইরূপ অবস্থার সৃষ্টি হয় না। উভয় বিভাগের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকিবার ফলে সুষ্ঠু শাসনের জন্য প্রয়োজনীয় আইন তৈয়ারীর ব্যাপারে আইনবিভাগের সহযোগিতার কখনই অভাব ঘটে না। অপরদিকে আইনবিভাগের কর্তৃক গৃহীত নীতিকে রূপান্বিত করার ব্যাপারে শাসনবিভাগেও সচেষ্ট থাকে। ল্যাস্কি তাই বলিয়াছেন যে কার্যকরী সরকার গঠনের ক্ষেত্রে যে দুইটি বিভাগের পারস্পরিক সম্পর্ক অপরিহার্য, আইনসভা পরিচালিত সরকার তাহাই সৃষ্টি করে।[9]

দ্বিতীয়ত, আইনসভা পরিচালিত শাসনব্যবস্থা দায়িত্বশীল সরকার সৃষ্টি করে। এই শাসনব্যবস্থায় শাসনবিভাগ তাহাদের প্রতিটি কাজের জন্য আইনসভার নিকট দায়িত্বশীল থাকে এবং আইনসভার আস্থা যতদিন অর্জন করিতে পারিবে ততদিন শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকে বলিয়া ইহা আইনসভার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও প্রভাবিত হয়। উপরন্তু মনে রাখিতে হইবে যে, সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে গঠিত আইনসভাকে জনমতের প্রতিফলন বলিয়া মনে করিলে এই শাসনব্যবস্থাকে জনমতের উপর নির্ভরশীল ও দায়িত্বশীল হিসাবে অভিহিত করা যায়।

তৃতীয়ত, আইনসভা পরিচালিত শাসনব্যবস্থা যথেষ্ট পরিমাণে নমনীয় বলিয়া ইহা জাতির এবং রাষ্ট্রের প্রয়োজনের সঙ্গে সঙ্গতি রাখিয়া চলিতে পারে এবং জাতীয় দুর্যোগের সময় যথাযোগ্যভাবে ইহার সম্মুখীন হওয়ার ব্যাপারে আইনসভা পরিচালিত সরকার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারে।

9. It secures an essential co-ordination between bodies whose creative interplay is the condition of effective Government. —Laski

প্রসঙ্গত, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় চার্চিলের (Churchill) নেতৃত্বে ইংলণ্ডে রক্ষণশীল এবং শ্রমিকদলের সংযুক্ত মন্ত্রিসভা গঠনের কথা উল্লেখ করা যায়।

চতুর্থত, দলীয় ব্যবস্থা ব্যতীত আইনসভা পরিচালিত শাসনব্যবস্থা সফল হইতে পারে না। এই শাসনব্যবস্থায় আইনসভায় সরকার ও বিরোধী দলের অস্তিত্ব এবং তাহাদের পারস্পরিক সমালোচনা জনগণকে রাজনৈতিক জ্ঞান ও চেতনায় উদ্বুদ্ধ করে এবং রাজনৈতিক শিক্ষার প্রসার ঘটায়।

সর্বশেষে বলা যায় যে, রাজতন্ত্রের সঙ্গে গণতন্ত্রের একই স্থানে অবস্থান আইনসভা পরিচালিত সরকারে ঘটিতে পারে। রাজাকে নিয়মতান্ত্রিক প্রধান করিয়া জনপ্রতিনিধিত্বমূলক আইনসভা সৃষ্টির দ্বারা রাজতন্ত্র ও গণতন্ত্রের মিলন ঘটান যাইতে পারে। ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ ইংলণ্ডের শাসনব্যবস্থা।

ত্রুটি: ব্যক্তিস্বাধীনতা রক্ষার উদ্দেশ্যে শাসন ও আইন বিভাগের মধ্যে পার্থক্য বজায় রাখিবার জন্য যে ক্ষমতার পৃথকীকরণ নীতির কথা বলা হয়, তাহা আইনসভা পরিচালিত শাসনব্যবস্থায় মান্য করা হয় না। কারণ এই ধরণের শাসনব্যবস্থায় শাসন ও আইনবিভাগের মধ্যে সম্পর্ক এত নিবিড় থাকে যে উহাদের মধ্যে ক্ষমতার পৃথকীকরণের পরিবর্তে ক্ষমতার একীকরণ লক্ষ্য করা যায়। অবশ্য ব্যক্তি স্বাধীনতা রক্ষার জন্য ক্ষমতার পৃথকীকরণ প্রয়োজনীয় কিনা এই ব্যাপারে বিতর্কের অবকাশ আছে।

দ্বিতীয়ত, এই শাসনব্যবস্থার সমালোচনা করিয়া বলা হইয়াছে যে ইহা দলীয় ব্যবস্থার উপর নির্ভরশীল থাকে বলিয়া ইহাতে দলীয় কলহ বৃদ্ধি পায়, রাজনৈতিক দলগুলি জাতীয় স্বার্থ অপেক্ষা দলীয় স্বার্থকে প্রাধান্য দেয় এবং ফলে দলীয় সংকীর্ণতা বৃদ্ধি পায়।[10]

তৃতীয়ত, আইনসভা পরিচালিত সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র সমালেচনা করিয়া বলা হয় যে, এই শাসনব্যবস্থায় প্রকৃতপক্ষে সমস্ত ক্ষমতা আইনসভার হাত হইতে মন্ত্রিসভার হস্তে কেন্দ্রীভূত হইয়া পড়ে এবং আইনসভা বাস্তবে মন্ত্রিসভার নিছক আজ্ঞাবাহকে রূপান্তরিত হয়। ফলে আইনসভা পরিচালিত সরকার মন্ত্রিসভার একনায়কত্ব (Cabinet Dictatorship) প্রতিষ্ঠার পথ সুগম করিয়া দেয়।

চতুর্থত, আইনবিভাগ পরিচালিত শাসনব্যবস্থায় সরকারের স্থায়িত্ব খুবই

---

10. "(It) intensifies the spirit of party and keeps it always on tha boil."
—Bryce.

অনিশ্চিত থাকে বলিয়া ইহা দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ করিতে পারে না। কারণ এই শাসনব্যবস্থায় মন্ত্রিসভা একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকিবে এই কথা বলা যায় না—মন্ত্রিসভাকে আইনসভার মর্জির উপর নির্ভর করিয়া বাঁচিয়া থাকিতে হয়। বিশেষ করিয়া সংযুক্ত মন্ত্রিসভার (Coalition Government) ক্ষেত্রে এই কথা বেশি করিয়া প্রযোজ্য।

৪॥ রাষ্ট্রপতি পরিচালিত সরকার (Presidential form of Government)

শাসন পরিচালনার প্রকৃত ক্ষমতা মন্ত্রিসভার পরিবর্তে যখন এমন কোন শাসকের হস্তে ন্যস্ত হয়, যিনি আইনসভার সদস্য নন, যাঁহার সহিত আইনসভার প্রত্যক্ষ কোন সম্পর্ক নাই এবং যিনি শাসনসংক্রান্ত কার্যাবলীর জন্য আইনসভার নিকট দায়িত্বশীল নন, সেইরূপ ক্ষেত্রে এই প্রকার শাসন-ব্যবস্থাকে রাষ্ট্রপতি পরিচালিত শাসনব্যবস্থা (Presidential form of Government) নামে অভিহিত করা হয়।[11] এই শাসনব্যবস্থায় সংবিধানগতভাবেই শাসন ও আইন বিভাগের স্বাতন্ত্র্য লিপিবদ্ধ থাকে। শাসনবিভাগীয় কর্তা বা রাষ্ট্রপতি যাবতীয় শাসন ক্ষমতা ভোগ করেন এবং অপরপক্ষে আইনসভা শাসনবিভাগের প্রভাব-মুক্ত থাকিয়া নিজস্ব ক্ষমতা প্রয়োগ করিয়া থাকে। ইহার দ্বারা মনে হইতে পারে যে এই ব্যবস্থায় শাসন ও আইনবিভাগের মধ্যে কোন যোগাযোগ এবং পারস্পারিক প্রভাব বিস্তারের সম্ভাবনা থাকে না এবং এখানে সম্পূর্ণভাবে ক্ষমতার পৃথকীকরণ নীতির প্রয়োগ ঘটে। কিন্তু ঘটনা বাস্তবে তাহা নয়। ক্ষমতার পৃথকীকরণ নীতি সম্পূর্ণভাবে প্রয়োগ করা সম্ভব নয় এবং কোন রাষ্ট্রে করাও হয় নাই। তবে রাষ্ট্রপতি পরিচালিত শাসনব্যবস্থার কিছু পরিমাণে ক্ষমতার পৃথকীকরণ নীতিকে প্রয়োগ করার চেষ্টা করা হয়। রাষ্ট্রপতি পরিচালিত সরকারের প্রধান উদাহরণ আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থা।

বস্তুত আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থা হইতেই 'রাষ্ট্রপতি পরিচালিত সরকার' নামকরণটি এতটা পরিচিতি লাভ করিয়াছে। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের শাসনবিভাগীয় সর্বময় ক্ষমতা মন্ত্রিসভার পরিবর্তে রাষ্ট্রপতির হস্তে ন্যস্ত। কিন্তু

11. What has been called 'Presidential' Government......is that system in which the executive is constitutionally independent of the legislature in respect of the duration of his or their tenure and irresponsible to it for his or their political policies."

—Garner

এই কথা মনে করিলে ভুল হইবে যে শাসন ক্ষমতার শীর্ষে রাষ্ট্রপতি থাকিলেই ইহাকে রাষ্ট্রপতি পরিচালিত সরকার বলা হয়। উদাহরণ হিসাবে বলা যায় যে ভারতবর্ষেও শাসনবিভাগের শীর্ষে একজন রাষ্ট্রপতি আছেন, কিন্তু ভারতবর্ষে আইনসভা পরিচালিত শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করা হইয়াছে। সুতরাং কোন রাষ্ট্রে রাষ্ট্রপতি আছেন কিনা—ইহা রাষ্ট্রপতি পরিচালিত সরকার নির্ণয়ের সূত্র নহে। তাই ষ্ট্রং বলিয়াছেন, দেখিতে হইবে আইনসভার নিয়ন্ত্রণ-মুক্ত নির্বাচিত কোন শাসকের অস্তিত্ব আছে কিনা।

রাষ্ট্রপতি পরিচালিত শাসনব্যবস্থায়ও মন্ত্রিসভা থাকিতে পারে। কিন্তু এই মন্ত্রিসভার সঙ্গে আইনসভা পরিচালিত শাসনব্যবস্থার মন্ত্রিসভার গুণগত এবং মূলগত পার্থক্য রহিয়াছে। এই মন্ত্রিসভার সদস্যগণ আইনসভার সদস্য নহেন এবং আইনসভার নিকট ইহাদের কোন দায়িত্বও নাই। ইহারা রাষ্ট্রপতি কর্তৃক মনোনীত কর্মচারী মাত্র এবং রাষ্ট্রপতির ইচ্ছা অনিচ্ছার উপরই ইহাদের চাকুরীর স্থায়িত্ব নির্ভর করে। ইংলণ্ড ও আমেরিকার মন্ত্রিসভার পার্থক্য উপলব্ধি করিতে পারিলে আইনসভা পরিচালিত এবং রাষ্ট্রপতি পরিচালিত শাসনব্যবস্থার মন্ত্রিসভার পার্থক্য বুঝিতে পারা যাইবে।

এইবার আমরা রাষ্ট্রপতি পরিচালিত সরকারের কয়েকটি **বৈশিষ্ট্য** লইয়া আলোচনা করিতেছি।

রাষ্ট্রপতি পরিচালিত শাসনব্যবস্থার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হইল এই যে, এখানে জনসাধারণ কর্তৃক প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নির্বাচিত ব্যক্তি বিশেষের হস্তে সমুদয় ক্ষমতা ন্যস্ত করা হয়। জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত এই শাসক শুধুমাত্র নামসর্বস্ব শাসক নহেন, প্রকৃত মুখ্য শাসকও (real chief executive) বটে। তিনি তাহার কার্যের জন্য জনসাধারণের নিকট দায়ী থাকেন। দ্বিতীয়ত, রাষ্ট্রপতি আইনবিভাগের সদস্য নহেন এবং তিনি আইন-বিভাগ কর্তৃক নির্বাচিত হন না। সেইজন্য তাহার কার্যাবলীর জন্য তিনি আইনসভার নিকট দায়িত্বশীল নহেন। তৃতীয়ত, সাধারণ ভাবে নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে রাষ্ট্রপতিকে তাহার পদ হইতে অপসারিত করা যায় না। একমাত্র অযোগ্যতা, অক্ষমতা ও দুর্নীতির জন্য এক বিশেষ বিচারপদ্ধতির (Impeachment) দ্বারা তাহাকে অপসারিত করা সম্ভব। চতুর্থত, রাষ্ট্রপতির সঙ্গে আইনবিভাগের কোন সম্পর্ক না থাকায় তিনি প্রত্যক্ষভাবে আইনপ্রণয়ন করিতে পারেন না এবং আইন প্রণয়নের প্রস্তাব উত্থাপন করিতে পারেন না।

তবে বাস্তবে রাষ্ট্রপতি নিজস্ব প্রভাব বিস্তার করিয়া আইনসভাকে দিয়া প্রয়োজনীয় আইন পাশ করাইয়া লইতে পারেন।

৫॥ রাষ্ট্রপতি পরিচালিত সরকারের গুণাগুণ (Merits and Demerits of Presidential form of Government)

আইনসভা পরিচালিত শাসনব্যবস্থার বিপরীত রূপ হইল রাষ্ট্রপতি পরিচালিত শাসনব্যবস্থা। সুতরাং আইনসভা পরিচালিত শাসনব্যবস্থার গুণগুলি রাষ্ট্রপতি পরিচালিত শাসনব্যবস্থার দুর্বলতা এবং উহার দুর্বলতা ইহার গুণ। যাহাই হউক নিম্নে আমরা রাষ্ট্রপতি পরিচালিত শাসনব্যবস্থার গুণাগুণ আলোচনা করিতেছি।

গুণ : প্রথমেই বলা যায় যে শাসন ও আইনবিভাগের পারস্পরিক বুঝাপড়া ও ঘনিষ্ঠতা ব্যক্তিস্বাধীনতার পরিপন্থী। রাষ্ট্রপতি পরিচালিত শাসনব্যবস্থায় শাসন ও আইনবিভাগের স্বাতন্ত্র্য রক্ষিত হয় বলিয়া ইহা আদর্শগত দিক হইতে কাম্য।

দ্বিতীয়ত, সরকারের কার্য্যকালের স্থায়িত্ব এই শাসনব্যবস্থার একটি প্রধান গুণ। মন্ত্রিসভা পরিচালিত সরকারের স্থায়িত্ব আইনসভার উপর নির্ভর করে বলিয়া ইহার কার্যকাল ও স্থায়িত্ব অনিশ্চিত থাকে, কিন্তু রাষ্ট্রপতি আইনসভার আস্থা-নিরপেক্ষভাবে ক্ষমতায় আসীন থাকেন বলিয়া ইহা অধিকতর স্থায়ী এবং সেইজন্য এই শাসনব্যবস্থায় দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবে রূপদান সম্ভব।

তৃতীয়ত, উপরোক্ত কারণে বলা যায় যে বহুদলীয় রাষ্ট্রব্যবস্থায় রাষ্ট্রপতি পরিচালিত শাসনব্যবস্থা গ্রহণ করাই বাঞ্ছনীয়। কারণ রাষ্ট্রপতি পরিচালিত শাসনব্যবস্থা প্রবর্তিত হইলে বহুদলীয় আইনসভায় দল ভাঙ্গা-গড়ার দ্বারা সরকারের পতন ঘটিবে না।

চতুর্থত, এই শাসনব্যবস্থার একটি প্রধান গুণ হিসাবে বলা যায় যে জরুরী অবস্থায় দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া পরিস্থিতির সম্মুখীন হওয়ার ব্যাপারে মন্ত্রিসভা পরিচালিত শাসনব্যবস্থা অপেক্ষা ইহা অনেক বেশি কার্যকরী ভূমিকা পালন করিতে পারে। সিদ্ধান্ত গ্রহণের পুর্বে নিয়মতান্ত্রিক জটাজালে এই শাসনব্যবস্থা আবদ্ধ নয় বলিয়াই ইহা সম্ভব।

ত্রুটি : এই প্রকারের শাসনব্যবস্থায় শাসন ও আইনবিভাগের মধ্যে স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করা হয় বলিয়া ইহাতে ক্ষমতা পৃথকীকরণ নীতির দুর্বলতাগুলি বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। শাসন ও আইনবিভাগের মধ্যে পারস্পরিক ভুল বুঝাবুঝি ও বিরোধীতা শাসনব্যবস্থাকে অনিশ্চিত ও অচল করিয়া দেয়। উদাহরণ হিসাবে আমেরিকার রাষ্ট্রপতি উইলসন কর্তৃক স্বাক্ষরিত ভার্সাই চুক্তিকে সিনেট কর্তৃক অগ্রাহ্য করায় ঘটনার উল্লেখ করা যাইতে পারে। বিশেষ করিয়া এই শাসনব্যবস্থায় রাষ্ট্রপতি একদল হইতে নির্বাচিত এবং আইনসভায় অন্য দলের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হইতে পারার সম্ভাবনা থাকায় অচলাবস্থা সৃষ্টি হইতে পারে।

দ্বিতীয়ত, শাসন ও আইনবিভাগের স্বাতন্ত্র্যের ফলে বিরোধের নিষ্পত্তি করিতে যাইয়া এই শাসনব্যবস্থায় বিচারবিভাগীয় প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়। অবশ্য বিচার বিভাগীয় প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা অকল্যাণকর না আশীর্বাদ সেই বিষয়ে বিতর্কের অবকাশ আছে।

তৃতীয়ত, রাষ্ট্রপতি পরিচালিত শাসনব্যবস্থায় ক্ষমতা, কর্তৃত্ব এবং কর্তব্যের দায়িত্ব নির্ণয় করিতে পারা যায় না বলিয়া যথেষ্ট অসুবিধা সৃষ্টি হয়। এই শাসনব্যবস্থা শাসন ও আইনবিভাগকে নিজস্ব দায়িত্ব এড়াইয়া পারস্পরিক দোষারোপে সাহায্য করে।

চতুর্থত, রাষ্ট্রপতি পরিচালিত সরকারের জনগণের নিকট শাসনবিভাগ দায়িত্বশীল থাকে। শাসনবিভাগে আইনবিভাগের সর্বপ্রকার নিয়ন্ত্রণ মুক্ত থাকে বলিয়া স্বৈরাচারী শাসনের অভ্যুত্থান ঘটিতে পারে এবং ইহার প্রতিবিধানের বিশেষ কোন উপায় থাকে না।

পঞ্চমত, রাষ্ট্রপতি পরিচালিত শাসনব্যবস্থা নমনীয় (flexible) না হওয়ার জন্য নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে বিশেষ প্রয়োজনেও (অক্ষমতা, অযোগ্যতা ইত্যাদি ব্যতীত) রাষ্ট্রপতিকে অপসারণ করা যায় না। তাই বিশেষ প্রয়োজনেও এ ই শাসনব্যবস্থায় কাম্য পরিবর্তন করা অসম্ভব।

অষ্টাদশ অধ্যায়

এককেন্দ্রিক ও যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা
(Unitary and Federal Government)

শাসনপদ্ধতির অপর দুইটি রূপের কথা আমরা এই অধ্যায়ে আলোচনা করিব। ইহাতে শাসনক্ষমতার বণ্টন ও অবস্থানের ভিত্তিতে শাসন পদ্ধতিকে দুইভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। শাসন ও আইনবিভাগীয় ক্ষমতা সমগ্র রাষ্ট্রের জন্য একটি কেন্দ্র হইতে প্রয়োগ করা হইবে অথবা একটি কেন্দ্র এবং বিভিন্ন অঞ্চলের ভিতর বণ্টিত হইবে—এই নীতির ভিত্তিতে শাসনব্যবস্থাকে এককেন্দ্রিক ও যুক্তরাষ্ট্র এই দুইভাগে বিভক্ত করা হইয়া থাকে।

১॥ এককেন্দ্রিক সরকার (Unitary Government)

একটি রাষ্ট্রে যখন শাসনক্ষমতা প্রয়োগ এবং আইন প্রণয়নের জন্য সংবিধানগত ভাবে একটিমাত্র সরকার থাকে, তখন ইহাকে আমরা এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থা বলিয়া অভিহিত করি। এই সরকারকে কেন্দ্রীয় সরকার বা জাতীয় সরকার বলা হয়। এককেন্দ্রিক সরকার সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে স্ট্রং (strong) বলিয়াছেন যে এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা সমস্ত প্রকার নিয়ন্ত্রণের ঊর্ধ্বে থাকে, কারণ সংবিধান কেন্দ্রীয় আইনসভা ব্যতীত অন্য কোন আইন প্রণয়ন সংস্থার অস্তিত্ব স্বীকার করে না।[1] অর্থাৎ এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থায় শুধুমাত্র শাসনক্ষমতাই একটিমাত্র কেন্দ্রে কেন্দ্রীভূত থাকে না, আইন প্রণয়নের সর্বময় কর্তৃত্বও একটিমাত্র কেন্দ্রীয় আইনসভা ভোগ করে।[2] এককেন্দ্রীক শাসনব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় আইনসভা যে কোন আইন তৈয়ারী ও বাতিল করিতে পারে, অন্য কোন সংস্থা সেই আইনের বৈধতা বিচার করিতে পারে না বা সেই আইনকে অবৈধ ঘোষণা করিতে পারে না এবং কেন্দ্রীয় আইনসভার কর্তৃত্ব রাষ্ট্রের অন্তর্গত সমস্ত এলাকায় পরিব্যাপ্ত থাকে।

1. "The essence of a unitary state is that the power of the Central Government is unrestrained, for the constitution does not admit any other law making body than the Central one." —Strong

2. "The habitual exercise of supreme legislative authority by one Central power." —Dicey

এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থায় আঞ্চলিক সংস্থার অস্তিত্ব থাকিতে পারে এবং বাস্তবে প্রতিটি এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রেই স্বায়ত্তশাসনমূলক বিভিন্ন আঞ্চলিক সংস্থা রহিয়াছে। এমনকি এই সমস্ত আঞ্চলিক সংস্থার শাসন ও আইন প্রণয়নের জন্য বিভাগও থাকিতে পারে। কিন্তু এই সমস্ত সংস্থা কেন্দ্রীয় শাসন ও আইনবিভাগীয় সংস্থার কর্তৃত্ব মান্য করিয়া এবং উহার অধীনে থাকিয়া পরিচালিত হয়। ইহারা কেন্দ্রীয় আইনবিভাগকে পরিচালনা বা নিয়ন্ত্রণ করিবার অধিকারী নয়। বস্তুত কেন্দ্রীয় আইনসভাই ইহাদের সৃষ্টি করে এবং কেন্দ্রীয় আইনের দ্বারাই ইহারা পরিচালিত হয়। অর্থাৎ কেন্দ্রীয় আইনসভা ব্যতীত অন্য কোন সমমর্য্যাদাসম্পন্ন আইনসভার অস্তিত্ব এককেন্দ্রিক শাসন-ব্যবস্থায় থাকিতে পারে না।

ইংলণ্ড, ফ্রান্স, নিউজিল্যাণ্ড প্রভৃতি রাষ্ট্রে এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থা লক্ষ্য করা যায়। বস্তুত ইংলণ্ডের শাসনব্যবস্থার অন্যতম বৈশিষ্ট্য ইহার এককেন্দ্রিক চরিত্র। এই সমস্ত এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থায় আঞ্চলিক সংস্থা আছে বটে, কিন্তু সেই সংস্থাগুলি অঙ্গরাজ্য হিসাবে স্বীকৃত নয়—সেখনে কেন্দ্রীয় সরকারই একমাত্র চরম কর্তৃত্ব হিসাবে স্বীকৃত এবং কেন্দ্রীয় আইনসভাই একমাত্র সার্বভৌম আইনসভার মর্য্যাদা ভোগ করে।

২॥ এককেন্দ্রিক সরকারের গুণাগুণ (Merits and Demirts of unitary Government)

অন্যান্য শাসনব্যবস্থার ন্যায় এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থারও দোষগুণ রহিয়াছে।

গুণ: এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থায় সমগ্র দেশে একই আইন, নিয়ম-কানুন ও শাসনব্যবস্থা প্রচলিত থাকে। ফলে ইহা দেশে সমরূপতা (uniformity) রক্ষায় সাহায্য করে। সমগ্র দেশে একটি সরকার এবং একই প্রকারের আইন থাকিবার জন্য বিভিন্ন সরকার প্রণীত আইনের মধ্য বিরোধীতা ঘটিবার সম্ভাবনা থাকে না এবং শাসনব্যবস্থা অনাবশ্যক জটিল না হইয়া সহজ ও সরল হইয়া উঠে।

দ্বিতীয়ত, এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থায় একটিমাত্র কর্তৃত্বের (authority) অস্তিত্ব থাকায় জরুরী অবস্থায় অধিকতর দক্ষতা ও দৃঢ়তার সঙ্গে সরকার কার্য্য করিতে পারে।

তৃতীয়ত, ইহাতে জনগণের আনুগত্য কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক সরকারের মধ্যে

দ্বিধা বিভক্ত না হইবার জন্য দেশের ঐক্য ও সংহতি রক্ষা করা সম্ভব। বস্তুত এককেন্দ্রিক ব্যবস্থায় জনগণের মধ্যে বিভেদকামী মনোবৃত্তি দেখা দেয় না।

চতুর্থত, এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থার নমনীয়তা ও সুপরিবর্তনশীলতা ইহার একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য। শাসনব্যবস্থার এই নমনীয়তা এককেন্দ্রীয় সরকারকে প্রয়োজনের সঙ্গে সঙ্গতি রাখিয়া চলিতে সাহায্য করে। উপরন্তু এই শাসনব্যবস্থা অর্থনৈতিক দিক হইতেও সুবিধাজনক, কারণ ইহাতে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা হইতে ব্যয় অনেক কম হয়।

ত্রুটি: প্রতিটি অঞ্চলের জনসাধারণ তাহাদের ইচ্ছা ও অভিরুচি অনুযায়ী নিজেদের কল্যাণার্থে শাসন পরিচালনা করার জন্য স্বায়ত্তশাসনের যে উদারনীতির কথা বলা হয় এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থায় তাহা অবহেলিত। এককেন্দ্রিক ব্যবস্থায় জনগণের স্বায়ত্তশাসনের অধিকার থাকে না বলিয়া ইহা বিভিন্ন আঞ্চলিক জনগণের ভাষা, কৃষ্টি, ঐতিহ্য প্রভৃতির বিকাশের এবং সামগ্রিকভাবে জাতীয় প্রগতির পরিপন্থী।

দ্বিতীয়ত, রাষ্ট্রের আয়তন ক্ষুদ্র হইলে এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থা চলিতে পারে, কিন্তু বিশাল ও বিরাট রাষ্ট্রে এককেন্দ্রিক সরকার একেবারেই অচল। বিশাল রাষ্ট্রে একটিমাত্র কেন্দ্রীয় সরকার প্রতিটি অঞ্চলের জনগণের অভাব, অভিযোগ ও প্রয়োজনের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া সুশাসনের ব্যবস্থা করিতে পারে না। উদাহরণ হিসাবে বলা যায় যে ভারতবর্ষের মত বিরাট দেশে যদি এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থা থাকিত তবে দিল্লী হইতে সুদূর আসাম বা মাদ্রাজ বা গুজরাটে প্রয়োজনীয় মুহূর্তে ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভবপর হইতে কি না সেই বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ রহিয়াছে।

তৃতীয়ত, কেন্দ্রীভূত ক্ষমতা সরকারকে স্বৈরাচারী করিয়া তোলে এবং জনগণের অধিকার ও স্বাধীনতার ব্যাপারে বিপদজনক পরিস্থিতি সৃষ্টি করে। তাই ল্যাস্কি মনে করেন যে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা বিভক্ত করিয়াই ক্ষমতা প্রয়োজনকারীদের সংযত রাখা যাইতে পারে।[৩]

৩. "......The formidable centralisation of modern state is so great an enemy of an ideal system of rights. For only where power is distributed widely is there any effective restraint upon those who wield it." —Laski

৩ ॥ যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা কাহাকে বলে? (What is a Federal Union?)

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের শাসনব্যবস্থা বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে, এককেন্দ্রিক (unitary) অথবা যুক্তরাষ্ট্রীয় (Federal) এই দুইটি পদ্ধতির একটির সাহায্যে শাসনকার্য পরিচালনা করা হইয়া থাকে। রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও সংবিধানের ছাত্র-ছাত্রীদের নিকট যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন পদ্ধতি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

যখন কোন রাষ্ট্রকে শাসনকার্যের সুবিধার জন্য বা কোন কারণে কয়েকটি অঙ্গরাজ্যে বা প্রদেশে বিভক্ত করিয়া প্রতিটি অঙ্গরাজ্যে একটি করিয়া সরকার এবং কেন্দ্রে আর একটি সরকার স্থাপন করিয়া শাসনব্যবস্থা পরিচালনা করা হয়, অথবা যখন কয়েকটি ক্ষুদ্র রাষ্ট্র বৈদেশিক আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা, নিজেদের নিরাপত্তা রক্ষা প্রভৃতি কারণে মিলিত হইয়া বিভিন্ন আঞ্চলিক ও একটি কেন্দ্রীয় সরকারের দ্বারা শাসন পরিচালনা করে, তখন তাহাকে যুক্তরাষ্ট্র বলে। সামাজিক, নৈতিক, সাংস্কৃতিক এবং ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্যগত বিভিন্ন জাতীয় জনসমাজের মিলন ঘটিতে পারে যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যদিয়া। ফাইনার বলিয়াছেন যে, যেখানে কর্তৃত্ব ও ক্ষমতার কিছু অংশ আঞ্চলিক ক্ষেত্রগুলিতে ন্যস্ত থাকে এবং অন্যান্য অংশে ঐ সব আঞ্চলিক ক্ষেত্রের সংঘের ভিতরকার কেন্দ্রীয় সংস্থার হস্তে ন্যস্ত থাকে তাহাকে যুক্তরাষ্ট্র বলে।[4]

যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার মূল ক্ষমতাকে কেন্দ্রীয় সরকার ও অঙ্গরাজ্যের সরকারগুলির ভিতর এমনভাবে ভাগ করিয়া দেওয়া হয় যাহাতে রাষ্ট্রের সমষ্টিগত স্বার্থের সঙ্গে জড়িত বা যৌথ স্বার্থসম্পন্ন বিষয়গুলি কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তে ন্যস্ত থাকে এবং আঞ্চলিক স্বার্থের সঙ্গে জড়িত এবং অন্যান্য বিষয়গুলি অঙ্গরাজ্যগুলির এক্তিয়ারভুক্ত রাখা হয়। উভয় পর্যায়ের সরকারই স্ব স্ব ক্ষেত্রে মোটামুটিভাবে স্বাধীন থাকিয়া কার্য পরিচালনা করিতে পারে এবং এক অন্যের ব্যাপারে সাধারণত হস্তক্ষেপ করিতে পারে না। অধ্যাপক হুইয়ার বলিয়াছেন: যুক্তরাষ্ট্রীয় নীতি ক্ষমতাবণ্টনের এমন পদ্ধতি অনুসরণ করিবে

4. A Federal state is one in which part of the authority and power is vested in the local areas while another part is vested in a central institution deliberately constituted by an association of the local areas. —Finer

যাহাতে কেন্দ্রীয় সরকার ও আঞ্চলিক সরকারগুলি প্রত্যেকেই স্ব স্ব এক্তিয়ারের মধ্যে স্বাধীন ও স্বতন্ত্র থাকে।[5]

যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় কেন্দ্রিয় ও অঙ্গরাজ্যের মধ্যে ক্ষমতা বিভক্ত করিবার ব্যাপারে একই নীতি অনুসরণ করা হয় না—এই ব্যাপারে প্রকারভেদ রহিয়াছে। কোন কোন যুক্তরাষ্ট্রে কেন্দ্রিয় সরকারের ক্ষমতা নির্দিষ্ট করিয়া অবশিষ্ট ক্ষমতা (Residuary powers) অঙ্গরাজ্যগুলিকে দেওয়া হয়। আবার কোন কোন যুক্তরাষ্ট্রে ইহার বিপরীত পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়, সেখানে অঙ্গরাজ্যগুলির ক্ষমতা নির্দিষ্ট থাকে এবং কেন্দ্রীয় সরকার অবশিষ্ট ক্ষমতা ভোগ করে। ভারতবর্ষে অবশ্য এই দুইটির কোন নীতিকে না মানিয়া তৃতীয় আর একটি পদ্ধতি গ্রহণ করা হইয়াছে। এখানে সমুদয় ক্ষমতাকে তিনভাগে বিভক্ত করিয়া একটি অংশ কেন্দ্র, অপর অংশ অঙ্গরাজ্যগুলি এবং তৃতীয় অংশ যুগ্ম তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। যুগ্ম তালিকার ক্ষেত্রে কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির যুগ্ম কর্তৃত্ব থাকিবে। তবে যুগ্ম তালিকার অন্তর্ভুক্ত কোন বিষয় লইয়া কেন্দ্র এবং অঙ্গরাজ্যের মধ্যে বিরোধ দেখা কালে কেন্দ্রীয় কর্তৃত্বই বজায় থাকিবে।

সে যাহাই হউক যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় ক্ষমতার বণ্টন এবং কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারের পারস্পরিক সম্পর্কের ব্যাপারে উভয় পর্যায়ের সরকারই স্ব স্ব ক্ষেত্রে মোটামুটিভাবে স্বাধীন থাকিয়া কার্য্য পরিচালনা করিবার অধিকারী এবং এক অন্যের ব্যাপারে তত্ত্বগত দিক হইতে হস্তক্ষেপ করিতে পারে না। ডাইসি মনে যে সংবিধানগতভাবে উৎপত্তি লাভ করিয়াছে এবং সংবিধান দ্বারা নিয়ন্ত্রিত বিভিন্ন সংস্থার মধ্যে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাকে বিভক্ত করিয়া দেওয়াকেই যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা বলে।[6]

সর্বশেষে ডাইসি যুক্তরাষ্ট্রে গঠনের যে উদ্দেশ্যের কথা বলিয়াছেন তাহার ব্যাখ্যা প্রয়োজন—নতুবা আমাদের আলোচনা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে। ডাইসির মতে জাতীয় ঐক্য এবং শক্তির সঙ্গে অঙ্গরাজ্যের অধিকারের সমন্বয়

5. "By the fedeal principle I mean the method of dividing powers so that the general and regional governments are each within a sphere, co-ordinate and independent." —Wheare

6. "Federalism means the distribution of the force of the state among a number of co-ordinate bodis each orginating in and controlled by the constitution." —Dicey

সাধনের রাষ্ট্রনৈতিক পন্থা হইল যুক্তরাষ্ট্র।[7] যখন পাশাপাশি অবস্থিত স্বতন্ত্র ভূ-খণ্ডের অধিকারী বিভিন্ন জাতীয় জনসমাজের মধ্যে একটি জাতীয় ঐক্যভাব পরিলক্ষিত হয় এবং তাহার জন্য ইহারা ঐক্যবদ্ধ এবং মিলিত হইতে চাহে, অথচ প্রতিটি জাতীয়জনসমাজ বিশিষ্ট ভূ-খণ্ড তাহাদের নিজেদের স্বাতন্ত্র্যকে রক্ষা করিতে চাহে—তখন যুক্তরাষ্ট্র গঠনের মধ্য দিয়াই কেবলমাত্র এই আপাতবিরোধী ইচ্ছা দুইটি রূপায়িত হইতে পারে। অর্থাৎ এই অবস্থার রাষ্ট্রনৈতিক সমাধান যুক্তরাষ্ট্র গঠন। ইহারা স্বাতন্ত্র্য রক্ষার ইচ্ছা পোষণ না করিয়া শুধুমাত্র ঐক্যবদ্ধ হইতে চাহিলে এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থাই সে দাবী পূরণ করিতে পারে। আবার ইহারা ঐক্যবদ্ধ হইবার ইচ্ছা পোষণ না করিয়া শুধুমাত্র স্বাতন্ত্র ভোগের দাবী করিলে প্রত্যেকটি জনসমাজবিশিষ্ট ভূ-খণ্ডের জন্য স্বতন্ত্র রাষ্ট্র সৃষ্টি করিয়া সেই ইচ্ছা পূরণ করা যায়। কিন্তু স্বাতন্ত্র্য রক্ষা এবং ঐক্যবদ্ধ হওয়ার এই যুগপৎ ইচ্ছা একমাত্র যুক্তরাষ্ট্র গঠনের মধ্য দিয়াই রাষ্ট্রনৈতিক রূপলাভ করিতে পারে।

যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার কয়েকটি মৌলিক **বৈশিষ্ট্য** লক্ষ্য করা যায়। প্রথমত, পূর্বেই বলা হইয়াছে যে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় দুই শ্রেণীর সরকারের অবস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যে এক প্রকারের এবং কেন্দ্রে আর এক প্রকার সরকার অবস্থান করে। দ্বিতীয়ত, সংবিধানগত স্বীকৃতির মধ্য দিয়াই যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের উৎপত্তি ঘটিয়া থাকে এবং যুক্তরাষ্ট্রের দুই শ্রেণীর সরকারের মধ্যে শাসনক্ষমতার বণ্টন ও পরস্পরের এক্তিয়ার শাসনতন্ত্র কর্তৃক নির্দেশ করিয়া দেওয়া হয়, যদি ও এই বণ্টন নীতি বিভিন্ন যুক্তরাষ্ট্রে বিভিন্ন প্রকারের। নিজ নিজ এক্তিয়ারের মধ্যে উভয় সরকারই চরম ক্ষমতার অধিকারী এবং কেহ কাহারও অধীন নয়। তৃতীয়ত, সুনিশ্চিত ও সুনির্দিষ্ট নীতির ভিত্তিতে যাহাতে কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক সরকারসমূহ পরিচালিত হইতে পারে তাহার জন্য যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র লিখিত (written constitution) হওয়া প্রয়োজন। উড্রো উইলসনের মতে লিখিত সংবিধান যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে একান্ত অপরিহার্য না হইলেও উহার বিশেষ প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে। চতুর্থত, সংবিধানের অবিসংবাদিত প্রাধান্য (supremacy of the constitution) যুক্তরাষ্ট্রের আর একটি বৈশিষ্ট্য। সংবিধানের প্রাধান্য না থাকিলে যুক্তরাষ্ট্রের

---

7. "A federal state is a political contrivance intended to reconcile national unity with the maintenance of 'state rights." —Dicey

কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক সরকারের মধ্যে সুশৃঙ্খলভাবে কাজকর্ম চলিতে পারে না। পঞ্চমত, সংবিধানের ধারাগুলি যথাযথভাবে প্রতিপালিত হইতেছে কিনা তাহা দেখিবার জন্য এবং কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক সরকারগুলির অধিকার ও ক্ষমতা রক্ষার জন্য যুক্তরাষ্ট্রে সর্বোচ্চ ক্ষমতাপূর্ণ এবং নিরপেক্ষ বিচারকসম্পন্ন যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত থাকা প্রয়োজন। শাসনতন্ত্রের ব্যাখ্যা লইয়া অথবা ক্ষমতার এক্তিয়ার লইয়া মতভেদ উপস্থিত হইলে যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত তাহার নিষ্পত্তি করিবে। অর্থাৎ এককথায় যুক্তরাষ্ট্রে বিচার বিভাগীয় প্রাধান্য (supremacy of the Judiciary) স্থাপিত হওয়া উচিত। বিচার বিভাগীয় প্রাধান্য রক্ষার দ্বারাই সংবিধানের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। ষষ্ঠত, কেন্দ্রীয় বা অঙ্গরাজ্যগুলির সরকারগুলি যাহাতে নিজেদের ইচ্ছা ও সুবিধা অনুযায়ী সংবিধান সংশোধন করিয়া অন্যের ক্ষমতা হস্তগত ও আত্মসাৎ করিতে না পারে তাহার জন্য যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান দুষ্পরিবর্তনীয় (Rigid) হওয়া কাম্য। সপ্তমত, সমানাধিকারের ভিত্তিতে অঙ্গরাজ্যগুলির প্রতিনিধিত্বের জন্য আইন-সভায় দ্বিতীয় কক্ষের অবস্থান যুক্তরাষ্ট্রের আর একটি বৈশিষ্ট্য। আইনসভার দুইটি কক্ষ সৃষ্টি করিয়া দ্বিতীয় কক্ষ দ্বারা অঙ্গরাজ্যগুলির প্রতিনিধিত্বকে সুনিশ্চিত করা যাইতে পারে।

বিভিন্ন যুক্তরাষ্ট্রে যুক্তরাষ্ট্রীয় বৈশিষ্ট্যের কতটা পরিমাণ অস্তিত্ব রহিয়াছে ইহার ভিত্তিতে হুইয়ার যুক্তরাষ্ট্র এবং আধা-যুক্তরাষ্ট্র (quasi-federal) এই প্রকারের শ্রেণীবিভাগ করিবার পক্ষপাতী। কোন কোন রাষ্ট্রে কাঠামোগত দিক হইতে যুক্তরাষ্ট্র থাকিলেও বাস্তবে যুক্তরাষ্ট্রীয় উপাদানের এত অভাব থাকে যে উহাকে পরিপূর্ণ যুক্তরাষ্ট্র বলা যায় না। এই দৃষ্টিকোণ হইতে বিচার করিলে ভারতবর্ষ, সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রভৃতিকে আধা-যুক্তরাষ্ট্র বলা যাইতে পারে।

যুক্তরাষ্ট্রীয় ও এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থা :—যুক্তরাষ্ট্র এবং এককেন্দ্রিক সরকার কাহাকে বলে এই ব্যাপারে আলোচনা আমরা মোটামুটিভাবে শেষ করিয়াছি।* এইবার তুলনামূলক আলোচনার মাধ্যমে ইহাদের ভিতরকার পার্থক্য নির্দেশ করা হইল।

শাসনক্ষমতার অবস্থান একটি কেন্দ্রে কেন্দ্রীভূত থাকিবে অথবা বিভিন্ন স্থানে বিক্ষিপ্ত থাকিবে এই নীতির ভিত্তিতে শাসব্যবস্থাকে এককেন্দ্রিক এবং যুক্তরাষ্ট্র এই দুই ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। এককেন্দ্রিক সরকারের বিপরীত রূপ হইল যুক্তরাষ্ট্র। এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থায় ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত

হইয়া একটিমাত্র স্থানে অবস্থান করে, যুক্তরাষ্ট্র সরকারের ক্ষমতা বিভিন্ন অঙ্গরাজ্য এবং কেন্দ্রের মধ্য বিভক্ত থাকে। অর্থাৎ এককেন্দ্রিক ও যুক্তরাষ্ট্রে যথাক্রমে কর্তৃত্বের কেন্দ্রীকরণ এবং কর্তৃত্বের বিকেন্দ্রীকরণ ঘটিয়া থাকে। এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থায় আঞ্চলিক সংস্থা থাকিতে পারে—কিন্তু ঐগুলি সংবিধানগত কোন মর্য্যাদা ভোগ করে না, কেন্দ্রীয় সরকারের দান হিসাবে ইহাদের উৎপত্তি হয় এবং কেন্দ্রীয় সরকার ইহাদের ইচ্ছামত পরিবর্তন, পরিবর্ধন, এবং বিলোপ করিতে পারে। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের অঙ্গরাজ্যগুলি সংবিধান দ্বারা সৃষ্ট এবং সংবিধান পরিবর্তন ব্যতীত ইহাদের ক্ষমতার পরিবর্তন বা বিলোপ-সাধন করা সম্ভব নয়।

৪ ॥ যুক্তরাষ্ট্র গঠনের শর্ত (Conditions of Federalism)

কোন একটি বিশেষ রাষ্ট্রে যুক্তরাষ্ট্রীয় পদ্ধতি প্রবর্তিত করা যাইবে কিনা, অথবা প্রবর্তিত হইলেও উহা সাফল্যলাভ করিতে পারিবে কিনা, তাহা কতকগুলি বাস্তব অবস্থার উপর নির্ভর করে। প্রসঙ্গত মনে রাখা প্রয়োজন যে, অনেক সময় ছোট ছোট কতকগুলি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র অর্থনৈতিক উন্নতি এবং নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার উদ্দেশ্যে অথবা অন্য রাষ্ট্রের দ্বারা বিজিত হওয়ায় মিলিত হইয়া কেন্দ্রীকরণ পদ্ধতির (Process of centralisation) দ্বারা যুক্তরাষ্ট্র গঠন করিয়া থাকে (যেমন আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র)। আবার অনেক সময় একটি বৃহৎ রাষ্ট্র শাসনের সুবিধার জন্য নিজেকে কয়েকটি আঞ্চলিক সরকারে বিভক্ত করিয়া বিকেন্দ্রীকরণ পদ্ধতির (Process of decentratisation) দ্বারা যুক্তরাষ্ট্রী গঠন করিয়া থাকে (যেমন কানাডা যুক্তরাষ্ট্র)।

উপরোক্ত পদ্ধতিগুলির যে কোনটির দ্বারা যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হউক না কেন, যুক্তরাষ্ট্রকে সফল হইতে হইলে প্রথমত উহাদের সংঘবদ্ধ হইবার ইচ্ছা থাকিতে হইবে। এইবার আলোচনা করিয়া দেখা যাইতে পারে যে, কোন্ কোন্ কারণে বা অবস্থায় জনসমাজ সংঘবদ্ধ হইতে চায়। (১) প্রথমেই আসে ভৌগোলিক সান্নিধ্যের প্রশ্ন। ভৌগোলিক সান্নিধ্য জনসমাজের ভিতর এমন একটা একাত্মবোধ জাগায় যাহার ফলে ঐক্যবদ্ধ হইবার ইচ্ছা দেখা দেয়। ভৌগোলিক ব্যবধান যুক্তরাষ্ট্র গঠনের অন্তরায় সৃষ্টি করে। (২) অর্থনৈতিক সুযোগ, সুবিধা ও উন্নতির সম্ভাবনা ঐক্যবদ্ধ হইবার ইচ্ছা বিশেষভাবে জাগ্রত করিয়া সাহায্য করে। (৩) সম্ভাব্য বিদেশী আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা ও শক্তিশালী প্রতিরক্ষা

ব্যবস্থা গড়িয়া তোলার প্রয়োজনবোধ হইতে ছোট ছোট রাষ্ট্রগুলির ঐক্যবদ্ধ হইবার ইচ্ছা দেখা দেয়। (৪) ধর্ম, ভাষা, সাহিত্য, কৃষ্টি, ঐতিহ্য প্রভৃতির অভিন্নতাও এইরূপ ঐক্যবোধকে জাগ্রত করিয়া থকে। (৫) জাতীয়তাবোধের প্রেরণাও বিভিন্ন জনসমাজে ঐক্যবদ্ধ হইবার ইচ্ছা সৃষ্টি করে।

মিল এবং ডাইসির মতে শুধুমাত্র ঐক্যবদ্ধ হইবার ইচ্ছাই যথেষ্ট নয়, দেখিতে হইবে এই ইচ্ছাকে কার্যকরী করিবার ক্ষমতা আছে কিনা। সুতরাং দ্বিতীয়ত ইচ্ছাকে কার্যকরী করিবার যোগ্যতা থাকিতে হইবে। এই যোগ্যতা বহুল পরিমাণে (১) ভৌগোলিক বিস্তৃতি, জনসংখ্যা ও সম্পদের দিক দিয়া সম-অবস্থা, (২) প্রচুর অর্থবল ও লোকবল, (৩) উচ্চতর রাজনৈতিক আদর্শ ও শিক্ষা প্রভৃতি উপাদানের উপর নির্ভর করে।

পূর্বেই বলা হইয়াছে, যুক্তরাষ্ট্র গঠনের আর একটি শর্ত হইয়াছে এই যে, স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রগুলি ঐক্যবদ্ধ হইয়া যুক্তরাষ্ট্র গঠন করিতে চাহিবে বটে, কিন্তু তাহারা পরস্পরের স্বাতন্ত্র্য বিলোপ করিতে প্রস্তুত নয় (There will be desire for union, but not for unity)। ইহাকে যুক্তরাষ্ট্র গঠনের তৃতীয় শর্ত বলা যায়।

চতুর্থত, ডাইসির মতে আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল জনসমাজ ব্যতীত যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা সফল হইতে পারে না।[৪] কারণ সাংবিধানিক আইন এবং বিচার বিভাগের প্রাধান্য নিশ্চিত না করিতে পারিলে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা ব্যর্থ হইতে বাধ্য। সুতরাং আইনকে শ্রদ্ধা ও মান্য করা এবং বিচার বিভাগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার মত মানবিক প্রস্তুতি কোন জনসমাজের না থাকিলে সেখানে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা সফল হইতে পারে না।

উপরোক্ত শর্তগুলি পালিত হইলে সাধারনত যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার প্রবর্তন করা এবং উহাকে সফল করা সম্ভব। কিন্তু ইহাও দেখা গিয়াছে যে, এইরকম অবস্থা সত্ত্বেও কোন রাষ্ট্রে এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থা এবং অন্যরাষ্ট্রে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা প্রবর্তিত এবং সাফল্য মণ্ডিত হইয়াছে। সুতরাং এই বাস্তব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সিদ্ধান্ত করা যাইতেছে পারে যে, যুক্তরাষ্ট্র গঠন এবং উহাকে সফল করিবার জন্য উপরোক্ত শর্তগুলি প্রয়োজনীয় হইলেও একান্ত অপরিহার্য নয়।

৪. A Federal System can flourish only among the communities imbued with a legal Spirit."

৫॥ যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার গুণাগুণ (Merits and demerits of Federation)

পূর্বে আমরা এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থার গুণাগুণ আলোচনা করিয়াছি। মূলত এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থার যাহা ত্রুটি তাহাই যুক্তরাষ্ট্রের গুণ এবং এককেন্দ্রিক ব্যবস্থায় যাহা গুণ যুক্তরাষ্ট্রের তাহাই ত্রুটি। নিম্নে আমরা যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার গুণাগুণ স্বতন্ত্রভাবে আলোচনা করিতেছি।

গুণ : ১। যুক্তরাষ্ট্রের সর্বপ্রথম সুবিধা হিসাবে বলা যায় যে, এই ব্যবস্থায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যগুলি নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিয়াও বৃহৎ রাষ্ট্রের শক্তি এবং সমস্ত সুযোগ-সুবিধা ভোগ করিতে পারে।

২। এইরূপ শাসনব্যবস্থায় অঙ্গরাজ্যগুলির স্বতন্ত্র আইনসভা ও সরকার থাকিবার জন্য আঞ্চলিক স্বায়ত্ত শাসন প্রতিষ্ঠিত হয় এবং অঙ্গরাজ্যগুলির নিজস্ব ভাষা, সংস্কৃতি, কৃষ্টি প্রভৃতির বিকাশ ঘটে। ইহার ফলে এই শাসন ব্যবস্থায় জনগণ রাষ্ট্রনীতি সম্পর্কে অধিকতর আগ্রহশীল হয়।

৩। যে রাষ্ট্রের জনগণ নানাপ্রকার ভৌগেলিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মগত ও ভাষাগত পার্থক্যের দ্বারা বিভক্ত থাকে সেইস্থানে এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থা অপেক্ষা যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা অধিকতর উপযোগী।

৪। ডাইসিকে অনুসরণ করিয়া তাই বলা যায় যে, বিভিন্ন জাতীয় জনসমাজের একদিকে নিজস্ব অধিকার রক্ষার ইচ্ছা এবং অপরপক্ষে নিজেদের মধ্যে ঐক্য গড়িয়া তুলিবার ইচ্ছা একমাত্র যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার মধ্য দিয়াই নিশ্চিত করা যাইতে পারে।

৫। বৃহৎ আকারের কেন্দ্রীয় শাসনের মধ্যে কোনরূপ পরীক্ষামূলক কার্য চালানো বিপজ্জনক, কারণ উহাতে বহুসংখ্যক লোকের স্বার্থ জড়িত থাকে। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রে নানারূপ সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার সুযোগ থাকে।

৬। একটিমাত্র সরকার বৃহৎ দেশ শাসন করিলে সুশাসনের অভাব দেখা যায়। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যাবস্থায় আঞ্চলিক সমস্যা ও অবস্থা সম্পর্কে আঞ্চলিক সরকারসমূহ অধিকতর অবহিত ও ওয়াকিবহাল থাকায় দক্ষতার সঙ্গে সুষ্ঠু শাসন পরিচালনা করা যাইতে পারে।

৭। যুক্তরাষ্ট্রীয় সংবিধানের মধ্যে স্বেচ্ছাচারী সরকারের (কেন্দ্রীয় বা আঞ্চলিক) অভ্যুত্থানের সম্ভাবনা কম। কারণ সংবিধান ও বিচারালয়ের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা দ্বারা কেন্দ্র এবং অঙ্গরাজ্যের স্বেচ্ছাচারীতা রোধ করা যাইতে পারে।

যুক্তরাষ্ট্রের ত্রুটি : উপরোক্ত গুণাবলী থাকে সত্ত্বেও যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় কিছু কিছু ত্রুটি লক্ষ্য করা যায়, যাহা নিম্নে আলোচনা করা হইল।

১। যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা অতন্ত জটিল, দুর্বল এবং ব্যয়বহুল। ইহার জটিলতার জন্য কেন্দ্র ও অঙ্গরাজ্যগুলির মধ্য ক্ষমতার ভারসাম্য বজায় রাখা কষ্টকর। যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা দুই স্তরের শাসন পরিচালনা করিবার জন্য প্রচুর সময়, শক্তি ও অর্থের অপচয় ঘটে।

২। কর্তৃত্ব দ্বিধাবিভক্ত থাকিবার জন্য এবং বিভিন্নপ্রকারের নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতি (Formality) গ্রহণ করিবার জন্য যুক্তরাষ্ট্রে দ্রুত কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব নয়। সেজন্য যুদ্ধের সময়, জাতীয় সংকটকালে এবং জরুরী অবস্থায় অসুবিধা সৃষ্টি হইতে পারে।

৩। নিরপেক্ষ যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত এবং উহার প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা দ্বারাই যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা সফল হইতে পারে। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত সাধারণত কেন্দ্রের প্রতি অধিকতর সহানুভূতিশীল হইবার জন্য পক্ষপাতহীন বিচার সর্বদা আশা করা যায় না। ফলে, অঙ্গবাজ্যগুলি অবহেলিত থাকে এবং ইহা যুক্তরাষ্ট্রকে দুর্বল করে।

৪। আঞ্চলিক ও কেন্দ্রীয় সরকারের পরস্পরবিরোধী আইন প্রচলনের জন্য ব্যক্তিগত অধিকার ও দায়দায়িত্ব সম্পর্কে অনেক সময়ই যুক্তরাষ্ট্রে বিভ্রান্তিকর পরিস্থিতি দেখা যায়।

৫। যুক্তরাষ্ট্রে সাধারণত দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধান থাকে বলিয়া প্রয়োজনীয় মুহূর্তে ইহাকে সহজে সংশোধন করা যায় না। দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধান প্রয়োজনের সঙ্গে সঙ্গতি রাখিয়া নিজেকে পরিবর্তিত করিতে না পারার জন্য বিপদজনক অবস্থার সৃষ্টি হইতে পারে এবং সংবিধান বহির্ভূত উপায়ে সংবিধান পরিবর্তনের রীতি প্রচলিত হয়। যেমন আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে সুপ্রিম কোর্টের ব্যাখ্যার মাধ্যমে সংবিধান পরিবর্তনের উদ্দেশ্য সাধন করা হয়।

যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার উপরোক্ত দোষত্রুটি থাকা সত্ত্বেও স্বীকার করিতে হইবে যে, এই শাসনব্যবস্থা যুগোপযোগী এবং প্রয়োজন মিটাইতে সক্ষম।

প্রতিটি অঞ্চলের জাতীয় বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়া শক্তিশালী রাষ্ট্র গঠন করা একমাত্র যুক্তরাষ্ট্রেই সম্ভব। এইস্থানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী রাষ্ট্র দুইটিতেই যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা অনুসরণ করিয়াছে।

৬॥ বিভিন্ন সংবিধানে যুক্তরাষ্ট্রীয় উপাদান (Federal aspects in different constitutions)

ভারতবর্ষ, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র এবং সুইজারল্যাণ্ডের সংবিধানে যুক্তরাষ্ট্রীয় বৈশিষ্ট্য এবং উপাদান কতটা পরিমাণে রহিয়াছে তাহা আলোচনা করা হইল।

(১) **ভারতবর্ষ:** ভারতবর্ষে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনপদ্ধতি গৃহীত হইয়াছে। ১৬টি অঙ্গরাজ্য ও ৬টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল লইয়া ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র গঠিত। ভারতের সংবিধান বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে, এইস্থানে যুক্তরাষ্ট্রের অনেক বৈশিষ্ট্য থাকিলেও কিছু কিছু যুক্তরাষ্ট্রীয় উপাদানের অভাব আছে। যুক্তরাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য হিসাবে বলা যায় যে. ভারতে কেন্দ্র ও অঙ্গরাজ্য-গুলিতে দুই শ্রেণীর সরকার দেখিতে পাওয়া যায় এবং সংবিধান ইহাদের পারস্পরিক ক্ষমতা বণ্টন করিয়া দিয়াছে। এখানকার শাসনতন্ত্র লিখিত। ক্ষমতাসম্পন্ন এবং স্বাধীন উচ্চবিচারালয় বা সুপ্রীম কোর্ট ভারতে আছে। ভারতবর্ষের সংবিধান আপাতদৃষ্টিতে দুষ্পরিবর্তনীয়। সুতরাং যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি ভারতবর্ষে মোটামুটি ভাবে অনুসৃত হইয়াছে।

কিন্তু একটু গভীরভাবে চিন্তা করিলে দেখা যাইবে যে, ভারতবর্ষে ক্ষমতা বণ্টনের ক্ষেত্রে অঙ্গরাজ্যগুলিকে বঞ্চনা করা হইয়াছে এবং সেইজন্য ভারতবর্ষের অঙ্গরাজ্যগুলি অনেক বেশি পরিমাণে কেন্দ্র মুখাপেক্ষী। ভারতবর্ষের সুপ্রীম কোর্ট আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রীম কোর্টের মত ব্যাপক বিচার বিভাগীয় সমীক্ষা বা Judicial Review-এর ক্ষমতার অধিকারী নয়। তত্ত্বগত দিক হইতে যাহাই হউক না কেন বাস্তবে ভারতের সংবিধান সহজ পরিবর্তনীয়। অর্থসংক্রান্ত ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রাধান্য রহিয়াছে। এইসমস্ত উপাদান বা বৈশিষ্ট্যগুলি একান্তভাবেই যুক্তরাষ্ট্রীয় নীতিবিরোধী। ভারতবর্ষে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনপদ্ধতি গৃহীত হওয়া সত্ত্বেও কিছু পরিমাণ এককেন্দ্রিকতার ঝোঁক রহিয়াছে। তাই হুইয়ার ভারতবর্ষের সংবিধানকে 'আধা যুক্তরাষ্ট্রীয়' বলিয়া

অভিহিত করিয়াছেন (A system of Government which is quasi-federal)।

(২) **আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র:** যুক্তরাষ্ট্রের তত্ত্বগত বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে বিচার করিলে দেখা যাইবে যে, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান অন্যতম শ্রেষ্ঠ যুক্তরাষ্ট্রীয় সংবিধান। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে কেন্দ্র ও অঙ্গরাজ্যগুলির মধ্যে ক্ষমতা পক্ষপাতহীন ও সুস্পষ্টভাবে বণ্টিত, সংবিধান সংশোধনপদ্ধতি দুষ্পরিবর্তনীয়, বিচার বিভাগ এবং সংবিধানের অবিসংবাদিত প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত, সংবিধান লিখিত, সংবিধানের ধারা যথাযথভাবে পালিত হইতেছে কিনা সুপ্রীম কোর্টের দ্বারা তাহা দেখিবার অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের অঙ্গরাজ্যগুলি অনেক বেশি ক্ষমতাসম্পন্ন এবং তাহারা সর্ববিষয়ে কেন্দ্রের মুখাপেক্ষী নয়। এই সমস্ত যুক্তরাষ্ট্রীয় বৈশিষ্ট্যের অস্তিত্ব থাকিবার জন্য অনেকে আমেরিকার সংবিধানকে আদর্শ যুক্তরাষ্ট্রীয় সংবিধান বলিয়া মনে করিয়া থাকেন।

(৩) **সোবিয়েত যুক্তরাষ্ট্র:** সোবিয়েত সংবিধানের ১৩নং ধারায় সোবিয়েত রাশিয়াকে একটি যুক্তরাষ্ট্র বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে।[9] যুক্তরাষ্ট্র হিসাবে সোবিয়েত ইউনিয়ন কতটা পরিমাণে যুক্তরাষ্ট্রীয় নীতি গ্রহণ করিয়াছে তাহা আলোচনা করা হইল।

সোবিয়েত ইউনিয়নে কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা নির্দিষ্ট রাখিয়া অবশিষ্ট ক্ষমতা ইউনিয়ন রিপাবলিকগুলিকে দেওয়া হইয়াছে। সোবিয়েত ইউনিয়নের সংবিধান সহজ পরিবর্তনশীল নহে,—কিন্তু তাই বলিয়া আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের মত এতটা দুষ্পরিবর্তনীয়ও নহে। সোবিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের বিচার বিভাগের প্রাধান্য স্বীকৃত হয় নাই। সেখানে সর্বোচ্চ যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালতের পরিবর্তে সংবিধানের ব্যাখ্যাকার ও অভিভাবক হিসাবে আছে সুপ্রীম সোবিয়েতের প্রেসিডিয়াম (Presidium of Supreme Soviet)। সোবিয়েত রাশিয়ার প্রতিটি ইউনিয়ন রিপাবলিকের স্বতন্ত্র সংবিধান এবং সৈন্যবাহিনী আছে। অন্যান্য বিদেশী রাষ্ট্রের সঙ্গে ইহারা প্রত্যক্ষভাবে সম্পর্ক স্থাপন, চুক্তি সম্পাদন, কূটনৈতিক প্রতিনিধি বিনিময় করিতে পারে এবং সম্মিলিত

9. "The Union of Soviet Socialist Republic is a federal state, formed on the basis of a voluntary union of equal Soviet socialist Republics."
—Art 13 of the Soviet constitution.

জাতিপুঞ্জের সদস্য হইতে পারে। আঞ্চলিক সরকারগুলিকে এইরূপ ব্যাপক ক্ষমতা দান অন্যান্য যুক্তরাষ্ট্রে দেখিতে পাওয়া যায় না।

উপরোক্ত যুক্তরাষ্ট্রীয় চরিত্রসমূহের পরিপ্রেক্ষিতে সংবিধান বিশেষজ্ঞগণ সোবিয়েত ইউনিয়নকে পরিপূর্ণ যুক্তরাষ্ট্র হিসাবে স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন। হুইয়ার তাই সোবিয়েত ইউনিয়নকে 'আধা যুক্তরাষ্ট্র' (quasi-federal) নামে অভিহিত করিয়াছেন।[10]

(৪) **সুইজারল্যাণ্ড:** ১৮৭৪ সালের সংবিধানে সুইজারল্যাণ্ডকে একটি রাষ্ট্র সমবায় বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে, যদিও বাস্তবে সুইজারল্যাণ্ড একটি যুক্তরাষ্ট্র। ক্ষমতা বণ্টনের ব্যাপারে সুইজারল্যাণ্ডে কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা নির্দিষ্ট করা হইয়াছে এবং অবশিষ্ট ক্ষমতা ক্যাণ্টনদের হস্তে ন্যস্ত করা হইয়াছে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, সুইজারল্যাণ্ডে কেন্দ্রীয় ক্ষমতার অন্তর্গত অনেক বিষয় সম্পর্কে ক্যাণ্টনগুলি শাসনক্ষমতা প্রয়োগ করে। যুক্তরাষ্ট্রীয় বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী সুইস সংবিধান লিখিত ও দুষ্পরিবর্তনীয়। এমনকি আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান অপেক্ষাও ইহা বেশি দুষ্পরিবর্তনীয়। সংবিধান সংশোধনের জন্য সুইস যুক্তরাষ্ট্রীয় বিধানমণ্ডলী প্রস্তাব গ্রহণ করিলেই চলিবে না, ইহা গণভোটে গৃহীত ও অধিকাংশ ক্যাণ্টন দ্বারা সমর্থিত হইতে হইবে। যদিও অন্যান্য যুক্তরাষ্ট্রের মত সুইজারল্যাণ্ডে একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত (Federal Tribunal) আছে, কিন্তু ইহা আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত অপেক্ষা অনেক কম ক্ষমতার অধিকারী। সুইস যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভায় সংবিধান বিরোধী কোন আইন গৃহীত হইলে উক্ত আইনের বৈধতা ফেডারেল ট্রাইবুনাল বিচার করিতে পারে না। অর্থাৎ সুইস যুক্তরাষ্ট্রে বিচারবিভাগীয় প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে নাই। সংবিধানকে অতিমাত্রায় দুষ্পরিবর্তনীয় করিয়া সেখানে সংবিধানের প্রাধান্য রক্ষা করার চেষ্টা করা হইয়াছে।

যুক্তরাষ্ট্রীয় নীতি ও বৈশিষ্ট্যের দিক হইতে কিছু কিছু ত্রুটি থাকিলেও ষ্ট্রং (Strong), কোডিং (Codding) প্রভৃতি সংবিধান বিশেষজ্ঞগণ সুইজার-ল্যাণ্ডকে যুক্তরাষ্ট্র হিসাবে স্বীকার করিয়াছেন।

10. "The U. S. S. R. does not provide an example of federal government, it is a higly developed decentralised government." —Wheare

৭॥ যুক্তরাষ্ট্রের আধুনিক প্রবণতা (Modern trends of Federalism)

বর্তমানকালে বিভিন্ন যুক্তরাষ্ট্রে অঙ্গরাজ্যগুলির ক্ষমতা ও অধিকারকে পদদলিত করিয়া কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব বৃদ্ধির বা কেন্দ্রীকরণের (centralisation) প্রবণতা যে ভাবে বৃদ্ধি পাইতেছে তাহাতে অনেকে যুক্তরাষ্ট্রের ভবিষ্যত সম্পর্কে গভীর সংশয় প্রকাশ করিয়াছেন। এককথায় বলা যায় যে, বিভিন্ন যুক্তরাষ্ট্রে কেন্দ্রীয় সরকার অঙ্গরাজ্যগুলির ক্ষমতাকে ক্রমাগত আত্মসাৎ করিয়া নিজেদের ক্ষমতার পরিধিকে প্রসারিত করিয়া চলিয়াছে। ফলে, কাঠামোগত দিক হইতে যুক্তরাষ্ট্র থাকিলেও বাস্তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এই যুক্তরাষ্ট্রগুলি প্রায় এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থায় রূপান্তরিত হইতেছে। অঙ্গরাজ্যগুলির সরকারগুলি ইহার জন্য ক্ষমতাহীন হইয়া নিছক স্বায়ত্বশাসন-মূলক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইতেছে এবং কেন্দ্রীয় সরকার সামগ্রিক রাষ্ট্র কর্তৃত্ব লাভ করিয়া এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রের সরকারের ন্যায় সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হইয়া উঠিতেছে। কেন্দ্রীকতার এই প্রবণতার ফলে বস্তুত যুক্তরাষ্ট্র এবং এককেন্দ্রিক সরকারের মধ্যকার পার্থক্য ক্রমশ লুপ্ত হইয়া পড়িতেছে।

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানের চতুর্দশ, ষোড়শ এবং অষ্টাদশ সংশোধনের দ্বারা কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা বৃদ্ধি করিয়া অঙ্গরাজ্যগুলির ক্ষমতা হ্রাস করা হইয়াছে। বিচার বিভাগীয় ব্যাখ্যার সাহায্যেও আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে ক্ষমতার কেন্দ্রীকতা বৃদ্ধি পাইয়াছে। সুইজারল্যাণ্ড, অষ্ট্রেলিয়া এবং কানাডার শাসন-ব্যবস্থাতেও কেন্দ্রীকতার বিশেষ ঝোঁক লক্ষ্য করা যাইতেছে। সংবিধান সংশোধনের সহজ পদ্ধতি, এক দলীয় প্রাধান্য এবং আর্থিক ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় প্রাধান্য প্রভৃতির জন্য ভারতবর্ষেও কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা ক্রমশ বৃদ্ধি পাইতেছে।

বিভিন্ন রাষ্ট্রে কেন্দ্রীকতার এই প্রবণতা লক্ষ্য করিয়া হুইয়ার তাহার *Federal Government* পুস্তকে ইহার কারণ বিশ্লেষণ করিয়াছেন। তাঁহার মতে যুদ্ধ, অর্থ নৈতিক মন্দা, সামাজিক ক্রিয়াকর্মের ব্যাপ্তি, শিল্প ও পরিবহনের ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক অগ্রগতি (War, economic depression, the growth of social services and the mechanical revolution in transport and industry) কেন্দ্রীকতার জন্য দায়ী কারণ। যুদ্ধ ও অর্থ নৈতিক মন্দাকে মোকাবিলা করিতে হইলে, সামাজিক ক্রিয়াকলাপকে ব্যাপকভাবে

প্রসারিত করিতে হইলে, এবং শিল্প ও পরিবহনের ক্ষেত্রে যে সমস্ত বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটিতেছে তাহার সঙ্গে সঙ্গতি রাখিতে হইলে আঞ্চলিক সীমা অতিক্রম করিয়া জাতীয় ভিত্তিতে ইহার সমাধান করা প্রয়োজন। জাতীয় ভিত্তিতে ইহার মোকাবিলা এবং সমাধান করিতে যাইয়া ক্রমশই কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইতেছে।

উপরন্তু বর্তমান যুগে যে ভাবে ব্যাপকহারে পরিকল্পিত অর্থনীতি গ্রহণ করা হইতেছে তাহাও প্রত্যক্ষভাবে কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা বৃদ্ধিতে সাহায্য করিতেছে। আঞ্চলিক ভিত্তিতে পরিকল্পনা নিয়ন্ত্রিত হইতে পারে না, ইহার জন্য প্রয়োজন চরম ও চূড়ান্ত কেন্দ্রীয় কর্তৃত্ব। সুতরাং পরিকল্পিত অর্থনীতি গ্রহণের দ্বারা ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ ঘটিতেছে। তাই যথার্থভাবেই যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিবন্ধক হিসাবে অর্থনৈতিক পরিকল্পনাকে অভিহিত করা হয়।[11]

যুক্তরাষ্ট্রীয় ক্ষমতার কেন্দ্রীকতার ঝোঁককে স্বীকার করিয়াও হুইয়ার যুক্তরাষ্ট্রের ভবিষ্যত সম্পর্কে খুব বেশি চিন্তিত নহেন। যুক্তরাষ্ট্রগুলি ক্রমান্বয়ে এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থায় পরিণত হইবে—এই ধরণের ভবিষ্যতবাণীকে তিনি স্বীকার করেন নাই।[12] তাঁহার মতে একটি যুক্তরাষ্ট্র ক্রমাগত যুদ্ধ এবং অর্থনৈতিক সমস্যায় জড়িত হইতে থাকিলে সেখানে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার বিলোপ ঘটাইয়া এককেন্দ্রিক ব্যবস্থা প্রবর্তনের সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু সাধারণভাবে বলা যায় আঞ্চলিক স্বায়ত্ব শাসনের অধিকারকে রক্ষার প্রেরণাই চরম কেন্দ্রীকতা প্রতিহত করিয়া যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থাকে রক্ষা করিতে থাকিবে।

৮ ॥ রাষ্ট্র সমবায় (Corfederation)

যখন দুই বা ততোধিক স্বাধীন ও সর্বভৌম রাষ্ট্র প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা শক্তিশালী করিবার জন্য বা অন্য কোন উদ্দেশে পারস্পরিক চুক্তির মাধ্যমে মিলিত হয় এবং নিজ নিজ সার্বভৌমিকতা ত্যাগ না করিয়া একটি কেন্দ্রীয় শাসন প্রতিষ্ঠান গঠন করে, তখন ইহাকে রাষ্ট্রসমবায় (confederation) বলা হয়। এই চুক্তির ফলে যেমন চুক্তিকারী রাষ্ট্রগুলি তাহাদের সার্বভৌমিকতা হারায় না, অন্যদিকে তেমনি নতুন কোন রাষ্ট্রের উদ্ভবও হয় না। আন্তর্জাতিক আইন পারদর্শী ওপেনহাইমের মতে রাষ্ট্র সমবায় হইতেছে পূর্ণ সার্বভৌম কয়েকটি রাষ্ট্রের মধ্যে

11. 'Economic Planning is the D. D. T. of federalism.'—Karl Loewenstein

12. "This is a prophecy, not an historical judgment, for, so far, no federal Government, as I define it—has become a unitary Government."—wheare.

আন্তর্জাতিক সন্ধির দ্বারা সংগঠিত এমন এক সংঘ যাহা সদস্য রাষ্ট্রদের উপর বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারে, কিন্তু ঐ রাষ্ট্রগুলির নাগরিকদের উপর কোন অধিকার দাবী করিতে পারে না।[13] প্রত্যেক সদস্য রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করা রাষ্ট্রসমবায়ের উদ্দেশ্যে।

রাষ্ট্রসমবায় গঠন না করিয়াও আন্তর্জাতিক সম্পর্কের স্বার্থে বিভিন্ন রাষ্ট্র পারস্পরিক **মৈত্রীবন্ধনে** (Alliance) আবদ্ধ হইয়া থাকে। আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করা (Defend), অক্রমণ সংগঠিত করা এবং ক্ষমতার ভারসাম্য (Balance of power) রক্ষার জন্য বিভিন্ন রাষ্ট্রকে এই ধরণের মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ হইতে দেখা যায়। কোন রাষ্ট্র এইরূপ মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ হইলে তাহার সার্বভৌমিকতার বিলোপ ঘটেনা, শুধুমাত্র অতিরিক্ত কতকগুলি দায়-দায়িত্ব পালন করিতে হয়।

যুক্তরাষ্ট্র ও রাষ্ট্রসমবায় : এইবার আমরা যুক্তরাষ্ট্র ও রাষ্ট্রসমবায়ের ভিতর-কার পার্থক্যগুলি দেখাইতেছি। যুক্তরাষ্ট্র ও রাষ্ট্র সমবায়ের ভিতর নিম্নলিখিত পার্থক্যগুলি লক্ষ্য যায় : (১) যুক্তরাষ্ট্র একটি সার্বভৌম রাষ্ট্র, রাষ্ট্রসমবায় কয়েকটি সার্বভৌম রাষ্ট্রের সমাবেশ মাত্র। যে-সমস্ত রাষ্ট্র মিলিত হইয়া যুক্তরাষ্ট্র গঠন করে, তাহাদের যুক্তরাষ্ট্র গঠনের পরে কোনপ্রকার স্বাধীনতা, স্বতন্ত্র অস্তিত্ব এবং সার্বভৌমিকতা থাকে না। কিন্তু রাষ্ট্রসমবায় গঠনকারী প্রত্যেকটি রাষ্ট্রের স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা অক্ষুন্ন থাকে। (২) যুক্তরাষ্ট্রের সমষ্টিগত ও যৌথ স্বার্থসম্পন্ন বিষয়গুলির শাসন পরিচালন করিবার জন্য ক্ষমতাসম্পন্ন একটি কেন্দ্রীয় সরকার থাকে। কিন্তু রাষ্ট্রসমবায়ে এইরূপ ক্ষমতাসম্পন্ন কোন কেন্দ্রীয় সরকার থাকে না। (৩) যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত প্রতিটি অঙ্গরাজ্যের নাগরিকদের যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করিতে হয়, কিন্তু রাষ্ট্রসমবায় গঠনকারী রাষ্ট্রসমূহের নাগরিকদের নিজ নিজ রাষ্ট্রের নিকট অনুগত থাকিতে হয়, রাষ্ট্রসমবায়ের নিকট নয়। (৪) যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত সমগ্র ভূখণ্ড এবং প্রতিটি অধিবাসীর উপর যুক্তরাষ্ট্রের অবাধ ক্ষমতা থাকে, কিন্তু রাষ্ট্রসমবায় এইরূপ অবাধ ক্ষমতার অধীকারী নয়। (৫) যুক্তরাষ্ট্রের ভিত্তি হইল শাসনতান্ত্রিক আইন, আর

13. "A confederacy consists of full sovereign states linked together for the maintenance of their external and internal independence by a recognised international treaty into a union with organs of its own, which are vested with a certain power over the member states, but not over the citizens of these states)"—Oppenheim.

রাষ্ট্রসমবায়ের ভিত্তি হইতেছে পারস্পরিক চুক্তি। যুক্তরাষ্ট্রের অধীনস্থ অঙ্গরাজ্যগুলি সাধারণত আন্তর্জাতিক সম্পর্কে স্থাপনের অধিকারী নয়, কিন্তু রাষ্ট্রসমবায়ের মিলিত রাষ্ট্রগুলি স্বাধীন এবং সার্বভৌম হইবার জন্য আন্তর্জাতিক সম্পর্কে স্থাপনের অধিকারী। সর্বোপরি যুক্তরাষ্ট্র স্থায়ী, রাষ্ট্রসমবায় অস্থায়ী।

ঊনবিংশ অধ্যায়

নির্বাচকমণ্ডলী ও প্রতিনিধিত্ব

(Electrate and Representation)

গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার সঙ্গে নির্বাচকমণ্ডলী ও প্রতিনিধিত্বের সমস্যা অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। শাসনব্যবস্থা প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক হইলে প্রতিনিধিত্বের প্রশ্ন আসে না, কিন্তু পরোক্ষ গণতন্ত্র প্রতিনিধিত্বের উপর নির্ভরশীল বলিয়া নির্বাচকমণ্ডলীর সঙ্গে প্রতিনিধিত্বেরও আলোচনা করা প্রয়োজন। সুতরাং কি ভিত্তিতে নির্বাচকমণ্ডলী গঠিত হইবে এবং প্রতিনিধিদেরই বা কোন নীতির ভিত্তিতে নির্বাচিত করা হইবে ইত্যাদী বিষয়ের আলোচনা পরোক্ষ গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় জন্য একান্তভাবেই অপরিহার্য। তাই আমরা এই অধ্যায়ে নির্বাচকমণ্ডলী ও প্রতিনিধিত্বের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত বিভিন্ন বিষয় লইয়া আলোচনা করিতেছি।

১ ॥ নির্বাচকমণ্ডলী সম্পর্কিত সমস্যা (Problems of Electorate)

কোন প্রকার আলোচনায় প্রবেশ করিবার পূর্বে আমাদের জানা প্রয়োজন নির্বাচকমণ্ডলী বলিতে কি বুঝি? গণতন্ত্রে ভোটাধিকার খুবই গুরুত্বপূর্ণ। নির্বাচকমণ্ডলী বলিতে সেই ব্যক্তি সমষ্টিকে বুঝায় যাহারা আইনসভা অথবা প্রতিনিধি সংস্থায় (Electoral College) প্রতিনিধি নির্বাচনের ব্যাপারে ভোটদানের আইনসঙ্গত অধিকারী। একটি রাষ্ট্রের সমগ্র জনমণ্ডলী প্রতিনিধি নির্বাচনের অধিকারী নহে। বয়স, যোগ্যতা এবং নারী-পুরুষ ইত্যাদীর ভিত্তিতে নির্বাচকমণ্ডলী গঠিত হইয়া থাকে। সুতরাং প্রথমেই প্রশ্ন দেখা দেয় নির্বাচকমণ্ডলী কাহাদের লইয়া গঠিত হইবে,—অর্থাৎ কাহারা এবং কোন যোগ্যতার ভিত্তিতে প্রতিনিধি নির্বাচন করিবে।

নাবালক, উন্মাদ, দেউলিয়া, শাস্তিপ্রাপ্ত আসামীকে প্রভৃতিকে যে ভোটদানের অধিকার দেওয়া উচিত নয় এই ব্যাপারে প্রায় সকলেই একমত। কিন্তু ইহাদের ব্যতীত প্রাপ্তবয়স্ক অন্যান্য সকল ব্যক্তিদের ভোটাধিকার দেওয়ার ব্যাপারে মতভেদ আছে। জন স্টুয়ার্ট মিল সম্পত্তি এবং বিশেষ করিয়া শিক্ষাগত

যোগ্যতার ভিত্তিতে ভোটাধিকার প্রদান করা উচিত বলিয়া মনে করেন (universal teaching must precede universal enfranchisement)। যাহাদের সম্পত্তি আছে তাহারা দায়িত্বশীল এবং তাহারা কর প্রদান করে বলিয়া সরকারের আয়, ব্যয় ও নীতি নির্ধারণে একমাত্র তাহাদেরই ভূমিকা থাকা উচিত বলিয়া তিনি মনে করেন। সুতরাং মিল ভোটাধিকারকে সঙ্কুচিত করিয়া শিক্ষিত ও সম্পত্তিশালী ব্যক্তিদের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখিতে চাহিয়াছেন। কিন্তু বর্তমানকালে এই মতবাদের বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা করিয়া বলা হইয়াছে যে সম্পত্তির মালিকানা মনুষ্যত্ব বা যোগ্যতার মানদণ্ড নহে, এবং দ্বিতীয়ত, ভোটাধিকার প্রয়োগ করিবার জন্য যে বুদ্ধি এবং বিচক্ষণতা প্রয়োজন তাহার সঙ্গে শিক্ষার কোন সম্পর্ক নাই—শিক্ষা-নিরপেক্ষ ব্যক্তিরও এই যোগ্যতা থাকিতে পারে।

স্বভাবতই শিক্ষা ও সম্পত্তিকে যোগ্যতার মানদণ্ড না ধরিয়া প্রতিটি প্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তিকে ভোটাধিকার প্রদান করিবার জন্য দাবী উত্থাপিত হইল। ইহাকেই বলে **প্রাপ্তবয়স্কদের সার্বজনীন ভোটাধিকার (universal Adult Suffrage)**। অষ্টাদশ শতাব্দীতে স্বাভাবিক অধিকার, জনকল্যাণ, ব্যক্তিত্ব বিকাশ এবং গণতান্ত্রিক অধিকার প্রভৃতির যুক্তিতে প্রাপ্তবয়স্কদের সার্বজনীন ভিত্তিতে ভোটদানের দাবীটি লক, রুশো প্রভৃতির দ্বারা সোচ্চার হইয়া উঠে।

যে সমস্ত যুক্তির ভিত্তিতে প্রাপ্তবয়স্কদের সার্বজনীন ভিত্তিতে ভোটদানের দাবী উত্থাপিত হইয়াছে তাহা এইবারে আলোচনা করা যাইতে পারে। প্রথমত, গণতন্ত্র বলিতে জনগণের সার্বভৌমিকতা বুঝায়। প্রতিটি নাগরিকের নির্বাচনে অংশ গ্রহণের মধ্য দিয়াই জনগণের সার্বভৌমিকতার তত্ত্বকে বাস্তবে রূপায়িত করা যায়। দ্বিতীয়ত, রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে সকলেই সমানভাবে জড়িত এবং ইহা সকলেই স্পর্শ করে। সুতরাং যে শাসনব্যবস্থা জনগণের প্রতিটি অংশকে সমানভাবে স্পর্শ করে, সেই শাসনব্যবস্থা পরিচালনায় সকলেরই সমান অংশ থাকা প্রয়োজন (what touches all must be decided by all)। তৃতীয়ত, সার্বজনীন ভিত্তিতে ভোটাধিকারকে প্রসারিত না করিয়া শিক্ষা, সম্পত্তি, কর-প্রদান বা অন্য কোন শ্রেণীগত ভিত্তিতে ইহাকে সীমাবদ্ধ রাখিলে বিশেষ শ্রেণীর স্বার্থে রাষ্ট্রযন্ত্র ব্যবহৃত হইবে। তাই ল্যাস্কি বলিয়াছেন, ভোটদানের ক্ষমতা হইতে বিতাড়িত করার অর্থ ক্ষমতার সুযোগ সুবিধা

হইতেও বিতাড়িত করা।[1] চতুর্থত. নৈতিক যুক্তিতে বলা হইয়া থাকে যে, প্রতিটি মানুষের ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ প্রকাশ ও বিকাশের জন্য ভোটাধিকারকে সার্বজনীন ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করা প্রয়োজন। পঞ্চমত, বলা যাইতে পারে, রাজনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠা ব্যতীত গণতন্ত্র অর্থহীন। সার্বজনীন ভিত্তিতে ভোটাধিকার প্রদানের দ্বারা রাজনৈতিক সাম্য নিশ্চিত করা যাইতে পারে।

কিন্তু ব্লুনৎস্লি, মিল, হেনরী মেইন প্রভৃতিরা উপরোক্ত যুক্তি মানিতে প্রস্তুত নহেন। তাহাদের মতে ভোটাধিকার জন্মগত অধিকার হইতে পারে না—যোগ্যতার দ্বারা ইহা অর্জন করিতে হয়। সার্বজনীন ভিত্তিতে দরিদ্র, অজ্ঞ এবং নির্বোধকে ভোটাধিকার প্রদান করিলে রাষ্ট্রের ক্ষতি হইবে বলিয়া তাঁহারা মনে করেন। এই বিষয় কোন সন্দেহ নাই যে এই সমস্ত সমালোচনার কারণ হইল ইহাদের তথাকথিত অভিজাতবোধ। দ্বিতীয়ত, বলা হইয়া থাকে যে, যাহাদের সম্পত্তি নাই তাহাদের ভোটাধিকার দেওয়ার কোন প্রয়োজনীয়তা থাকিতে পারে না। কারণ, সম্পত্তিহীন ব্যক্তিরা রাষ্ট্রের ভাল-মন্দ ব্যাপারে উদাসীন থাকে এবং এই ব্যাপারে তাহাদের কোন আকর্ষণ থাকে না। সুতরাং ভোটাধিকার প্রদান করিলে তাহারা দায়িত্বহীনভাবে উহা প্রয়োগ করিবে। তৃতীয়ত, যাহারা রাষ্ট্রকে কর প্রদান করে না, রাষ্ট্রের আয়-ব্যয় ইত্যাদির ব্যাপারে তাহাদের কোন বক্তব্য থাকিতে পারে না। মিল মনে করেন যে, যাহারা কর দেয় না, অথচ অন্যের দেওয়া টাকা কিভাবে ব্যবহৃত হইবে তাহা নিয়ন্ত্রণের অধিকার লাভ করে তাহারা কখনও মিতব্যয়ী হয় না—টাকা পয়সার ব্যাপারে যথেচ্ছাচার করে।[2] চতুর্থত, মিল আরও মনে করেন যে, মোটামুটি একটা শিক্ষাগত মানদণ্ড না থাকিলে কাহাকেও ভোটাধিকার দেওয়া উচিত নয়, কারণ সেই ক্ষেত্রে ভোটাধিকারকে সঠিকভাবে প্রয়োগ করা সম্ভব হয় না। বলা বাহুল্য মিলের এই বক্তব্য গ্রহণযোগ্য নহে। ভোটাধিকারের প্রয়োগের জন্য সাধারারণ জ্ঞান এবং পৌরজ্ঞানের প্রয়োজনমাত্র। ইহার সঙ্গে পুঁথিগত বিদ্যার কোন সম্পর্ক নাই।

1. "Exclusion from power means exclusion from the benefits of power." —Laski

2. Those who pay no taxes, disposing by their votes of other people's money, have every motive to be lavish and none to economise," —Mill.

সুতরাং সার্বজনীন ভিত্তিতে প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকার প্রদানের বিরোধীতা করিয়া তাঁহারা বলিয়াছেন যে, একমাত্র যাহারা শিক্ষিত, সম্পত্তিশালী এবং করদান করে, তাহারাই ভোটদানের অধিকারী। সৌভাগ্যের কথা ভোটাধীকারকে সীমাবদ্ধ রাখিবার ইহাদের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে এবং বর্তমানযুগে পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই প্রাপ্তবয়স্কদের সার্বজনীন ভিত্তিতে ভোটাধিকার দেওয়া হইয়াছে।

সার্বজনীন ভোটাধিকারের দাবী যদিবা স্বীকৃত হইল তখন নতুন করিয়া প্রশ্ন দেখা দিল **নারীজাতির ভোটাধিকার (Women suffage)** থাকা উচিত কিনা। অর্থাৎ নারীজাতিকে বাদ দিয়া সার্বজনীন ভিত্তিতে প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষদের ভোটাধিকার দেওয়ার কথা উঠিল। ইহা খুবই দুঃখের কথা যে, নারীজাতির ভোটাধিকার থাকা উচিত কিনা ইহাকে একটি বিতর্কিত বিষয় হিসাবে আমাদের আলোচনা করিতে হইতেছে। এবং ইহা আরও লজ্জারকথা যে গণতন্ত্রের পীঠস্থান সুইজারল্যাণ্ডে নারী জাতির ভোটাধিকারের দাবী আজ ও অস্বীকৃত।

নারীজাতিকে ভোটাধিকার দেওয়ার বিপক্ষে বলা হইয়া থাকে যে নারীর যথাযোগ্য স্থান হইল গৃহের মধ্যে, তাই বাহিরের রাজনৈতিক আবর্তে তাহাকে টানিয়া আনা উচিত নয়। নারী রাজনীতিতে লিপ্ত হইলে পরিবারিক সুখ এবং শান্তি নষ্ট হইবে। শারীরিক দিক হইতে নারীজাতি দুর্বল বলিয়া রাজনৈতিক ক্রিয়াকর্মের যোগ্য নহে। রাজনৈতিক ব্যাপারে লিপ্ত হইতে হইলে যে পরিমাণ জ্ঞান ও দক্ষতা থাকা প্রয়োজন তাহা নারীদের নাই। নারীজাতিকে ভোটাধিকার দিলে ইহা তাহার পিতা বা স্বামীর ইচ্ছা অনুযায়ী ব্যবহৃত হইবে।

বলা বাহুল্য যে নারী জাতিকে ভোটাধিকার দেওয়ার বিরুদ্ধে যে সমস্ত যুক্তির অবতারনা করা হইয়াছে তাহার বেশিরভাগই তর্কে টিকতে পারেনা। প্রথমেই বলা যায় যে, গৃহের শান্তি নারী এবং পুরুষ উভয়েরই সমবেত প্রচেষ্টার উপর নির্ভর করে—ইহা রক্ষার দায়িত্ব একা নারীর নহে। সুতরাং পুরুষের ভোটাধিকার থাকিলে নারীরও থাকিতে পারে। দ্বিতীয়ত, বলা যায় যে, ভোটাধিকার একটি রাজনৈতিক অধিকার, ইহার সঙ্গে শারীরিক ব্যাপারের কোন সম্পর্ক নাই। রাজনৈতিক জীব হিসাবে নারী ভোট দানের রাজনৈতিক অধিকার পাইতে বাধ্য। তৃতীয়ত, নারী জাতি বুদ্ধি, বিচক্ষনতা এবং জ্ঞানের

ক্ষেত্রে পুরুষের চাইতে নিকৃষ্ট এইরূপ অর্থহীন অহমিকা প্রচারের কোন ন্যায় সঙ্গত ভিত্তি আছে কি ? বর্তমানে নারী চন্দ্রালোকের পথে পাড়ি দিয়েছে, নারী প্রধানমন্ত্রি হইয়া জাতির ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করিতেছে, নারী জ্ঞান বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে পুরুষের সঙ্গে সমকক্ষতা প্রমান করিতেছে। সুতরাং জ্ঞান, বুদ্ধি ও দক্ষতার অজুহাতে নারীর ভোটাধিকার অস্বীকার করার আর কোন উপায় নাই। চতুর্থত, নারীকে ভোটাধিকার দিলে সে নিজের বুদ্ধি অনুযায়ী উহা প্রয়োগ করিতে পারেনা, পিতা বা স্বামীর মতানুযায়ী প্রয়োগ করে— এই বক্তব্য একান্তভাবেই নারীজাতির বিরুদ্ধে একটি অপবাদ (aspersion) মাত্র। নিজের বিচার বিবেচনা অনুযায়ী ভোটাধিকার প্রয়োগ না করিতে পারাকে সার্বজনীন না ধরিয়া ব্যতিক্রম হিসাবে ধরিতে হইবে এবং এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই যে এই ব্যতিক্রমের মধ্যে কিছু কিছু নারী এবং পুরুষ উভয়েই পড়ে।

যাহাই হউক, নারীজাতির ভোটাধিকারের দাবিটিকে যুক্তি-তর্কের দ্বারা বিচার করিলে বিরোধীতা করা সম্ভব নহে। পৃথিবীর প্রায় সমস্ত দেশেই নারীর ভোটাধিকারের দাবী স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে এবং আশাকরা করা যায়, আগামীদিনে জ্ঞান গরিমায় নারীজাতির নতুন নতুন সাফল্য পুরুষের সঙ্গে সমস্ত ব্যাপারে নারীর সমানাধিকারের দাবীকে যথাযোগ্য মর্য্যাদাদানে বাধ্য করিবে।

২॥ নির্বাচকমণ্ডলী কর্তৃক প্রতিনিধি নিয়ন্ত্রণ (How can the electorate exercise control over Representatives ?)

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় নির্বাচকমণ্ডলী আইন-সভার সদস্যদের নির্বাচিত করিয়া থাকেন। নির্বাচকমণ্ডলী কর্তৃক নির্বাচিত এই সমস্ত প্রতিনিধি (Representatives) আইনসভার সদস্য হিসাবে কীভাবে কার্য করিবেন এবং ইহাদের ভিতরে পারস্পরিক সম্পর্কই বা কি হইবে সেই বিষয়ে মতপার্থক্য রহিয়াছে। অনেকে মনে করেন প্রতিনিধিরা সাধারণত নিজেদের বিচার-বুদ্ধি অনুযায়ী স্বাধীনভাবে কাজকর্ম করিবার অধিকারী। কেহ কেহ মনে করেন যে, দলীয় ব্যবস্থা প্রবর্তনের ফলে প্রতিনিধিরা সাধারণত বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সভ্য হইয়া থাকেন। এইরূপ অবস্থায় প্রতিনিধিদের স্ব স্ব দলের নীতি ও কর্মসূচী অনুসারে কার্য করা উচিত। কারণ নির্বাচকমণ্ডলী বিভিন্ন দলীয় নীতি ও কর্মসূচীর ভিত্তিতেই প্রার্থীদের নির্বাচন করিয়াছেন।

কিন্তু উপরোক্ত দুইটি মতেরই বিরোধীতা করিয়া অনেকে বলিয়া থাকেন যে, যেহেতু প্রতিনিধিরা নির্বাচনমণ্ডলীর দ্বারা নির্বাচিত, সেইজন্য নির্বাচকমণ্ডলীর আজ্ঞাবাহক হিসাবে তাহাদের ইচ্ছা ও নির্দেশ অনুযায়ী প্রতিনিধিরা কার্য করিবেন।[৪]

এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই যে, প্রতিনিধিরা যে উপায়ে-ই তাহাদের দায়িত্ব পালন করুক না কেন, তাহাদের উপর নির্বাচকমণ্ডলীর কিছু পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ থাকা উচিত। প্রতিনিধিরা যদি নিজ বিবেক-বুদ্ধি প্রয়োগের নামে অন্যায় ও জনকল্যাণবিরোধী কার্য করে বা প্রতিনিধিরা যদি এক দলের নীতি ও কর্মসূচীর ভিত্তিতে নির্বাচিত হইয়া পরবর্তীকালে দল পরিবর্তন করে এবং নির্বাচকমণ্ডলীর ইচ্ছাবিরুদ্ধ কার্য করে, তবে নির্বাচকমণ্ডলী ন্যায়সঙ্গতভাবেই ইহার প্রতিকার করিবার ক্ষমতা দাবী করিতে পারে। সুতরাং যে সমস্ত ক্ষেত্রে প্রতিনিধিরা নির্বাচকমণ্ডলীর আস্থা হারায় বা তাঁহারা নির্বাচনের সময় যে সমস্ত নীতি গ্রহণ করিবে বলিয়া প্রতিশ্রুত থাকে, তাহা হইতে বিচ্যুত হয়, সেই সমস্ত ক্ষেত্রে নির্বাচকমণ্ডলী কর্তৃক প্রতিনিধিদের নিয়ন্ত্রণের প্রশ্ন গুরুত্বপূর্ণ হইয়া দেখা দেয়। অনেকের মতে এই সমস্ত অবস্থায় নির্বাচকমণ্ডলী পরবর্তী নির্বাচনের দ্বারা সেই সমস্ত প্রতিনিধিদের পরিবর্তন করিতে পারেন। কিন্তু প্রতিনিধিদের নিয়ন্ত্রণ করিবার কোন ক্ষমতা নির্বাচকমণ্ডলীর হাতে না থাকিলে দুইটি নির্বাচনের মধ্যবর্তী চার বা পাঁচ বৎসরকাল নির্বাচকমণ্ডলীর করিবার কিছুই থাকে না। এই সমস্ত কারণে নির্বাচকমণ্ডলী যাহাতে নিজ নিজ প্রতিনিধিদের উপর নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা রাখিতে পারেন তাহার জন্য নিম্নলিখিত উপায়গুলির কথা বলা হইয়া থাকে।

অনেকে মনে করেন যে, প্রত্যক্ষ নির্বাচন-পদ্ধতি প্রবর্তনের দ্বারা নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা বৃদ্ধি করা যাইতে পারে। পরোক্ষ নির্বাচনে নির্বাচকমণ্ডলী ও প্রার্থীর মধ্যে দূরত্ব বজায় রাখা হয়, কারণ এই ব্যবস্থায় উভয়ের মধ্যে একটি মধ্যবর্তী স্তর থাকায় যোগাযোগ ঘনিষ্ঠ হইতে পারে না। পরোক্ষ নির্বাচনে নির্বাচক-মণ্ডলীর ভোটে একটি নির্বাচক সংস্থা গঠিত হয়, যাহারা ভোটের সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে প্রার্থী নির্বাচন করেন। সুতরাং প্রত্যক্ষ নির্বাচনব্যবস্থা প্রবর্তনের

৪. "..............a member of Parliament is a representative and not a delegate."
—Burke.

দ্বারা প্রার্থী নির্বাচনে নির্বাচকমণ্ডলীর প্রভাব ও নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা বৃদ্ধি করা যাইতে পারে।

দ্বিতীয়ত, প্রত্যাহার আজ্ঞা (Recall) প্রবর্তনের দ্বারা প্রতিনিধিদের নিয়ন্ত্রণ করা যাইতে পারে। নির্বাচকমণ্ডলী কর্তৃক প্রতিনিধি হিসাবে কাহারো সদস্যপদ বাতিল করিয়া তাহার কার্যের অবসান ঘটনাকে প্রত্যাহার আজ্ঞা বলে। নির্বাচকমণ্ডলী যদি কোন প্রতিনিধির কার্যকলাপে সন্তুষ্ট না হন বা প্রতিনিধির উপর আস্থা হারান কবে এই পদ্ধতির প্রয়োগ করা যায়। সুইজারল্যাণ্ডে প্রতিনিধিদের নিয়ন্ত্রণ করিবার গণতান্ত্রিক পন্থা হিসাবে প্রত্যাহার আজ্ঞা প্রচলিত আছে। ল্যাস্কি সীমাবদ্ধ প্রত্যাহার-আজ্ঞা প্রবর্তনের প্রস্তাব সমর্থন করিয়াছেন। সোভিয়েত রাশিয়ার শাসনতন্ত্রে প্রত্যাহার-আজ্ঞার সঙ্গে প্রতিনিধি কর্তৃক নির্বাচকমণ্ডলীর নিকট নিয়মিত ও বাধ্যতামূলকভাবে তাহার কার্য সম্পর্কে খবরাখবর (Reporting) দিবার দায়িত্ব নির্ধারিত হইয়াছে। সুতরাং প্রতিনিধি কর্তৃক নির্বাচকমণ্ডলীর নিকট তাহার কার্যের বিবরণী নিয়মিত ও বাধ্যতামূলকভাবে উপস্থিত করিবার নিয়ম প্রবর্তনের ভিতর দিয়া কিছু পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ আনা যাইতে পারে।

ইহা ছাড়াও সুইজারল্যাণ্ডের ন্যায় গণভোটে ও গণউদ্যোগের মত প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক পন্থাগুলি প্রবর্তনের দ্বারা নির্বাচকমণ্ডলী প্রতিনিধিদের উপর নিয়ন্ত্রণ বহাল রাখিতে পারে। কারণ গণউদ্যোগ ও গণভোটের ব্যবস্থা থাকিলে প্রতিনিধিরা আইনসভায় ইচ্ছামত আইন প্রণয়নে বা জনগণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে যাইতে সাহসী হইবে না। সুতরাং এই পদ্ধতিগুলি প্রতিনিধি নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাকে অধিকতর শক্তিশালী করিয়া তোলে।

গেটেলের মতে জনপ্রতিনিধিদের কার্যকাল অনাবশ্যক দীর্ঘ বা অতিরিক্ত সংক্ষিপ্ত না করিয়া এমন করা উচিত যাহাতে নির্বাচিত হইবার জন্য প্রতিনিধিগণকে মধ্যে মধ্যে জনসংস্পর্শে আসিতে হয়। এইরূপ ব্যবস্থায় প্রতিনিধিদের উপর নির্বাচকমণ্ডলীর প্রভাব ও নিয়ন্ত্রণ অক্ষুণ্ণ থাকে।

উপসংহারে বলা যাইতে পারে, প্রতিনিধিদের নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য যে পন্থাই অবলম্বিত হউক না কেন, জনগণ যদি সতর্ক না হয় এবং জনমতের ধারক ও বাহকগুলি যদি যথেষ্ট পরিমাণে জাগ্রত, শক্তিশালী ও সক্রিয় না হয়, তবে জন প্রতিনিধিদের নিয়ন্ত্রণব্যবস্থা বিশেষ কার্যকরী হইতে পারে না। সুতরাং

সতর্ক, সক্রিয় ও জাগ্রত জনমতও নির্বাচকমণ্ডলী কর্তৃক গণপ্রতিনিধিদের নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য একান্ত অপরিহার্য।

৩॥ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব (Minority Representation)

দলীয় ব্যবস্থা প্রবর্তনের ফলে বর্তমানে রাজনৈতিক দলের ভিত্তিতেই প্রতিনিধি নির্বাচন হইয়া থাকে। এইরূপ অবস্থায় সাধারণত সংখ্যাগরিষ্ঠ দলই নির্বাচনে অধিক সংখ্যক ভোট পাইয়া আইনসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দল বলিয়া গণ্য হয় এবং ফলে এই দলই মন্ত্রিসভা গঠন করিয়া শাসনকার্য পরিচালনা করে। সংখ্যালঘিষ্ঠ অংশের জন্য কোন বিশেষ সংরক্ষণ ব্যবস্থা প্রবর্তন না করিয়া সাধারণ পদ্ধতি প্রয়োগ করিলে, সমস্ত দেশকে কয়েকটি নির্বাচন এলাকায় বিভক্ত করা হয়, এবং প্রতিটি এলাকা হইতে যে ব্যক্তি সর্বোচ্চ ভোট পান তিনিই নির্বাচিত হইয়া থাকেন। এই ব্যবস্থায় সংখ্যালঘুরা নিজেদের সংখ্যার অনুপাতে নির্বাচিত হইতে পারে না এবং ফলে তাহাদের স্বার্থ ক্ষুণ্ন হইবার সম্ভাবনা দেখা দেয়। এই জন্যই বিভিন্ন গণতান্ত্রিক দেশে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের যথোপযুক্ত বা সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্বের দাবী গুরুত্ব লাভ করিয়াছে। গণতন্ত্রের অর্থই হইতেছে সংখ্যাগরিষ্ঠের সরকার। এইরূপ সরকারের দ্বারা বিভিন্ন প্রকার ধর্মগত, ভাষাগত, দলগত সংখ্যালঘিষ্ঠের স্বার্থসিদ্ধ নাও হইতে পারে বা সেখানে সর্বপ্রকার মতামত প্রতিফলিত নাও হইতে পারে। তাই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় যাহাতে বিভিন্ন সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের যথোপযুক্ত প্রতিনিধিত্ব থাকিতে পারে তাহার দিকে দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন।

প্রসঙ্গত বলা প্রয়োজন যে, সংখ্যালঘু বলিতে শুধুমাত্র রাজনৈতিক দলগত সংখ্যালঘুদের কথাই বলা হইতেছে না, সম্প্রদায়গত, ধর্মগত, বর্ণগত, ভাষাগত সম্প্রদায়গণের প্রতিনিধিত্বের সমস্যাও ইহার ভিতর ধরা হইতেছে। সংখ্যালঘু সম্প্রদায় যাহাতে যথোপযুক্ত প্রতিনিধিত্ব লাভ করিয়া রাষ্ট্র-কার্যে অংশ গ্রহণ করিতে পারে তাহার জন্য অনেক বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বনের প্রয়োজনীয়তার কথা বলিয়াছেন। কিন্তু এই ব্যবস্থার কিছু কিছু ত্রুটি থাকায় অনেকে আবার এই প্রথার বিরোধীতা করিয়া দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন যে, এই প্রথা গ্রহণযোগ্য নয়। নিম্নে আমরা সংখ্যালঘুদের প্রতিনিধিত্বের প্রশ্নটির পক্ষে ও বিপক্ষে আলোচনা করিতেছি।

পক্ষে বক্তব্য: প্রথমত, বলা যাইতে পারে যে, সংখ্যাগরিষ্ঠরাই শাসন

পরিচালনা করিবে ইহা যেমন গণতান্ত্রিক নীতি, ঠিক তেমনি সংখ্যালঘুদের স্বার্থ যাহাতে উপেক্ষিত না হয় তাহার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া আইনসভাকে বিভিন্ন শ্রেণী ও মতের প্রতিনিধিত্বমূলক করিয়া তোলাও গণতন্ত্রের আদর্শ। তাই মিল বলিয়াছেন যে, গণতন্ত্রের অর্থ হইল সর্বসাধারণের সরকার এবং স্বভাবতই সংখ্যাগরিষ্ঠের মতে এই সরকার পরিচালিত হইবে। কিন্তু ব্যবস্থা এমন হওয়া উচিত যাহাতে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ও যথোপযুক্ত প্রতিনিধি নির্বাচন করিতে পারে। এইরূপ হইলে আইনসভা সর্বপ্রকার মতের প্রতিনিধিত্ব করিতে পারিবে। তাহা না হইলে আইনসভা বিশেষ গোষ্ঠীর প্রাধান্যের ক্ষেত্র হইয়া উঠিবে।

দ্বিতীয়ত, অনেকের মতে সংখ্যালঘু দলের আইনসভায় উপযুক্ত সংখ্যক প্রতিনিধি প্রেরণ করা গণতন্ত্রের একটি প্রধান উপাদান। সংখ্যালঘু দল যদি আইনসভায় প্রতিনিধি নির্বাচন করিতে না পারে, তাহা হইলে প্রকৃত গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা প্রবর্তিত হইতে পারে না। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্বের বিশেষ কোন ব্যবস্থা না থাকিলে এমনও হইতে পারে যে, সংখ্যাগরিষ্ঠরা শতকরা মাত্র ৫১টি ভোট পাইয়া আইনসভার সমস্ত আসনই অধিকার করিল, অথচ সংখ্যালঘিষ্ঠরা শতকরা ৪৯টি ভোট পাইয়া একটিও আসন অধিকারে সমর্থ হইল না। এইরূপ নির্বাচনব্যবস্থাকে নিশ্চয়ই গণতন্ত্রসম্মত বলা যাইতে পারে না। আইনসভায় সংখ্যালঘুদের প্রতিনিধি প্রেরণ করাকেই মিল যথেষ্ট মনে করেন না, তাঁহার মতে সংখ্যালঘুদের জন্য সমানুপাতিক নির্বাচনব্যবস্থা প্রচলিত হওয়া প্রয়োজন। উপরোক্ত যুক্তির ভিত্তিতে লেকী বলিয়াছেন যে, ভোটদাতাদের দুই-তৃতীয়াংশ যদি কোন দলবিশেষের পক্ষে ভোট দেয়, তবে ন্যায়সঙ্গত ভাবেই সংখ্যালঘিষ্ঠরা দুই-তৃতীয়াংশ আসনের অধিকারী এবং সংখ্যালঘুরাও এক তৃতীয়াংশ আসন পাইবার অধিকারী।

তৃতীয়ত, রুশোকে অনুসরণ করিয়া বলা যাইতে পারে যে, জনসাধারণের ইচ্ছাই আইনের ভিতর দিয়া প্রকাশ লাভ করে। কিন্তু আইন প্রণয়নকারীরা যদি সংখ্যাগরিষ্ঠের প্রতিনিধি হন, তবে আইন হইবে সংখ্যাগরিষ্ঠের ইচ্ছার প্রকাশ এবং সেই ক্ষেত্রে এই আইন সর্বসাধারণের ইচ্ছার প্রকাশ বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। চতুর্থত, অনেকের মতে আইনসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠদের প্রতিনিধিত্বের সুযোগ না থাকিলে ইহা সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের স্বৈরাচারে পরিণত হইবে।

উপরোক্ত যুক্তির ভিত্তিতে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য অনেকে আইনসভার সংখ্যালঘিষ্ঠদের যথোপযুক্ত প্রতিনিধিত্বের প্রয়োজনীয়তার উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়াছেন। কিন্তু অনেকে সংখ্যালঘিষ্ঠদের জন্য সমানুপাতিক বা অন্য কোন স্বতন্ত্র নির্বাচন ব্যবস্থা প্রবর্তনের বিরুদ্ধে তত্ত্বগত ও কার্যকারিতা উভয় দিক হইতে বক্তব্য উপস্থিত করিয়া এই প্রকার ব্যবস্থার বিরোধীতা করিয়াছেন।

বিপক্ষে বক্তব্য : সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য উহাদের যথোপযুক্ত প্রতিনিধিত্বের সুযোগ সৃষ্টি করিয়া নির্বাচনব্যবস্থা প্রবর্তনের তত্ত্বগত বিরোধীতা করিয়া বলা হইয়া থাকে যে, এইরূপ ব্যবস্থা মানুষকে সংকীর্ণ দলীয়, আঞ্চলিক ও সাম্প্রদায়িক মনোভাবে বিশ্বাসী করিয়া তোলে। ইহার ফলে জনগণ পরস্পরবিরোধী দল ও সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া পড়ে এবং দলাদলি, ভেদাভেদ, ঈর্ষা, দ্বেষ প্রভৃতি বৃদ্ধি পাইয়া এক অসুস্থ ও অস্বস্তিকর আবহাওয়া সৃষ্টি হয়। এইরূপ অবস্থা কোনমতেই কাম্য নয়।

দ্বিতীয়ত, তত্ত্বগত দিক হইতে বলা হয় যে, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে যথোপযুক্ত প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা প্রবর্তন করিলে আইনসভার সদস্যগণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হইয়া পড়িবে এবং ইহার ফলে স্থায়ী, শক্তিশালী ও সুনির্দিষ্ট নীতি গ্রহণকারী মন্ত্রিসভা গঠন করা কষ্টকর হইয়া দাঁড়ায়। সুতরাং এইরূপ অবস্থায় দুর্বল, অনিশ্চিত ও অস্থায়ী শাসন প্রবর্তনের সম্ভাবনা প্রবল হইয়া দেখা দেয়।

কার্যকারিতার দিক হইতেও সংখ্যালঘুদের জন্য যথোপযুক্ত প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থার সমালোচনা করিয়া বলা হইয়া থাকে যে, এই ব্যবস্থা অত্যন্ত জটিল ও ব্যয়বহুল। এই জটিল ব্যবস্থা নির্বাচকমণ্ডলীকে বিশেষভাবে বিভ্রান্ত করে। উপরন্তু সংখ্যালঘুদের প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা প্রবর্তিত থাকিলে, কে জয়ী হইতে পারেন ইহা লইয়া সংখ্যালঘুদের মধ্যে পারস্পরিক ঈর্ষা, কলহ বৃদ্ধি পায়। সুতরাং সমালোচকগণের মতে তত্ত্বগত ও কার্যকারিতা কোন দিক হইতেই সংখ্যালঘিষ্ঠদের প্রতিনিধিত্বের দাবীকে গ্রহণ করা যায় না।

উপসংহারে বলা যায় যে, এই সমস্ত সমালোচনা সত্ত্বেও সংখ্যালঘিষ্ঠদের যথোপযুক্ত প্রতিনিধিত্বের দাবীকে অস্বীকার করা যায় না। কারণ জনগণের একটা ব্যাপক ও লক্ষ্যণীয় অংশকে বাদ দিয়া গণতন্ত্র কখনই সফল হইতে পারে না। উপরন্তু স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ার দেশগুলিতে সংখ্যালঘুদের প্রতিনিধিত্বের জন্য

প্রবর্তিত নির্বাচনব্যবস্থা সাফল্যলাভ করিবার জন্য ইহার স্বপক্ষে দাবী ক্রমশ শক্তিশালী হইয়া উঠিতেছে।

৪ ॥ সংখ্যালঘিষ্ঠের প্রতিনিধিত্বের বিভিন্ন পদ্ধতি (Methods of Minority Representation)

আইনসভায় সংখ্যালঘিষ্ঠদের প্রতিনিধিত্বের জন্য বিভিন্ন প্রকারের যে সমস্ত পদ্ধতি অবলম্বন করা হইয়া থাকে, তাহা নিম্নে আলোচনা করা হইল।

(ক) সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব : সংখ্যালঘিষ্ঠ সাম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্বের জন্য যে সমস্ত পদ্ধতি প্রচলিত আছে উহার মধ্যে সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব ব্যবস্থা (Proportional Representation) অন্যতম। সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্বের আবার দুইটি পদ্ধতি আছে। প্রথমটি হইল হেয়ার স্কিম (Hare Scheme) এবং দ্বিতীয়টি তালিকা পদ্ধতি (List system)।

১। হেয়ার স্কিম : সংখ্যালঘিষ্ঠের প্রতিনিধিত্বের জন্য একক হস্তান্তরযোগ্য ভোটে আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থার সমর্থক ছিলেন টমাস হেয়ার (Thomas Hare)। তাই এই প্রথাকে হেয়ার স্কিম নামে অভিহিত করা হয়। এই নির্বাচনপদ্ধতি অনুসারে প্রতি নির্বাচনী এলাকা হইতে একাধিক প্রতিনিধি নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু প্রতিটি ভোটদাতার মাত্র একটি করিয়া ভোট থাকে। ভোটদাতাগণ যে প্রার্থীকে অধিক যোগ্য মনে করেন, প্রার্থীতালিকায় তাহার নামের পাশে 'এক' লিখিয়া দেয়। ইহা ছাড়াও ভোটদাতা অন্যান্য নামের পাশে পছন্দ অনুযায়ী 'দুই', 'তিন', 'চার', ইত্যাদি পছন্দের পরিমাপসূচক সংখ্যা লিখিয়া দেয়। প্রতিটি প্রার্থীকে নির্বাচনে জয়ী হইবার জন্য একটা নির্দিষ্ট সংখ্যক ভোট পাইতে হইবে। এই নির্দিষ্ট সংখ্যক ভোট (Electoral quota) বাহির করিবার জন্য কার্ল আন্দ্রে নিম্নলিখিত পদ্ধতির কথা বলিয়াছেন।

$$\frac{\text{নির্বাচন কেন্দ্রের বৈধ ভোট সংখ্যা}}{\text{নির্বাচন কেন্দ্রের আসন সংখ্যা}} = \text{নির্দিষ্ট সংখ্যক ভোট}$$

কিন্তু অনেকের মতে এই পদ্ধতি যথেষ্ট সন্তোষজনক নয়। তাই এই পদ্ধতিকে ত্রুটিহীন করিবার জন্য তাহারা আসনসংখ্যা দ্বারা বৈধ ভোটকে

ভাগ করিবার সময় আসনের সঙ্গে এক এবং ভাগফলের সঙ্গে এক যোগ করিয়া নির্দিষ্ট সংখ্যক ভোট নির্ণয় করিবার পক্ষপাতী। অর্থাৎ,

$$\frac{\text{নির্বাচন কেন্দ্রের বৈধ ভোট সংখ্যা}}{\text{নির্বাচন কেন্দ্রের আসন সংখ্যা}+১}+১=\text{নির্দিষ্ট সংখ্যক ভোট}$$

ভোট গণনার সময় যে সকল প্রার্থী ভোটদাতাদের 'প্রথম' পছন্দ অনুসারে পূর্বোক্ত নির্দিষ্ট সংখ্যক ভোট লাভ করিবেন, তাঁহারা নির্বাচিত হইবেন। নির্বাচিত হইবার জন্য প্রয়োজনীয় নির্দিষ্ট সংখ্যক ভোটের অতিরিক্ত ভোট যে সকল প্রার্থী পাইবেন সেই ক্ষেত্রে তাহাদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত ভোটগুলি 'দ্বিতীয়'পছন্দপ্রাপ্ত প্রার্থীদের হস্তান্তর করা হইবে। এইরূপে দ্বিতীয় পছন্দপ্রাপ্ত প্রার্থীদের মধ্যে যাহারা প্রয়োজনীয় নির্দিষ্ট সংখ্যক ভোট পাইবেন, তাহারা নির্বাচিত হইবে। আবার এই সমস্ত নির্বাচিত প্রার্থীদের অতিরিক্ত ভোটগুলি 'তৃতীয়' পছন্দপ্রাপ্ত প্রার্থীদের মধ্যে হস্তান্তরিত হইবে। নির্ধারিত সংখ্যক আসন পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত এই পদ্ধতি চলিতে থাকিবে।

পদ্ধতিটি একটু জটিল। তাই একটি দৃষ্টান্তের সাহায্যে ইহাকে বুঝাইবার চেষ্টা করা হইল। মনে করি কোন নির্বাচন-কেন্দ্রে দুই লক্ষ বৈধ ভোট পড়িয়াছে এবং সেখানে চারটি আসন এবং আটজন প্রার্থী আছে। প্রতিটি প্রার্থীকে নির্বাচিত হইবার জন্য $\frac{২,০০,০০০}{৪+১}+১=৪০০০১$টি 'প্রথম' পছন্দের ভোট প্রয়োজন। মনে করা যাক যে, মাত্র একজন প্রার্থী নির্দিষ্ট সংখ্যক 'প্রথম' পছন্দের ভোট পাইয়া নির্বাচিত হইলেন। এই নির্বাচিত ব্যক্তি তাহার প্রয়োজনীয় নির্দিষ্ট ভোটের অতিরিক্ত যে ভোট পাইবেন তাহা 'দ্বিতীয়' পছন্দপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের হস্তান্তর করিবার পর যাহারা উক্ত নির্দিষ্ট ভোট পাইবেন তাহারাও নির্বাচিত হইবেন। সকল আসন পুর্ণ না হওয়া পর্যন্ত এই পদ্ধতি চলিতে থাকিবে। ভারতবর্ষে রাষ্ট্রপতি, উপরাষ্ট্রপতি এবং বিধান পরিষদের কয়েকটি নির্বাচকমণ্ডলীতে এই পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়।

২। **তালিকা পদ্ধতি:** তালিকা পদ্ধতি প্রচলিত থাকিলে প্রতিটি দলই যে কয়েকটি আসন থাকে সেই সংখ্যক প্রার্থী দ্বারা এক একটি তালিকা প্রস্তুত করে। তালিকায় প্রার্থীদের নামগুলি পছন্দ (preference) অনুযায়ী সাজাইয়া দেওয়া হয়। এই পদ্ধতিতে ভোটদাতাগণ রাজনৈতিক দলগুলি দ্বারা তৈয়ারী বিভিন্ন তালিকার মধ্যে যে কোন একটিতে ভোট দিয়া থাকে। পরে

গণনা করিয়া দেখা হয় যে, কোন তালিকার পক্ষে কত ভোট পড়িয়াছে এবং সেই অনুপাতে বিভিন্ন তালিকা হইতে প্রার্থী নির্বাচিত হইয়া থাকেন।

মনে করি, নির্বাচনে ত্রিশ হাজার ভোটদাতা ও ছয়টি আসন আছে এবং তিনটি বিকল্প তালিকা বিভিন্ন দল কর্তৃক ভোটে উপস্থিত করা হইয়াছে। 'ক' দলের তালিকা পনের হাজার ভোটার কর্তৃক, 'খ' দলের তালিকা দশ হাজার ভোটার কর্তৃক এবং 'গ' দলের তালিকা পাঁচ হাজার ভোটার কর্তৃক সমর্থিত হইয়াছে। এইরূপ অবস্থায় তালিকা-পদ্ধতি অনুসারে 'ক' দলের তালিকার প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রার্থী ; 'খ' দলের তালিকার প্রথম ও দ্বিতীয় প্রার্থী এবং (গ) দলের তালিকার প্রথম ব্যক্তি নির্বাচিত হইবে।

(খ) স্তূপীকৃত ভোটদান পদ্ধতি (Cumulative Vote System) : স্তূপীকৃত ভোটদান পদ্ধতিতে যতগুলি আসন থাকে প্রতিটি ভোটদাতার সেই সংখ্যক ভোট থাকে। কিন্তু এই পদ্ধতিতে প্রার্থীদের মধ্য হইতে ভোটদাতা পছন্দমত প্রার্থীদের একটি করিয়া ভোট না দিয়া যে কয়টি আসন আছে সেই কয়টি ভোট একজন প্রার্থীকে দিতে পারেন বা দুই তিনজন প্রার্থীর মধ্যে ইচ্ছামত সংখ্যক ভোট ভাগ করিয়া দিতে পারেন। মনে করা যাক এই পদ্ধতি অনুসারে ছয়জন প্রার্থী নির্বাচিত হইবে। ভোটদাতা ছয়জনকে একটি করিয়া ভোট না দিয়া একজন প্রার্থীকে ছয়টি বা দুই-তিন জন প্রার্থীর মধ্যে ছয়টি ভোট ভাগ করিয়া দিতে পারেন। এইভাবে সংখ্যালঘিষ্ঠরা তাহাদের প্রার্থীদের অনুকূলে নিজেদের সমস্ত ভোট জমায়েত করিয়া কিছু সংখ্যক প্রার্থীর নির্বাচন সুনিশ্চিত করিতে পারে।

(গ) দ্বিতীয় ব্যালট পদ্ধতি (Second Ballot System) : ভোট গণনায় যদি কেহ সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোট অর্জন করিতে না পারে তবে দ্বিতীয় ব্যালট পদ্ধতি অনুযায়ী সর্বনিম্ন ভোটপ্রাপ্ত প্রার্থীর নাম বাদ দিয়া দ্বিতীয়বার ভোটদানের ব্যবস্থা করা হয়। দ্বিতীয়বারের নির্বাচনে পূর্ণসংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করিয়া জয়ী হওয়া সম্ভবপর।

(ঘ) সাম্প্রদায়িক নির্বাচন (Communal Representation) : সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্বকে সুনিশ্চিত করিবার জন্য সাম্প্রদায়-ভিত্তিক নির্বাচন ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হইয়াছে। এইরূপ নির্বাচন দুইটি

পদ্ধতিতে করা যায়। প্রথমত, প্রতিটি সম্প্রদায়ের জন্য পৃথক সাম্প্রদায়িভিত্তিক নির্বাচন প্রবর্তিত করিয়া এবং দ্বিতীয়ত, যৌথ নির্বাচন ব্যবস্থায় প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য আসন নির্দিষ্ট রাখিয়া এই পদ্ধতি প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

উপরোক্ত পদ্ধতিগুলির মধ্যে সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব ব্যবস্থাই অধিকতর বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত এবং ইহা সংখ্যালঘিষ্টের সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা নিশ্চিত করিতে পারে। সুতরাং এই পদ্ধতি গণতান্ত্রিক নীতি ও আদর্শের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। আইনসভার মধ্য দিয়া বিভিন্ন সম্প্রদায়ের চিন্তা ও চেতনাকে প্রতিফলিত করিতে হইলে সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্বই শ্রেষ্ঠ উপায়। সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব শুধুমাত্র সংখ্যাগরিষ্ঠের প্রতিনিধিত্বই দান করে না, ইহা বিভিন্ন সম্প্রদায়ের শক্তি অনুযায়ী সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা করে বলিয়া বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে রাজনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করে।

কিন্তু সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থাকে অনেকে সমালোচনা করিয়া বলিয়াছেন যে বাস্তবে এই প্রথার দ্বারা বিশেষ কোন উপকার হয় না। বরং এই প্রথা প্রবর্তনের ফলে জাতীয় স্বার্থ অপেক্ষা সম্প্রদায়গত চিন্তা ও স্বার্থ প্রাধান্য বিস্তার করে। ফলে জাতীয় স্বার্থের পরিপ্রেক্ষিতে সুস্থ এবং সুনিশ্চিত জনমত গঠিত হইতে পারে না। এমনকি এই পদ্ধতির ব্যাপক প্রয়োগের দ্বারা রাজনৈতিক দলগুলিও সম্প্রদায়গতভাবে উপদলে বিভক্ত হইয়া পড়ে। ইহা ছাড়াও বলা হইয়া থাকে যে সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্বের বিশেষ করিয়া 'হেয়ার পদ্ধতি' বিশেষ জটিল এবং সাধারণ নাগরিকেরা ইহাকে অনুসরণ করিতে পারে না। এক আসন বিশিষ্ট নির্বাচনেও (single member constituency) এই পদ্ধতি প্রয়োগ করা চলে না। সমানুপাতিক নির্বাচন পদ্ধতিতে সঠিকভাবে জনমত প্রতিফলিত হয় না বলিয়াও সমালোচনা করা হয়।

যাহাই হউক সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্বের উপরোক্ত পদ্ধতি দুইটিই অতিশয় জটিল এবং ব্যয়সাপেক্ষ এবং অজ্ঞ ও অশিক্ষিত ভোটদাতাগণের পক্ষে এই পদ্ধতি অনুসারে ভোট দেওয়া কষ্টকর হইলেও বহু দল ও সম্প্রদায়ে বিভক্ত রাষ্ট্রে সংখ্যালঘিষ্ঠদের প্রতিনিধিত্ব দানে একক হস্তান্তরযোগ্য ভোট ব্যবস্থা বা হেয়ার স্কিম বিশেষ কার্যকারী।

৫॥ আঞ্চলিক এবং পেশাগত প্রতিনিধিত্ব (Territorial and Occupational Representation)

নির্বাচকমণ্ডলী কোন নীতির ভিত্তিতে গঠিত হইবে এই ব্যাপারে বিভিন্ন প্রকার পদ্ধতির কথা বলা হয়। বর্তমান যুগে বিভিন্ন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে আইন-সভার প্রতিনিধি নির্বাচনের ক্ষেত্রে মূলত আঞ্চলিক প্রতিনিধিত্ব (Territorial Representation) এবং পেশাগত বা বৃত্তিগত প্রতিনিধিত্ব (Occupational or Functional Representation) ব্যবস্থার প্রবর্তন লক্ষ্য করা যায়। আঞ্চলিক প্রতিনিধিত্ব ব্যবস্থায় সমগ্র রাষ্ট্রকে কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 'নির্বাচন এলাকায়' (constituency) ভাগ করিয়া প্রতিটি এলাকা হইতে সর্বোচ্চ ভোট-প্রাপ্ত এক বা একাধিক প্রতিনিধি নির্বাচন করা হয়। অর্থাৎ এইরূপ ব্যবস্থায় বিভিন্ন জাতি, ধর্ম, বর্ণ ও বৃত্তি নির্বিশেষে নির্বাচকমণ্ডলী এক একটি এলাকায় ভোট দিয়া থাকেন এবং প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক ভোটপ্রাপ্ত প্রতিনিধি বা প্রতিনিধিদের নির্বাচিত বলিয়া ঘোষণা করা হয়। ভারতবর্ষের লোকসভা ও বিধানসভার নির্বাচনের ক্ষেত্রে এই আঞ্চলিক প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হইয়াছে।

কিন্তু এইভাবে আঞ্চলিক ভিত্তিতে নির্বাচন এলাকাকে বিভক্ত না করিয়া যদি বিভিন্ন বৃত্তি বা পেশার ভিত্তিতে নির্বাচন এলাকাকে বিভক্ত করিয়া প্রতিটি বৃত্তিকে আইনসভায় যথোপযুক্ত প্রতিনিধিত্বের সুযোগ দেওয়া হয় তবে তাহাকে বৃত্তিগত প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা বলা হয়। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের বিধান পরিষদের নির্বাচনে কয়েকটি ক্ষেত্রে পেশা-গত প্রতিনিধিত্ব রহিয়াছে। বিভিন্ন বৃত্তি ও শ্রেণীর পরস্পরবিরোধী স্বার্থ থাকায় বৃত্তিগত প্রতিনিধিত্বের ভিতর দিয়া আইনসভায় জাতীয় জীবনের বিভিন্ন বৃত্তি ও স্বার্থকে প্রতিফলিত করা যাইতে পারে। অর্থাৎ এইরূপ ব্যবস্থায় নির্বাচন এলাকাগুলি শিক্ষক, চিকিৎসক, শ্রমিক, কৃষক, কর্মচারী প্রভৃতির পেশার ভিত্তিতে বিভক্ত হইবে এবং প্রতিটি পেশা হইতে নির্দিষ্ট সংখ্যক প্রতিনিধি নির্বাচিত হইবেন।

আঞ্চলিক প্রতিনিধিত্ব ও বৃত্তিমূলক প্রতিনিধিত্বের ভিতর উৎকর্ষ বিচার করিতে হইলে আমাদের প্রথমেই এই দুই ব্যবস্থার দোষ-গুণ সম্পর্কে অবহিত হওয়া প্রয়োজন। আঞ্চলিক প্রতিনিধিত্বের স্বপক্ষে বলা হইয়া থাকে যে, আঞ্চলিক স্বার্থরক্ষা ও আঞ্চলিক সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান আঞ্চলিক প্রতিনিধি দ্বারাই সম্ভবপর। বৃত্তিগত প্রতিনিধিত্বে আঞ্চলিক সমস্যা অবহেলিত হয়।

ইহা ছাড়াও বলা যায় যে, মানুষের আঞ্চলিক স্বার্থ দ্বারাই অনেকাংশে রাজনৈতিক মতামত প্রভাবিত হইয়া থাকে এবং একই অঞ্চলের অধিবাসীদের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও অন্যান্য সমস্যা ও স্বার্থ প্রায় একইরূপ হয়। এমতাবস্থায় আঞ্চলিক প্রতিনিধিত্বই আঞ্চলিক স্বার্থরক্ষার শ্রেষ্ঠ উপায়।

কিন্তু এই ব্যবস্থা ও উপরোক্ত যুক্তিসমূহের তীব্র বিরোধিতা করিয়া বলা হইয়া থাকে যে, এই ব্যবস্থা গণতন্ত্রের আদর্শ বিরোধী। বর্তমান যুগে বিভিন্ন পেশাগত পার্থক্যের জন্য সমাজের যে রূপ আত্মপ্রকাশ করিয়াছে তাহাতে কোন অঞ্চলের অধিবাসীদের সকলের স্বার্থ ও সমস্যা এক হইবে এইরূপ আশা করা যায় না। একটি অঞ্চলে শ্রমিক, মালিক, ধনী, দরিদ্র, কৃষক, জমিদার ও কর্মচারী বাস করিতে পারে। একই অঞ্চলে বাস করা সত্ত্বেও ইহাদের স্বার্থ এক তো নয়ই, এমনকি বিভিন্ন শ্রেণীর স্বার্থ অনেক ক্ষেত্রেই পরস্পরবিরোধী। এইরূপ অবস্থায় আঞ্চলিক প্রতিনিধিত্ব তত্ত্ব প্রয়োগ করা যায় না। সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মতামত যদি আইনসভায় প্রতিফলিত না হয়, তবে তাহাকে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা বলা যায় না। একমাত্র পেশাগত বা বৃত্তিগত প্রতিনিধিত্বের ভিতর দিয়াই বিভিন্ন বৃত্তি ও শ্রেণীর মতামত ও স্বার্থ প্রতিফলিত হইতে পারে। তাই ফরাসী পণ্ডিত দ্যুগোয়া বলিয়াছেন।[4] জাতীয় জীবনের প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ শ্রেণীশক্তির প্রতিনিধিত্ব থাকা প্রয়োজন। কিন্তু একমাত্র বৃত্তিগত নির্বাচন-ব্যবস্থার দ্বারাই বিভিন্ন শ্রেণীস্বার্থকে প্রতিফলিত করা যাইতে পারে। ইংরেজ লেখক কোনও পেশাগত নির্বাচন প্রথাকে সমর্থন করিয়া বলিয়াছেন যে, বিভিন্ন স্বার্থের প্রতিনিধিত্বের মাধ্যমেই সাধারণ ইচ্ছা প্রকাশ লাভ করিতে পারে। তাই জাতীয় জীবনের সমস্ত পেশাকেই আইনসভায় প্রতিফলিত করা প্রয়োজন।

আঞ্চলিক ভিত্তিক নির্বাচনব্যবস্থায় সংখ্যাগরিষ্ঠদের শাসন প্রবর্তিত হয় এবং সংখ্যালঘুদের স্বার্থ অবহেলিত হয়। অর্থাৎ সমাজের বিভিন্ন স্বার্থ ও মতের বাহক গোষ্ঠীগুলির ভিতর যাহারা সংখ্যাগরিষ্ঠ, এইরূপ ব্যবস্থায় তাহাদের শাসনই প্রবর্তিত হয়। অপরপক্ষে, সংখ্যালঘুরা জনসংখ্যার একটা ব্যাপক অংশের প্রতিনিধি হইয়াও নিজেদের অধিকার, স্বার্থ ও মতামতকে প্রতিফলিত

4. "All the great forces of the national life ought to be represented—industry, property, commerce, manufacturing, professions and even science and religion.
—Duguit

করিবার অধিকার হইতে বঞ্চিত হয়। ইহা ছাড়াও আঞ্চলিক নির্বাচনব্যবস্থায় বিভিন্ন অঞ্চলের ক্ষুদ্র ও সংকীর্ণ স্বার্থ এত বেশি প্রাধান্য লাভ করে যে জনগণের ব্যাপক ও বৃহৎ সমষ্টিগত স্বার্থ গুরুত্ব লাভ করিতে পারে না।

বহুত্ববাদে (Pluralists) যাঁহারা বিশ্বাসী তাঁহারা মনে করেন যে. বৃত্তিগত ভিত্তিতে গঠিত বিভিন্ন সংস্থাগুলির সমাজে ঐতিহাসিক প্রয়োজন রহিয়াছে। সুতরাং এই সমস্ত সংস্থাগুলিকে যথোপযুক্ত প্রতিনিধিত্বের সুযোগ না দিলে রাষ্ট্রের সামগ্রিক স্বার্থ রক্ষিত ও প্রতিফলিত হইতে পারে না।

বৃত্তিগত প্রতিনিধিত্ব ব্যবস্থা অবশ্য সম্পূর্ণভাবে ত্রুটিহীন নয়। এই ব্যবস্থার সমালোচনা করিয়া বলা হয় যে, বৃত্তিগতভাবে শ্রেণীবিভাগ করিয়া নির্বাচনব্যবস্থা পরিচালনা করা এক জটিল ও দুঃসাধ্য ব্যাপার। দ্বিতীয়ত, বৃত্তির ভিত্তিতে শ্রেণী বিভাগ করিয়া এই নির্বাচনব্যবস্থা প্রচলিত করিলে প্রত্যেকটি পেশাগত প্রতিনিধি নিজ নিজ স্বার্থ লইয়া ব্যাপৃত থাকিবে এবং ইহার ফলে ভেদাভেদ, হিংসা, দ্বেষ, বৃদ্ধি পাইবে এবং তাহার ফলে সামগ্রিকভাবে জাতীয় স্বার্থ ক্ষুন্ন হইবে। তাই ফরাসী লেখক ইজমে এই ব্যবস্থাকে ভ্রান্ত ও অলীক বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহার মতে, এই ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইলে সমাজে সংঘর্ষ, বিশৃঙ্খলা, এমন কি অরাজকতা পর্যন্ত দেখা দিতে পারে।[৫]

বৃত্তিভিত্তিক নির্বাচনব্যবস্থার কিছু কিছু ত্রুটি আছে সন্দেহ নাই। কিন্তু জনগণের ভিতরকার বিভিন্ন মত ও পথকে আইনসভার প্রতিফলিত করিয়া উহার ভিত্তিতে রাষ্ট্রীয় নীতি ও কার্যক্রম নির্ধারণ করাই গণতান্ত্রিক রীতি ও আদর্শ। সুতরাং আঞ্চলিক নির্বাচন-প্রথার সঙ্গে কিছু পরিমাণ সীমাবদ্ধ আসনে বৃত্তিভিত্তিক নির্বাচনব্যবস্থা প্রবর্তিত থাকা একান্ত আবশ্যক।

৫. The Principle of representation of interests is an illusion and a false principle, which will lead to struggles, confusion and even anarchy.

—Esmein

বিংশ অধ্যায়

জনমত

(Public Opinion)

বেশির ভাগ রাষ্ট্রেই বর্তমানে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার প্রবর্তন ঘটিয়াছে। গণতন্ত্রের শাসকেরা জনগণের দ্বারা নির্বাচিত হয় বলিয়া, গণতন্ত্রে জনমতের মূল্য অপরিসীম। বস্তুত জনমতকে গণতন্ত্রের প্রাণ বলিয়া অভিহিত করা হয়। জনমতের মধ্য দিয়া ব্যাপক জনসাধারণের চিন্তা ও দৃষ্টিভঙ্গী প্রতিফলিত হয়, বলিয়া গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় সরকার ও বিরোধী দলসহ সমস্ত রাজনৈতিক দলই জনমতের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিয়া নিজেদের অনুকূলে জনমত সৃষ্টির চেষ্টা করেন। কোন রাজনৈতিক দলই জনমতকে অবহেলা করিতে সাহসী হয় না। বস্তুত গণতন্ত্রে জনমতই দেবতার আজ্ঞার মর্যাদা লাভ করে (Voice of the people is the voice of God)

১॥ জনমত কাহাকে বলে ? (What is Public opinion ?)

রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা জনমতের সংজ্ঞা বা প্রকৃত বিষয়ে কোন সর্বাবাদী-সম্মত সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন নাই। রুশো জনমত দ্বারা জনতার প্রকৃত ইচ্ছা বা একটি আদর্শের কথা বলিয়াছেন। আধুনিক কালে রাষ্ট্রের বিশেষ কোন সামাজিক, অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক সমস্যা বা উহার সমাধানের ক্ষেত্রে জনগণের ব্যাপক অংশ কর্তৃক স্বীকৃত, সমর্থিত ও নির্দিষ্ট জনকল্যাণকর মতকে জনমত বলে। জনমতের স্বরূপ ও সংজ্ঞা নির্ণয় করিতে যাইয়া ব্রাইস বলিয়াছেন যে, ব্যাপক জনসমাজের কল্যাণ সম্পর্কিত জনগণের সমষ্টিগত মতকে সাধারণত জনমত (Public opinion) বলা হয়।[1] এই বক্তব্যকে আর একটু বিশ্লেষণ করিয়া বলা যাইতে পারে যে, রাষ্ট্রের কোন বিশেষ সামাজিক, অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক সমস্যা বা উহা সমাধানের ক্ষেত্রে জনকল্যাণধর্মী বলিয়া পরিচিত ব্যক্তি বা ব্যক্তিসমষ্টির মত যদি জনগণের একটি ব্যাপক অংশ কর্তৃক সমর্থিত হয়, তবে তাহাকে জনমত বলে। নিছক সংখ্যাগরিষ্ঠের মতকে জনমত বলা

1. "The term (public opinion) is commonly used to denote the aggregates of the views men hold regarding matters that affect or interest the community." —Bryce

যায় না, কিন্তু তাই বলিয়া জনমতের স্বীকৃতি সর্বসম্মতির উপরও নির্ভর করে না।[2]

জনগণের সকলপ্রকার মতকে জনমত বলা যায় না, ইহার একটি বিশিষ্ট চরিত্র আছে। কোন মতামতকে জনমতের পর্যায়ে আসিতে হইলে ইহাকে রাষ্ট্রীয় সমস্যার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, কল্যাণধর্মী, নির্দিষ্ট ও দায়িত্বশীল হইতে হইবে এবং জনগণের ব্যাপক অংশের সমর্থন লাভ করিতে হইবে। উদাহরণ হিসাবে বলা যাইতে পারে যে, সম্প্রদায়গত ভেদাভেদ সৃষ্টির নীতি যদি কোন রাষ্ট্রের জনগণের একটা বিশেষ অংশের সমর্থন লাভও করে তবু ইহাকে জনমত বলা যাইতে পারে না। কারণ ইহা জনকল্যাণকর তো নয়ই, বরং সম্পূর্ণভাবেই জনস্বার্থবিরোধী। কাইনারকে অনুসরণ করিয়া বলা যায় যে জনমতের তিনটি উপাদান থাকা প্রয়োজন। প্রথম উপাদান তথ্য, দ্বিতীয়ত উহার মূল্যায়ন এবং তৃতীয়ত ইহার পরিপ্রেক্ষিতে ভবিষ্যত কর্মপন্থা নির্ধারণ করা।

জনমতের ধারা ও ইহার উৎসব আলোচনা প্রসঙ্গে ব্রাইস বলিয়াছেন: "প্রথম স্তরে জনমত বিভ্রান্তিপূর্ণ এলোমেলো, অসম্বদ্ধ ও আকারবিহীন অবস্থায় দেখা দেয়, এবং প্রতি সপ্তাহে ইহার রূপ পরিবর্তিত হয়। কিন্তু এই এলোমেলো ও বিভ্রান্তিপূর্ণরূপের মধ্য হইতে ক্রমে মতগুলি ঘনীভূত ও পরিষ্কার হইয়া এক বিশেষ নির্দিষ্ট আকার ধারণ করে। জনমতের গঠনপ্রণালী গভীরভাবে লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে, প্রাথমিক স্তরে জনমতের বিশেষ কোন নির্দিষ্ট আকার ও বক্তব্য থাকে না। দেশপ্রেম, অন্ধ-বিশ্বাস, সংস্কার, শ্রেণীবিদ্বেষ প্রভৃতি উপাদানের মিশ্রণে নানাপ্রকারের অস্পষ্ট ও অসংলগ্ন মতামত দেখা দেয়। ইহাদের ভিতর যেগুলি গুরুত্বপূর্ণ তাহা লইয়া আলোচনা, বিশ্লেষণ, পর্যালোচনা চলিতে থাকে। এই সমস্ত পর্যালোচনার ভিতর দিয়া মতামতগুলি সুসংহতরূপে প্রকাশ পায়। কিন্তু তখন পর্যন্ত ইহারা জনমতের মর্যাদা লাভ করিতে পারে না। কারণ, জনগণের ব্যাপক অংশ কর্তৃক এই মত স্বীকৃতি লাভ করে না। বক্তৃতা, খবরের কাগজের সম্পাদকীয়, পুস্তক, ইস্তাহার, পোস্টার, রেডিও প্রভৃতির প্রচারের ভিতর দিয়া অবশেষে জনগণের এক লক্ষ্যণীয় অংশ যখন কোন একটি মতের সমর্থক হইয়া দাঁড়ায়, তখন সেই মতটি জনমতের পর্যায়ে উপনীত হয়। সুতরাং যে মত এতদিন এলোমেলোভাবে ইতস্তত প্রচারিত হইতেছিল, তাহা পরবর্তী স্তরে নির্দিষ্ট আকার ধারণ করিয়া জনমতে রূপান্তরিত হয়।

2. "...a majority if not enough and unanimity is not required." —Lowell

অনেকে মনে করেন যে, জনমত বলিয়া প্রকৃতপক্ষে কিছু নাই। তাহারা মনে করেন যে জনমত জনগণের নয় এবং ইহা মতও নয় (Public opinion is neither Public nor opinion) তাহাদের মতে বাস্তবক্ষেত্রে জনসাধারণের সাধারণত নিজস্ব কোন মতামত থাকে না। জনমত বলিয়া যাহা প্রচলিত হয় তাহা সাধারণত রাজনৈতিক দল এবং মুষ্টিমেয় নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবেশেষের মত ছাড়া কিছু নয়। সুতরাং প্রকৃতপক্ষে জনমত বলিয়া কোন কিছুর অস্তিত্ব নাই। জনমতের স্বরূপ বিশ্লেষণ করিতে যাইয়া কেহ কেহ বলিয়াছেন যে জনমত এতই উদাসীন এবং ব্যস্ত, এত পরিবর্তনশীল ও ভাবপ্রবণ যে, ইহার ক্ষমতা লইয়া ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা যাইতে পারে, যদিও মাঝে মাঝে অস্থির দৈত্যের মত ইহার প্রচণ্ড শক্তির প্রয়োগ ঘটিতে পারে। রবার্ট পীল জনমত বলিতে তিনি বোকামী, দুর্বলতা, কুসংস্কার, ভুল বুঝা, ঠিক বুঝা, একগুয়েমি ও খবরের কাগজের এক বিরাট সংমিশ্রণ বুঝাইয়াছেন।[3] জনমত সম্পর্কে এই সমস্ত বিরূপ সমালোচনা সত্ত্বেও স্বীকার করিতে হইবে যে, জনগণের ইচ্ছা, চিন্তা ও বক্তব্য বেশ কিছুটা জনমতের ভিতর দিয়া প্রতিফলিত হয় এবং সেইজন্যই জনমতের বাস্তব গুরুত্ব অস্বীকার করা যায় না। জনমতের এই বাস্তব গুরুত্ব মনে রাখিয়া বলা যাইতে পারে যে জনমত কি এবং জনমত বলিয়া কিছু আছে কিনা যেই ব্যাপারে তর্ক করিয়া লাভ নাই। প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী বলা যায় যে জনমত বলিতে মোটামুটিভাবে সমাজের ও জনগণের মতকে বুঝায়।[4]

চারিত্রিক বৈশিষ্ট যাই হোক, উপরোক্ত সংজ্ঞার ভিত্তিতে জনমতের নিম্নলিখিত প্রকাশ পায়।

প্রথমত, কোন ব্যক্তিগত ব্যাপারকে কেন্দ্র করিয়া জনমতের উৎপত্তি হয় না, রাষ্ট্র বা জাতি বা জনজীবনের বৃহত্তর সমস্যাকে কেন্দ্র করিয়া ও উহার সমাধানের ইঙ্গিত লইয়া জনমত গঠিত হয়। দ্বিতীয়ত, দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্যের জন্য একই বিষয়ে পরস্পরবিরোধী মতামত থাকিতে পারে। উভয় মতই যদি জনগণের এক একটি লক্ষ্যণীয় অংশ দ্বারা সমর্থিত হয়, তবে পরস্পরবিরোধী দুইটি জনমতের অস্তিত্ব দেখা যায়। তৃতীয়ত, জনগণের যে কোন মতকে

3. "The great compound of folly, weakness, prejudice, wrong feeling, right feeling, obstinacy and newspaper paragraphs." —Robert Peel

4. "There should be no question about what we mean by calling public opinion 'public', we mean, in the light of long established usage, that its the opinion of the community, the opinion of the people." —F. M. Sait

জনমত বলা যায় না। ইহাকে জাতীয় সমস্যার সঙ্গে জড়িত থাকিলে, সমাধানের ইঙ্গিত নির্দেশ করিলে এবং সুস্পষ্ট ও নির্দিষ্ট রূপ পরিগ্রহ করিতে পারিলে জনমতের পর্যায়ে উপনীত হইতে পারে চতুর্থত, সাময়িক উত্তেজনার বশে জনগণের ব্যাপক অংশ কোন হটকারী মত প্রকাশ করিতে পারে। কিন্তু জনগণের ব্যাপক অংশ কর্তৃক সমর্থিত হইলেও সাময়িক উত্তেজনার বশে গৃহীত জনস্বার্থবিরোধী ও সংকীর্ণতা দোষে দুষ্ট মত জনমতের পর্যায়ে পড়িতে পারে না। পঞ্চমত, কোনমতকে জনমতের মর্যাদালাভ করিলে জনগণের একটি ব্যাপক এবং লক্ষ্যণীয় অংশের সমর্থন লাভ করিতে হইবে। জনগণের কত অংশের সমর্থন লাভ করিতে পারিলে ইহা জনমত বলিয়া বিবেচিত হইবে এই ব্যাপারে কোন নির্দিষ্ট নিয়ম নাই। সংখ্যা অপেক্ষা জনমতের চরিত্র এবং আস্থার দৃঢ়তা জনমত গঠনে বেশি গুরুত্বপুর্ণ। ষষ্ঠত, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সরকারের নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে জনমত প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে।

২ ॥ জনমত গঠনের মাধ্যম (Means of formulating Public opinion)

এতক্ষণ আমরা জনমত কাহাকে বলে এবং জনমতের স্বরূপ ও চরিত্র লইয়া আলোচনা করিয়াছি। এইবার কোন কোন উপাদানের সাহায্যে জনমত গঠিত এবং প্রকাশিত হয় তাহা আলোচনা করা হইল।

(ক) **বিভিন্ন পত্র পত্রিকা:** জনমত গঠন ও প্রকাশের ক্ষেত্রে সংবাদ-পত্র এবং বিভিন্ন প্রকারের পত্র-পত্রিকা, মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করিয়া থাকে। বর্তমান যুগে মানুষের অক্ষর পরিচয় জ্ঞান এবং রাজনৈতিক চেতনা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পাইবার জন্য সংবাদপত্র ও বিভিন্ন প্রকারের পত্র-পত্রিকার পাঠকের সংখ্যাও লক্ষ্যণীয়ভাবে বৃদ্ধি পাইতেছে। এই সমস্ত পত্র-পত্রিকায় বিভিন্ন সংবাদ প্রকাশিত হয়, সংবাদের আলোচনা পরিবেশিত হয় এবং সম্পাদকীয়-এর মাধ্যমে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ হইতে সংবাদের আলোচনা ও ব্যাখ্যা করা হইয়া থাকে। জনগণের একটা ব্যাপক অংশ এই সমস্ত সংবাদ এবং সমালোচনা দ্বারা বিশেষ ভাবে প্রভাবিত হয় এবং স্বভাবতই সমস্ত পত্র-পত্রিকা জনমত সৃষ্টিতে সাহায্য করে। কিছুদিন পুর্বে আসামে বাঙ্গালীদের বিরুদ্ধে যে জেহাদ ঘোষিত হইয়াছিল সেই সম্পর্কে সংবাদপত্র কর্তৃক প্রকাশিত সংবাদ এবং সম্পাদকীয়ই শক্তিশালী জনমত গঠনে সাহায্য করিয়াছিল। এই সমস্ত পত্র-

পত্রিকা শুধুমাত্র জনমত সৃষ্টিই করে না, জনমতে প্রকাশের দায়িত্বও পালন করে। এইজন্যই কোন প্রকৃত গণতান্ত্রিক সরকার জনমতের বাহন সংবাদ-পত্রের মতামতকে অবহেলা করিতে সাহসী হন না।

জনমত গঠন ও প্রকাশের ক্ষেত্রে পত্র-পত্রিকার এই গুরুত্ব থাকিবার জন্য বিশেষভাবে দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন যে সংবাদপত্রগুলি যাহাতে জনস্বার্থ উপেক্ষা করিয়া কোন গোষ্ঠী বা কায়েমীস্বার্থের প্রতিভূ হিসাবে কার্য না করে। কারণ ইহা হইলে সংবাদপত্র প্রকৃত এবং জনকল্যাণের জন্য প্রয়োজনীয় জনমতকে প্রতিফলিত করিতে পারিবে না। সুতরাং সংবাদপত্রগুলি যাহাতে অবাধ, অবিকৃত এবং নিরপেক্ষভাবে সংবাদ পরিবেশন করে। তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখা উচিত।

(খ) **বেতার ও চলচ্চিত্র :** বেতার ও চলচ্চিত্রের মাধ্যমেও জনমত গঠিত এবং প্রতিফলিত হইয়া থাকে। বেতার এবং চলচ্চিত্র শুধুমাত্র চিত্ত-বিনোদনের উপাদান নয়,—সংবাদ পরিবেশনা এবং সংবাদ সম্পর্কীয় আলোচনা পরিবেশনার ক্ষেত্রেও ইহার বিশেষ ভূমিকা আছে। সংবাদ পরিবেশনার ব্যাপারে বেতারের প্রত্যক্ষ ভূমিকা আছে। চলচ্চিত্রও বিশেষ করিয়া শিক্ষা-মূলক এবং প্রচার মূল ছবির (Documentary Film) মাধ্যমে এই ভূমিকা পালন করিয়া থাকে। বেতার ও চলচ্চিত্রের আবেদন সংবাদপত্রের মত শুধু-মাত্র শিক্ষিত সম্প্রাদায়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়—ইহা শিক্ষার সঙ্গে সম্পর্কহীন সাধারণ মানুষের মধ্যেও প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে। সুতরাং এই দিক হইতে সংবাদপত্র অপেক্ষা বেতার ও চলচ্চিত্রের প্রচারের ব্যাপকতা বেশি।

বেতার এবং চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রেও সরকারী নিয়ন্ত্রণ এবং নীতি ও আদর্শ অপেক্ষা চলচ্চিত্র প্রস্তুতকারীদের মুনাফার প্রচেষ্টা সত্য, অবিকৃত এবং নিরপেক্ষ সংবাদ পরিবেশনার পরিপন্থী হিসাবে দেখা দিয়াছে।

(গ) **রাজনৈতিকদল :** জনমতসৃষ্টির ব্যাপারে রাজনৈতিকদলের ভূমিকা অপরিসীম গুরুত্বের দাবী রাখে। বিশেষ করিয়া যেখানে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার প্রবর্তন ঘটিয়াছে এবং যেখানে সুদৃঢ় দলীয় ব্যবস্থার অস্তিত্ব আছে সেখানে জনমত সৃষ্টির ব্যাপারে রাজনৈতিক দলের ভূমিকা সর্বাপেক্ষা বেশি। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে রাষ্ট্রীয় কোন সমস্যার ব্যাপারে রাজনৈতিক দলের বক্তব্য যখন সংবাদপত্রের আনুকূল্য লাভ করিয়া ব্যাপক প্রচারের সুযোগ

পায়, জনমত সৃষ্টির ক্ষেত্রে রাজনৈতিক দলের ভূমিকা তখন অনেক বেশি কার্যকরী (effective) হইয়া উঠে।

রাজনৈতিক দল জনমত সৃষ্টি করিতে কেন পারে এই সম্পর্কে লাওয়েলের ভাষায় বলা যায় যে, রাজনৈতিক দলই চিন্তা ও ভাবের আদান প্রদানের কার্য করে। দেশের প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা এবং জনগণের স্বার্থের সঙ্গে জড়িত বিষয় লইয়া রাজনৈতিক দলগুলি আলাপ-আলোচনা করে এবং নিজস্ব দৃষ্টিকোণ হইতে এই ব্যাপারে বক্তব্য উপস্থাপিত করে। শুধু বক্তব্য উপস্থিতই করে না, এই বক্তব্য এবং ইহার স্বপক্ষের যুক্তি লইয়া তাহারা জনগণের সামনে উপস্থিত হয় এবং জনগণকে এই বক্তব্যের স্বপক্ষে আনিয়া জনমত সৃষ্টির চেষ্টা করে। বঙ্গ-বিহার সংযুক্তির বিরুদ্ধে যে প্রবল জনমত বাংলাদেশে সৃষ্টি হইয়াছিল তাহা সরকার-বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলিরই অবদান এবং প্রবল জনমতের চাপে বাংলা-বিহার সংযুক্তির প্রস্তাব পরিত্যক্ত হইয়াছিল। জনমত গঠনের ব্যাপারে রাজনৈতিক দলের ভূমিকার ভীত হইয়া বিভিন্ন দেশের শাসক শ্রেণী বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলির কার্যকলাপের বিরুদ্ধে বিভিন্ন প্রকারের বাধা নিষেধ আরোপ করিবার চেষ্টা করিয়া থাকে।

(ঘ) **শিক্ষা প্রতিষ্ঠান:** শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা নৈতিক আদর্শ, সমসাময়িক ধ্যান-ধারণা প্রভৃতি সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করে এবং এইগুলি তাহাদের পরবর্তী জীবনের কার্যে প্রতিফলিত হইয়া জনমত গঠনে সাহায্য করে। ছাত্র-ছাত্রীরাই রাষ্ট্রের ভবিষ্যত নাগরিক এবং কর্ণধারের দায়িত্ব গ্রহণ করে বলিয়া ইহাদের চিন্তা, ধারণা এবং আদর্শ গঠনের ক্ষেত্রে শিক্ষায়তনের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এই সমস্ত চিন্তা, ধারণা ও আদর্শ দ্বারাই পরবর্তী জীবনে জনমতের গঠন হয়। শিক্ষা ব্যবস্থার পূর্ণতা এবং স্বয়ংসম্পূর্ণতার উপরে তাই ভবিষ্যত নাগরিকদের দক্ষতা, জ্ঞান ও কর্মনৈপুণ্যতা নির্ভর করে। অবশ্য এই দায়িত্ব পালন করিতে হইলে শিক্ষা ব্যবস্থাকে সংকীর্ণতা, একপেশে মনোভাব এবং নিছক প্রচারের উর্ধ্বে উঠিতে হইবে।

(ঙ) **সভাসমিতি:** বিশ্বাস ও ভাবের আদান প্রদানের ক্ষেত্রে সভাসমিতি বিরাট দায়িত্ব পালন করে। বিশেষ করিয়া গণতন্ত্রে ভাবের আদান প্রদান, কথা বলার স্বাধীনতা এবং সভা সমিতির অনুষ্ঠানের অধিকার স্বীকৃত বলিয়া গণতন্ত্রে জনমত গঠনে সভাসমিতির গুরুত্বও খুব বেশি। দেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সমসাময়িক অবস্থা, বিভিন্ন বিষয় ও সমস্যা সম্পর্কে

রাজনৈতিক দলগুলি সভাসমিতির আয়োজন করে। এই সমস্ত সভা সমিতির মাধ্যমে দেশের অবস্থা সম্পর্কে জনগণ বিভিন্ন বক্তব্য ও আলোচনা শুনিয়া নিজেদের মতামত গঠন করে এবং এইভাবে সভাসমিতি জনমত গঠন করে। সভাসমিতি একদিকে যেমন জনমত গঠন করে, অন্যদিকে গঠিত জনমত প্রকাশের সম্ভাবনার পথও উন্মুক্ত করে। প্রসঙ্গত উল্লেখকরা প্রয়োজন যে, শাসকশ্রেণী যতই সংকটের সম্মুখীন হয় এবং জনগণ হইতে বিচ্ছিন্ন হয়, ততই তাহারা সভাসমিতির অধিকারকে সঙ্কুচিত করিবার চেষ্টা করে।

(চ) **আইনসভা:** গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় সরকার ও সরকারবিরোধী সমস্ত রাজনৈতিক দলগুলির নিয়মতান্ত্রিক কার্যাবলী আইনসভার মধ্য দিয়া প্রতি-ফলিত হয়। সরকারী নীতি, কার্য পদ্ধতি এবং সরকার কর্তৃক উত্থাপিত বিভিন্ন বিল সম্পর্কে রাজনৈতিক দলগুলি আইনসভায় আলোচনা, সমালোচনা, বিতর্ক ও প্রশ্নাদি করিয়া থাকে। ফলে খবরের কাগজ, রেডিও প্রভৃতির মাধ্যমে জনগণ এই সমস্ত তথ্য ও সমালোচনা জানিতে পারে এবং এই সম্পর্কে জনমত গঠন করে। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল বিভিন্ন প্রকার জনমতের ধারক বলিয়া তাহাদের আলোচনায় আইনসভায় বিভিন্ন প্রকারের জনমত প্রতিফলিত হয়। তাই জনমত গঠন অপেক্ষাও জনমতের প্রতিফলনের ব্যাপারে আইনসভার ভূমিকা বেশি।

ইহা ব্যতীত, পুস্তক, পোষ্টার, প্রচার পুস্তিকা প্রভৃতি দ্বারা জনমত গঠিত ও প্রকাশিত হইতে পারে।

৩।। গণতন্ত্রে জনমতের গুরুত্ব (Importance of Public opinion in Democracy)

পূর্বেই বলা হইয়াছে, আধুনিক যুগে গণতান্ত্রিক চেতনার প্রসারের ফলে বিভিন্ন রাষ্ট্রে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার প্রবর্তন হইয়াছে। গণতন্ত্রের প্রসার অনিবার্যভাবেই জনমতের ভূমিকাকে ক্রমশ গুরুত্বপূর্ণ করিয়া তুলিতেছে। যে যুগে স্বেচ্ছাচারী রাজা জনগণের সর্বপ্রকার ইচ্ছা ও মতকে অপেক্ষা করিয়া শাসন চালাইত, সেই সময় জনমতের বিশেষ কোন গুরুত্ব বা ভূমিকা ছিল না। কিন্তু বর্তমানে রাষ্ট্রীয় নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে জনমত কার্যত প্রধান নিয়ামক। বস্তুতপক্ষে জনমতের উপরই গণতন্ত্র নির্ভরশীল। গণতন্ত্রে জনমত সক্রিয় থাকে এবং চালিতশক্তি হিসাবে কার্য করে। ফলে গণতান্ত্রিক সরকারকে জনগণ এমন

একটি সংস্থা মনে করে, যাহাকে তাহারা ক্ষমতা হস্তান্তরিত করিয়াছে এবং যে সংস্থা জনমতের নির্দেশ অনুযায়ী কার্য করিতে বাধ্য।[5] গণতন্ত্র সাধারণ মানুষের ইচ্ছাকে অবহেলা করিয়া শাসন পরিচালনা করিতে পারে না। জনমতের ভিতর দিয়াই জনগণের ব্যাপক অংশের ইচ্ছা মূর্ত হইয়া উঠে। সুতরাং একমাত্র জনমতের ভিতর দিয়াই সরকার জনসাধারণের ব্যাপক ইচ্ছা ও অভিরুচি জানিতে পারেন এবং সেই অনুযায়ী শাসনকার্য পরিচালনা করিতে পারেন। জনমত যদি জাগ্রত ও সতর্ক হয়, তবে তাহারা আইন ও শাসনবিভাগকে জনকল্যাণে প্রভূত পরিমাণে প্রভাবিত করিতে পারে। ইহা ছাড়াও গতানুগতিক ও রক্ষণশীল সরকারকে প্রাচীনপন্থী নীতি পরিত্যাগ করাইয়া জনমত প্রগতিশীলতার পথে পরিচালিত করিতে পারে। ব্যক্তিস্বাধীনতাকে রক্ষা ও প্রসারের ভিতর দিয়া গণতন্ত্র বিকাশ লাভ করে। জনমতের গুরুত্ব ও তাৎপর্য ব্যাখ্যা করিয়া ল্যাস্কি বলিয়াছেন যে, সদাজাগ্রত জনমতই স্বাধীনতার রক্ষাকবচ। সচেতন জনমতকে গণতন্ত্রের প্রহরী বলা হয়। প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রে জনগণ প্রত্যক্ষভাবে শাসনকার্যে অংশ গ্রহণ করিবার সুযোগ পায় না। সেক্ষেত্রে গভীর আত্মচেতনা সম্পন্ন এবং সতর্ক জনমতই সরকারী স্বেচ্ছাচারিতা বন্ধ করিয়া সরকারকে জন কল্যাণের নীতি গ্রহণে বাধ্য করাইতে পারে।

গণতন্ত্রে জনমতের ভূমিকা মূলত দুইটি দৃষ্টিকোন হইতে বিচার করা প্রয়োজন। প্রথমত, রাষ্ট্রীয় সমস্যার ব্যাপারে দ্রুত জনমত সৃষ্টি হইলে সরকার সেই জনমতের দ্বারাই পরিচালিত হয়। জনমতকে অবহেলা করিয়া ইচ্ছামত সমস্যার প্রতিবিধান করিতে পারে না। দ্বিতীয়ত, গণতন্ত্রে জনমতের দ্বারা শাসনব্যবস্থা পরিচালিত হয় এবং জনমত অনুসারে আইন রচিত হয় এইরূপ ধারনা সৃষ্টি হইলে আইন রচয়িতা এবং আইন মান্যকারীর মধ্যকার পার্থক্যটুকু লোপ পায়। ফলে, রাজনৈতিক আনুগত্যের (Political obligation) সমস্যা থাকে না। অবশ্য এই সমস্তকিছুই নির্ভর করে জনমতের চরিত্র, শক্তি এবং প্রভাবের উপর।

কোন দেশের শাসনব্যবস্থা কতটা গণতান্ত্রিক তাহা সেই দেশের জনমতের প্রভাব, শক্তি ও কার্যকারিতার উপর নির্ভর করে। যে দেশে জনমতের প্রভাব

5. "Under a democracy, public opinion becomes an active, propelling factor. The people regard the Government as a mere agency to which they have delegated power without releasing it from the obligation to obey orders."

— E. M. Sait.

যত বেশি, সেখানকার শাসনব্যবস্থা তত বেশি গণতান্ত্রিক। যেখানকার সরকার জনমতের উপর শ্রদ্ধাশীল এবং জনমতের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, সেখানে গণতন্ত্র অধিকতর পরিমাণে বিকাশ লাভ করে।

গণতন্ত্রে সরকারের চরিত্র ও প্রকৃতি বহুল পরিমাণে জনমতের উপর নির্ভরশীল। যে রাষ্ট্রে জনমত সতর্ক ও সচেতন নয় বা যেখানে জনমত গঠনের উপাদানগুলি যথেষ্ট শক্তিশালী নয়, সেখানকার সরকার সর্বদা জনকল্যাণমূলক নীতি অনুসরণ নাও করিতে পারে। আবার জাগ্রত ও প্রগতিশীল চিন্তাধারার বাহক হিসাবে যদি কোন জনমত আত্মপ্রকাশ করে, তবে তাহা সেখানকার সরকারের চরিত্রও কার্যাবলীকে জনকল্যাণ ও প্রগতিমূলক পথে পরিচালিত করিত পারে। সুতরাং সরকারের প্রকৃতি ও চরিত্র গঠনের ক্ষেত্রে জনমতের বিরাট অবদান রহিয়াছে।

পৃথিবীর ইতিহাস পর্যালোচনা করিয়া দেখানো যাইতে পারে যে, প্রবল জনমতের চাপে সরকার অনেক নীতি পরিবর্তিত করিতে বাধ্য হইয়াছেন। উদাহরণ হিসাবে ১৮৩২ সালের ইংলণ্ডের রাষ্ট্রীয় সংস্কার আইনের কথা উল্লেখ করিতে পারা যায়, যাহা প্রবল জনমতের চাপেই তদানীন্তন সরকার প্রবর্তন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ইদানীংকালে ভারতবর্ষেও 'বঙ্গ-বিহার সংযুক্তি' প্রস্তাব প্রবল জনমতের চাপে অবশেষে পরিত্যক্ত হইয়াছিল। সুতরাং দেখা যে, জনমত যদি সত্যি সত্যিই জনগণের লক্ষ্যণীয় অংশের সমর্থন লাভ করিয়া দানা বাঁধিয়া উঠিতে পারে তবে তাহা রাষ্ট্রীয় নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে প্রবল প্রভাব বিস্তারে সমর্থ হয়। গণশক্তি ও গণসমর্থনের উপর ভিত্তি করিয়াই গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা জনমত সম্পর্কে নীরব, নির্লিপ্ত ও নিরপেক্ষ থাকিতে পারে না। তাই গণতন্ত্রে শক্তিশালী, সতর্ক ও সচেতন জনমতের ভূমিকা যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ সেই বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নাই।

একবিংশ অধ্যায়

রাজনৈতিক দল

(Political Party)

নির্বাচকমণ্ডলী ও সরকারের মধ্যস্থানে অবস্থান করে রাজনৈতিক দল। নির্বাচকমণ্ডলীর ইচ্ছা অনুযায়ী সরকার গঠনের ব্যাপারে রাজনৈতিক দলগুলিই প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করে। গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার প্রসারণের ফলে রাজনৈতিক দল এবং দলীয় ব্যবস্থা ক্রমশই গুরুত্বপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। ক্ষমতাসীন দলের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য এবং আদর্শই সরকারের মধ্য দিয়া বাস্তবে রূপায়িত হয় বলিয়া রাজনৈতিক দল এবং ইহার আদর্শ সম্পর্কে নাগরিকেরা উদাসীন থাকিতে পারে না। জেনিংস বলিয়াছেন যে, বৃটিশ শাসনপদ্ধতির আলোচনা করিতে হইলে রাজনৈতিক দল লইয়াই আলোচনা আরম্ভ এবং শেষ করিতে হয় এবং ইহাদের মধ্যস্থানেও থাকে রাজনৈতিক দলেরই আলোচনা।[1] জেনিংসের এই বক্তব্য শুধুমাত্র বৃটেনের পক্ষেই নয়, পৃথিবীর যে কোন রাষ্ট্রের পক্ষেই প্রযোজ্য। আরও বলা যাইতে পারে যে, সোভিয়েত রাশিয়ার কমিউনিষ্ট দলের ভূমিকা উপলব্ধি করিতে না পারিলে সেখানকার শাসনব্যবস্থা সম্পর্কীয় ধ্যান-ধারণা পরিপূর্ণতা লাভ করিবে না। বস্তুত, প্রতিটি রাষ্ট্রের শাসনতান্ত্রিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং নৈতিক উন্নতি বা অবনতির ব্যাপারে রাজনৈতিক দলের অবদান বিরাট। বর্তমান যুগের রাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা এবং সমস্যা হইতে রাজনৈতিক দলগুলিকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না।

১॥ রাজনৈতিক দল কাহাকে বলে? (What is a Political Party ?)

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে বার্ক (Burke) রাজনৈতিক দলের সংজ্ঞা দিয়া বলিয়াছেন যে, কিছু সংখ্যক লোক যখন তাহাদের সমবেত চেষ্টার দ্বারা সার্বজনীন স্বার্থ ও কল্যাণ সাধনের উদ্দেশে কতকগুলি জাতীয়

1. "A realistic survey of British constitution to-day must begin and end with parties, discuss them at length in the middle." —Jennings

নীতি সম্বন্ধে একমত হইয়া সংঘবদ্ধ হয়, তখন তাহাকে রাজনৈতিক দল বলে।[2] সুতরাং বার্কের মতে জনকল্যাণ সাধন করাই রাজনৈতিক দলের উদ্দেশ্য। রাজনৈতিক দলের সংজ্ঞা প্রসঙ্গে ম্যাকআইভার বলিয়াছেন যে, কোন নীতি ও আদর্শের ভিত্তিতে সংঘবদ্ধ জনসমাজ, যাহা বৈধ উপায়ে শাসনক্ষমতা দখল করিতে চেষ্টা করে, তাহাকে রাজনৈতিক দল বলে।[3] সুতরাং বলা যায় যে, কোন রাষ্ট্রের জনসমাজের একটি লক্ষ্যণীয় অংশ যদি বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে ঐক্যমত হইয়া সংঘবদ্ধ হয় এবং সেই মত ও নীতি অনুযায়ী প্রচাকার্য চালাইয়া বৈধ উপায়ে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখলের চেষ্টা করে বা ক্ষমতা দখল করিয়া উহা পরিচালনা করে, তাহা হইলে জনসমাজের সেই সংঘবদ্ধ সংস্থাকে রাজনৈতিক দল বলা হয়। বার্কার বলিয়াছেন যে রাজনৈতিক দলগুলি যদিও এক একটি বিশেষ মতের ধারক, তবুও ইহারা সাধারণ জাতীয় স্বার্থের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া জাতীয় স্বার্থের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ কর্মসূচী উত্থাপন করিয়া নির্বাচকমণ্ডলীর অনুমোদন লাভে সচেষ্ট থাকে।

সুতরাং উপরোক্ত সংজ্ঞা অনুযায়ী রাজনৈতিক দল গঠন করিতে হইলে প্রথমত, জনগণের একটা লক্ষ্যণীয় অংশকে একটি বিশেষ নীতি ও আদর্শের ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ হইতে হইবে; দ্বিতীয়ত, জনগণের কল্যাণ সাধন করাই ইহাদের নীতি হইবে; তৃতীয়ত, ইহারা নিজেদের নীতি ও আদর্শকে জনগণের মধ্যে প্রচারের দ্বারা বৈধ উপায়ে শাসনক্ষমতা লাভের চেষ্টা করিবে; চতুর্থত, শাসনক্ষমতা দখল করিতে পারিলে দলীয় নীতি ও আদর্শকে সরকারের দ্বারা বাস্তবে রূপায়িত করিবে; এবং পঞ্চমত, ক্ষমতা লাভ করিতে না পারিলে বিরোধীদলের ভূমিকা পালন করিবে।

জনগণের কল্যাণ সাধনের নীতি ও পন্থা সম্পর্কে অনৈক্য থাকিবার জন্যই একটি রাষ্ট্রে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের আবির্ভাব ঘটে। সমস্ত রাজনৈতিক দল একই নীতি, আদর্শ ও কর্মপন্থায় বিশ্বাসী নহে—তাই এক একটি আদর্শ, নীতি ও কর্মপন্থাকে রূপদানের জন্য এক একটি রাজনৈতিকদলের উদ্ভব ঘটে।

2. "Party is a body of men united for promoting, by their joint endeavours the national interest upon some particular principle in which they are all agreed." —Burke

3. "We may define a political party as an association organised in support of some principle or policy which by constitutional means endeavours to make the determinant of Government." —MacIver

এইবার আমরা রাজনৈতিক দল সম্পর্কে মার্কসবাদী বিশ্লেষণ পর্যালোচনা করিতে পারি। কার্ল মার্কস এবং বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের অন্যান্য প্রবক্তরা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র দৃষ্টিকোণ হইতে রাজনৈতিক দলের সংজ্ঞা বিচার করিয়াছেন। তাঁহারা মনে করেন যে, সমাজে ব্যাপক অর্থনৈতিক অসাম্য থাকিবার জন্য পরস্পরবিরোধী স্বার্থসম্পন্ন বিভিন্ন শ্রেণী ও শ্রেণীস্বার্থ জন্মলাভ করে। প্রতিটি রাজনৈতিক দলই এক একটি শ্রেণী স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করে। এই দৃষ্টিকোণ হইতে বিচার করিলে রাজনৈতিক দলগুলিকে অর্থনৈতিক শ্রেণী-স্বার্থের প্রতিভূ হিসাবে দেখিতে হয়। উৎপাদনের উপাদানের মালিকানা যে শ্রেণীর হাতে কেন্দ্রীভূত থাকে তাহার স্বার্থ নিশ্চয়ই কোন প্রকার সম্পদহীন ব্যক্তি, যিনি শ্রমদানের পরিবর্তে কোন রকমে অন্নসংস্থান করিয়া জীবনধারন করেন, তাহার সমান হইতে পারে না। আরও পরিষ্কার করিয়া বলা যায় একটি দেশে জমিদার, কৃষক, মালিক, শ্রমিক প্রভৃতি বিভিন্ন অর্থ-নৈতিক শ্রেণী থাকিতে পারে। ফলে সেই দেশে বিভিন্ন শ্রেণীস্বার্থের উদ্ভব ঘটে। কোন একটি রাজনৈতিক দল জমিদার ও কৃষক—এই দুইটি পরস্পর-বিরোধী শ্রেণীস্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করিতে পারে না। বা মালিক ও শ্রমিক শ্রেণীর স্বার্থ একটি দল রক্ষা করিতে পারে না। অর্থাৎ পরস্পরবিরোধী শ্রেণী-সম্পন্ন সমাজে বিভিন্ন শ্রেণীর শ্রেণীস্বার্থ রক্ষার জন্য বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের আবির্ভাব অবশ্যম্ভাবী।

সুতরাং জনগণের কল্যাণ সাধনের নীতি ও পন্থা সম্পর্কে অনৈক্য থাকিবার জন্য বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের আবির্ভাব ঘটে না—বিভিন্নশ্রেণী স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করিবার তাগিদ হইতেই বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের আবির্ভাব ঘটে। এই প্রসঙ্গে আর একটি প্রশ্নও আলোচনা করা প্রয়োজন। ম্যাকআইভার বলিয়াছেন যে, রাজনৈতিক দল ক্ষমতালাভের জন্য সংবিধান-সম্মত বা বৈধ উপায়ে প্রচেষ্টা চালাইবে। এই মতবাদের সঙ্গেও মার্কসবাদী দৃষ্টি ভঙ্গীর পার্থক্য রহিয়াছে। মার্কসবাদীরা মনে করেন যে ক্ষমতাশীল শাসকশ্রেণী নিজেদের শাসন এবং শোষণের সুবিধার জন্য সংবিধান ও আইন রচনা করে। এই আইন ও সংবিধান মান্য করিয়া কোনদিনই কায়েমী স্বার্থের প্রতিভূ ক্ষমতাসীন দলকে ক্ষমতা হইতে বিতাড়িত করা যায় না। তাই শ্রমিক শ্রেণীর রাজনৈতিক দল সংবিধান বহির্ভূত উপায়ে ক্ষমতা দখলের প্রয়োজন দেখা দেয় বলিয়া মার্কস এবং তাহার সমর্থকেরা মনে করেন।

রাজনৈতিকদলের সংজ্ঞা প্রসঙ্গে আমরা গোষ্ঠী (Group) এবং উপদল (Faction) কাহাকে বলে এবং ইহাদের সঙ্গে রাজনৈতিক দলের প্রভেদই বা কি তাহা আলোচনা করিতে চাই। গণসমর্থনের দিক হইতে যদি একটি দল জনগণের লক্ষ্যণীয় অংশের সমর্থন লাভ করিতে না পারে তবে তাহাকে রাজনৈতিক দল না বলিয়া গোষ্ঠি বলা উচিত। এই দৃষ্টিতে বিচার করিলে ভারতবর্ষে মাত্র তিন চারিটি রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব আছে, বাকি সকলগুলি গোষ্ঠী। অপরপক্ষে একই আদর্শে বিশ্বাসী হইয়াও বিভিন্ন ব্যাপারে মত পার্থক্যের জন্য একটি রাজনৈতিক দলের মধ্যে বিভিন্ন উপদল থাকিতে পারে। উদাহরণ হিসাবে বলা যায় একসময় কংগ্রেসের মধ্যে সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসীরা উপদল হিসাবে কাজ করিত।

২ ॥ রাজনৈতিক দলের কার্য (Functions of Political Party)

লর্ড ব্রাইস বলিয়াছেন. নিজেদের নীতি প্রচার করা এবং নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করা এই তুইটি রাজনৈতিক দলের কার্য।[4] কিন্তু বর্তমানকালে রাজনৈতিক দলের কার্য্যাবলী শুধুমাত্র এই তুইটিতেই সীমাবদ্ধ নহে। গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় রাজনৈতিক দলের গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলীর অনেক প্রসার ঘটিয়াছে। রাজনৈতিক দলের মৌলিক ও গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলী নিম্নে আলোচনা করা হইল।

প্রথমত, রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব ও কার্যাবলীই গণতন্ত্রে প্রাণসঞ্চার করিয়া থাকে। ফাইনারকে অনুসরণ করিয়া বলা যায় যে, গণতন্ত্র ইহার আশা ও নিরাশা লইয়া দলীয়ব্যবস্থার উপর নির্ভরশীল থাকে। দলীয় ব্যবস্থাই রাজনৈতিক মাধ্যাকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু।[5]

দ্বিতীয়ত, রাজনৈতিক দলগুলি দেশের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থ নৈতিক ও বৈদেশিক সমস্যাগুলি পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ করিয়া নিজ নিজ দলীয় দৃষ্টিকোণ হইতে উহার সমাধানের নির্দেশ জনগণের সম্মুখে উপস্থিত করে। এই সমস্ত সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতেই রাজনৈতিক দলগুলি নিজস্ব দলীয় নীতি ও কর্মসূচী স্থির করে এবং ইহার অনুকূলে জনমত গঠনের জন্য বিভিন্ন উপায়ে প্রচেষ্টা চালায়।

---

4. Parties have two main functions, the promotion by argument of their principles and the carrying of elections.„ —Bryce

5. "(Democracy) rests, in its hopes and doubts upon the party system. There lies political centre of gravity." —Finer

তৃতীয়ত, সভা-সমিতি, আলোচনা, পুস্তক, প্রচারপত্র প্রভৃতির মাধ্যমে উপরোক্ত নীতি ও কর্মপদ্ধতির ব্যাপক প্রচারের ভিতর দিয়া রাজনৈতিক দলগুলি জনগণের রাজনৈতিক শিক্ষা ও চেতনার মান উন্নত করে। জনগণের রাজনৈতিক শিক্ষা ও জ্ঞান ব্যতীত গণতন্ত্র সফল হইতে পারে না। রাজনৈতিক দলগুলিই জনগণের ঔদাসীন্য দূর করিয়া তাহাদিগকে রাজনৈতিক চেতনার দ্বারা উদ্বুদ্ধ করে।

চতুর্থত, উপরোক্ত কার্যাবলীর ভিতর দিয়া রাজনৈতিক দলগুলি জনমত সৃষ্টি করে। সরকার কর্তৃক শাসন পরিচালনা ও রাষ্ট্রীয় নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে জনমতের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। চূড়ান্ত স্বেচ্ছাচারী সরকারও জনমত অগ্রাহ্য করিতে সাহস পায় না। রাজনৈতিক দলগুলিই বিভিন্ন মতাদর্শগত পার্থক্য উপস্থিত করিয়া এবং দেশের বিভিন্ন সমস্যার ক্ষেত্রে উহা সমাধানের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত প্রদান করিয়া জনমত সৃষ্টি করে। লাওয়েল (Lowell) বলিয়াছেন যে, বিভিন্ন ব্যাপারে জনমত গঠন করা এবং জনমতকে তুলিয়া ধরা রাজনৈতিক দলের কার্য্য এবং ইহার জন্যই রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব।[6]

পঞ্চমত, রাজনৈতিক দলের আর একটি উল্লেখযোগ্য কার্য হইতেছে এই যে, রাজনৈতিক দলগুলি সরকারের ব্যর্থতা ও ভ্রান্ত নীতির তীব্র সমালোচনা করিয়া উহা সংশোধনের পথ প্রশস্ত করে, সরকারে অধিষ্ঠিত দলের স্বেচ্ছাচারিতা রোধ করে এবং রাষ্ট্রতরীকে সঠিক পথে পরিচালিত করিতে সাহায্য করে।

ষষ্ঠত, দেশের সাধারণ নির্বাচনের সময় দলীয় প্রার্থী মনোনয়ন করা, দলীয় নীতির ভিত্তিতে ভোটারদের সমর্থন প্রার্থনা করা, ভোটারদের ভোটদানে উৎসাহিত করা, প্রভৃতি উপায়ে রাজনৈতিক দলগুলি ভোটারদের কর্তব্য পালনে ও নির্বাচন পরিচালনায় সাহায্য করে।

সপ্তমত, যে রাজনৈতিক দল নির্বাচনে জয়ী হইয়া শাসনক্ষমতা লাভ করে, দলীয় আদর্শ নীতির ভিত্তিতে সরকার পরিচালনা করাও সেই রাজনৈতিক দলের অন্যতম কার্য। নির্বাচনে জয় লাভ করিতে না পারিলে দায়িত্বশীল বিরোধীপক্ষ

6. "Their essential function and the true reason for their existence is bringing public opinion to a focus and framing issues for the popular verdict."
—Lowell.

হিসাবে শাসকদলের অন্যায় ও অবিচারের বিরোধীতা করিয়া সরকারকে জনকল্যাণে বাধ্য করাও রাজনৈতিক দলের কার্য।

৩॥ দলীয়ব্যবস্থার সাফল্যের শর্ত (Conditions of success of Party system)

দলীয় ব্যবস্থার সাফল্যের উপর গণতন্ত্রের স্থায়িত্ব ও সাফল্য বহুলাংশে নির্ভর করে। দলীয় ব্যবস্থা যাহাতে ক্লেদাক্ত ও দুর্নীতিপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টির পরিবর্তে সুস্থ, স্বাভাবিক ও গণতান্ত্রিক পরিবেশ সৃষ্টি করিয়া সফল হইতে পারে, তাহার জন্য কয়েকটি শর্ত বিশেষভাবে প্রতিপালিত হওয়া প্রয়োজন। প্রথমত, রাজনৈতিক দলগুলির ভিতর সহিষ্ণুতা থাকা আবশ্যক। গণতন্ত্রে একাধিক রাজনৈতিক দল থাকে এবং প্রতিটি দলই নিজ নিজ নীতি ও কর্মপন্থা কার্যকরী করিতে যাইয়া অন্য দলগুলির বিরোধিতার সম্মুখীন হয়। এমতাবস্থায় রাজনৈতিক দলগুলির যদি সহিষ্ণুতা না থাকে তবে দেশে চরম অরাজকতা সৃষ্টি হয় এবং ইহার ফলে দলীয়ব্যবস্থা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। সুতরাং রাজনৈতিক দলগুলির সহিষ্ণুতা দলীয় সাফল্যের জন্য একান্ত অপরিহার্য। দ্বিতীয়ত, সরকারী উচ্চপদস্থ কর্মচারী এবং আমলাদের নিরপেক্ষ ও নৈর্ব্যক্তিকভাবে রাষ্ট্রের সেবা করা প্রয়োজন। ইহারা যদি কোন বিশেষ দলের প্রতি পক্ষপাতিত্ব করিয়া উহাকে অধিক সুযোগ-সুবিধা ও আনুকূল্য প্রদর্শন করে, তবে দলীয় ব্যবস্থা সফল হইতে পারে না। তৃতীয়ত, রাজনৈতিক দলগুলি যাহাতে সামরিক শক্তিতে বলীয়ান হইয়া উঠিতে না পারে, তাহাও দলীয় ব্যবস্থার সাফল্যের আর একটি শর্ত। কারণ এইরূপ ক্ষেত্রে দলগুলির ভিতরকার সুস্থ ও নীতিগত সংগ্রামের মাধ্যমে ক্ষমতা অধিকারের প্রচেষ্টা পরিত্যক্ত হইয়া সামরিক উপায়ে ক্ষমতা লাভের চেষ্টা লক্ষ্য সুরু হইবে। ইতালির ফ্যাসিস্ট ও জার্মানির নাৎসীদলের কার্যাবলীই ইহার প্রমাণ। চতুর্থত, রাজনৈতিক দলগুলি যাহাতে আঞ্চলিকতা, সাম্প্রদায়িকতা প্রভৃতি সংকীর্ণতার উর্ধ্বে উঠিয়া দেশের সামগ্রিক কল্যাণে নিজেদের নিয়োজিত করিতে পারে, তাহাও একান্ত অপরিহার্য। পঞ্চমত, দলীয় ব্যবস্থার সাফল্যের প্রধান শর্ত হইতেছে উপযুক্ত দলীয় নেতৃত্ব। দলগুলির নেতারা যদি উদার, সহিষ্ণু, ব্যক্তিত্বপূর্ণ, বিবেচক ও মানবতাবাদী না হন, তবে দলগুলির ভ্রান্ত পথে পরিচালিত হইবার সম্ভাবনা দেখা যায়। অনেক সময় আদর্শ নীতির

পৃষ্ঠপোষক হইয়াও যোগ্য নেতৃত্বের অভাবে রাজনৈতিক দল সাফল্য লাভ করিতে পারে না। সেইজন্যই রাজনৈতিক দলগুলির যোগ্য নেতৃত্বের উপর দলীয় ব্যবস্থার সাফল্য বহুলাংশে নির্ভর করে।

৪॥ রাজনৈতিক দলের গুণাগুণ (Merits and Demerits of Political Party)

বর্তমান যুগে দলীয় ব্যবস্থার উপর শাসনব্যবস্থা নির্ভরশীল এবং দলগুলিই শাসনব্যবস্থার মধ্যমণি। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে, দলীয় ব্যবস্থার যেমন উপযোগিতা এবং সুবিধা আছে, তেমনি ইহার কতকগুলি ত্রুটিও আছে। নিম্নে রাজনৈতিক দলীয় ব্যবস্থার গুণাগুণ আলোচনা করা হইল।

গুণ : সংসদীয় শাসনব্যবস্থায় রাজনৈতিক দল অপরিহার্য। সংসদীয় বা প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রে আইনসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দল সরকার গঠন করে বলিয়া রাজনৈতিক দল না থাকিলে সংসদীয় গঠনতন্ত্র চলিতে পারে না। সুতরাং সংসদীয় শাসনব্যবস্থায় রাজনৈতিক দল মন্ত্রিপরিষদকে স্থায়িত্ব দান করে। দ্বিতীয়ত, বিচ্ছিন্ন ও অসংবদ্ধ জনগণের পক্ষে রাজনৈতিক ব্যাপারে কোন সুনির্দিষ্ট জনমত সৃষ্টি ও প্রকাশ করা সম্ভব নয়। রাজনৈতিক দলগুলিই নিজ নিজ নীতি ও বিভিন্ন মতাদর্শগত পার্থক্য উপস্থিত করিয়া এবং দেশের বিভিন্ন সমস্যা ও উহার সমাধানের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত প্রদান করিয়া প্রত্যক্ষভাবে জনমত সৃষ্টি করে। তৃতীয়ত, বিভিন্ন সভা-সমিতি, আলোচনা, পুস্তক, প্রচার-পত্র প্রভৃতির মাধ্যমে রাজনৈতিক দলগুলি নিজেদের নীতি ও কর্মপন্থার ব্যাপক প্রচারের ভিতর দিয়া জনগণের রাজনৈতিক শিক্ষা ও চেতনার মান উন্নত করে। জনগণের রাজনৈতিক শিক্ষা, ও জ্ঞান ও চেতনা না থাকিলে সংসদীয় গণতন্ত্র চলিতে পারে না। রাজনৈতিক দলই জনগণের ঔদাসীন্য দূর করিয়া তাহাদিগকে রাজনৈতিক চেতনার দ্বারা উদ্বুদ্ধ করে। চতুর্থত, সরকারে অধিষ্ঠিত দলের ভ্রান্ত নীতি ও ব্যর্থতার তীব্র সমালোচনার দ্বারা দলীয় ব্যবস্থা রাষ্ট্রকে সঠিক পথে পরিচালিত করিতে সাহায্য করে। ইহা ছাড়াও উপরোক্ত পন্থায় দলীয় ব্যবস্থা সরকার পরিচালনকারী সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের স্বেচ্ছাচারিতা রোধ করিতে পারে। পঞ্চমত, আইনবিভাগ ও শাসনবিভাগের মধ্য সমন্বয় সাধনের দ্বারা সুষ্ঠুভাবে সরকারের কার্যপরিচালনার ক্ষেত্রে দলীয় ব্যবস্থার দান অনস্বীকার্য। দলীয় ব্যবস্থা না থাকিলে আইনবিভাগ ও শাসনবিভাগের

মধ্যে যোগসূত্র ক্ষীণ হইয়া পড়ে এবং ইহার ফলে শাসনের ক্ষেত্রে অচলাবস্থা সৃষ্টি হয়। যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় রাষ্ট্রপ্রধানের সঙ্গে আইনসভার যোগসূত্রও দলীয় ব্যবস্থার জন্যই রক্ষিত হইতে পারে।

ত্রুটি: দলীয় ব্যবস্থার উপরোক্ত সুবিধা ও উপযোগিতা থাকা সত্ত্বেও মনে রাখিতে হইবে যে, দলীয় ব্যবস্থা অবিমিশ্র আশীর্বাদ নয়, ইহার কতকগুলি অসুবিধাও রহিয়াছে। (১) দলীয় ব্যবস্থা একদিকে যেমন গণতন্ত্রে বিকাশের সহায়ক, তেমনি রাজনৈতিক দলের অত্যধিক ক্ষমতার লোভ গণতন্ত্রকে বিপন্ন করিয়া তোলে। প্রথমত মহাযুদ্ধের পর ইউরোপের কয়েকটি দেশে যে একনায়কতন্ত্রের অভ্যুত্থান ঘটিয়াছিল, ইহার মূলে রহিয়াছে দলীয় ব্যবস্থার ব্যর্থতা ও দুর্বলতা। (২) দলীয় ব্যবস্থার ফলে সরকার গঠনকারী দলের সর্বোচ্চ নেতারা সরকারের অধিষ্ঠিত না থাকিয়াও সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকারী হইয়া উঠেন এবং ইহার ফলে মন্ত্রিসভার ক্ষমতা ও আইনসভার গুরুত্ব বহুলাংশে লোপ পায়। এইরূপ হইবার ফলে দলের সর্বোচ্চ নেতৃত্বের সিদ্ধান্তকে আইনসঙ্গত রূপ দিবার জন্য আইনসভাকে একটি যন্ত্রহিসাবে ব্যবহার করা হয় এবং সেই জন্যই আইনসভার বিতর্ক, আলোচনা ও সমগ্র কার্যাবলীই অর্থহীন হইয়া দাঁড়ায়। (৩) অনেক সময় দেখা যায় যে, রাজনৈতিক দলগুলি দেশের সর্বাঙ্গীন কল্যাণ অপেক্ষা দলীয় স্বার্থকে অধিক গুরুত্ব দেয় বলিয়া দলের স্বার্থে অনেক জনস্বার্থবিরোধী নীতি দলীয় অনুশাসনের দ্বারা গৃহীত হয়। (৪) রাজনৈতিক দলগুলি ক্ষমতা অধিকার ও উহা রক্ষা করিবার জন্য নানাপ্রকার স্বজনপোষণ নীতিও দুর্নীতির আশ্রয় গ্রহণ করিয়া দেশের সুস্থ পরিবেশকে দূষিত করিয়া তোলে এবং জনগণের ব্যাপক নৈতিক অবনতি ঘটায়। বিশেষ করিয়া নির্বাচনে জয়লাভ করিবার জন্য রাজনৈতিক দলগুলি যে পন্থা ও কৌশল গ্রহণ করে তাহা দেশের নৈতিক আবহাওয়াকে কলুষিত ও দূষিত করে এবং দেশে হিংসা ও বিদ্বেষের জন্ম দেয়। (৫) অনেক যোগ্য ও পারদর্শী ব্যক্তি কঠোর দলীয় অনুশাসন মানিতে প্রস্তুত নহেন বলিয়া কোন রাজনৈতিক দলে যোগদান করেন না। কিন্তু দলীয় অবস্থায় রাজনৈতিক দলই সরকার গঠন বা রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে বলিয়া যোগ্যতা ও দক্ষতা থাকা সত্ত্বেও এই সমস্ত দলহীন ব্যক্তি রাষ্ট্রনৈতিক ব্যাপারে বিশেষ কোন অংশ গ্রহণ করিতে পারেন না। (৬) দলীয় ব্যবস্থায় কঠোর দলীয় অনুশাসন থাকিবার ফলে দলভুক্ত

সভ্যদের স্বাভাবিক চিন্তাশক্তি ও ব্যক্তিত্বের যথোপযুক্ত প্রকাশ ও বিকাশ লাভ ঘটিতে পারে না।

দলীয় ব্যবস্থার এই সমস্ত ত্রুটি ও অসুবিধা থাকা সত্ত্বেও ইহা অপরিহার্য। জনগণকে ব্যাপকভাবে রাজনৈতিক চেতনার দ্বারা সমৃদ্ধ করিতে পারিলে সুস্থ ও জাগ্রত জনমত দলীয় ব্যবস্থার এই সমস্ত ত্রুটি রোধ করিতে পারে।

৫ ॥ একদলীয়, দ্বি-দলীয় এবং বহুদলীয় ব্যবস্থা (One Party, Bi-Party and Multi Party system)

এতক্ষণ আমরা যে আলোচনা করিয়াছি তাহার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত করা যায় যে, প্রতিনিধিত্বমূলক শাসনব্যবস্থায় (Representative Government) গণতন্ত্র রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব অপরিহার্য। কিন্তু এখন প্রশ্ন হইল প্রতিনিধিমূলক শাসনব্যবস্থার জন্য একদলীয়, দ্বি-দলীয় এবং বহুদলীয় ব্যবস্থার মধ্যে কোনটি উপযোগী? নিম্নে আমরা উপরোক্ত তিনটি দলীয় ব্যবস্থাকে স্বতন্ত্রভাবে পর্যালোচনা করিতেছি।

একদলীয় ব্যবস্থা (One Party system): যে সমস্ত রাষ্ট্রে বিধিবদ্ধভাবে একটিমাত্র রাজনৈতিক দল থাকে তাহাকে একদলীয় ব্যবস্থা বলা হয়। প্রথম মহাযুদ্ধের পর সংসদীয় (Parliamentary) শাসনব্যবস্থায় চরম ব্যর্থতার ফলে ইউরোপের কয়েকটি দেশে একদলীয় শাসনব্যবস্থা ও একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠা লাভ করে। প্রসঙ্গত জার্মানী ও ইটালীর নাম উল্লেখ করা যায়। ১৯১৭ সালে বলশেভিক বিপ্লবের পর সোভিয়েত ইউনিয়নেও অন্য দলকে বিলুপ্ত করিয়া একমাত্র কমিউনিস্ট দলকে স্বীকৃতি দেওয়া হয় এবং একদলীয় শাসনব্যবস্থা প্রবর্তিত করা হয়। আধুনিক কালে কয়েকটি রাষ্ট্রে একদলীয় শাসনের প্রবণতা লক্ষ্য করা যাইতেছে।

একদলীয় শাসনব্যবস্থার স্বপক্ষে বলা হইয়া থাকে যে, একাধিক দলের অস্তিত্ব কৃত্রিম বিভেদ ও দলাদলী সৃষ্টি করিয়া জাতীয় শক্তি ও সংহতি নষ্ট করে, কিন্তু একদলীয় ব্যবস্থায় এইরূপ হয় না। দ্বিতীয়ত, একদলীয় ব্যবস্থা সুদৃঢ় জাতীয়তাবোধ জাগ্রত করিয়া জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠা করে। তৃতীয়ত, একদলীয় ব্যবস্থায় কর্মদক্ষতার সঙ্গে শাসন পরিচালনা ও দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ সম্ভবপর। চতুর্থত, এই শাসনব্যবস্থায় সুনির্দিষ্ট নীতির সাহায্যে দেশের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি করা যায়।

পাশ্চাত্য গণতন্ত্রের প্রবক্তাগণ একদলীয় ব্যবস্থার তীব্র সমালোচনা করিয়া বলিয়াছেন যে, দলব্যবস্থা ব্যতীত গণতন্ত্র চলিতে পারে না। কারণ দলব্যবস্থা প্রচলিত না থাকিলে দেশের বিভিন্ন মত ও পথ প্রকাশ লাভ করিতে পারে না এবং রাষ্ট্রীয় শাসনের ক্ষেত্রে জনগণের সম্মুখে গ্রহণযোগ্য বিকল্প কোন নীতি বা কর্মপন্থা উপস্থিত করা যায় না। সুতরাং গণতন্ত্রে দলীয় ব্যবস্থা একান্ত অপরিহার্য। দ্বিতীয়ত, বলা হইয়া থাকে যে, একদলীয় শাসনব্যবস্থায় দলীয় একনায়কতন্ত্র ও স্বেচ্ছাচারিতা প্রতিষ্ঠিত হয়। তৃতীয়ত, একদলীয় ব্যবস্থা মানুষের চিন্তা, স্বাধীনতা ও ব্যক্তিত্ব বিকাশের পরিপন্থী।

প্রসঙ্গত সোভিয়েত ইউনিয়নের একদলীয় শাসনব্যবস্থা প্রবর্তকদের মত উল্লেখ করা যাইতে পারে। তাঁহাদের মতে পাশ্চাত্য ধনতান্ত্রিক গণতন্ত্রে আদর্শ স্বাধীনতা ও অর্থনৈতিক সাম্য নাই। অর্থনৈতিক সাম্য ও সমানাধিকার না থাকিলে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। তাঁহারা মনে করেন যে, ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে পরস্পর স্বার্থবিরোধী একাধিক শ্রেণী থাকায় সেখানে একাধিক রাজনৈতিক দল আছে। কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়নে জনগণের সমস্ত অংশের স্বার্থ অভিন্ন হওয়ায় একটিমাত্র স্বার্থের প্রতিভূ হিসাবে একটিমাত্র দলঅবস্থান করিতেছে।

দ্বিদলীয় ব্যবস্থা (Bi-Party system): যে-রাষ্ট্রে রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রে মূলত দুইটি রাজনৈতিক দল অবস্থান করে তাহাকে দ্বিদলীয় ব্যবস্থা বলে। এই সমস্ত রাষ্ট্রে আরও দুই-একটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল থাকিতে পারে, কিন্তু তাহাদের কোনরূপ বাস্তব গুরুত্ব বা ভূমিকা না থাকার জন্য কার্যত দুইটি দলই প্রাধান্য লাভ করায় দ্বিদলীয় ব্যবস্থার সৃষ্টি হয়। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ও ইংলণ্ডে কার্যত দ্বিদলীয় ব্যবস্থা প্রচলিত। আমেরিকায় মূলত রিপাবলিকান (Republican) এবং ডেমোক্র্যাটিক (Democratic) এই দুইটি দল আছে। আমেরিকাতে আরও দুই-একটি ছোট ছোট দল আছে। কিন্তু নির্বাচন এই দুইটি দলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। বৃটেনে পূর্বে রক্ষণশীল (Conservative) এবং উদারনৈতিক (Liberal) এই দুইটি দল ছিল। বর্তমানে উদারনৈতিক দলের বিশেষ কোন অস্তিত্ব নাই, তাহার স্থান দখল করিয়াছে শ্রমিকদল (Labour Party)। বৃটেনেও রাজনৈতিক দল বলিতে তাই রক্ষণশীল ও শ্রমিকদলকে বুঝায়। দ্বিদলীয় শাসনব্যবস্থার স্বপক্ষে ল্যাস্কি বলিয়াছেন, যে শাসনব্যবস্থায় দুইটি বৃহৎ দলের পরস্পরবিরোধী চিন্তাধারায়

যত বেশি প্রকাশ ঘটিবে, সেই শাসনব্যবস্থাই তত বেশি সন্তোষজনক।[7] কারণ হিসাবে বলা যায়: (১) দ্বিদলীয় ব্যবস্থায় একটি দল একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করিতে সক্ষম হয় বলিয়া এই ব্যবস্থায় নির্দিষ্ট সময়ের জন্য স্থায়ী মন্ত্রিসভা গঠন করা সম্ভব। (২) দ্বিদলীয় ব্যবস্থায় নির্বাচকমণ্ডলী সহজে প্রতিনিধি নির্বাচন করিতে পারে। কিন্তু বহুদলীয় প্রথায় বিভিন্ন দলীয় প্রার্থী এবং বিভিন্ন দলের নীতি ও কর্মপদ্ধতি জনগণের সম্মুখে উপস্থিত হইবার ফলে জনগণ বিভ্রান্ত হয় এবং তাহাদের পক্ষে প্রতিনিধি নির্বাচন করা কঠিন হয়। (৩) বহুদলীয় ব্যবস্থায় কোন এক দলের একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করিতে না পারার সম্ভাবনা থাকে, এইরূপ অবস্থায় বহুদলের সমর্থনে যে সরকার গঠিত হয় তাহার কোন সুনির্দিষ্ট নীতি, একতা ও কর্মদক্ষতা থাকিতে পারে না। দ্বিদলীয় ব্যবস্থায় ইহা ঘটিবার আশঙ্কা না থাকায় কর্মদক্ষ, একতাবদ্ধ ও সুনির্দিষ্ট নীতি গ্রহণকারী সরকার গঠিত হয়।

দ্বিদলীয় ব্যবস্থার সমালোচনা করিয়া বলা হইয়া থাকে যে. এই ব্যবস্থায় জনগণের বিভিন্ন মত ও বক্তব্য প্রতিফলিত হইতে পারে না। উদাহরণ হিসাবে বলা যাইতে পারে যে, ইংলণ্ডের রক্ষণশীল ও শ্রমিকদলের মৌলিক নীতির ভিতর খুব বেশি গুণগত এবং মূলগত প্রভেদ নাই। সুতরাং সেখানে যাহারা উক্ত দল দুইটির কোনটির নীতিকে সমর্থন করে না. তাহাদের পক্ষে কার্যত বিকল্প কোন নীতির সমর্থক সরকার প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। দ্বিদলীয় ব্যবস্থায় বিভিন্ন মতকে প্রতিফলিত করিবার এই সীমাবদ্ধতার জন্যই এই ব্যবস্থাকে তীব্র সমালোচনা করা হয়। ইহা ছাড়াও মনে রাখা প্রয়োজন যে, দ্বি-দলীয় ব্যবস্থায় ক্ষমতাধীন দল আইনসভায় চরম সংখ্যাগরিষ্ঠতা (absolute majority) লাভ করে বলিয়া মন্ত্রিসভার একনায়কত্ব ও কায়েমী স্বার্থ প্রতিষ্ঠার পথ সুগম হয়।

বহুদলীয়ব্যবস্থা (Multi-Party system): যে রাষ্ট্রের রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রে মোটামুটিভাবে শক্তিশালী কয়েকটি রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব থাকে, তাহাকে বহুদলীয় ব্যবস্থা বলা হয়। বহুদলীয় ব্যবস্থার উদাহরণ ফ্রান্স, ইটালী, ভারতবর্ষ প্রভৃতি দেশ। দলীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রথম পর্যায়ে অনুন্নত দেশে বহুদলীয় ব্যবস্থা লক্ষ্য করা যায়। পরবর্তীকালে রাষ্ট্রনৈতিক

7. (Political system) "is more satisfactory the more it is able to express itself through the antithesis of two great parties." —Laski

অস্থিরতা স্তিমিত হইলে ছোট ছোট দলগুলি নিশ্চিহ্ন হইয়া যায় এবং প্রধান দুই-তিনটি দলই দানা বাঁধিয়া উঠে। যাহাই হউক, পৃথিবীর বেশির ভাগ দেশেই বর্তমানে বহুদলীয় ব্যবস্থা লক্ষ্য করা যায়। বহুদলীয় ব্যবস্থার স্বপক্ষে বলা যাইতে পারে যে, এই ব্যবস্থায় বিভিন্ন মত প্রতিফলিত হয় বলিয়া জনগণের পক্ষে ইচ্ছানুযায়ী প্রার্থী বাছাই করা সম্ভব। দ্বিতীয়ত, সর্বপ্রকার মত ও পথের প্রতিফলন ঘটে বলিয়া বহুদলীয় ব্যবস্থা অনেক বেশি গণতান্ত্রিক। তৃতীয়ত, বহুদলীয় ব্যবস্থায় সাধারণত কোন দলই আইনসভায় চরম সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করিতে পারে না। ফলে, এই ব্যবস্থায় সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের স্বেচ্ছাচার করিবার সুযোগ কম থাকে। চতুর্থত, বহুদলীয় ব্যবস্থায় জাতীয় সমস্যাগুলিকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ হইতে পর্যালোচনা করা এবং সমাধানের ইঙ্গিত দান করা সম্ভব।

বহুদলীয় ব্যবস্থার স্বপক্ষে যে-সমস্ত যুক্তি উত্থাপিত হইয়াছে তাহার যথেষ্ট গুরুত্ব আছে সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও মনে রাখিতে হইবে, বহুদলীয় ব্যবস্থা মানেই বহুদলীয় সরকার। তাই বহুদলীয় ব্যবস্থায় বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই কোন একটি দল একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন না করিতে পারিবার ফলে সম্মিলিত (coalition) মন্ত্রিসভা গঠন করিতে হয় বলিয়া সুনির্দিষ্ট নীতির ভিত্তিতে দ্রুত, কর্মদক্ষ ও স্থায়ী শাসন পরিচালনা করা সম্ভব হয় না। ফলে, বহুদলীয় ব্যবস্থার জন্য বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই মন্ত্রিসভা অস্থায়ী ও ক্ষণভঙ্গুর হয়।

দ্বি-দলীয় এবং বহুদলীয় ব্যবস্থার মধ্যে কোনটি গ্রহণযোগ্য সেই বিষয়ে কোন সহজ উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়। ইংলণ্ড ও আমেরিকায় দ্বি-দলীয় ব্যবস্থা সাফল্য লাভ করিয়াছে। অপরপক্ষে ফ্রান্স, ইটালী, পশ্চিম জার্মানী প্রভৃতি দেশে বহুদলীয় ব্যবস্থা রহিয়াছে এবং তাহাও ব্যর্থ হইয়াছে বলা যায় না। তবে স্থায়িত্ব, দক্ষতা এবং সরলতার জন্য দ্বি-দলীয় ব্যবস্থাই অধিকতর উপযোগী বলিয়া ল্যাস্কি প্রভৃতি অনেকে মনে করেন।

দ্বাবিংশ অধ্যায়

রাষ্ট্রের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও কর্মপরিধি

(End, purpose and sphere of the state)

রাষ্ট্র কাহাকে বলে, রাষ্ট্রের উৎপত্তি কি ভাবে ঘটিয়াছে, রাষ্ট্রের প্রকৃতিই বা কি ইত্যাদি বিষয় এবং রাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে আমরা আলোচনা শেষ করিয়াছি। কিন্তু এই পুস্তক সমাপ্ত করিবার পূর্বে রাষ্ট্রের লক্ষ্য, কি উদ্দেশ্য সাধনের জন্য রাষ্ট্রের অস্তিত্ব এবং উপরোক্ত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সাধনের জন্য রাষ্ট্রের কার্যের পরিধি কতটা হওয়া উচিত এই বিষয়ের আলোচনা করা প্রয়োজন। বস্তুত, রাষ্ট্রের লক্ষ উদ্দেশ্য এবং কর্মপরিধি সম্পর্কে আলোচনা ব্যতীত রাষ্ট্র সম্পর্কে কোন আলোচনাই পরিপূর্ণ হইতে পারে না। বর্তমান অধ্যায়ে আমরা এই আলোচনাই উপস্থিত করিলাম।

১ ॥ রাষ্ট্রের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য (End and Purpose of the State)

আমরা রাষ্ট্রীয় জীবন যাপন করি, রাষ্ট্রীয় সংগঠনের মাধ্যমে আমাদের কার্য্য, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সাধনের চেষ্টা করি। কিন্তু প্রথমেই প্রশ্ন দেখা দেয় এই লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য কি ? কোন লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য সাধনের জন্য রাষ্ট্রীয় সংগঠনের অস্তিত্ব ঘটিয়াছে ?

প্রাচীনকালে গ্রীক্ এবং রোমানরা মনে করিত যে রাষ্ট্রের স্বতন্ত্র কোন লক্ষ্য নাই—রাষ্ট্র আপনাতেই আপনি পরিপূর্ণ (The state is an and in itself)। আরও পরিস্কার করিয়া বলা যায় যে, তাহারা মনে করিতেন রাষ্ট্র কোন লক্ষ্য সাধনের উপায় নহে (the state is not a means to an end), রাষ্ট্র নিজেই নিজের লক্ষ্য। ইহাদের এই বক্তব্যের যুক্তিসঙ্গত পরিণতি হিসাবে বলা যায় ব্যক্তি বা সমষ্টির জন্য রাষ্ট্রের কিছু করণীয় নাই, কারণ রাষ্ট্রের কোনও লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য নাই। অর্থাৎ ব্যক্তির অস্তিত্ব রাষ্ট্রের জন্য, রাষ্ট্রের অস্তিত্ব ব্যক্তির জন্য নয়।

অল্প কথায় রাষ্ট্রের লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্যকে সুন্দরভাবে ব্যক্ত করিয়া আরিস্টটল বলিয়াছেন যে মানুষের জীবন সুন্দর করিয়া তোলার জন্যই রাষ্ট্রের অস্তিত্ব (the state exists to promote good life)। মানবসমাজের কল্যানসাধনের ব্যাপক পরিবেশ সৃষ্টির মধ্য দিয়াই মানুষের সুন্দর জীবন রচিত হয়। তাই বলা যায় যে, মানবসমাজের কল্যানসাধনের ব্যাপক পরিবেশ সৃষ্টি করাই রাষ্ট্রের লক্ষ্য। সেইজন্য রাষ্ট্রের মৌলিক উদ্দেশ্য হিসাবে বলা যায় যে, জনগণের মধ্যে শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখিয়া প্রত্যেককে এমন অধিকার ভোগ করিতে দেওয়া, যাহাতে সকলে নিজ নিজ অন্তর্নিহিত শক্তি অনুসারে পরিপূর্ণভাবে বিকশিত হইতে পারে। এই উদ্দেশ্যে ও লক্ষ্যে পৌছিবার জন্য প্লেটো হইতে শুরু করিয়া আজ পর্যন্ত বহু রাষ্ট্রবিজ্ঞানী বিভিন্ন পন্থার নির্দেশ দিয়াছেন।

যাহাই হউক রাষ্ট্রের প্রকৃত লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য কি হওয়া উচিত এ ব্যাপারে পরস্পর বিরোধী দুইটি মতবাদের অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায়। একদল মনে করেন যে, ব্যক্তি জীবনের বিকাশের জন্য রাষ্ট্রীয় ক্রিয়াকর্মকে সীমিত রাখিয়া ব্যক্তির স্বাধীনতাকে প্রসারিত করা উচিত এবং রাষ্ট্র শুধুমাত্র ব্যক্তিজীবনের বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় পরিবেশ রচনা করিবার দায়িত্বলাভ করিবে। ইহারা রাষ্ট্রকে একটি অকল্যানকর প্রতিষ্ঠান হিসাবে অভিহিত করিতেও দ্বিধা করেন নাই। অপর পক্ষে রাষ্ট্রীয় কর্ম পরিধিকে প্রসারিত করিয়া ব্যক্তি স্বাধীনতা ও ব্যক্তির কর্মধারাকে সঙ্কুচিত করিবার প্রয়োজনীয়তা কথা বলা হইয়াছে। ইহার স্বপক্ষে যুক্তি হিসাবে প্রথমত বলা হইয়াছে যে, রাষ্ট্রীয় কর্ম পরিধিকে প্রসারিত করিয়াই জনগনের অধিকতর কল্যান সাধন সম্ভব এবং দ্বিতীয়ত, অপর একটি দৃষ্টকোন হইতে রাষ্ট্রীয় কর্ম পরিধিকে প্রসারিত করার কথা বলা হইয়াছে এই কারনে যে, ব্যক্তির অস্তিত্ব রাষ্ট্রের জন্য, সুতরাং রাষ্ট্র তাহার উদ্দেশ্য যাহাতে পালন করিতে পারে তাহার জন্য তাহার ব্যাপক ক্ষমতা থাকা প্রয়োজন।

প্লেটো (plato) এবং আরিষ্টটলের মতে নাগরিকদের সামাজিক, নৈতিক মানসিক ও অর্থনৈতিক উন্নতিসাধন করাই রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য। ফলে গ্রীক্ ধ্যান-ধারণায় রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্র ও পরিধি ছিল ব্যাপক এবং বিস্তৃত। রোমানযুগে রাষ্ট্রের কর্মপরিধিকে অনেকটা সীমিত রাখা হয়। মধ্যযুগে

সামন্তপ্রথার উদ্ভবের ফলে শুধুমাত্র কর ধার্য করা ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষার ভিতরই রাষ্ট্রের ক্রিয়াকর্মকে আবদ্ধ রাখিবার চেষ্টা চলে। ষোড়শ শতাব্দীতে ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও স্পেনে সামন্ততন্ত্রের ধ্বংসের ভিতর দিয়া জাতীয় রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা হওয়ার জন্য সামন্তদের বিপুল ক্ষমতা রাষ্ট্রের অধীনে আনা হয়। ফলে, সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা ও বহির্বাণিজ্যের প্রসারঘটে এবং আইন শৃঙ্খলা, শিক্ষা, সংস্কৃতি, কলা ও ব্যবসা-বাণিজ্যের কর্মক্ষেত্রে রাষ্ট্রের কার্যাবলী প্রসারিত হয়। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার এইরূপ প্রসারের প্রতিক্রিয়া হিসাবেই পরবর্তীকালে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের উদ্ভব হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর শিল্পবিপ্লবের সময় হইতে রাষ্ট্রের কার্যের পরিধি আরও বাড়িতে লাগিল। শুধুমাত্র শিল্পবিপ্লবই নয়, একচেটিয়া কারবার ও ব্যবসায় সংগঠনের উদ্ভব, ভোটাধিকারের প্রসার, দুইটি বিশ্বযুদ্ধ, সমাজতান্ত্রিক মতবাদের প্রসার প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ কারণগুলি রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার পরিধিকেও প্রচণ্ডভাবে প্রসারিত করিতে সাহায্য করিয়াছে। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের ব্যর্থতা ও সমাজতন্ত্রের বিপুল সাফল্য মানুষের জীবনের বিভিন্ন দিকে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাকে ব্যাপকভাবে প্রতিষ্ঠা করিল। ইদানীংকালে ব্যক্তিগত কর্মোদ্যোগকে সীমিত করিয়া জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্রের (Welfare State) মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় কাজকর্ম ও ক্ষমতাকে প্রসারিত করিবার বিশেষ প্রবণতা লক্ষ্য করা যাইতেছে।

এইবার আমরা রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য সম্পর্কে কয়েকজন রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর বক্তব্য আলোচনা করিয়া দেখিব। হবস্ মোটামুটিভাবে রাষ্ট্রকে একটি অকল্যাণকর প্রতিষ্ঠান বলিয়া মনে করিতেন। তাই তাঁহার মতে রাষ্ট্রের বিশেষ কোন উদ্দেশ্য নাই, এবং ইহার কর্ম পরিধিকে সীমাবদ্ধ রাখা প্রয়োজন। লকের মতে সাধারণভাবে মানবসমাজের কল্যাণসাধন করাই রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য। উইলোবি (Willoughby)-এর মতে স্বাধীনতা ও আভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা রক্ষা, ব্যক্তিস্বাধীনতা প্রসারিত করা এবং জনসাধারণের কল্যাণসাধন করাই রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য। ম্যাকআইভার বলিয়াছেন যে, একটি সামাজিক সংগঠন হিসাবে যাহা করা সম্ভব, রাষ্ট্র তাহাই করিবে। বাস্তবে যাহা করিবার মত ইহার যোগ্যতা আছে, সেই কার্য করাই ইহার উদ্দেশ্য।[1] ল্যাস্কি মনে করেন, জনসাধারণের সর্বাধিক কল্যাণসাধনই রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য। তবে ইহার কার্য্যাবলী সীমাবদ্ধ,

1. "What the State should do is what, as an organ of the community, if can do. What services it should render is that of which it is in fact capable." —MacIver

তাই ইহা মানুষের সামগ্রিক কার্য্যাবলী নিয়ন্ত্রণ করিবার অধিকারী নয়।" সর্বশেষে মার্কসীয় দৃষ্টিতে বলা যায়, যেহেতু অসাম্য এবং শ্রেণী সম্পর্কের উপর রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত, সেইজন্য বর্তমান শ্রেণী সম্পর্ককে (existing class relations) রক্ষা করাই রাষ্ট্রের লক্ষ্য এবং ক্ষমতাহীন শ্রেণীর স্বার্থরক্ষা করাই রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য।

যাহাই হউক, রাষ্ট্রীয় উদ্দেশ্য এবং কার্য্যাবলী কি হওয়া উচিত এই সম্পর্কে নৈরাজ্যবাদী তত্ত্ব হইতে সুরু করিয়া সমাজতন্ত্র পর্যন্ত বিভিন্ন মতবাদের অস্তিত্ব রহিয়াছে। আমরা সেইগুলি একটি একটি করিয়া পরে আলোচনা করিতেছি।

২॥ রাষ্ট্রের কার্য্যাবলী (Functions of the State)

রাষ্ট্রের লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্যের সঙ্গে রাষ্ট্রের কার্য্যাবলী অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। কারণ রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য কি হইবে তাহার উপরে রাষ্ট্রের কার্য্যাবলী নির্ভর করে। পূর্বে রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য আলোচনা প্রসঙ্গে বিভিন্ন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী রাষ্ট্রের কার্য্যাবলী কি এবং কতটা হওয়া উচিত এই ব্যাপারে যাহা বলিয়াছেন তাহারও কিছু উল্লেখ করিয়াছি। ডঃ গার্নার রাষ্ট্রের কার্য্যাবলী সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করিয়া বর্তমান যুগের রাষ্ট্রের কার্যকলাপকে তিনভাগে ভাগ করিয়াছেন: (১) অত্যাবশ্যক বা প্রাথমিক কাজকর্ম, যাহা প্রত্যেক রাষ্ট্রকেই সম্পাদন করিতে হয়। (২) স্বাভাবিক কিন্তু অপ্রয়োজনীয় কার্যাবলী, যাহা সম্পন্ন করা রাষ্ট্রের পক্ষে বাধ্যতামূলক নয়। (৩) এমন কতকগুলি কার্যাবলী—যাহা স্বাভাবিকও নয়, অপ্রয়োজনীয়ও নয়। গার্নারের এই বিশ্লেষণ যথেষ্ট যুক্তিপুর্ণ নয়। তাই গেটেল রাষ্ট্রের কাজকর্মকে দুইটি ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন, যথা: (১) **অত্যাবশ্যক বা মৌলিক কার্যাবলী** (essential) এবং (২) **ইচ্ছাধীন কার্যাবলী** (optional)।

(১) মৌলিক বা অত্যাবশ্যক বা অবশ্যকরণীয় কার্য্য বলিতে সেই সমস্ত ক্রিয়াকর্মকে বুঝায় যাহা পালনের সঙ্গে রাষ্ট্রের অস্তিত্ব, স্থায়িত্ব এবং নিরাপত্তা জড়িত। এই সমস্ত কার্যের মধ্যে বিদেশী আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা, জাতীয় জীবনের সংরক্ষণ ও বিকাশ এবং নাগরিকদের ধনসম্পত্তি ও স্বাতন্ত্র্য রক্ষাকে ধরা হইয়া থাকে। রাষ্ট্রের অস্তিত্ব বজায় রাখিতে হইলে সৈন্যবাহিনী, জাহাজ, এরোপ্লেন, অস্ত্রশস্ত্র অর্থাৎ এককথায় প্রতিরক্ষার সমস্ত উপকরণ প্রস্তুত রাখা

প্রয়োজন। শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখিবার জন্য পুলিসবাহিনী ও কর্মচারী নিয়োগ; দেওয়ানী, ফৌজদারী ও অন্যান্য আইন প্রণয়ন, বিচারব্যবস্থা স্থাপন প্রভৃতি করিতে হয়। কিন্তু এই সমস্ত কার্য করিবার জন্য অর্থ সংগ্রহ করিয়া উহা ব্যয় করাও রাষ্ট্রের অবশ্যকরণীয় কার্য।

(২) ইচ্ছাধীন কার্য বলিতে আমরা বুঝি যে সমস্ত কার্য যাহা না করিলে রাষ্ট্রের অস্তিত্ব নষ্ট হইবে না, অথচ করিলে জনগণের কল্যাণ হইবে। ইচ্ছাধীন কার্যকে আবার সমাজতান্ত্রিক (Socialistic) ও অ-সমাজতান্ত্রিক (Non-Socialistic) এই দুইভাগে বিভক্ত করা হইয়া থাকে।

(ক) **সমাজতান্ত্রিক কার্যাবলী :** সমাজতান্ত্রিক কার্য বলিতে সেই সমস্ত কার্যকে বুঝায় যেগুলি ব্যক্তিগত উদ্যোগে পরিচালিত না হইয়া রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে পরিচালিত হইলে অধিকতর মঙ্গল সাধন করিতে পারে এবং দক্ষতার সঙ্গে সম্পন্ন হইতে পারে। রেলপথ, টেলিগ্রাম ও টেলিফোন পরিচালনা, শিল্প ও ব্যবসা পরিচালনা, শিক্ষা বিস্তার, স্বাস্থ্যরক্ষা, বিদ্যুৎ সরবরাহ, সামাজিক নিরাপত্তা বিধান ইত্যাদীকে সমাজতান্ত্রিক ইচ্ছাধীন কার্য বলিয়া মনে করা হয়। অর্থাৎ অনেকে মনে করেন, এই সমস্ত কার্য করিবার জন্য রাষ্ট্র একান্তভাবেই অপরিহার্য নয়, ব্যক্তিগত উদ্যমেও এই সমস্ত কার্য হইতে পারে, তবে রাষ্ট্রীয় পরিচালনায়ই কাম্য।

(খ) **অসমাজতান্ত্রিক কার্যাবলী :** অসমাজতান্ত্রিক কার্য বলিতে এমন কার্যাবলীকে বুঝায় যাহা ব্যক্তিগত উদ্যোগে যথাযথভাবে পালিত হইতে পারে না, যাহা পরিচালনার জন্য রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ একান্ত অপরিহার্য। বিজ্ঞানমন্দির প্রতিষ্ঠা, পরিসংখ্যান সংস্থা পরিচালনা, আর্তের সেবার ব্যবস্থা, রাস্তা নির্মাণ প্রভৃতিকে অ-সমাজতান্ত্রিক ইচ্ছাধীন কার্য বলা হয়।

রাষ্ট্রীয় কার্যাবলীর উপরোক্ত বিশ্লেষণ মূলত ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের আদর্শ দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত। কিন্তু বর্তমানে বিশেষ করিয়া প্রথম মহাযুদ্ধের পর হইতে রাষ্ট্রের কার্যের পরিধি এইরূপ বিস্ময়করভাবে বাড়িয়া চলিয়াছে যে, রাষ্ট্রের ইচ্ছাধীন ও অত্যাবশ্যক কাজকর্মের সীমারেখা ক্রমশ সঙ্কুচিত হইয়া আসিতেছে। শিল্প বিপ্লব, ভোটাধিকারের প্রসার, শিল্প ও ব্যবসায়ে নতুন নতুন সম্ভাবনা, বিগত দুইটি মহাযুদ্ধ, জনকল্যাণকর রাষ্ট্রের চিন্তার প্রসার

প্রভৃতি কারণে রাষ্ট্রীয় কার্য অভাবনীয়ভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। এমন কি আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেনের মত ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী রাষ্ট্রেও রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ অভাবনীয়রূপে বৃদ্ধি পাইয়াছে। আর অনুন্নত দেশগুলিতে তো ইহা প্রমাণিতই হইয়াছে যে, রাষ্ট্রীয় কর্মপ্রচেষ্টা ব্যতীত আর্থিক উন্নতি সম্ভব নয়। প্রাচীন 'পুলিসী রাষ্ট্রের' ধারণা ত্যাগ করিয়া রাষ্ট্রকে বর্তমানে মানুষের সর্বাঙ্গীন উন্নতি সাধনের উদ্দেশ্যে ব্যাপক কর্মপন্থা গ্রহণ করিতে হইতেছে। তাই রাষ্ট্রীয় কর্মপরিধি আজ মানুষের জীবনের সর্বক্ষেত্রে প্রসারিত।

৩॥ রাষ্ট্রীয় কার্য্যবলী সম্পর্কে বিভিন্ন মতবাদ (Theories of State Functions)

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে রাষ্ট্রের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও কর্মপরিধি সম্পর্কে বিভিন্ন মতবাদ প্রচলিত আছে। একদিকে নৈরাজ্যবাদীরা রাষ্ট্রের কোন প্রকার প্রয়োজনীয়তা আছে বলিয়া স্বীকার করেন না, সুতরাং রাষ্ট্রের কার্যের পরিধি সম্পর্কিত কোনপ্রকার আলোচনার প্রয়োজনকে তাহারা অস্বীকার করেন। অপরপক্ষে সমাজতন্ত্রীরা মনে করেন যে, রাষ্ট্রের কাজকর্মের কোনরূপ সীমারেখা থাকিতে পারে না, রাষ্ট্র সমস্ত কিছু করিবার অধিকারী। রাষ্ট্রীয় ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কীয় তত্ত্বগুলির মধ্যে নৈরাজ্যবাদ, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ, ভাববাদ ও সমষ্টিবাদই প্রধান। সমষ্টিবাদকে আবার জনকল্যাণনীতি, ফ্যাসীবাদ ও সমাজতন্ত্রে বিভক্ত করা যায়। সমাজতন্ত্রের ও বিভিন্ন রূপ আছে।
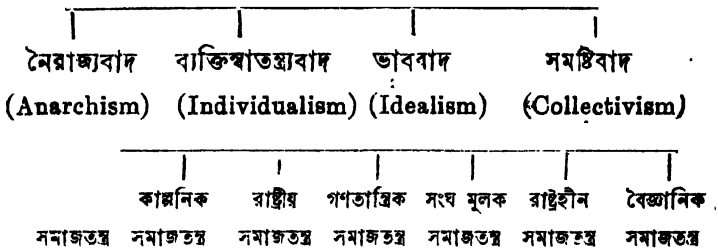
(১) **নৈরাজ্যবাদ (Anarchism):** নৈরাজ্যবাদের উৎপত্তি হইয়াছে উনবিংশ শতাব্দীতে। নৈরাজ্যবাদের মূল কথা হইল এই যে, মানুষ স্বভাবতই

সৎ, সরল ও সহযোগপরায়ণ; কিন্তু রাষ্ট্র শ্রেণীস্বার্থ রক্ষার জন্য তাহার উপর আইন কানুন চাপাইয়া দিয়া শোষণ ও দুর্নীতির যন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে। সুতরাং নৈরাজ্যবাদিগণ রাষ্ট্রের বিলোপ সাধন করিয়া সমস্যার সমাধান করিতে চান।[2] তাঁহারা মনে করেন যে, রাষ্ট্রের বিলোপ সাধনের পর উহার স্থান দখল করিবে কতগুলি সংঘ।

বাস্তবকে উপেক্ষা করিয়া কল্পনার উপর ভিত্তি করিয়া নৈরাজ্যবাদ সৃষ্টি হইয়াছে। নৈরাজ্যবাদের সমালোচনা করিয়া বলা যাইতে পারে যে, রাষ্ট্রকে উচ্ছেদ করিলেও উহার স্থানে কোন না কোন কর্তৃত্বের আবির্ভাব অবশ্যম্ভাবী। দ্বিতীয়ত, বিভিন্ন ব্যক্তি ও সংঘের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের জন্য রাষ্ট্রের প্রয়োজন অস্বীকার করা যায় না। তৃতীয়ত, রাষ্ট্র ব্যক্তিস্বাধীনতার স্বীকৃতি দেয় এবং উহাকে সংরক্ষণ করে, সুতরাং রাষ্ট্র না থাকিলে ব্যক্তির স্বাধীনতা ও অধিকার স্বীকৃত ও সংরক্ষিত হইতে পারে না। চতুর্থত, নৈরাজ্যবাদ রাষ্ট্রে অরাজকতা সৃষ্টির মনোভাব তৈয়ারী করে।

(২) ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ (Individualism): মার্ক্যানটাইলিস্ট নামে খ্যাত একদল পণ্ডিত কৃষি, শিল্প, ব্যবসায় প্রভৃতি ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণকে সমর্থন করিয়া তাঁহাদের বক্তব্য প্রচার করায় ইহার প্রতিক্রিয়া হিসাবে ফিজিওক্রাটরা (Physiocrats) আর্থিক ক্ষেত্রে ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্য দাবী করিলেন। তাঁহাদের মতে কৃষি, শিল্প, ব্যবসায় ও বাণিজ্যের ক্ষেত্রে যত বেশি ব্যক্তিস্বাধীনতা থাকিবে ততই রাষ্ট্রের উন্নতি হইবে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে এই মতই পরিবর্তিত হইয়া ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের রূপ ধারণ করে।

রাষ্ট্র ও সমাজের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গলের জন্য নৈরাজ্যবাদিগণ রাষ্ট্রের সম্পূর্ণ বিলুপ্তির কথা বলিয়াছেন। কিন্তু ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদিগণ রাষ্ট্রের সম্পূর্ণ বিলোপ দাবী করেন না, রাষ্ট্রকে ত্রুটিপূর্ণ ও অনিষ্টকর প্রতিষ্ঠান বলিয়া স্বীকার করিয়াও অনিচ্ছাসত্ত্বে ইহার অস্তিত্বকে মানিয়া লইয়াছেন। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদীরা মনে করেন যে, রাষ্ট্রের কার্যকলাপের গণ্ডীকে যত বেশি সীমিত করা যাইবে রাষ্ট্র ও সমাজের ততই মঙ্গল হইবে। তাই ইহারা রাষ্ট্রের পরিবর্তে ব্যক্তিগত উদ্যোগ ও ক্রিয়াকলাপকে সর্বক্ষেত্রে প্রসারিত করিবার পক্ষপাতী। ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদ মনে করে যে, রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ ব্যক্তির স্বাধীনতা ও ব্যক্তিত্ব

2. "Anarcism is the doctrine that political authority, in any of its froms, is unnecessary and undesirable—Coker.

বিকাশের অন্তরায়। রাষ্ট্রের ক্ষমতা ও কর্মদক্ষতা যত বৃদ্ধি পাইবে, ব্যক্তি-স্বাধনতা ও ব্যক্তিত্ব বিকাশের সম্ভাবনা তত বেশি ক্ষুণ্ণ হইবে বলিয়া ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদীরা আশঙ্কা প্রকাশ করিয়া থাকেন। তাই তাহারা ব্যক্তির স্বাধীনতা ও আধিকারকে প্রসারিত করিয়া রাষ্ট্রের ক্ষমতাকে সংকুচিত করিতে চান। রাষ্ট্রের কর্মপরিধিকে সঙ্কুচিত করিয়া ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদিগণ কেবলমাত্র ব্যক্তির জীবন, সম্পত্তি,অধিকার ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষার ক্ষেত্রে ইহাকে আবদ্ধ রাখিতে চান। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের অন্যতম সমর্থক মিল বলিয়াছেন: নিজের উপর, নিজের দেহ ও মনের উপর, প্রত্যেক ব্যক্তি পূর্ণমাত্রায় সর্বভৌম কর্তৃত্বের অধিকারী (over himself, over his own body and mind, the individual is sovereign)। মিলের এই উক্তির ভিতর দিয়া ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদের প্রকৃত রূপটি ধরা পড়িয়াছে। বস্তুত বেন্থাম (Bentham), জন ষ্টুয়ার্ট মিল প্রমুখ ইউটিলিটারিয়ান (utilitarian) এবং হারবার্ট স্পেনসার (Herbert Spencer) প্রভৃতি দ্বারাই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী তত্ত্বের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। যে-সমস্ত নৈতিক, দার্শনিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক যুক্তি তর্কের উপর ভিত্তি করিয়া ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদীরা তাঁহাদের মতবাদকে প্রতিষ্ঠা করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, উহাদের নিম্নে আলোচনা করা হইল।

১। নৈতিক যুক্তি: মানুষ অন্যের সাহায্য ব্যতীত আপন প্রচেষ্টায় নিজেকে উন্নত করিবে, ইহাই স্বাভাবিক প্রাকৃতিক নিয়ম। রাষ্ট্র যদি প্রতিটি ব্যাপারে ব্যক্তিজীবনে হস্তক্ষেপ করে, তবে ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বিকাশলাভ করিবে না, ব্যক্তির আত্মনির্ভরতা হ্রাস পাইবে এবং ব্যক্তিজীবনের সমূহ ক্ষতি হইবে। সেইজন্য রাষ্ট্রীয় কর্মক্ষেত্রকে সীমিত করিয়া ব্যক্তিকে নিজ ইচ্ছামত চলিবার স্বাধীনতা ও অধিকার দেওয়া প্রয়োজন।

২। দার্শনিক যুক্তি: দার্শনিক যুক্তির অবতারণা করিয়া বলা হইয়া থাকে যে, ব্যক্তির জন্য রাষ্ট্র; রাষ্ট্রের জন্য ব্যক্তি নয়। রাষ্ট্রের কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই, ব্যক্তির ভিতর দিয়াই রাষ্ট্রের অস্তিত্ব। সুতরাং রাষ্ট্রের ক্রিয়াকলাপ ও ক্ষমতাকে যথাসম্ভব সঙ্কুচিত করিয়া ব্যক্তিগত স্বাধীন কর্ম-প্রচেষ্টাকে প্রাধান্য দেওয়া প্রয়োজন।

৩। রাজনৈতিক যুক্তি: জনগণের রাজনৈতিক ও অন্যান্য অধিকার রক্ষার জন্য রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্র সঙ্কুচিত করা একান্ত প্রয়োজনীয়। ইতিহাসের

নজীর দেখাইয়া বলা হইয়া থাকে, যে-সমস্ত রাষ্ট্রে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা অপ্রতিহত ও প্রসারিত থাকে সেখানেই ব্যক্তিস্বাধীনতার বিলুপ্তি ঘটিয়াছে। সুতরাং জনগণের অধিকার ও স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য রাষ্ট্রীয় কর্মক্ষেত্রকে সীমিত করা প্রয়োজন।

৪। অর্থনৈতিক যুক্তি : মার্ক্যানটাইলিস্টগণ কৃষি, শিল্প, ব্যবসায়, বাণিজ্য প্রভৃতির ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণকে সমর্থন করায় প্রতিক্রিয়া হিসাবে ফিজিওক্র্যাটরা আর্থিক ক্ষেত্রে ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্য দাবী করিল। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের সমর্থক অর্থনীতিবিদ্ অ্যাডাম স্মিথ দেখাইয়াছেন যে, ব্যক্তিগত ও স্বাধীন ব্যবসায়ের ফলে সামাজিক উৎপাদন ও দেশের অগ্রগতি বৃদ্ধিলাভ করে। তাঁহার মতে ব্যক্তিজীবনে রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ না ঘটিলে পারস্পরিক প্রতিযোগিতার ভিতর দিয়া উৎপাদন এবং ইহার উৎকর্ষ বৃদ্ধি পাইবে। অপরপক্ষে রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ দ্বারা ব্যক্তিস্বাধীনতা খর্বিত হইলে ব্যক্তি তাঁহার চিন্তা, বুদ্ধি ও কর্মপ্রচেষ্টাকে কার্যকরী করিতে পারে না। সুতরাং রাষ্ট্রীয় কর্মক্ষেত্রকে যত সীমিত রাখা যায় ততই ভাল।

৫। বৈজ্ঞানিক যুক্তি : হারবার্ট স্পেনসার প্রভৃতিরা বিবর্তন তত্ত্বের উল্লেখ করিয়া বলেন যে, জীবজগতে বাঁচার প্রতিযোগিতায় যাহারা সংগ্রাম করিয়া পরিবেশের সঙ্গে মানাইয়া চলিতে পারে তাহারাই বাঁচিয়া থাকে, অন্য সবাই বিলুপ্ত হইয়া যায়। সুতরাং তাহাদের মতে মানবসমাজেও যাহাতে এই প্রাকৃতিক নিয়ম কার্যকর হইতে পারে তাহার চেষ্টা করা উচিত। তাই রাষ্ট্রীয় সাহায্য ও সক্রিয় সংরক্ষণ ব্যতীত ব্যক্তিরা যাহাতে স্বাভাবিক জীবজগতের নিয়মানুযায়ী অস্তিত্ব রক্ষা ও আত্মপ্রসার করিতে পারে, তাহার জন্য রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাকে একান্তভাবে সীমিত করা প্রয়োজন বলিয়া ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদীরা মনে করেন।

উপরোক্ত যুক্তি ছাড়াও বলা হইয়া থাকে যে, গত কয়েকশত বৎসরের অভিজ্ঞতায় দেখা গিয়াছে যে, ব্যক্তির স্বাধীন প্রচেষ্টাতেই সমাজ অধিকতর সমৃদ্ধির পথে অগ্রসর হইতে পারে। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদীরা আরও বলিয়া থাকেন যে, ব্যক্তিগত প্রচেষ্টাকে সর্বদা অন্যায় ও ত্রুটিপূর্ণ এবং রাষ্ট্রীয় কাজকর্মকে সর্বদা অভ্রান্ত মনে করিবার সঙ্গত কোন কারণ নাই। ব্যক্তির কর্মপ্রেরণা ও কুশলতার বাহিরে রাষ্ট্রের নিজস্ব কোন অস্তিত্ব নাই। সুতরাং

রাষ্ট্রীয় সাফল্য ও ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার উপর নির্ভর করে। এমতাবস্থায় ব্যক্তিগত ক্ষমতাকে সীমিত করিয়া রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাকে প্রসারিত করা অর্থহীন।

সমালোচনা: ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের সমর্থনে যে-সমস্ত যুক্তির অবতারণা করা হইয়াছে তাহার গুরুত্ব কম নয়। অপরপক্ষে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের সমালোচনা করিয়া যে-সমস্ত বক্তব্য উপস্থিত করা হইয়াছে তাহাও উপেক্ষণীয় নয়। বস্তুতপক্ষে সমাজতন্ত্রবাদের ভাব ও আদর্শের প্লাবনে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ বর্তমানে একপ্রকার নিশ্চিহ্ন হইয়াছে বলা চলে। পরিবর্তিত সমাজব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদীদের অধিকাংশ যুক্তিই বর্তমান যুগে অসার ও অযৌক্তিক বলিয়া মনে হয়। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের বিরুদ্ধে যে-সমস্ত সমালোচনা করা হইয়াছে তাহা নিম্নে উপস্থিত করা হইল।

১। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদীরা যে নৈতিক যুক্তি দেখাইয়াছেন তাহার সমালোচনা করিয়া বলা হয়, বর্তমান যুগের সমস্যা জটিল সমাজে সব শ্রেণীর মানুষের পক্ষে নিজ নিজ স্বার্থ সম্পর্কে সচেতন থাকিয়া চলা সম্ভব নয়, দুর্বল, অশিক্ষিত ও অজ্ঞ লোকেরা যাহাতে জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে তাহা দেখা রাষ্ট্রের নৈতিক দায়িত্ব। জোড্ (Joad) বলিয়াছেন যে, সব ব্যক্তিই সমান দূরদর্শী, সব ব্যক্তিরই নিজ অভাব জানার ক্ষমতা আছে এবং ব্যক্তিগত কল্যাণ ও জনকল্যাণের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই—এই ধারণা ভুল।

২। ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদীরা দার্শনিক যুক্তির অবতারণা করিয়া বলিয়াছেন যে, ব্যক্তির জন্য রাষ্ট্র, রাষ্ট্রের জন্য ব্যক্তি নয়। তাহাই যদি হয় তবে দুর্বল, অজ্ঞ ও অসহায় ব্যক্তির সাহায্যের জন্য রাষ্ট্রীয় হস্ত প্রসারিত হইবে না কেন? সুতরাং ব্যক্তির সমষ্টিগত জীবনকে উপেক্ষা করা রাষ্ট্রের অনুচিত।

৩। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদীদের যুক্ত বিশ্লেষণ করিয়া সমালোচকেরা মন্তব্য করিয়াছেন যে, রাষ্ট্রই ব্যক্তিস্বাধীনতা ও অধিকারের ধারক, বাহক এবং সৃষ্টিকর্তা। সুতরাং ব্যক্তিস্বাধীনতা রক্ষার জন্য রাষ্ট্রের কর্মপরিধি সঙ্কুচিত করিতে হইবে এইরূপ যুক্তি গ্রহণ করা যায় না।

৪। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের স্বপক্ষে যে অর্থনৈতিক যুক্তির কথা বলা হইয়াছে তাহার উত্তরে বলা যায় যে, রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণহীন অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় একচেটিয়া কারবার সৃষ্টি হয়, উৎপাদন ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং বণ্টনের ক্ষেত্রে চরম অরাজকতা দেখা যায়। অপরপক্ষে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণে ও রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যবসায় অধীনে সুষ্ঠুভাবে

অর্থনৈতিক জীবন পরিচালিত হইতে পারে। তাহা ছাড়া, বর্তমান যুগে রাষ্ট্রের সক্রিয় সাহায্য ব্যতীত কোন ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ব্যবসা-বাণিজ্য চালানো সম্ভব নয়। সুতরাং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও রাষ্ট্রীয় কর্মক্ষমতা প্রসারিত করা প্রয়োজন।

৫। রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রণহীন অবাধ ব্যক্তিস্বাধীনতার তত্ত্বটি সমাজ ও সভ্যতা বিরোধী একটি ভয়াবহ ধারণা। অবাধ ও অনিয়ন্ত্রিত স্বাধীনতা উচ্ছৃঙ্খলতার নামান্তর মাত্র। একজনের বল্গাহীন স্বাধীনতা অন্যের স্বাধীনতা ও অধিকারকে সীমিত করিয়া অরাজকতা সৃষ্টি করে।

উপরোক্ত সমালোচনার ভিত্তিতে বলা যাইতে পারে যে, সমাজ ও চিন্তার পরিবর্তন এবং অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তিগত কর্মক্ষেত্রকে সঙ্কুচিত করিয়া রাষ্ট্রীয় কর্মপরিধি বহুদূর বিস্তৃত হওয়ায় ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের গুরুত্ব বহুলাংশে লোপ পাইয়াছে। বস্তুত সমাজতান্ত্রিক চিন্তার ব্যাপক প্রসারের ফলে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের প্রায় অবলুপ্তি ঘটিয়াছে।

আধুনিক ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ (Modern Individualism)

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে ব্যক্তিগত কর্ম প্রচেষ্টার পরিধিকে সীমিত করিয়া রাষ্ট্রীয় কর্মক্ষেত্রকে পরিব্যপ্ত করার নীতি বহুল পরিমাণে স্বীকৃত হইবার জন্য ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী মতবাদ প্রায় পরিত্যক্ত হইয়াছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে অত্যাধিক রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের বিরুদ্ধে আবার নতুন করিয়া প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। এই প্রতিক্রিয়া সংক্রান্ত মতবাদকেই আধুনিক ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ নামে অভিহিত করা হয়। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের প্রতিক্রিয়া হিসাবে দেখা গেল ব্যক্তির অধিকারকে সীমিত করিয়া রাষ্ট্রের কর্মপরিধিকে প্রসারিত করার প্রচেষ্টা। আবার এই প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া হিসাবে দেখা গেল ব্যক্তির অধিকারকে প্রসারিত করিয়া রাষ্ট্রের ক্রিয়ার কর্মের পরিধিকে কিছুটা সংকুচিত করার চেষ্টা। জোড তাই যথার্থই বলিয়াছেন যে, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া ইহার স্বপক্ষে আর একটি প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করিয়াছে।[3]

গ্রাহাম ওয়ালাস (Graham Wallas), নরম্যান এঞ্জেল (Norman Angell), গিল্ড সমাজতন্ত্রী প্রভৃতিরা আধুনিক ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের প্রবক্তা।

---

3. "The reaction against Individualism has produced a reaction on its own turn."—Joad.

আধুনিক ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ মনে করে যে, বর্তমান কালে রাষ্ট্রের কর্মপরিধি এতটা পরিমাণে পরিব্যপ্ত হইয়াছে যে ইহার ফলে ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বিকাশের পরিপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্ট হইতে পারিতেছে না এবং জনমতের সন্তোষজনক প্রতিনিধিত্ব ঘটিতেছে না। সেই জন্য গিল্ড সমাজতন্ত্রী এবং বহুধবাদীরা এই মতবাদে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ হ্রাস করিয়া সংঘ স্বাতন্ত্র্য প্রবর্তনের কথা বলিয়াছেন। তাহাদের মতে প্রতিটি সংঘ বা সংস্থা অপেক্ষাকৃত কম লোক লইয়া গঠিত হইয়া নিজ নিজ নির্দিষ্ট লক্ষ্য রাষ্ট্র অপেক্ষা অনেক বেশি দক্ষতার সঙ্গে পালন করিতে পারিবে।

গ্রাহাম ওয়ালাস মনে করেন যে, রাষ্ট্রীয় ক্রিয়া-কর্মকে যথার্থভাবে পরিচালনার জন্য সমষ্টিগত চেতনার বিশেষ প্রয়োজন। কিন্তু প্রতিনিধিত্বমূলক শাসন ব্যবস্থায় সমষ্টিগত চেতনার সৃষ্টি হইতে পারে না এবং জনমতেরও যথার্থ প্রতিফলন ঘটিতে পারেনা। সেইজন্য ওয়ালস সংখ্যাগরিষ্টের প্রভাব হইতে ব্যক্তিসত্বাকে রক্ষা করিবার জন্য নির্বাচকমণ্ডলীকে পেশাগত ভিত্তিতে বিভক্ত করা এবং উহাদের আইন সভায় যথাযোগ্য প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা করার কথা বলিয়াছেন। এঞ্জেল ব্যক্তিকে নিছক নাগরিক হিসাবে না দেখিয়া অর্থনৈতিক স্বার্থের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত আন্তর্জাতিক সংগঠনের সদস্য হিসাবে দেখিতে বলিয়াছেন। এইজন্য তিনি রাষ্ট্রীয় কার্যকে সীমিত করিয়া জাতীয় রাষ্ট্রের উর্দ্ধে আন্তর্জাতিক সংগঠন সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তার কথা বলিয়াছেন।

উপরোক্ত আলোচনার ভিত্তিতে বলা যাইতে পারে যে, আধুনিক ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ মূলত সংঘস্বাতন্ত্র্যবাদ এবং ইহাতে বহুত্ববাদী চিন্তার ব্যাপক প্রতিফলন ঘটিয়াছে। আধুনিক ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ ব্যক্তি বা রাষ্ট্রের পরিবর্তে সংঘগুলির উপর গুরুত্ব এবং ব্যক্তিত্ব আরোপ করিবার পক্ষপাতী।

(৩) **ভাববাদ (Idealism):** ভাববাদীরা মনে করেন যে, ব্যক্তির কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই, রাষ্ট্রের অস্তিত্বের মধ্য দিয়াই ব্যক্তি আপনাকে উপলব্ধি করিতে পারে। তাই ভাববাদীদের মত অনুযায়ী ব্যক্তি যত পরিমাণে রাষ্ট্র-দেহে বিলীন হইয়া যাইবে, ব্যক্তি জীবনের তত বেশি স্বার্থকতা। ভাববাদীরা রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্রকে সর্বগ্রাসী ও সর্বব্যাপী করিয়া ব্যক্তিকে রাষ্ট্রের পদতলে বিসর্জন দিয়াছেন এবং সাকল্যবাদের জন্ম (Totalitarianism) দিয়াছেন। এই বিষয় কোন সন্দেহ নাই যে, ফ্যাসীবাদ ও নাৎসীবাদের মত ঘৃণ্য ও মানবসভ্যতার পরিপন্থী তত্ত্বগুলি ভাববাদী নীতিরই পরিণতি।

(৪) **সমষ্টিবাদ** (Collectivism): ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া হিসাবে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে সমষ্টিবাদের উৎপত্তি হইয়াছিল। সমষ্টিবাদিরা ব্যক্তি ও রাষ্ট্রের মধ্যে রাষ্ট্রকেই প্রাধান্য দিয়া থাকেন। ইহাদের মতে রাষ্ট্রীয় কার্যবলীর কোনরূপ সীমা থাকা সম্ভব নয়। ব্যক্তিজীবনকে সমষ্টির কর্তৃত্বের নিয়ন্ত্রণে আনয়ন করিয়া রাষ্ট্রের তথা সমগ্র জনসাধারণের কল্যাণসাধন করাই সমষ্টিবাদের উদ্দেশ্য। সমষ্টিবাদের প্রকাশ বিভিন্নরূপে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের মধ্যে **জনকল্যাণনীতি** (Welfare Theory) **নাৎসীবাদ এবং ফ্যাসীবাদ** (Nazism and Fascism) এবং **সমাজতন্ত্রবাদ** (Socialism) প্রধান। বর্তমান যুগে ইহাদের মধ্যে সমাজ-তন্ত্রবাদ সবিশেষ গুরুত্ব লাভ করিয়াছে। নিম্নে ইহাদের সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হইল।

(ক) জনকল্যাণ নীতি (Welfare Theory)

রাষ্ট্রের কার্যাবলী কি হওয়া উচিত সেই ব্যাপারে ধ্যান-ধারণার পরিবর্তনের ফলে জনকল্যাণমূলক নীতির ভিত্তিতে জনকল্যাণকর রাষ্ট্র গঠনের বিশেষ প্রবণতা ইদানীংকালে লক্ষ্য করা যাইতেছে। ব্যাপকসংখ্যক জনগণের কল্যাণ-সাধনই রাষ্ট্রের লক্ষ্য। এই উদ্দেশ্য পালনের জন্য রাষ্ট্রীয় কর্মপরিধিকে ব্যাপকভাবে প্রসারিত করার প্রয়োজনীয়তার কথা জনকল্যাণমূলক নীতির সমর্থকগণ বলিয়া থাকেন। মানুষের সঙ্গে মানুষের পার্থক্য না করিয়া সর্বমানবের জন্য সর্বপ্রকার উন্নতির পথ এবং সম্ভাবনা উন্মুক্ত করাই জনকল্যাণমূলক নীতির উদ্দেশ্য। স্বভাবতই জনকল্যাণমূলক নীতিতে রাষ্ট্রের কর্মপরিধির কোনরূপ সীমারেখা থাকিতে পারে না—মানুষের জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রেই ইহা প্রসারিত।

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ ব্যক্তির অধিকারকে প্রসারিত করিয়া রাষ্ট্রীয় ক্রিয়া কর্মকে শুধুমাত্র আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার মধ্যে আবদ্ধ রাখিতে চায়। অপরদিকে সমাজতন্ত্রীরা ব্যক্তির উদ্যোগকে সীমিত করিয়া রাষ্ট্রীয় কর্মের পরিধিকে সর্ব-ব্যাপারে পরিব্যাপ্ত করিতে চাহেন। জনকল্যাণমূলক নীতিতে বস্তুত উভয় মতবাদের চরমতার মধ্যে একটি ভারসাম্য রক্ষার চেষ্টা করা হয়। জন-কল্যাণমূলক নীতিতে ব্যক্তির নিরাপত্তার অধিকার, পারিবারিক অধিকার ও অন্যান্য সামাজিক, রাজনৈতিক অধিকারকে স্বীকার করা হয়। কিন্তু সম্পত্তি, শিল্প, বণ্টন, উৎপাদন ইত্যাদির ব্যাপারে জনকল্যাণের প্রয়োজনে

ব্যক্তিগত উদ্যোগ এবং রাষ্ট্রীয় উদ্যোগের মধ্যে একটি সামঞ্জস্য রক্ষার চেষ্টা করা হয়। তাই দেখা যায় যে, জনকল্যাণমূলক নীতিতে ব্যক্তির সম্পত্তির অধিকার স্বীকার করা হয় বটে, কিন্তু এই অধিকার চরম নহে, সামাজিক স্বার্থে সম্পত্তির অধিকারকে নিয়ন্ত্রণ করা যাইতে পারে। শিল্পোন্নয়নের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র ব্যক্তিগত বা রাষ্ট্রীয় উদ্যোগকে স্বীকার না করিয়া যৌথ অর্থনীতির (Mixed Economy) আশ্রয় গ্রহণ করা হয়। বণ্টন ও উৎপাদনের ক্ষেত্রে চরম মুনাফা অর্জনের প্রচেষ্টাতে সংযত রাখিয়া সামাজিক কল্যাণের দৃষ্টিকোণ হইতে ইহাকে নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করা হয়।

জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্রে শিক্ষার প্রসার, জনস্বাস্থ্য সংরক্ষণ এবং চিকিৎসার উন্নতি, সামাজিক কর্তব্য সম্পাদন প্রভৃতিকে রাষ্ট্রীয় কার্য্য হিসাবে গ্রহণ করিয়া থাকে। পরিকল্পিত অর্থনীতির মাধ্যমে উৎপাদন ও সম্পদ বৃদ্ধির দ্বারা জনগণের জীবন যাত্রার মান উন্নয়নেরও প্রচেষ্টা করা হইয়া থাকে।

(খ) ফ্যাসীবাদ (Fascism)

সাকল্যবাদের (Totalitarianism) চরম প্রকাশ দেখিতে পাওয়া যায় ফ্যাসী ও নাৎসী মতবাদের মধ্য দিয়া। ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্য ও ব্যক্তি স্বাধীনতাকে বিসর্জন দিয়া রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের চরমতা সম্পর্কীয় হেগেলীয় মতবাদের দ্বারাই ফ্যাসীবাদ গঠিত ও পরিপুষ্ট হইয়াছে। প্রথম মহাযুদ্ধের পরবর্তী সময়ে ইতালী ও জার্মানীতে মুসোলীনি ও হিটলারের নেতৃত্বে ফ্যাসীবাদ ও নাৎসীবাদের অভ্যুত্থান ঘটিয়াছিল। ইতালীতে গণতন্ত্রের ব্যর্থতা এবং সমসাময়িককালে জার্মানীর অসহ্য গ্লানি ও ব্যর্থতা এই মতবাদ দুইটির প্রতিষ্ঠার সুযোগ সৃষ্টি করিয়াছিল।

ফ্যাসীবাদ ও নাৎসীবাদকে একপ্রকারের নিকৃষ্ট একনায়কতন্ত্র বলিয়া অভিহিত করা যায়। নিজের জাতিগত ঐতিহ্যের মিথ্যা অহমিকা সৃষ্টি করিয়া অন্য সমস্ত জাতির কৃষ্টি, ঐতিহ্য ও সৃষ্টিশীল ইতিহাসকে অস্বীকার করাই এই তত্ত্বের ভিত্তি। স্বভাবতই তাই, জাতিগত শ্রেষ্ঠত্বের অহমিকার জন্য ফ্যাসীবাদ ও নাৎসীবাদ অন্যান্য জাতির সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া সহযোগিতার ভিত্তিতে বসবাস করিবার আন্তর্জাতিক প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করে এবং যুদ্ধের মধ্য দিয়া সমস্ত কিছু, সমাধানের চেষ্টা করে। এই মতবাদ উগ্র জাতীয়তাবাদের দ্বারা সমস্ত জাতিকে উদ্বুদ্ধ করিয়া যুদ্ধের মানসিকতা সৃষ্টি করিয়াছে এবং পৃথিবীর

বুকে এবং অন্য জাতিগুলির উপর সর্বনাশা যুদ্ধকে স্থায়ীভাবে চাপাইয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছে।

এই লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য পালন করিবার জন্য ফ্যাসী ও নাৎসীবাদীরা সর্বপ্রথমে হত্যা করে ব্যক্তিস্বাধীনতাকে। রাষ্ট্রীয় যুপকাষ্ঠে ব্যক্তিস্বাধীনতাকে বলি দিয়া এই মতবাদ রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের চরমতাকে প্রতিষ্ঠা করে। সমস্ত কিছুই রাষ্ট্রের জন্য, রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে কিছু নহে, রাষ্ট্রীয় পরিধির বাহিরে কিছু নহে—ইহাই ফ্যাসীবাদ বা নাৎসীবাদের মূল বক্তব্য। সমস্ত প্রকার গণতান্ত্রিক অধিকার, গণতান্ত্রিক সংস্থা এবং গণতান্ত্রিক বোধ, চিন্তার কণ্ঠরোধ, মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা হরণ করিয়া কৃত্রিম একীকরণ পদ্ধতির আশ্রয় লইয়া ফ্যাসীবাদ তাহার আগ্রাসী ও যুদ্ধংদেহী মনোভাবকে চরিতার্থ করিয়া থাকে।

অনেকে ফ্যাসীবাদ, নাৎসীবাদ ও সাম্যবাদকে সাকল্যবাদেরই বিভিন্ন রূপ হিসাবে বর্ণনা করিয়া থাকেন। ফ্যাসী বা নাৎসীবাদের সঙ্গে সাম্যবাদকে একই স্তরে দাঁড় করানো সাম্যবাদের প্রতি অন্ধ বিদ্বেষ ব্যতীত কিছু নহে। সাম্যবাদ সর্বসাধারণের কল্যাণ এবং মানবতাবাদের উপর নির্ভরশীল একটি প্রগতিশীল মতবাদ। অপরপক্ষে ফ্যাসীবাদ ও নাৎসীবাদ জনকল্যাণ বিরোধী, মানবতা বিরোধী প্রতিক্রিয়াশীল মতবাদ। ইহারই জন্য ফ্যাসীবাদ ও নাৎসীবাদ ইতিহাসের আবর্জনায় নিক্ষিপ্ত হইয়াছে, আর সাম্যবাদ পৃথিবীতে অভূতপূর্ব প্রভাববিস্তার করিয়া ক্রমশ অধিকতর মানুষের দ্বারা স্বীকৃত ও গৃহীত হইতেছে।

(গ) সমাজতন্ত্র (Socialism)

পূর্বেই বলা হইয়াছে, সমষ্টিবাদের একটি বিশেষ রূপ হইল সমাজতন্ত্রবাদ। সমাজতন্ত্রে রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্রের পরিধি সীমাহীন। সমাজতন্ত্রীরা সমাজ ও ব্যক্তি-জীবনের সর্বক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় কর্মক্ষেত্রকে প্রসারিত করিতে চান। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ রাষ্ট্রীয় কর্মক্ষেত্রকে সংকীর্ণ ও সীমিত করিয়া অনিয়ন্ত্রিত ব্যক্তিগত কর্ম-প্রচেষ্টাকে প্রসারিত করিবার যে আদর্শ প্রচার করিয়াছিল তাহারই প্রতিক্রিয়া হিসাবে সমাজতন্ত্রবাদের আবির্ভাব। ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার বিশ্লেষণপ্রসূত সমালোচনার উপরই সমাজতন্ত্রবাদ প্রতিষ্ঠিত। বস্তুত, ধনতন্ত্রের বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ প্রতিবাদ হইতেছে সমাজতন্ত্র। ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা এবং ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য-

বাদের স্বরূপ বিশ্লেষণ করিয়া সমাজতান্ত্রিকেরা দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন যে, সেখানে ধনোৎপাদনের সমস্ত উপাদান ও উৎস ব্যক্তিগত সম্পত্তি হিসাবে সম্পদশালী এবং সমাজে প্রতিষ্ঠাবান একটি শ্রেণীর হাতে থাকে। এই সম্পদশালী বা মালিকশ্রেণী সংখ্যায় অল্প হইলেও দেশের সম্পদের প্রায় সমস্ত অংশটাই নিজেরা আত্মসাৎ করিয়া থাকে। অপরপক্ষে যাহারা প্রকৃতপক্ষে শ্রম দান করিয়া উৎপাদন করে, সেই শ্রমিকশ্রেণী শোষিত ও বঞ্চিত হয়। তাই এইরূপ সমাজব্যবস্থায় পরস্পরবিরোধী স্বার্থসম্পন্ন দুইটি শ্রেণী জন্মলাভ করে। ধনোৎপাদনের উপাদানগুলি মালিকশ্রেণীর হাতে থাকে বলিয়া তাহারা রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভ করে এবং আইন, পুলিস, সৈন্যবাহিনী প্রভৃতি রাষ্ট্রশক্তির প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ প্রয়োগ করিয়া নিজেদের স্বার্থ বজায় রাখিবার চেষ্টা করে।

সমাজতন্ত্রীরা মনে করেন যে, এইরূপ অবস্থার অবসান ঘটাইতে হইলে উৎপাদনের মালিকানা রাষ্ট্রের অধীনে আনিয়া রাষ্ট্রীয় তত্ত্বাবধানে ও নিয়ন্ত্রণে উৎপাদন ও বণ্টনব্যবস্থা পরিচালনা করিতে হইবে। তাই রাষ্ট্রের সমুদয় ধনোৎপাদনের উৎসগুলিকে রাষ্ট্রের হস্তে ন্যস্ত করাই সমাজতন্ত্রের মূল কথা। এইরূপ ব্যবস্থায় রাষ্ট্রের প্রতিটি লোক রাষ্ট্র বা সমাজ কর্তৃক নিযুক্ত কর্মী হিসাবে নিজ যোগ্যতা অনুযায়ী উৎপাদনকার্যে অংশ গ্রহণ করিবে এবং আপন প্রয়োজন অনুযায়ী সম্পদ ভোগ করিবে। কোল-এর (Cole) মতে এইরূপ অবস্থায় (১) ধনী-নির্ধনের মধ্যে কোনরূপ পার্থক্য থাকিবে না, (২) উৎপাদনের উপায়গুলির মালিকানা রাষ্ট্রের হস্তে কেন্দ্রীভূত থাকিবে, (৩) এইরূপ সমাজ-ব্যবস্থায় শ্রেণীহীন, বর্ণহীন ও পারস্পরিক মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ সমাজের সৃষ্টি হইবে। সমাজতন্ত্রীরা নিম্নলিখিত যুক্তিসমূহের উপর ভিত্তি করিয়া তাঁহাদের বক্তব্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।

১। নৈতিক যুক্তি : ধনতন্ত্রকে নীতিবিরুদ্ধ পন্থায় ব্যক্তিগত মুনাফা সৃষ্টির অবাধ সুযোগ দেওয়ার ফলে দুঃখ, দারিদ্র্য ও বঞ্চনার এক বীভৎস পরিবেশ সৃষ্টি হয়। ইহার ফলে মানুষের অন্তর্নিহিত গুণাবলী বিনষ্ট হয়, জাতীয় অবনতির সূচনা ঘটে। সমাজতন্ত্র এই অবস্থা হইতে জনগণকে মুক্তি দিতে পারে এবং মানুষের নৈতিক উন্নতি বিধানে সাহার্য করিতে পারে।

২। দার্শনিক যুক্তির ভিত্তিতে বলা যায় যে, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ সমগ্র সমাজের কল্যাণ করিতে পারে না, ইহা শুধুমাত্র সম্পদশালী শ্রেণীর উন্নতি করে। কিন্তু সমাজ প্রতিটি ব্যক্তিকে লইয়া; ব্যাপকসংখ্যক ব্যক্তির স্বার্থ

বিসর্জন দিয়া সামগ্রিক কল্যাণ হইতে পারে না। সমাজতন্ত্রই কেবলমাত্র সামগ্রিকভাবে সমাজের কল্যাণ করিতে পারে।

৩। রাজনৈতিক যুক্তি : ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ সমানাধিকারের দাবী উপেক্ষা করিয়া সমাজে ধনী-দরিদ্র দুইটি শ্রেণীর সৃষ্টি করে। ইহার ফলে জনগণের মধ্য অসাম্য সৃষ্টি হয় গণতান্ত্রিক নীতি অবহেলিত হয় এবং এই ব্যবস্থা মুনাফার লোভ পৃথিবীতে যুদ্ধ ও সাম্রাজ্যবাদের জন্ম দিয়া অত্যাচার ও জীবনের অপচয় ঘটায়। কিন্তু সমাজতন্ত্রে এইরূপ ঘটিবার আশঙ্কা নাই।

৪। অর্থনৈতিক যুক্তি : ধনতান্ত্রিক সমাজ একচেটিয়া কারবারসহ অন্যান্য মুনাফাভিত্তিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়া অর্থনৈতিক স্বেচ্ছাচার প্রবর্তন করে। অপরদিকে কাঁচামাল সংগ্রহ ও উৎপাদিত দ্রব্য বিক্রয়ের জন্য বাজার সংগ্রহ করিবার উদ্দেশে ধনতন্ত্রকে উপনিবেশ স্থাপন করিতে হয়। কালক্রমে এই উপনিবেশগুলি রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক শোষণের পীঠস্থানে পরিণত হয়। সমাজতন্ত্রে এইরূপ অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইবার সম্ভাবনা থাকে না।

৫। বৈজ্ঞানিক যুক্তি : বৈজ্ঞানিক যুক্তির সাহার্যে ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবাদীরা বলিয়াছেন যে প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়া যাহাদের বাঁচিয়া থাকিবার যোগ্যতা থাকিবে, একমাত্র তাহারাই বাঁচিয়া থাকিবে। এই যুক্তি জীবজগতের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইলেও মনুষ্য সমাজে প্রয়োগ করা চলে না। কারণ মানুষের মনুষ্যত্ব, বুদ্ধি, নীতিবোধ, সৃষ্টিশীল ক্ষমতা ইত্যাদি প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়া বিকশিত হইতে পারে না। সেইজন্য বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ হইতেই বলা যায় যে প্রতিযোগিতা ভিত্তিক ধনতন্ত্র অপেক্ষা সহযোগিতা ভিত্তিক সমাজতন্ত্রের মধ্য দিয়াই মানুষের গুণের প্রকাশ ও বিকাশ ঘটিতে পারে।

ইহা ছাড়াও বলা হয় যে, মানুষের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি ধনতন্ত্র এবং ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য-বাদের দ্বারা সম্ভব নয়। একমাত্র সমাজতন্ত্রই মানুষের আর্থিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাষ্ট্রনৈতিক, দৈহিক, মানসিক দিকগুলিকে পরিপূর্ণ ও বিকশিত করিতে পারে। সর্বোপরি বলা যাইতে পারে যে, সমাজতন্ত্রবাদ মানবতার উপর ভিত্তি করিয়া প্রতিষ্ঠিত।

সমালোচনা : সমাজতন্ত্রের বৈপ্লবিক চিন্তা, আদর্শ ও কর্মসূচীকে সহজভাবে গ্রহন করিতে না পারিয়া স্বভাবতই একশ্রেণীর সমালোচক এই মতবাদকে তীব্রভাবে আক্রমণ করিয়াছেন। প্রথমত, বলা হইয়া থাকে যে

ব্যক্তি-স্বাধীনতা ব্যতীত মানুষের সর্বাঙ্গীণ বিকাশ হইতে পারে না। কিন্তু সমাজ-তান্ত্রিক দেশে ব্যক্তিস্বাধীনতার কোন স্থান নাই। ব্যক্তিকে রাষ্ট্রীয় যূপকাষ্ঠে বলি দিয়া ব্যক্তির উন্নতি ঘটানো যায় না। মানুষের স্বাধীনতা খর্ব করিয়া কখনও স্বাধীনতার মূল্য উপলব্ধি করানো যায় না। দ্বিতীয়ত, সমাজতন্ত্রে রাষ্ট্রকে খুব বেশি প্রাধান্য দিবার ফলে রাষ্ট্র অবাধ ও অনিয়ন্ত্রিত ক্ষমতার অধিকারী হইয়া উঠে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা যায় যে, রাষ্ট্রের এই অবাধ ক্ষমতার অধিকারী হন মুষ্টিমেয় শাসকশ্রেণী। তৃতীয়ত, রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণে সকল কিছু পরিচালিত হয় বলিয়া সমাজতন্ত্র আমলাতান্ত্রিক রূপ ধারণ করে এবং আমলারা একটি স্বতন্ত্র শ্রেণী হিসাবে শাসন ক্ষমতা নিজেদের স্বার্থ এবং প্রাধান্য রক্ষা করার জন্য প্রয়োগ করিয়া থাকে। চতুর্থত, বলা হয় যে, সমাজতন্ত্রে গণতন্ত্র চলিতে পারে না। সমাজতন্ত্র পরোক্ষভাবে এক-নায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে বলিয়া ইহা গণতন্ত্রকে ধ্বংস করে। পঞ্চমত, সমাজতন্ত্রের সমালোচনা করিয়া বলা হয় ব্যক্তিগত মালিকানায় পরিচালিত শিল্পসংস্থাগুলি সরকার নিয়ন্ত্রিত শিল্পসংস্থা হইতে অনেক বেশি কর্মদক্ষ। ষষ্ঠত, সমালোচকের মতে ধনতন্ত্রে প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়া উৎপাদনের বিস্ময়কর উন্নতি হইয়াছে। কিন্তু সমাজতন্ত্রে প্রতিযোগিতার অভাবে অর্থনৈতিক অবনতি ঘটে।

এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই যে সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে যে-সমস্ত সমালোচনা করা হইয়াছে উহাতে কিছু পরিমাণ সত্য থাকিলেও বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই ইহা অতিরঞ্জিত এবং যুক্তিগুলি খুবই দুর্বল। তাই এই সমস্ত সমালোচনা সমাজতন্ত্রের ভিত্তিকে বিন্দুমাত্র দুর্বল করিতে পারে নাই। পৃথিবীর বিভিন্ন সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির বিস্ময়কর সৃষ্টিশীল ক্ষমতা, অগ্রগতি ও সমাজতন্ত্রের মানবতাবাদী আবেদন সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে এই সমস্ত সমালোচনা সত্ত্বেও ইহাকে ক্রমশ জনপ্রিয় করিয়া তুলিতেছে।

সমাজতন্ত্রের বিভিন্নরূপ : সমাজতন্ত্রীরা বিভিন্ন প্রকার সমাজতান্ত্রিক পন্থার কথা বলিয়া থাকেন। এই সমস্ত সমাজতান্ত্রিক তত্ত্বগুলিকে বিশ্লেষণ করিয়া দেখা যাইবে যে, বিভিন্ন প্রকারের সমাজতন্ত্রের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের মধ্যে গভীর পার্থক্য রহিয়াছে। সমাজতন্ত্রের বিভিন্ন প্রকারভেদ লক্ষ্য করিয়া জোড্ বলিয়াছেন যে, সমাজতন্ত্র যেন একটি আকৃতিহীন টুপি, কারণ প্রত্যেকেই ইহা পরিধান করে এবং নিজেকে সমাজতন্ত্রী বলিয়া অভিহিত করে।[4] অর্থাৎ

4. "Socialism.........is like a hat that has lost its shape because everybody wears it." —Joad

'সমাজতন্ত্র' শব্দটিকে এত ব্যপক ও পরস্পরবিরোধী অর্থে প্রয়োগ করা হইতেছে যে ইহার কোন বিশয় অর্থ বা বৈশিষ্ট আছে বলিয়া মনে হয় না। যাহাই হউক সমাজতন্ত্রকে নিম্নলিখিত ভাগে বিভক্ত করা যায় :

১। খৃষ্টীয় সমাজতন্ত্র (Christian Socialism). ২। কাল্পনিক সমাজতন্ত্র (Utopian Socialism), ৩। রাষ্ট্রীয় সমাজতন্ত্র (State Socialism), ৪। গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্র (Democratic Socialism or Fabianism), ৫। সংঘমূলক সমাজতন্ত্র (Guild Socialism), ৬। রাষ্ট্রহীন সংঘমূলক সমাজতন্ত্র (Syndicalism) এবং ৭। বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র বা মার্কসবাদ বা সাম্যবাদ (Scientific Socialism or Marxism)

বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র বা মার্কসবাদ বা সাম্যবাদ (Scientific Socialism or Marxism or Communism)

সমাজতন্ত্রের যে সমস্ত রূপের কথা আলোচনা করিয়াছি উহাদের মধ্যে মার্কসবাদের গুরুত্ব ও প্রভাবের কথা চিন্তা করিয়া আমরা এই সম্পর্কে স্বতন্ত্রভাবে কিছু আলোচনা করিতেছি।

১৮৪৮ সালে প্রকাশিত মার্কস ও এঙ্গেলস লিখিত 'কমিউনিষ্ট ইস্তাহার' (Communist Manifesto) ও ১৮৬৭ সালে প্রকাশিত মার্কসের 'দাস ক্যাপিটাল' (Das Capital) বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রবাদের ভিত্তি। বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রবাদ বা সাম্যবাদের মূল প্রবক্তা কার্ল মার্কস, তাই তাহার নামানুসারে এই তত্ত্বকে মার্কসবাদ নামেও অভিহিত করা হয়। মার্কসীয় তত্ত্বকে ব্যাখ্যার দ্বারা যাঁহারা পরিপুষ্ট করিয়াছেন তাহাদের মধ্যে সর্বাগ্রে এঙ্গেলস এবং লেনিনের নাম উল্লেখ করিতে হয়। ইহারা ব্যতীত ষ্টালিন ও মাও সে তুং-এরও এই ব্যাপারে অবদান আছে।

সমাজতন্ত্রের অন্যান্য যে সমস্ত রূপের উল্লেখ আমরা পূর্বে করিয়াছি, উহারা বাস্তবকে অস্বীকার এবং বৈজ্ঞানিক চিন্তাকে পরিহার করিয়া মূলত কল্পনা এবং হৃদয়াবেগের দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিলেন। কিন্তু মার্কসবাদই সর্বপ্রথম বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে সমাজবিজ্ঞান ও অর্থ বৈজ্ঞানের সূত্র অবলম্বন করিয়া সাম্যবাদের নীতিগুলিকে প্রতিষ্ঠা করেন। তাই মার্কসবাদকে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র নামে অভিহিত করা হয়।

মার্কসবাদ মনে করে যে. ইতিহাস মূলত অর্থনৈতিক অবস্থার দ্বারা প্রভাবিত এবং বিবর্তিত হইয়া থাকে। তাই তিনি ইতিহাসের পুরানো ভাববাদী ধারণাকে পরিহার করিয়া অর্থনৈতিক স্বার্থের ভিত্তিতে শ্রেণীসংগ্রামের কষ্টিপাথরে ইতিহাসকে ব্যাখ্যা করিয়া দেখাইলেন যে প্রতিটি যুগ ও সমাজের পরস্পর বিরোধী স্বার্থসম্পন্ন শ্রেণীগুলির অস্তিত্ব মূলত তৎকালীন উৎপাদন ব্যবস্থা, উৎপাদন সম্পর্ক, বিনিময় পদ্ধতি অর্থাৎ তৎকালীন অর্থনৈতিক ব্যবস্থারই ফলশ্রুতি। মার্কসের এই ব্যাখ্যাকে ইতিহাসিক বস্তুবাদ (Historical Materialism) বলা হয়। বিভিন্নযুগের ধনোৎপাদনের বিভিন্ন পদ্ধতি বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে সমাজের উৎপাদিত সম্পদ এবং ধনোৎপাদনের উপাদানগুলিকে একটি শ্রেণী. যাহারা সংখ্যায় নগণ্য, দখল করে এবং অন্য শ্রেণী প্রথম শ্রেণীর নিকট শ্রম বিক্রয় করিয়া সহায় সম্পদহীন অবস্থায় কোনপ্রকারে জীবিকানির্বাহ করিয়া থাকে। প্রথম শ্রেণীকে মালিক শ্রেণী এবং দ্বিতীয় শ্রেণীকে মেহনতী বা শ্রমিক শ্রেণী নামে অভিহিত করা যায়। প্রাক্‌ ঐতিহাসিক সমাজ ব্যতীত অন্যান্য যুগের ইতিহাস মূলত এই দুইটি শ্রেণীর মধ্যে শ্রেণীসংগ্রামের ইতিহাস।

মার্কসবাদের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য হইতেছে পুঁজি ও শ্রমের সম্পর্কের চূড়ান্ত ব্যাখ্যা। অর্থাৎ বর্তমান সমাজে উৎপাদনের পুঁজিবাদী পদ্ধতিতে পুঁজিবাদ কিভাবে শ্রমিককে শোষণ করে ইহা তাহার বিশ্লেষণ। মার্কসবাদ মনে করে শ্রমই সমস্ত সম্পদ এবং সমস্ত মূল্যের উৎস। অথচ নিজের শ্রমে উৎপন্ন মূল্যের সমস্তটুকু শ্রমিক পায় না, ইহার এক বিরাট অংশ তাহাকে পুঁজিপতিরনিকট সমর্পণ করিতে হয়। অর্থাৎ, মালিক শ্রমিককে তাহার প্রাপ্যমূল্য হইতে বঞ্চিত করিয়া উহার সামান্য একটা অংশমাত্র মজুরী হিসাবে প্রদানকরে এবং অবশিষ্ট অংশটা নিজে আত্মসাৎ করে। ইহাকেই মার্কস উদ্বৃত্ত মূল্য বা Surplus Value বলিয়াছেন।

মার্কসবাদ মনে করে যে ক্রমবর্ধমান এবং এই বিরামহীন শোষণ ও বঞ্চনার সম্মুখীন হইয়া শ্রমিকশ্রেণী বলিষ্ঠ, ঐক্যবদ্ধ এবং বৈপ্লবিক সংগঠন সৃষ্টির মাধ্যমে ক্ষমতাসীন শ্রেণীকে বলপূর্বক ক্ষমতা হইতে বিতাড়িত করিয়া সর্বহারা শ্রেণীর একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট থাকে। কারণ, মার্কসের ভাষায় বলা যায় যে, সর্বহারা শ্রেণীর হারাইবার কিছুই নাই, বরং জয়লাভ করিবার জন্য পড়িয়া আছে সম্মুখে এক বিরাট পৃথিবী (The workers have nothing.

to loose but their chains. They have a would to win)। সর্বহারা শ্রেণীর একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইলে এই ব্যবস্থার ধনোৎপাদনের উপাদানগুলি রাষ্ট্রীয় অধিকারে আসে, বণ্টন ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটে এবং স্বাভাবিক-ভাবেই বাষ্ট্রীয় কর্মপরিধির বিপুল এবং ব্যপক প্রসার ঘটে। সর্বহারা শ্রেণীর নেতৃত্বে প্রথমে প্রতিষ্ঠিত হয় সমাজতন্ত্র এবং ধীরে ধীরে সমাজতন্ত্রের উত্তরায়ণ ঘটে সাম্যবাদে।

ইতিহাসের বস্তুবাদী ব্যাখ্যা এবং উদ্বৃত্ত মূল্যতত্ত্বই বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের ভিত্তি। তাই এঙ্গেলস যথার্থই বলিয়াছেন, "ইতিহাসের বস্তুবাদী ব্যাখ্যা এবং উদ্বৃত্ত মূল্য দিয়া পুঁজিবাদী উৎপাদনের রহস্য উদ্ঘাটিত হইয়াছে। এই দুইটি বিরাট আবিস্কারের জন্য আমরা মার্কসের কাছে ঋণী। এই আবিস্কারগুলির ফলে সমাজতন্ত্র হইয়া উঠিল বিজ্ঞান।"

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়

আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও সংগঠন

(International Relations and Organisations)

বর্তমান পৃথিবী বিভিন্ন স্বার্থের সংঘাতে এবং আণবিক অস্ত্রের বিস্ময়কর অগ্রগতির ফলে এক বিপদজনক অবস্থায় আসিয়া উপনীত হইয়াছে। একদিকে উত্তেজনা, সংঘাত, যুদ্ধ মনোবৃত্তি এবং সেই উদ্দেশে মারণাস্ত্র সৃষ্টির প্রতিযোগিতা যেমন বৃদ্ধি পাইতেছে, অপরদিকে এই সার্বিক ধ্বংসের প্রচেষ্টাকে প্রতিবিধানের জন্য আন্তর্জাতিক তৎপরতাও বৃদ্ধি পাইয়াছে। তাই আন্তর্জাতিকবোধের প্রসার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক স্থাপনের বিভিন্ন প্রচেষ্টা এবং আন্তর্জাতিক সংগঠনের দ্বারা বিভিন্ন রাষ্ট্রের কাজকর্মকে নিয়ন্ত্রণ করিবার চেষ্টা লক্ষ্য করা যাইতেছে। সমসাময়িক ছাত্র-ছাত্রীদের বিশেষ করিয়া রাষ্ট্র-বিজ্ঞানের ছাত্র-ছাত্রীদের পক্ষে এই সমস্ত বিষয়ে জ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা এবং ইহার গুরুত্বের কথা বিবেচনা করিয়া আমরা এই অধ্যায়ে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক এবং আন্তর্জাতিক সংগঠন সম্পর্কে কিছু প্রাথমিক আলোচনা উপস্থিত করিলাম।

১॥ আন্তর্জাতিকতা (Internationalism)

জাতিতত্ত্বের আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা বলিয়াছিলাম যে মানুষের প্রতি ভালবাসা, নৈকট্যবোধ এবং সৌভ্রাতৃত্বমূলক মনোভাব জাতীয় গণ্ডী অতিক্রম করিয়া সমগ্র পৃথিবীতে পরিব্যপ্ত হওয়াকে আন্তর্জাতিকতা বলা যাইতে পারে। বিকৃত এবং আগ্রাসী জাতীয়তাবাদ, সাম্রাজ্যবাদ এবং সামরিকবাদ প্রভৃতির বিকল্প হিসাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে আন্তর্জাতিকতার মহান আদর্শ। সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে পারস্পরিক বোঝাপড়া ও আদান ও প্রদানের মধ্য দিয়া 'নিজে বাঁচো ও অপরকে বাঁচিতে দাও'—এই নীতিকে রূপায়ণ করাই আন্তর্জাতিকতার উদ্দেশ্য। আন্তর্জাতিকতাবোধের সৃষ্টি হইয়াছে তখনই বলা যাইবে যখন আমরা সমগ্র পৃথিবীকে আমার দেশ মনে করিতে পারিব, বিশ্ববাসীকে

আমার স্বজাতি মনে করিব এবং আমার নিজের দেশের মত অন্য দেশকে ভালবাসিতে শিখিব।[1]

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যে বিশৃঙ্খলা এবং নৈরাজ্য চলিয়াছে তাহা হইতে মুক্ত করিয়া আন্তর্জাতিক শৃঙ্খলার পরিবেশ সৃষ্টি করিতে পারে আন্তর্জাতিকার মহান আদর্শ। পরিবহন এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার বৈপ্লবিক অগ্রগতি বিভিন্ন জাতি ও রাষ্ট্রের মধ্যকার ভৌগলিক ব্যবধানকে দূরীভূত করিবার ফলে সমস্ত পৃথিবীকে একটি বৃহৎ মানুষ পরিবার হিসাবে চিন্তা করার সময় আসিয়াছে। এইরূপ সম্ভাবনাকে বাস্তবে রূপায়িত করিতে পারিলে অর্থনৈতিক দিক হইতে উন্নত এবং অনুন্নত জাতির অস্তিত্ব অর্থাৎ ধনী ও দরিদ্রের ব্যবধান দূরীভূত হইবে। বেশির ভাগ জাতিই সমস্ত দিক দিয়া স্বাবলম্বী হইতে পারে নাই, সুতরাং দেওয়া-নেওয়ার ভিত্তিতে তাহারা যে সম্পর্ক গড়িয়া তুলিয়াছে তাহাকে আরও প্রসারিত করিয়া আন্তর্জাতিকতার প্রতিষ্ঠা সম্ভব।

বিগত দুইটি মহাযুদ্ধ সভ্যতার উপরে যে আবর্জনার স্তূপ জড় করিয়াছে বিভিন্ন জাতির মধ্যে শত্রুতার মনোভাব, ক্রমবর্ধমান ঠাণ্ডা লড়াই, আণবিক ও মারণাস্ত্রের ব্যাপক অগ্রগতি তাহাকে আরও পুঞ্জীভূত করিয়া তুলিয়াছ। আন্তর্জাতিকতার আদর্শই এই বিষাক্ত পরিবেশ হইতে মুক্তি দিয়া পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে সুন্দর, সমৃদ্ধশালী ও সাবলীল জীবন যাপনের সম্ভাবনা সৃষ্টি করিতে পারে। এই উদ্দেশে মধ্যযুগ হইতে বিশেষ করিয়া প্রথম মহাযুদ্ধের পর হইতে বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে সুস্থ আন্তর্জাতিক সম্পর্ক সৃষ্টির চেষ্টা চলিয়াছে। বর্তমান যুগে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের নেতৃত্বে বিভিন্ন জাতির মধ্যে সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ইত্যাদি ব্যাপারে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের প্রচেষ্টা চলিয়াছে। সংঘাতের পরিধিকে সম্প্রসারিত হইতে না দিয়া শান্তিপূর্ণ মীমাংসার প্রচেষ্টার ক্ষেত্রে জাতিপুঞ্জ কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণের আন্তর্জাতিক দায়িত্ব পালনের প্রচেষ্টা চালাইয়া যাইতেছে। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের সুষ্ঠু নিয়ন্ত্রণ এবং আন্তর্জাতিক সংগঠনের কার্যকরী ভূমিকা পালনের মধ্য দিয়াই আন্তর্জাতিকতাবোধে মানবজাতিকে অনুপ্রাণিত করা সম্ভব। পারস্পরিক দ্বেষ, হিংসা, বিদ্বেষ, অবিশ্বাস এবং ঘৃণা হইতে মানবজাতিকে রক্ষা করিতে পারে একমাত্র আন্তর্জাতিকার আদর্শ।

1. "Our country is the world, our countrymen are all mankind. We love the land of our nationality as we love all other lands."

—Walliam Lloyd Garrison

২ ॥ আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ধারা (An outline Of International Relations)

সমাজিক সহযোগিতা যেমন ব্যক্তির বিকাশের সহায়ক, আন্তরাষ্ট্রিক সহযোগিতা বা আন্তর্জাতিক সম্পর্কও তেমনি একটি রাষ্ট্রের নিরাপত্তা ও বিকাশের পক্ষ্যে অপরিহার্য। স্বাধীন ও স্বতন্ত্র একটি বিষয় হিসাবে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক নতুন হইলেও ইহার সম্পর্ক মানুষের সচেতনতা দীর্ঘদিনের। কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্র' গ্রন্থের কয়েকটি তত্ত্বমূলক বিবৃতি আন্তর্জাতিক সম্পর্কের বিষয় প্রাচীনকালের মানুষের সচেতনতার নিদর্শন। কিন্তু এই সচেতনতা সত্ত্বেও একটি পূর্ণাঙ্গ বিষয় হিসাবে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের প্রকৃত আবির্ভাব ঘটে মাত্র বিংশ শতকে। অধ্যাপক কার (E. H. Carr) বলিয়াছেন যে পঠনযোগ্য একটি স্বতন্ত্র বিষয় হিসাবে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক এখনও ইহার শৈশব অতিক্রম করিতে পারে নাই।[2] প্রায় এই একই বক্তব্য পামার ও পারকিনস্ (Pamer and Perkins), অরগ্যানস্কি (Organski) প্রমুখ লেখকদেরও। প্রকৃত পক্ষে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় হইতে অন্তর্জাতিক সম্পর্কের শুরু। তাহার পূর্বে আন্তর্জাতিক রাজনীতি ছিল কিছু সংখ্যক পেশাদার কূটনীতিকের নিয়ন্ত্রণাধীন।

ইতিপূর্বে দীর্ঘকাল ধরিয়া আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয় বিশেষ অনুশীলন হয় নাই কেন তাহার কারণ নির্দেশ করিয়া অধ্যাপক মরগেন্থ (Morgenthau) বলিয়াছেন যে আন্তর্জাতিক সম্পর্ককে যে, নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব এই বিশ্বাসই বহুদিন-পর্যন্ত মানুষের ছিলনা। ইহাছাড়া আন্তর্জাতিক রাজনীতির আলোচনার সময়ে আদর্শবাদের উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করার ফলে বাস্তবসত্যের উদ্ঘাটন দুরূহ হইয়া পড়িত। অধ্যাপক কার আরও একটি কারণ নির্দেশ করিয়াছেন। তিনি বলেন, পূর্বে মনে করা হইত যে যুদ্ধবিগ্রহ কেবল পেশাদার সৈন্যবর্গের নিজস্ব ব্যাপার এবং ইহারাই অনুসিদ্ধান্ত হিসাবে মনে করা হইত যে, আন্তর্জাতিক রাজনীতিও তেমনি পেশাদার কূটনীতিকদের আলোচ্য বিষয়। প্রথম মহাযুদ্ধ এই ধরনের ধারনাকে ভুল ও বিপজ্জনক বলিয়া প্রমানিত করে। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় হইতে আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক সম্পর্কে জনসাধারনের আগ্রহী করিবার প্রচেষ্টা দেখা যায়। আন্তর্জাতিক রাজনীতি যে শুধুমাত্র সৈন্যবর্গ ও কূটনীতিকদেরই বিষয় নয়—

2. "The Science of internatinal politics is in its infancy"—Carr.

এই ধরনের একটা মনোভাব ক্রমশ স্পষ্ট হইয়া উঠে। এই মনোভাব প্রথম দেখা দেয় গোপনচুক্তির (Secret Treaty) বিরুদ্ধে আন্দোলনের আকারে। প্রেসিডেন্ট উইলসনের চৌদ্দ দফানীতির (Fourteen Points) মধ্যে প্রকাশ্য চুক্তি অন্যতম। ১৯১৭ সালের ৮ই নভেম্বরে গৃহীত লেনিনের Decree on Peace-এর একটি মূলকথাই ছিল এই যে, সোভিয়েত সরকার কূটনীতিকে সকল গোপনতা হইতে মুক্তি দিয়া উহাকে প্রকাশ্য করিবেন।

আন্তর্জাতিক সম্পর্কের পঠনপাঠনের প্রসারে জাতিসংঘের অবদান অনস্বীকার্য। বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের সুষ্ঠ অনুশীলনের মধ্য জাতিসংঘের কর্তৃত্বাধীনে লণ্ডন, প্যারিস ও মাদ্রিদে তিনটি আন্তর্জাতিক অধিবেশন (International Studies Conferences) সংগঠিত হয়। এই অধিবেশনগুলিতে এই ঐক্যমত প্রতিষ্ঠিত হয় যে, 'আন্তর্জাতিক সম্পর্ক' অনুশীলনযোগ্য একটি স্বতন্ত্র বিষয় এবং বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে ইহাই পঠনপাঠনের গুরুত্ব অত্যধিক। ইতিমধ্যে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ ও নিরাপত্তা পরিষদ বিভিন্ন রাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতির উপর প্রকাশ্য আলোচনার ফলে পররাষ্ট্রমন্ত্রক গুলি ক্রমশ জনসাধারণের প্রয়োজনের প্রতি প্রতিবেদনশীল হইতে লাগিল।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ এই ধারাটিকে আরও ত্বরান্বিত করে। এবিষয়ে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। সাম্রাজ্যবাদের ক্রমাবনতি ও নূতন স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহের উত্থানের সংগে সংগে ইয়োরোপ হইতে রাজনীতির ভারকেন্দ্র এশিয়ায় স্থানান্তরিত হয় এবং ইহার স্পষ্ট প্রতিফলন দেখা যায় জাতিপুঞ্জের আলোচনাসমূহে। বস্তুতপক্ষে, জাতিপুঞ্জ আন্তর্জাতিক রাজনীতি সম্পর্কে মানুষের উৎসাহ প্রভূত পরিমানে বাড়াইয়া দিয়াছে।

কিন্তু আন্তর্জাতিক সম্পর্কের অন্তর্ভুক্ত বিষয় কি এবং ইহার লক্ষ্য ও পরিধিই বা কিরূপ তাহা লইয়া মতান্তর আছে। এই ব্যাপারে ১৯৪৮ সালে প্যারিসে রাষ্ট্র-বিজ্ঞানীদের যে সম্মেলন হইয়াছিল তাহা স্মর্তব্য। এই সম্মেলনে আন্তর্জাতিক সম্পর্ককে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের একটি প্রধান শাখা হিসাবে স্বীকার করা হয়। আন্তর্জাতিক রাজনীতি, অন্তর্জাতিক সংগঠন ও আন্তর্জাতিক আইন এই তিনটি বিষয়কে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এই সম্মেলন নিঃসন্দেহে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের লক্ষ্য ও আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধীয় আলোচনাকে সহজ করিয়াছে। যদিও ভারতবর্ষ ও পাশ্চাত্যের কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে ইহাকে স্বতন্ত্র একটি পাঠ্য বিষয়ের মর্যাদা দেওয়া হইয়াছে তথাপি একথা বলা নিশ্চয়ই

অসঙ্গত নয় যে, স্বতন্ত্র একটি বিষয় হিসাবে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক এখনও সম্পূর্ণ বিকাশ লাভ করে নাই। আন্তর্জাতিক সংগঠন, কূটনীতি প্রভৃতি বিষয়ে গভীর ও ব্যাপক অনুশীলন ও গবেষণা যত বেশি হইতে থাকিবে, স্বীয় মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হইবার জন্য আন্তর্জাতিক সম্পর্কের দাবী ততই শক্তিশালী হইবে।

৩॥ জাতিসংঘ (League of Nations)

বর্তমান যুগে আন্তর্জাতিক সংগঠন প্রভূত পরিমাণে আন্তর্জাতিক সম্পর্ককে প্রভাবান্বিত করিয়া থাকে। এই সংগঠনগুলি আন্তর্জাতিক সম্পর্ককে একাধারে প্রতিফলিত ও নিয়ন্ত্রণ করে। ভের্সাই শান্তিব্যবস্থার (Versailles Treaty) অঙ্গীভূত এই জাতিসংঘের কর্মারম্ভ হয় ১৯২০ সালের ১০ই জানুয়ারী। একটি স্থায়ী সংগঠনের মাধ্যমে জাতিসংঘকে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা প্রতিষ্ঠার প্রথম প্রকৃত প্রচেষ্টা বলা যাইতে পারে। পূর্ববর্তী আন্তর্জাতিক সংগঠনগুলি ছিল শিথিল এবং অনির্দিষ্ট; জাতিসংঘই প্রথম দৃঢ়সংবদ্ধ সংগঠন। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও বলিতে হইবে যে, জাতিসংঘ নিশ্চয়ই সংগঠনের দিক দিয়া কোন বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনিতে পারে নাই। আলফ্রেড জিমার্ন (Alfred Zimmern) বলিয়াছেন যে, জাতিসংঘ তদানীন্তন রাষ্ট্রব্যবস্থাকেই স্বীকার করিয়া লইয়াছিল; বরং বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে যে রাজনৈতিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত ছিল তাহাকেই আরও সন্তোষজনকভাবে পরিচালনা করিবার প্রচেষ্টায় জাতিসংঘ নিয়োজিত হইয়াছিল। জাতিসংঘের আবির্ভাবে কূটনীতির পূর্বেকার রীতিনীতি আদৌ পরিত্যক্ত হইল না—শুধু কয়েকটি নূতন রীতি ইহার সহিত সংযুক্ত হইল।

বলিতে গেলে জাতিসংঘই প্রথম নীতিগতভাবে স্বীকার করিলে যে, জাতিসংঘের সভ্যদের আন্তর্জাতিক কার্যকলাপের সমালোচনা করিবার নৈতিক ও আইনগত অধিকার ইহার আছে। যৌথ নিরাপত্তার ভিত্তিতে শান্তিপ্রতিষ্ঠার চেষ্টাই ছিল জাতিসংঘের মূল লক্ষ্য। শুধু রাজনৈতিক বিষয়সমূহ নয়, সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিষয়েও আন্তর্জাতিক সহযোগিতার উপর জাতিসংঘ যথোপযুক্ত গুরুত্ব আরোপ করিয়াছিল। পূর্বেই আমরা উল্লেখ করিয়াছি যে, পররাষ্ট্রনীতির উপর প্রকাশ্য আলোচনা জাতিসংঘেই প্রথম শুরু হয়, ফলে গোপন কূটনীতির বিরুদ্ধে আন্দোলন আরও শক্তিশালী হইয়া উঠিল।

প্রায় চার হাজার শব্দে রচিত জাতিসংঘের চুক্তিপত্রটিতে (covenant) প্রস্তাবনা ছাড়াও ছিল ছাব্বিশটি ধারা। প্রস্তাবনাটিতে ছিল জাতিসংঘের

উদ্দেশ্য ও নীতি সম্পর্কে একটি বিবৃতি। এই লক্ষ্যগুলিতে পৌছাইবার জন্য একটি সভা (Assembly), একটি পরিষদ (council), একটি স্থায়ী মহাকরণ (Secretariat) এবং স্থায়ী আন্তর্জাতিক বিচারালয়—এই সাংগঠনিক মাধ্যমগুলি স্থাপিত হইল। মহাকরণকে জাতিসংঘের একটি স্মরণীয় অবদান বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন হ্যারল্ড নিকলসন।

জাতিসংঘের কার্যাবলীর মূল্যায়ন

জাতিসংঘ শেষপর্যন্ত ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইলেও ইহার অবদান নিতান্ত নগণ্য নয়। জাতিসংঘের অবদান সম্পর্কে ও অলটার্সের (Walters) উক্তি প্রণিধানযোগ্য : "জাতিসংঘ যে আদর্শকে তুলিয়া ধরিয়াছিল, যে আশা সৃষ্টি করিয়াছিল, যে পদ্ধতি আবিষ্কার করিয়াছিল এবং যে সমস্ত সংগঠন সৃষ্টি করিয়াছিল সেইগুলি পৃথিবীর সভ্যমানুষের রাজনৈতিক ধ্যানধারণার গুরুত্বপূর্ণ অংশবিশেষে পরিণত হইয়াছে এবং ইহাদের প্রভাব বহুদিন অক্ষুণ্ণ থাকিবে"।[3]

বিশ্বরাজনীতির ক্ষেত্রে সহযোগিতা ও যৌথ প্রচেষ্টার প্রথম প্রকৃত শিক্ষা আধুনিক মানুষকে জাতিসংঘই দিয়াছে। শুধু তাহাই নহে, বিভিন্ন প্রকারের আন্তর্জাতিক রীতিনীতি, কৌশল, প্রক্রিয়া প্রভৃতি জাতিসংঘেই প্রথম পরীক্ষিত হইয়াছে। তথাপি জাতিসংঘ যে ব্যর্থ কারণ জাতিসংঘের তিনটি প্রধান কর্তব্যকার্য ছিল আন্তর্জাতিক শান্তিরক্ষা, যুদ্ধনিবারণ ও যৌথ নিরাপত্তা। এই তিনটি ক্ষেত্রেই জাতিসংঘের ব্যর্থতা সুস্পষ্ট। বিভিন্ন সময়ে যে সকল সঙ্কট উপস্থিত হইয়াছে জাতিসংঘের সাংগঠনিক অব্যবস্থা বা দ্বিধার জন্যই সেগুলির সহজ সমাধান সম্ভব হয় নাই। যাহাই হউক আমরা সংক্ষেপে **জাতিসংঘের ব্যর্থতার কারণসমূহ** আলোচনা করিতেছি।

প্রথমত, জাতিসংঘের চুক্তিপত্রটিকে সন্ধিপত্রে অন্তর্ভুক্ত করা নিঃসন্দেহে একটি বিরাট ভুল। প্রেসিডেণ্ট উইলসনের আগ্রহাতিশয্যে ইহা হইলেও বৃহৎ শক্তিগুলি ইহাকে স্থিতাবস্থা বজায় রাখিবার একটি উপায় হিসাবে ব্যবহার করিতে লাগিল। অপরপক্ষে, বিজিত দেশগুলি স্বাভাবিকভাবেই এই সন্ধিপত্রের প্রতি যথেষ্ট আস্থাশীল ছিল না বলিয়া জাতিসংঘের চুক্তিপত্রটি

3. "the ideals which it sought to promote, the hopes to which it gave rise, the methods it devised, the agencies it created, have become essential part of the political thinking of the civilised world and their influence will survive." —Walters.

তাহাদের সদিচ্ছা সম্যক লাভ করিতে পারে নাই। দ্বিতীয়ত, প্রেসিডেন্ট উইলসনের আদর্শবাদ ও প্রভাব জাতিসংঘ গঠনের পশ্চাতে প্রেরণাস্বরূপ কাজ করিলেও আমেরিকা প্রথম হইতেই জাতিসংঘ হইতে বিচ্ছিন্ন ছিল। ইহাও জাতিসংঘের দুর্বলতার একটি প্রধান কারণ। ম্যাডারিয়াগা (S. D. Madariaga) বলিয়াছেন যে, প্রেসিডেন্ট উইলসন প্যারিস ও ওয়াশিংটনে যে প্রতিক্রিয়ার নির্ভীকভাবে মোকাবিলা করিয়াছেন, জাতিসংঘ হইতে আমেরিকার আত্ম-অপসারণের সংগে সংগে সেই প্রতিক্রিয়া প্রবল হইয়া উঠিল। অধ্যাপক মরগেন্থ এই ব্যাপারটিকে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ না মনে করিলেও, ইহা সত্য যে আমেরিকা জাতিসংঘের সভ্য না হওয়ায় জাতিসংঘ প্রথম হইতেই শক্তিহীন হইয়া পড়িয়াছিল। তৃতীয়ত, জাতিসংঘের সাফল্য অনেকাংশে বৃহৎ শক্তিগুলির আগ্রহ এবং আন্তরিকতার উপর নির্ভরশীল ছিল, অথচ ব্রিটেন ও ফ্রান্স দ্বৈতভাবে জাতিসংঘের নীতি ও কার্যপদ্ধতির প্রতি অবহেলা প্রদর্শন করে। জাপান কর্তৃক মাঞ্চুরিয়া দখল, ইটালী কর্তৃক আবিসিনিয়া অধিকার এবং হিটলার কর্তৃক ভের্সাই সন্ধিপত্র অস্বীকার প্রভৃতি ঘটনার প্রতি ইঙ্গ-ফরাসী নেতৃত্ব উদাসীন ছিল।

সদস্যতা সার্বজনীন হইবে ইহাই ছিল জাতিসংঘের সংগঠনের একটি মূলসূত্র। কিন্তু বস্তুতপক্ষে জাতিসংঘের সদস্য পদ কখনই সার্বজনীন ছিল না। সোভিয়েত রাশিয়া ও জার্মানীকে প্রথম হইতেই বিচ্ছিন্ন রাখা হইয়াছিল; আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র স্বেচ্ছায় দূরে সরিয়া গিয়াছিল; লোকার্নো চুক্তির পরে জার্মানী যদিবা সদস্য হইল, জাপান ১৯৩৩ সালে সদস্যপদ ত্যাগ করিল; রাশিয়া ১৯৩৪ সালে জাতিসংঘের সদস্য হইল, কিন্তু জার্মানী ও ইটালী জাতিসংঘ ত্যাগ করিল। ফলে, জাতিসংঘ বিজয়ীদের সংঘে পরিণত হইয়াছিল। জাতিসংঘের মধ্যে একটি প্রকট স্ববিরোধ ছিল। জাতিসংঘ ছিল জাতীয় সার্বভৌম রাষ্ট্রগুলির আন্তর্জাতিক সংগঠন। নূতন ও পুরাতন জাতিগুলি তাহাদের সার্বভৌমিকতা রক্ষার জন্য সবিশেষ আগ্রহী থাকায় জাতিসংঘের আন্তর্জাতিকতা ক্ষুণ্ণ হইয়াছিল। ইংল্যাণ্ড এবং আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র যথাক্রমে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য ও মনরো নীতির বিষয়ে জাতিসংঘের হস্তক্ষেপে সম্মত ছিল না। অপর পক্ষে, জাতিসংঘের সাংগঠনিক ত্রুটিও ইহার ব্যর্থতার জন্য দায়ী ছিল। ইহার নির্দেশগুলিকে কার্যকর করিবার জন্য কোন আন্তর্জাতিক বাহিনী ছিল না, শুধুমাত্র সভ্যদের অনুরোধ করা ব্যতীত জাতিসংঘের করিবার আর কিছু ছিল

না। ফলে অনেক সময়ই জাতিসংঘের বৈঠকে অচলাবস্থার সৃষ্টি হইত, কোন নির্দেশ কার্যকর করিতে হইলে পরিষদে ঐকমত্যের প্রয়োজন ছিল। শান্তিমূলক ব্যবস্থাগুলি ইহার ফলে প্রায় কখনোই প্রযুক্ত হইত না। জাতিসংঘের আর একটি মূল ত্রুটি ছিল এই যে ইহার চুক্তিপত্রে যুদ্ধকে সম্পূর্ণ বর্জন করা হয় নাই। বিষয়টি কোন রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ এক্তিয়ারভুক্ত হইলে, অথবা পরিষদ ঐকমত্যে উপনীত হইতে ব্যর্থ হইলে, সদস্যরা নিজ নিজ বিবেচনা অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিত। ইহারই ফলশ্রুতি হইল ইচ্ছানুসারে আক্রমণ এবং পরে সদস্যপদ ত্যাগ।

৪॥ সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ (United Nations Organisations)

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভের স'গে সংগেই জাতিসংঘ নিষ্ক্রিয় হইলেও ১৯৪৫ সালের ১৮ই এপ্রিল পর্যন্ত ইহাব অস্তিত্ব ছিল। ১৯৪৬ সালের ১৮ই এপ্রিল জাতিসংঘ সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের মধ্যে বিলীন হইয়া গেল। লর্ড সিসিল বলিয়াছেন : "The League is dead, Long Live the Uuited Nations"।

জাতিসংঘ আধুনিক মানুষকে যে অভিজ্ঞতা ও শিক্ষা দান করিয়াছে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জেব মধ্যে তাহার স্পষ্ট প্রতিফলন আছে। তথাপি সম্মিলিত জাতিপুঞ্জেব প্রতিষ্ঠা ঘোষণার সময় জাতিসংঘের প্রতি অবহেলা দেখান হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে অধ্যাপক নিকলাসের একটি চমকপ্রদ উক্তি স্মরণীয় : নবজাত সংস্থাকে লইয়া উত্তেজনার আতিশয্যে অবসিত সংস্থাটির অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার কথা সকলেই বিস্মৃত হইয়াছিল।

ডামবার্টন ওকস্, ইয়াল্টা ও সানফ্রানসিসকোর সম্মেলনগুলি জাতিপুঞ্জের প্রতিষ্ঠাব ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়া আছে। জাতিপুঞ্জের সনদটি ১৯৪৫ সালের ২৬শে জুন সানফ্রানসিসকোতে পঞ্চাশটি দেশের প্রতিনিধি কর্তৃক স্বাক্ষরিত হয়। সনদটি দশসহস্রেরও অধিক শব্দে রচিত এবং ১১১ টি ধারা ও ১৯ টি পবিচ্ছেদে বিভক্ত। সনদের প্রথম ধারায় ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করা হইয়াছে যে, আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা, বিভিন্ন জাতির মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ আবহাওয়ার সৃষ্টি ও শান্তিপূর্ণ উপায়ে আন্তর্জাতিক সমস্যাবলীর সমাধান করাই নূতন এই সংগঠনটির লক্ষ্য। সনদের দ্বিতীয় ধারায় বলা হইয়াছে যে, জাতিপুঞ্জের মূলসূত্রটি হইল সকল সভ্যরাষ্ট্রের সমান অধিকার। কিন্তু "ভিটো" (বা প্রতিষেধ ক্ষমতা) এই সমানাধিব নীতিকে অবশ্যই ক্ষুণ্ণ করিয়াছে। সনদের একটি প্রধান কর্ম ছিল

সাংগঠনিক মাধ্যমগুলিকে সৃষ্টি ও নিয়ন্ত্রণ করা। ম্যাডারিয়াগা, স্যুমান প্রমুখ লেখকগণ জাতিপুঞ্জকে জাতিসংঘেরই একটি নবতর রূপ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। এই দুইটি সংস্থার মধ্যে কয়েকটি স্পষ্ট সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু বৈসাদৃশ্যগুলিও উপেক্ষনীয় নয়। আমরা অত্যন্ত সংক্ষেপে সেগুলির উল্লেখ করিতেছি।

আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা যে কেবল সুসংবদ্ধ যৌথ উদ্যমের দ্বারাই অর্জন করাই যাইতে পারে ইহা উভয় সংস্থাই বিশ্বাস করে। উভয় সংস্থাই কতকগুলি সার্বভৌম রাষ্ট্রের সংঘ, যদিও তাহাদের ক্ষমতা ছিল সীমিত। জাতিপুঞ্জের সাধারণ পরিষদ ও আন্তর্জাতিক বিচারালয় জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদও স্থায়ী আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের প্রায় অবিকৃত প্রতিরূপ। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থাও আকৃতি ও প্রকৃতিতে উভয় সংগঠনেই একই রূপ ছিল। জাতিপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদ বস্তুত জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের আদর্শেই গঠিত হইয়াছে। এই সকল কারনে ও অস্তুলটার্স বলিয়াছেন যে, শুধুমাত্র নিরস্ত্রীকরণ ও সংখ্যালঘু নিরাপত্তার বিষয়গুলি ব্যতীত জাতিসংঘের প্রতিটি কর্তব্যকর্মই কোন না কোন আকারে জাতিপুঞ্জের মধ্যে পুনঃ প্রবর্তিত হইয়াছে।

ইহা সত্ত্বেও উভয়ের মধ্যে পার্থক্যের অভাব ছিলনা। কোন বিষয়েই জাতিসংঘের অপেক্ষা সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ অধিকতর প্রতিশ্রুতিবদ্ধ না হইলে উহার প্রয়োজনীয়তা আদৌ অনুভূত হইতনা। জাতিসংঘে তৎকালীন পৃথিবীর সকল প্রধান দেশগুলি কখনই একত্রে সদস্য পদভুক্ত হয় নাই। কিন্তু সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে বর্তমান পৃথিবীর তিনটি বৃহত্তম শক্তিই উপস্থিত। অধ্যাপক ইগ্‌লটন বলেন যে, যদিও দুইটি সংগঠনের মধ্যে আকৃতিগত ও গঠন-সংক্রান্ত সাদৃশ্য দেখা যায়, তথাপি উহাদের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য আছে। বৃহৎ শক্তিগুলির ক্ষমতা ও অধিকারগত বিষয়ে জাতিসংঘ অপেক্ষা জাতিপুঞ্জ ভিন্ন নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। নিরাপত্তা পরিষদে বৃহৎশক্তিগুলির অবস্থা অপেক্ষাকৃত সুবিধাজনক। বৃহৎ যুদ্ধ বৃহৎ শক্তিগুলির সংঘাতের ফলেই হইতে পারে; অতএব এই বৃহৎ শক্তিগুলির মতৈক্যের উপর নিরাপত্তা পরিষদের অধিকাংশ কর্মপ্রণালীকে স্থাপিত করিলে যুদ্ধ পরিহার করা যাইবে—এই নীতি জাতিপুঞ্জের মধ্যে বিধৃত হইয়াছে। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের অর্থনৈতিক সামাজিক ও মানবিক উন্নয়নের জন্য সৃষ্ট উপসংস্থাগুলির

কর্মপ্রনালী জাতিসংঘের অধীনস্থ অনুরূপ সংস্থা অপেক্ষা ব্যাপকতর ও বেশী স্পষ্ট। জাতিপুঞ্জের সাধারণ পরিষদ ও নিরাপত্তা পরিষদের মধ্যে ক্ষমতা বিভাজন জাতিসংঘের দুই পরিষদের মধ্যে ক্ষমতা বিভাজন অপেক্ষা যথাযথ। জাতিসংঘের চুক্তিপত্র 'শান্তি' প্রতিষ্ঠার জন্য আগ্রহী ছিল, তবে 'শান্তি' বলিতে সেখানে যুদ্ধপরিহার করাকেই বুঝান হইয়াছে। সেই সঙ্গে প্রকাশ্য কূটনীতি, আন্তর্জাতিক আইনের প্রতি অনুগত্য প্রভৃতির উপরন্তু গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। জাতিপুঞ্জের সনদ এই সকল বিষয়গুলি ছাড়াও বিভিন্ন জাতির মধ্যে আত্মনিয়ন্ত্রনের অধিকার এবং বন্ধুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক সম্পর্কের উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়া একটি নূতন তত্ত্বের সন্ধান দিয়াছে। উপরন্তু মানবিক অধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতার জন্য অর্থ নৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার কথাও সনদ ঘোষনা করিয়াছে। এই উদ্দেশে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে অর্থনৈতিক ও সামাজিক সংস্থাটিকে একটি মুখ্য সংস্থার মর্যাদা দেওয়া হইয়াছে।

জাতিসংঘের তিক্ত অভিজ্ঞতার কথা জাতিপুঞ্জের উদ্যোক্তাদের বিস্মৃত হইবার কথা নয়। তাই নূতনভাবে নূতন উদ্যম লইয়া নূতনতর একটি সংস্থা লইয়া আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তার সন্ধান সুরু হইল।

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের প্রধান সংস্থাগুলি হইল সাধারণ পরিষদ, নিরাপত্তা পরিষদ, অছি পরিষদ, আন্তর্জাতিক বিচারালয়, অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ ও মহাকরণ।

আমরা ইহার মধ্যে প্রধান দুইটি—সাধারণ পরিষদ ও নিরাপত্তা পরিষদ—লইয়া সংক্ষেপে আলোচনা করিব।

(ক) সাধারণ পরিষদ (General Assembly)

সাধারণ পরিষদের গঠন অত্যন্ত সরল। জাতিপুঞ্জের সকল সদস্যই এই পরিষদের সদস্যপদভুক্ত। প্রত্যেক সদস্য রাষ্ট্রেরই ভোটসংখ্যা একটি। ইহার প্রধান কার্য হইল আলোচনা করা, অনুমোদন করা, বিবেচনা করা ও আলোচনার সূত্রপাত করা। নিরাপত্তা পরিষদে যে বিষয়গুলি আলোচিত হইয়া গিয়াছে বা আলোচিত হইতেছে সেগুলির সম্পর্কে অনুমোদন করার অধিকার সাধারণ পরিষদের নাই। অবশ্য নিরাপত্তা পরিষদ ইহাকে অনুরোধ করিলে স্বতন্ত্র কথা। সনদে এই পরিষদকে ব্যাপক আবোক্ষণমূলক ও

অনুসন্ধানমূলক দায়িত্ব দেওয়া হইয়াছে। সকল গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাধিক্যে গৃহীত হয়। জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য সম্পূর্ণ মতৈক্যের প্রয়োজন হইত। সুতরাং এই ক্ষেত্রে জাতিপুঞ্জের সাধারণ পরিষদের সিদ্ধান্ত গ্রহণের নীতিটি অপেক্ষাকৃত সহজ ও উন্নত।

এই পরিষদের প্রথম কার্য হইল ইহার সভাপতি নির্বাচন করা; সাধারণ পরিষদের সভাপতি বৃহৎ শক্তিগুলির প্রতিনিধি হইতে পারিবেন না। ইহা ছাড়া নির্বাচিত হইবেন ১৭জন উপসভাপতি ও ৭জন চেয়ারম্যান।

সাধারণ পরিষদের আলোচ্য বিষয়সূচী পূর্বাহ্নেই সেক্রেটারী-জেনারেল কর্তৃক নির্দিষ্ট হয়। সাধারণ পরিষদকে প্রত্যেক বাৎসরিক অধিবেশনের সূত্রপাত হয় একটি 'সাধারণ বিতর্কে'। শান্তিরক্ষা ও শান্তিপূর্ণ অবস্থার সৃষ্টি প্রভৃতি সমস্যা এই বিতর্কের স্থান পায়। সাধারণ পরিষদের দ্বিতীয় কার্য হইল আন্তর্জাতিক আইন ও ইহার সংকলনের উন্নতি ও প্রসারে উৎসাহ দেওয়া। এক্ষেত্রে সাধারণ পরিষদের অনুমোদন যদিও আইনের মর্যাদা লাভ করে না, তথাপি ইহার কার্যধারা জাতীয় আইনসভার কার্য প্রণালীরই অনুরূপ; এই কারণে এই পরিষদকে quasi-legislatue বলা হইয়া থাকে। সাধারণ পরিষদের রাজনৈতিক কার্যাবলীই অধিক গুরুত্ব অর্জন করিয়াছে এবং এই ক্ষেত্রে ইহা সবিশেষ সাফল্যেরও পরিচয় দিয়াছে। একথা সত্য যে, সনদ রচয়িতাগণ এ বিষয়ে নিরাপত্তা পরিষদ অপেক্ষা সাধারণ পরিষদকে গুরুত্বপূর্ণ সংস্থায় পরিণত করিতে নিশ্চয়ই আগ্রহী ছিলেন না। সাধারণ পরিষদের ক্ষমতার এই সম্প্রসারণের প্রধান কারণ এই যে, বৃহৎ শক্তিগুলির মতানৈক্যের ফলে নিরাপত্তা পরিষদ প্রায়শই একটি অক্ষম সংস্থায় পরিণত হইয়া থাকে। তদুপরি 'ভিটো' প্রয়োগে অবস্থা আরও জটিল হইয়া থাকে। ১৯৫০ সালে কোরিয়ার যুদ্ধ প্রসঙ্গে 'Uniting for Peace' প্রস্তাব গ্রহণের সংগে সংগে সাধারণ পরিষদের কার্যধারা একটি নূতন খাতে প্রবাহিত হইল। শান্তি বিঘ্নিত হইবার আশংকা দেখা দিলে, বা শান্তিভঙ্গ ও আক্রমণাত্মক কার্যাবলী সংগঠিত হইলে নিরাপত্তা পরিষদই উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে ইহাই ছিল সনদ রচয়িতাদের অভিপ্রায়। কিন্তু সাধারণ পরিষদ এই ক্ষমতাটিকে আত্মসাৎ করায় ইহার মর্যাদা বৃদ্ধি পাইল। পক্ষান্তরে নিরাপত্তা পরিষদের অকর্মণ্যতা যেন আরও বৃদ্ধি পাইল।

সাধারণ পরিষদের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক দায়িত্ব ছিল নূতন ও উন্নত আইনগত ও রাজনৈতিক পরিবেশ সৃষ্টি করিয়া শান্তিপূর্ণ পরিবর্তনে সহায়তা করা। এই কর্মাধিকারের দ্বারাই সাধারণ পরিষদ প্যালেষ্টাইন বিভাজনের পরিকল্পনাটিকে রূপায়িত করিয়াছিল, যাহার ফলে স্বাধীন ইসরায়েল রাষ্ট্রের পত্তন হইয়াছিল।

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সাধারণ পরিষদের কার্যকলাপের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে যাহা আমাদের স্বতঃই মনে হইবে তাহা হইল বিধিনিয়মের প্রতি ইহার উদাসীনতা। অধ্যাপক নিকলাসের মতে কোন বিষয়ে মতৈক্য উপনীত হওয়াই যদি প্রধান কর্তব্য হয়, তবে বিধিনিয়মের প্রতি আনুগত্য অপেক্ষা অস্পষ্টতাই অধিকতর প্রয়োজনীয় হইয়া পড়ে।

(খ) নিরাপত্তা পরিষদ (Security Council)

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদ ১১টি সদস্যরাষ্ট্র লইয়া গঠিত, প্রত্যেক সদস্যরাষ্ট্রের একজন করিয়া প্রতিনিধি থাকিবে। এই সদস্যরাষ্ট্রগুলির মধ্যে ৫টি স্থায়ী সদস্য: ইহারা হইল ফ্রান্স, জাতীয়তাবাদী চীন, সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্য (ইংলণ্ড)। ৬টি অস্থায়ী সদস্য সাধারণ পরিষদ কর্তৃক দুই বৎসরের জন্য নির্বাচিত হয়। নিরাপত্তা পরিষদ সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের একমাত্র কার্যনির্বাহক সংস্থারূপে পরিকল্পিত হইয়াছে। সেই পরিকল্পনা অনুযায়ী আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার প্রাথমিক দায়িত্ব ইহারই উপর ন্যস্ত হইয়াছে। বিবদমান দুইটি রাষ্ট্রকে শান্তিপূর্ণ সমাধানে উপনীত হইবার জন্য নিরাপত্তা পরিষদ তাহাদের কয়েকটি নির্দিষ্ট উপায়ে বিবাদের শান্তিপূর্ণ সমাধান খুঁজিতে বলিবে। এই উপায়গুলি হইল আলাপ-আলোচনা, অনুসন্ধান, মধ্যস্থতা, আপোষ, শালিসী, ইত্যাদি। এই উপায়গুলি ব্যর্থ হইলে নিরাপত্তা পরিষদ দোষী সদস্যের বিরুদ্ধে জাতিপুঞ্জের অন্যান্য সদস্যদের বলপ্রয়োগ দ্বারা বিবাদ মীমাংসা করিতে বলিতে পারে।

কিন্তু নিরাপত্তা পরিষদের গঠনপ্রণালী ও ভোটদানের প্রক্রিয়াটি এরূপ যে কোন বৃহৎ শক্তিকে বা তাহার দলীয় অপর কোন রাষ্ট্রকে দোষী বলিয়া ঘোষণা করা একরূপ অসম্ভব। ফলে প্রয়োজন অনুভূত হইলেও দোষী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা দুরূহ হইয়া পড়িয়াছে। 'ভিটো' ব্যবস্থা এই সমস্যাকে অধিকতর জটিল করিয়া তুলিয়াছে। ভিটোর অত্যাধিক ব্যবহারের

ফলে নিরাপত্তা পরিষদে প্রায়ই অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়, এবং ইহারই ফলে সাধারণ পরিষদের ক্ষমতা ও মর্যাদা বৃদ্ধি ও নিরাপত্তা পরিষদের দুর্বলতা প্রকট হইতেছে। অথচ নিরাপত্তা পরিষদ সম্পর্কে সনদের রচয়িতাদের উচ্চাশার সীমা ছিল না। এই কারণেই অধ্যাপক নিকলাস বলিয়াছেন যে, জাতিপুঞ্জের অপর সকল সংস্থা হইতে নিরাপত্তা পরিষদই প্রতিশ্রুতি ও কৃতকর্মের মধ্যে সর্বাধিক পার্থক্য সৃষ্টি করিয়াছে।

নিরাপত্তা পরিষদের এই অক্ষমতাকে ঢাকিবার জন্ত জাতিপুঞ্জের নিয়ন্ত্রণাধীনে কতকগুলি আঞ্চলিক নিরাপত্তা সংস্থা স্থাপিত হইয়াছে। ইহারা আঞ্চলিক সমস্যাগুলির বিহিত করিবে, তবে সমগ্র বিষয়টি সম্পর্কে অবশ্যই নিরাপত্তা পরিষদকে অবহিত করিতে হইবে।

নিরাপত্তা পরিষদের দিক দিয়া বলিতে গেলে আশ্বাসের কথা এই যে, বর্তমান শতকের ষষ্ঠ দশক হইতেই নিরাপত্তা পরিষদের দায়িত্ব ও মর্যাদা পুনরায় বৃদ্ধি পাইতেছে। কঙ্গো ও সাইপ্রাসে ইহার মাধ্যমেই জাতিপুঞ্জের কার্য সম্পাদিত হইয়াছে। একথা বলিলে নিশ্চয়ই অন্যায় হইবে না যে নিরাপত্তা পরিষদের গঠনগত সংঘবদ্ধতা (সদস্যসংখ্যা ১১) ইহাকে সাধারণ পরিষদ (সদস্য সংখ্যা ১২০) অপেক্ষা অধিক সক্রিয় হইবার সুযোগ দিয়াছে।

৫ ॥ সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের ভবিষ্যত (Future of United Nations)

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের ইতিহাস সম্পূর্ণভাবে সাফল্যের ইতিহাস নয়। কিন্তু একথা স্বীকার করিতেই হইবে যে, জাতিপুঞ্জের প্রতিষ্ঠার সময় ইহার স্বপক্ষে মানুষের সহানুভূতি ও সমর্থন অর্জন ছিল করিবার জন্য উদ্যোক্তাগণ ইহার ভবিষ্যত সাফল্যের যে ইংগিত দিয়াছিলেন তাহা অতিরঞ্জিত। ফলে, আশাভঙ্গ পদে পদেই ঘটিয়াছে। অবশ্য সমকালীন পৃথিবীর রাষ্ট্রব্যবস্থা ও শক্তিবিন্যাসের কথা মনে রাখিয়া সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের কার্যাবলীর হিসাব হইলে ইহা যে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইয়াছে তাহা বলা যাইবে না।

জাতিপুঞ্জ ইহার সমগ্র অর্থবরাদ্দের শতকরা ৮৫ ভাগ সমাজ কল্যাণমূলক ব্যয় করে, এবং এই ব্যাপারে ইহা দশ বৎসরের বিশ্বব্যাপী সমাজ নর যে পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছে তাহা প্রভূতভাবে সাফল্যমণ্ডিত এই উদ্দেশ্যে গঠিত EPTA (Expanded Program of Technical Assistance) একটি অত্যন্ত কার্যকর সংস্থা। ইহা ব্যতীত FAO (Food

and Agricultural Organization), UNICEF (United Nations Children's Emergency Fund), UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) প্রভৃতি সংস্থার কার্যাবলী জাতিপুঞ্জের সার্থকতার প্রমাণ। উ থাণ্ট বলিয়াছেন যে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ সদস্যতার দিক দিয়া সার্বজনীন এবং জাতিসংঘ অপেক্ষা কার্যকর ও শক্তিশালী। অবশ্য চীন সাধারণতন্ত্র (কমিউনিষ্ট চীন) যতদিন পর্যন্ত জাতিপুঞ্জের অন্তর্ভুক্ত না হইবে ততদিন জাতিপুঞ্জের সার্বজনীনতা অসম্পূর্ণ থাকিবে।

একথা অনস্বীকার্য যে, সার্বভৌম রাষ্ট্রের সংগঠন হিসাবে জাতিপুঞ্জ শুধু যে টিঁকিয়াই রহিয়াছে তাহা নয়, ওঅল্টার লিপম্যান (W. Lipmann) যথার্থই বলিয়াছেন যে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ "একটি অপরিহার্য সংস্থা।" অভিজ্ঞতার মধ্যদিয়া আমরা বুঝিয়াছি, যে ধরণের আদর্শস্থানীয় আন্তর্জাতিক সংগঠন স্থাপিত হইলে পৃথিবীতে স্থায়ী শান্তি বিরাজ করিবে অথবা শান্তি বিঘ্নিত হইবার আশংকামাত্রও ঘটিবে না, সেইরূপ সংগঠন প্রতিষ্ঠা করিবার মত রাজনৈতিক পরিবেশ ও মানসিক উৎকর্ষ পৃথিবীতে এখনো দেখা দেয় নাই। তাই জাতিপুঞ্জের অধিকাংশ ব্যর্থতার জন্য দায়ী বর্তমান পৃথিবীর জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি। 'ভিটো' সমস্যাটি প্রায়শই জাতিপুঞ্জের একটি ত্রুটি বলিয়া মনে করা হয়; কিন্তু আমরা জানি যে সানফ্রানসিসকো সম্মেলনে বৃহৎ শক্তিগুলি অন্যদেশগুলির প্রবল বিরোধিতার মধ্যেও তাহাদের জাতিপুঞ্জে যোগদানের প্রায় একটি সর্ত হিসাবেই 'ভিটো' দানের অধিকারটি দাবী করিয়াছিল। অর্থাৎ, এই 'ভিটো' মানিয়া না লইলে জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠিতই হইতে পারিত না।

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ যে অপরিহার্য তাহার আর একটি প্রমাণ এশিয়া ও আফ্রিকার নূতন রাষ্ট্রগুলির ইহার প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন। কালভোকোরেসি (Calvocoressi) এই সকল দেশগুলির এই সমর্থনকে জাতিপুঞ্জের মূল্যবান সম্পদ বলিয়াছেন। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন আঞ্চলিক নিরপেক্ষ সম্মেলনের মধ্য দিয়া এই দেশগুলি এই সকল অঞ্চলের মানুষের যুদ্ধবিরোধী মনোভাব ব্যক্ত করিয়া শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য তাহাদের প্রস্তাব তুলিয়া ধরিতেছে। একথা সর্বৈব স্বীকৃত যে, রাশিয়া, আমেরিকা প্রভৃতি দেশগুলি যেভাবে মারাত্মক পারমানবিক ও আন্তর্মহাদেশীয় ক্ষেপনাস্ত্রের অধিকারী হইয়া উঠিয়াছে তাহাতে

যেকোন আঞ্চলিক যুদ্ধই মহাযুদ্ধে পরিণত হইতে পারে। এই সকল দিক দিয়া বিবেচনা করিলে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের প্রয়োজনীয়তা আরো তীব্রভাবে অনুভূত হয়। জাতিপুঞ্জকে ব্যর্থ হইতে দেওয়া যাইতে পারে না, কারণ ইহার ব্যর্থ হওয়ার অর্থ মানুষের সকল আশা ও পরিকল্পনার অপমৃত্যু।

আমরা এই পুস্তকের সূচনায় রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য উদ্ধৃত করিয়াছিলাম "মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ, সে বিশ্বাস শেষ পর্যন্ত রক্ষা করব।" পুস্তকের সমাপ্তিতেও সেই একই আশার বাণীর পুনরুল্লেখ করিয়া পৃথিবীর অপরাজেয় মানুষের প্রতি গভীর আস্থা রাখিয়া বলিতে চাই যে সার্বিক ধ্বংসের সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ করিয়া আন্তর্জাতিকতার প্রসার এবং প্রতিষ্ঠা অবশ্যম্ভাবী। সুতরাং বলা যাইতে পারে, আশার অস্তিত্ব যতদিন থাকিবে, আন্তর্জাতিকতা এবং আন্তর্জাতিক সংগঠনেরও ততদিন ধ্বংস নাই। দৃঢ়তার সঙ্গে বলা যায় যে, আন্তর্জাতিকতাই আমাদের আগামী দিনের উজ্জ্বল ইতিহাসের পাথেয়।